সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889 Vol : XII, Issue : XXV 27 February, 2026

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

সম্পাদক

ড. প্রণবকুমার মাহাতো

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০৯

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual
Peer-reviewed Journal
ISSN : 2394 4889 Vol : XII, Issue : XXV 27 February, 2026

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

Editor :
Dr. Pranab Kumar Mahato

© Publisher

Cover Drawing : Krishnadhan Acharyya

Type Setting & Cover Setting :
Manik Sahu
Mob : 9830950380

Printing and Binding :
Granco Press

Price : 250.00

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P. S. Saraidhela, Dhanbad-828109
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U. P.
Prof. (Dr.) Barendu Mondal, Dept. of Bengali, Jadavpur University
Amar Mitra, (Katha Sahityik: Bankim & Sahitya Academy Awarded)
Nalini Bera (Katha Sahityik. Bankim & Ananda Awarded)
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh)
Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka
Nahida Ashrafi, Editor : Jolodhi, Dhaka, Bangaladesh

Editor :

Dr. Pranab Kumar Mahato, Dept. of Bengali, Saltora N.C. College, Bankura

Working Editorial Board :

Dr. Samaresh Bhowmik, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia
Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Kutubuddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W. B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay, Dept. of Bengali, Saltora N.C. College, Bankura
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Dr. Ujjwal Pramanik, Dept. of Bengali, Saltora Netaji Centenary College, Bankura
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Dr. Soma Mukherjee, Hridaypur, North 24 Parganas

কৃতজ্ঞতা

সময় চলে নিজের ছন্দে, গতিতে। কখনো দাঁড়ায় না, স্তিমিত হয় না। কিন্তু জীবন পাল্লা দিতে অপারগ। কখনো শারীরিক, কখনো মানসিক বিপর্যয় তাকে বেঁধে ফেলে, গন্ডীবদ্ধ করে। মনের উপর পলি জমে। ইচ্ছে ছিল মহাশ্বেতা দেবী, মুনীর চৌধুরী, কবি রাম বসু ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষ স্মরণ ক'রব ঢাকঢোল পিটিয়ে; জীবনের চড়াইটা মালভূমির তলদেশে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেখানেই আছে শালতোড়া নেতাজি সেনটেনারি মহাবিদ্যালয়, এই অধোনমনের কালে এগিয়ে এলো ড. সৌমব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. প্রণব কুমার মাহাতো এবং ছাত্রপ্রতীম ড. উজ্জ্বল কুমার প্রামাণিক। উদ্যোগ গৃহীত হলো, আন্তর্জাতিক সেমিনার উপলক্ষে সাহিত্য অঙ্গনের থেমে যাওয়া রথের রশি ধরে ধারাবাহিকতা রক্ষা করল এই তিন সৌম্যব্রতী যুবক। অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। পত্রিকার ২৫তম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জাঁকজমক ছাড়াই। ছাড়া বা বলি কি করে! হ্যাঁ, বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের ঘনঘটা এবার হলো না। তবুও খুশি এ যাত্রা বেঁচে যাওয়ায়। ধন্যবাদ সবাইকে।

জয়গোপাল মণ্ডল

২৭.০২.২০২৬

We proud to know that
three articals has been referred from the
'Sahitya Angan' Patrika, Vol. IV, Issue : VIII,
31st July 2018 to 'Ful Futuk', Published by Paschimbanga
Bangla Academy, Tathya Sanskriti Daftar, Govt. of West Bengal,
Edited by Renowned Poet Joy Goswami on 12th
February 2019. Except this fact
our jurnal honoured by
many Researchers.
They teke evidence as
reference from this journal. In this rescept the
'Sahitya Angan Patrika' may be honoured as referred journal.

সূচি

সম্পাদকীয় ৭

◎ দুর্গাদাস মিদ্দা —সুকান্ত ভট্টাচার্য শতবর্ষের আলোকে কতটা প্রাসঙ্গিক? ৯

◎ তনিমা দত্ত—বাংলা সাহিত্যে যাযাবরদের জীবন : সেকাল ও একাল ১২

◎ জয়ন্ত নারায়ণ ভট্টাচার্য—'রাধা' উপন্যাসে কৃষ্ণদাসী চরিত্র : অস্তিত্বগত বিচ্যুতি ও কাঠামোগত সংকট ২৫

◎ মৌসুমী ব্যানার্জী—বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবস্থানের ক্রমবিবর্তন (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ) ৩২

◎ সংগ্রাম মাহাত—বিদ্যাসাগরের অনাবিল আনন্দ : প্রসঙ্গ কর্মাটাঁড় ৪২

◎ অমর ভাণ্ডারী—প্রগতি আন্দোলন ও গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা ৪৬

◎ মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি—বিপন্ন-বিস্ময় ও 'আট বছর আগের একদিন' ৫৪

◎ দীপঙ্কর আরশ—পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মুসলমান কবি ৫৯

◎ সৌমেন সাহা—প্রাগ্‌জন্ম সংস্কার : প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা ৬৪

◎ শাশ্বতী সিনহাবাবু—শরৎ সাহিত্যে নারী ৭১

◎ দয়াময় রায়—শতবার্ষিক মুক্তি পত্রিকা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ৭৬

◎ অজয় কুমার দাস—বিদ্যাপতির কবিতায় প্রদীপ, লোকশিল্পের বিস্ময়কর দ্যোতনা — কাব্য সৌন্দর্যের মুক্তবেণী ৮২

◎ পীযূষ বেরা—প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি-চেতনা ও বাস্তুতান্ত্রিক বিন্যাস : পরিবেশসমালোচনামূলক ও পরিবেশ মানববিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা ৯১

◎ কুনাল রায়—খাঁচায় বন্দি পাখির কণ্ঠরোধ : কবি মঞ্জুশ্রী সরকার ৯৯

◎ সৃজিতা ব্যানার্জী—শিশুর নরম হাতে কি শূন্যতা আজ অনিবার্য! ১০২

◎ অমিতাভ ব্যানার্জী—সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় প্রতিফলিত শোষিত মানুষদের জীবন সংগ্রাম ১০৬

◎ প্রদীপকুমার পাত্র—মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' : একটি সমীক্ষা ১১৭

◎ বিজয় হাঁসদা—বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীত : বিষ্ণুপুর থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যাত্রা ১২৬

◎ সোমা সামন্ত—রবীন্দ্রনাথের আলোকে মানবতা, সাহিত্য ও দর্শন : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১৪০

◎ সুরজিৎ প্রামাণিক—জয়দেব বসুর কবিতায় সমাজ ও রাজনীতি ১৪৬

◎ দীপা মাজি—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নর-নারায়ণ' নাটকে কর্ণের কৃষ্ণভক্তি : বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ১৫১

◎ দোলন চ্যাটার্জী—চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের অনবদ্য শিল্পরূপ : শাক্ত পদাবলী সাহিত্য ১৬২

◎ সুজিত দেবনাথ—ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক ১৬৮

◎ শুভ দত্ত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-সাহিত্য : সমাজতত্ত্বের আলোয় ১৭৫

◎ বিশ্বজিৎ পাত্র—এক লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি : রাঢ় বাসরের ছড়া ১৮১

◎ স্বরূপ দে—বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য ১৮৮

◎ গোপাল মণ্ডল—বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন ও কীর্তন সম্প্রসারণে এক মহীয়সী ব্যক্তিত্ব জাহ্নবা দেবী ১৯৪
◎ সত্যজিৎ দত্ত—বিশ্লেষণের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্যচর্চা ২০১
◎ জয়শ্রী মুখার্জী—সাহেবধনী গানে বৈষ্ণব ভাবনার প্রতিফলন ২০৫
◎ শান্তনু সাহা—'আলাপচারী তুলি ও কলম: সমসাময়িক নির্বাচিত মহিলা কবিদের কবিতার প্রাসঙ্গিক পাঠ' ২১৪
◎ মনোজ কুমার দে—নাগরিক বিচ্ছিন্নতা ও বাংলা কবিতা : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা২২২
◎ নিরঞ্জন ঘোষ—বাঁকুড়া জেলার পুরাতত্ত্ব ও জৈন প্রভাব :- একটি অলিখিত ইতিহাস ২৩০
◎ রবিন ঘোষ—বাংলা সাহিত্যের সেকাল একাল : ফিরে দেখা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ২৩৫
◎ প্রকৃতি রায়—জীবনানন্দ চর্চার সেকাল-একাল : নির্জনতা থেকে বিশ্বজনীনতায় উত্তরণ২৪৭
◎ অরুণাভ মুখার্জী—ভাষা থেকে তত্ত্বের সন্ধানে নজরুল সাহিত্য ২৫৪
◎ মৃন্ময় সরকার—মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষাদান — রবীন্দ্রনাথ, চমস্কি এবং অন্যান্য ২৬৩
◎ মহ: খুর্শিদ আলম—গনকণ্ঠের কবি নজরুল : হিন্দু মুসলমানের মূল সুর ২৬৮
◎ সাথী নন্দী—সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা : দেহ, ভাষা ও নাগরিক অস্তিত্বের অন্বেষণ ২৭০
◎ ডাক্তার মাহাত—উনিশ শতকের আলোকে সধবা-বিধবা নারী মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ 'মধুমতী' ২৭৯
◎ অসীম মাজি—রামেন্দ্রসুন্দরের মননে অমঙ্গল : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা ২৮৫
◎ প্রণবকুমার মাহাতো—বৈষ্ণব পদাবলি গান মনুষ্যত্বের উদারলোকে আহ্বান ২৯১
◎ Utsab Ranjan Kar–From Emergency to "Undeclared Emergency" : The Evolving Role of Indian Civil Society. ২৯৬
◎ প্রতিমা প্রামাণিক—কাব্যনাট্যকার মঙ্গলাচরণ ৩০০
◎ মৌসুমী মন্ডল—রবীন্দ্রদর্শনে মানবতাবাদ : মানবমুক্তির এক দার্শনিক রূপায়ণ ৩০৬
◎ অনুপ কুমার মাজি—সমকালীন সংকটের ভেতর মানবিকতা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার পাঠ ৩১৫
◎ গাফফার আনসারী—প্রান্তিক জনপদ ও জনজীবনের চালচিত্র : প্রসঙ্গ নির্মল হালদারের কবিতা ৩২২
◎ सञ्चिता सांतरा—रामकथा के रचयिता : आदिकवि वाल्मीकि ৩৩১
◎ Tushar Mandal–Literary Tourism in the Rarh Region of West Bengal : Textual Landscapes, Cinematic Terrains and Cultural Regionalism ৩৪২
◎ Dr. Sandip Tikait–"Bihar Geet": Re-reading of Social Customs and rituals of the native folks of Manbhum ৩৫৩
◎ সেবিকা হাঁসদা—শতবর্ষে তৃপ্তি মিত্র : ফিরে দেখা, এক অবিস্মরণীয় নাট্য ব্যক্তিত্বের বর্ণময় জীবন ৩৫৮
◎ বুদ্ধদেব মাজী—'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' : এক গণ্ডিবদ্ধ অভ্যস্ত জীবনযাপনের সরোবর থেকে উন্মুক্ত জীবন সমুদ্রের আকাঙ্ক্ষাময় কাব্যগ্রন্থ ৩৬৩

স ম্পা দ কী য়—

'আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারা নিশি, সারা বেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।'

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর দ্রুতগামী জীবনে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ডিজিটালাইজেশন একদিকে যেমন পাঠককে মুঠোফোনে সাহিত্য পৌঁছে দিচ্ছে, অন্যদিকে গভীর পাঠের অভ্যাস কমিয়ে আনছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপ দ্রুত বদলাচ্ছে, যা একদিকে বৈচিত্র্য আনলেও, অন্যদিকে শেকড় বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি তৈরি করছে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই স্বর্ণযুগে আমরা যখন একদিকে দ্রুততম সময়ে বিশ্বজুড়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ দেখছি, অন্যদিকে তখন হারিয়ে ফেলছি ধীর ও গভীর পাঠের আনন্দ। বর্তমান সময়ের সাহিত্য আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত, সংক্ষিপ্ত এবং সোশাল মিডিয়া-নির্ভর। ফেসবুক, ব্লগ বা ই-বুকের মাধ্যমে পাঠকরা এখন সরাসরি লেখকের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, যা ইতিবাচক। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই 'তাৎক্ষণিক' সাহিত্য কি আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির শেকড়কে ধারণ করতে পারছে?

বর্তমান সমাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর সাথেই বদলাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি। ইন্টারনেটের কারণে বিশ্বসংস্কৃতির যে অবাধ প্রবেশ, তা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে যেমন বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে, তেমনি নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। জনপ্রিয়তার মোহে অনেক সময় গভীর মননশীল সাহিত্য হারিয়ে যাচ্ছে হালকা বিনোদনের ভিড়ে।

সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ। বর্তমানে যে সাহিত্য বা সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে, তা যেন শুধুমাত্র ভার্চুয়াল জগৎ বা লাইক-শেয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সেদিকে খেয়াল

রাখা প্রয়োজন। ডিজিটালের পাশাপাশি বইয়ের সুবাস, গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধ এবং ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ার অভ্যাস ধরে রাখা জরুরি।

সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের দায়িত্ব, নতুন যুগের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রযুক্তি একটি মাধ্যম, কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতি হলো জাতির আত্মা। এই আত্মাকে বাঁচিয়ে রেখেই আমাদের আধুনিক হতে হবে। ভার্চুয়াল জগতের চাকচিক্যে যেন আমাদের শেকড় হারিয়ে না যায়, সেটাই আজকের বড় চ্যালেঞ্জ।

'বাংলা সাহিত্যের সেকাল একাল : অনুভবে বিশ্লেষণ' নামাঙ্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগুলির একত্রীকরণে মলাটবন্দী হয়েছে সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার এবারের সংখ্যা। এজন্য পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক ড. জয়গোপাল মন্ডলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজের অধ্যক্ষ সম্মানীয় ড. কিশোর কুমার বিসওয়াল মহাশয় ও অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ণায়ক কমিটির আহ্বায়ক ড. তুষার মন্ডলকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। পরিচালন সমিতির সভাপতি সম্মানীয় সন্তোষ কুমার মন্ডল মহাশয় অভিভাবকের মতো সর্বদাই প্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছেন, তার প্রতি রইল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। বাংলা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, যাদের নিরলস পরিশ্রমে এই লেখাগুলো প্রকাশমুখ দেখেছে তাদের সকলের প্রতি রইল ভালোবাসা। বিশেষভাবে ড. সৌমব্রত ও ড. উজ্জ্বলের কথা না বললেই নয়।

সবশেষে এই পত্রিকার কাজের সঙ্গে যুক্ত সকল মুদ্রণকর্মীর প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। যাঁরা লেখা দিয়ে এই উদ্যোগ সফল করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

প্রণবকুমার মাহাতো

দুর্গাদাস মিদ্দা

সুকান্ত ভট্টাচার্য শতবর্ষের আলোকে কতটা প্রাসঙ্গিক?

হিসেব মতো শতবর্ষের পাদানিতে পা রাখতে চলেছেন কবি সুকান্ত। জাগতিক জীবনের চলাফেরা নয়। তাঁর স্মৃতি চারণের পদক্ষেপ। আজ এই শতবর্ষের আলোকে তাঁকে নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনবোধে কিছু আঁচড় কেটে যেতে চাই সময়ের আয়নায়।

কবি সুকান্ত জন্মেছিলেন এই কলকাতায় বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ সালের ৩০শেষ শ্রাবণ ইংরেজিতে ১৯২৬ এর ১৫ অগাস্ট। এখন তিনি জন্মশতবর্ষের আলোকবৃত্তে।

মাঝে শতবর্ষের চলমান সময় চলে গেছে আপন গতিতে। যে গতিকে আমরা বলি -কালস্রোত।

সেই কালস্রোত! যে কালস্রোতে ভেসে যায় 'জীবন যৌবন ধনমান' শুধু তব অন্তর বেদনা চিরন্তন হয়ে থাক। সেই অন্তর বেদনা প্রসূত নিয়ে আমরা সুকান্তের সাহিত্য চেতনা নিয়ে সামান্য আলোকপাত করবো। স্মৃতির 'তাজমহল' তৈরি করবো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে। জানি এ এক মূঢ় বাতুলতা। তাও এও তো সত্য যে তিনি অম্বুবিম্বের মতো ক্ষণজন্মা হয়েও তিনি শতবর্ষের দোরগোড়ায় এসে আমাদের বন্ধ হৃদয় দুয়ারে মৃদু করাঘাত করছেন তাঁর কর্মের স্রোতধারার ঔজ্জ্বল্যে। তিনি আজও প্রাসঙ্গিক। যে প্রাসঙ্গিকতা তাঁকে আজও এই শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে আমাদের সামনে এনে হাজির করেছে।

তাঁকে অস্বীকার করা মানে আমাদের চেতনার দৌর্বল্য প্রকাশ করা। প্রমাণ করে আমরা কতটা উদাসীন এবং অকৃতজ্ঞ।

সেই দোষের হাত থেকে মুক্ত হতে, বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত হতে আমরা আলোকপাত তাঁর সাধন পথে।

কবিকে নাকি 'দ্বিতীয় ঈশ্বর' বলে গণ্য করা হয়। যদিও আমি ঈশ্বর তত্বে একেবারেই আস্থাহীন। ধর্মের নামে অদ্ভুত এক ভড়ং চলছে সারা বিশ্বে। তবে আমাদের এই পোড়া দেশের মতো নয়। কোটি কোটি দেবতার বাস নাকি এই ভারতে, আর ঠিক ততটাই চোর ডাকাত! ভাবতে এমন ঘৃণা হয় যে আমি- ভারতবাসী।

যাকসেকথা, আমরা ফিরে আসি কবি সুকান্তের আলোচনার বৃত্তে। তিনি কি চেয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন—'বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য—করে যাব আমি-নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' কিন্তু আমরা যা দেখছি কবি যা ভেবেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়নি। বেঁচে থাকলে আজ তিনি অবশ্যই দুঃখ পেতেন বর্তমান পৃথিবীর করুণ অবস্থা দেখে। সারা পৃথিবীতেই শিশুদের কোনো শৈশব নেই। জন্মলগ্ন থেকেই নানা চাপের সম্মুখীন হতে হয় বা হচ্ছে তাদের। এখন তারা 'বাপের স্নেহ মায়ের আদর পায় না। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বাবা মা উভয়েই বাইরে কাজে ব্যস্ত থাকে বা থাকতে বাধ্য হয়। ফলে যতটুকু স্নেহ

মায়া মমতা প্রাপ্য একজন সদ্যোজাত শিশুর তার আর ওদের পাওয়া হয় না। শিক্ষিত বাবা ও মায়ের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণা বেশি। ফলে শিশুদের বাসযোগ্য পৃথিবী এখন নেই। আরও একটা অন্য কারণে নেই তা হল যৌথ পরিবার ভেঙে চুরমার।

দাদু নেই দিদিমা নেই। ছায়াহীন এক মরু প্রান্তরের বাসিন্দা আজকের শিশুরা।

স্বার্থপর জীবনযাপনের ভাবনার কুফল যৌথ পরিবারের ভাঙন। আর এই ভাঙনের ফলে মায়া—মমতা—স্নেহ—এই সমস্ত লালিত্য গুণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আর কেউ নয় এই সমস্ত শিশু। দেওয়া নেওয়া বোঝে না। পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন এক একটা দ্বীপে বাস করে এক একটি স্বার্থপর জীবন তৈরি হচ্ছে যার ফল পৃথিবীর বাসযোগ্যতার সমস্ত নিয়মকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। আপনি বেঁচে থাকলে দেখতেন শৈশব পাথর চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এটা প্রায় অসম্ভব যে শিশুদের পক্ষে সত্যি এক বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করা যাবে? আমার এই মতের সঙ্গে সহমত হতে অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করতে পারেন, তবে এটাই এখন নির্মম সত্য।

শুধু ভরণ—পোষণ সব নয় যদি না তাদের অর্থাৎ শিশুদের মধ্যে মায়া মমতার সঞ্চরণ না ঘটে। একেবারে দিনের মতো সত্য যখন খবরের কাগজে দেখি শিশুদের এমন সব আচরণ দেখিযা মমত্বহীন মানসিকতার প্রকাশের এক দুঃসহ রূপ।

কবি আজ এই ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার ভারে আক্রান্ত হতেন যদি বেঁচে থাকতেন।

তবে এই ব্যর্থতা কখনোই কোনো কবির জীবনে চিরন্তন সত্যের প্রকাশ ঘটায় না।

কবিতা পড়তে পড়তে দেখতে পাচ্ছি কবি শোষণের বিরুদ্ধে কীভাবে গর্জে উঠেছেন। কবির মানসিকতা আমরা জানতে পেরেছি তাঁর রচিত কবিতা পাঠ করে। কারণ কবিতার সৃষ্টি হয় মানসিক অবস্থান থেকে। দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা কবিতার জাত চেনায়। কবি সুকান্ত বামঘরাণার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু কথা শুনে নিলে বুঝতে সুবিধে হবে তিনি কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।" কিশোর বাহিনীর আন্দোলনে সুকান্তকে টেনে এনেছিল তখনকার এক ছাত্রনেতা এবং আমাদের বন্ধু অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। রাজনীতিতে শুকনো ভাবতেন অনেকখানি কেটে গিয়ে নাচ গান নাটক আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বেশ একটা রসকষ এসেছে। কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের যেমন রাজনীতির আসরে ঢুকতে হয়েছিল, সুকান্তের বেলায় তা হয়নি।—সুকান্তর আগের যুগের লোক বলে আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল।" এর থেকে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা গেল যে সুকান্তের কবিতার বিষয় -রাজনীতি নির্ভর। কিন্তু কবিতায় রাজনীতি নির্ভরতা ছিল বলেই তিনি মানুষের কবি হতে পেরেছেন। তাঁর কবিতায় শোষক শোষণ সম্পর্ক উঠে এসেছে। কবিতার মূল বিষয়বস্তু হয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদর্প ঘোষণা। 'ভালখাবার' কবিতাটি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ধনী যারা তারা গরিবকে

শোষণ করে সম্পন্ন হয়ে ওঠে। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন কোন খাবার খেতে পছন্দ করে ধনী ব্যক্তি। যদিও ব্যঙ্গাত্মক তবুও এক নিগূঢ় সত্য উঠে আসছে-সবচেয়ে ভালো খেতে গরীবের রক্ত। এক নগ্ন সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন এই কবিতায় যা তৎকালীন সত্য নয়, চিরকালীন সত্য।

'ব্ল্যাক মার্কেট কবিতাটিও সেই চিরন্তন সত্য বহন করে চলছে।

"হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,
ব্ল্যাক মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার,
গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জতে বাড়ি খান ছয় তাকালো।

ঠিক এইভাবেই এগিয়ে চলেছে শোষণের ধারাবাহিকতা।

'কৃষকের গান' কবিতায় যে আশার বাণী শোনাতে চেয়েছেন তার বেশ প্রণিধানযোগ্য।"
—এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে—

"এইবার ফলাব ফসল—
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন।"

শেষ করছেন কবিতাটি সেই বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়ে যা তাঁর ভাবনার চিরায়ত রূপ।

কী বলছেন? বলছেন— "দুয়ারে শত্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস। কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ।"

সুকান্তের কবিতার আলোচনা করতে বসলে "আঠারো বছর বয়স" নিয়ে কিছু কথা বলতেই হয়। যৌবনের জয়গান গেয়েছেন তিনি। যেমন বিদ্রোহী কবি নজরুলের "যৌবনেরই দূত" কবিতার কথা মনে আসবেই।

কবি বলেছেন—"আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা"।

কী দৃঢ়তা কবির কবিতায়। তাঁকে বিস্মরণ করি কী করে? আরও অনেক কথা বলা যায় লেখা যায়। কিন্তু শেষ করতে হয়।

আজও কবির কবিতায় প্রতিবাদের ধ্বনি শোনা যায় যা সমকালের বলে মনে হয়। তাই কবি সুকান্ত সেকালে যেমন প্রযোজ্য ছিলেন তিনি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। শতবর্ষের আলোকে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানালাম এই আলোচনার মাধ্যমে।

তনিমা দত্ত

বাংলা সাহিত্যে যাযাবরদের জীবন : সেকাল ও একাল

সাহিত্য একটি জাতির আত্মার দর্পণ। মানুষের ভাবনা,অনুভূতি, জীবনবোধ ও সমাজ চেতনা সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষা পায়। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা সাহিত্য ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের সমৃদ্ধ রূপ লাভ করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাপন,সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চিন্তা ধারায় যে রূপান্তর ঘটেছে তার সরাসরি প্রতিফলন ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে।

সেকালের বাংলা সাহিত্য মূলত ধর্ম,সমাজ ও মানবিক আবেগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তখন সাহিত্য ছিল মানুষের নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অন্যতম মাধ্যম। অন্যদিকে একালের বাংলা সাহিত্য ব্যক্তি মানুষ, সামাজিক বাস্তবতা, সংগ্রাম, বিদ্রোহ ও অস্তিত্বের প্রশ্নকে আরো গভীরভাবে তুলে ধরে। এখানে সাহিত্য কেবল সৌন্দর্যের প্রকাশ নয় বরং সমাজ বিশ্লেষণ ও প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক কবিতা, উপন্যাস পর্যন্ত প্রতিটি যুগ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রতিটি সময়ের সাহিত্যিকেরা তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে দেখেছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের রূপ ও ভাষাকে পরিবর্তিত করেছে।আমরা দেখেছি উপনিবেশোত্তর কালে আধিপত্যবাদী বর্গের চাওয়া-পাওয়া নিয়েই আবর্তিত হতো সাহিত্য-শিল্প। কিন্তু আবার স্রোতের মধ্যেই প্রতিস্রোতের মতো জন্ম নিয়েছিল আধিপত্যের দর্পকে চূর্ণ করার বাসনা। তবে আদিতে যে নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের মিলিত উপস্থিতি একেবারেই লক্ষ্য করা যায়নি এমন নয়। ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে হলেও বিশাল গণ-জীবনের এক নিখুঁত সার্বিক চিত্রাঙ্কন আমরা চর্যাপদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। আর মধ্যযুগের সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনাচরণ ধর্মের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরপর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর্ব থেকে মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে চৈতন্যদেবের মানবধর্মে অভিষিক্ত হয়ে লোক সাহিত্যের সপ্তরঙা জীবনের বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ হয় বাংলা সাহিত্য। সময় ও সমাজের অনিবার্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কালের কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় জীবন অজস্র বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের পালা অতিক্রম করে আসে ঠিকই কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির একটি অংশ হয়েও তারা বিধিবদ্ধ সমাজ থেকে অনেকটাই দূরে থেকে যায়। এই বিশাল জনতাকে সমাজে মূলত 'অসভ্য' বলে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়। এই অস্তিত্বহীনতার ও নৈঃশব্দ্যের পরিসরে আবর্তিত হতে থাকে 'অচ্ছুৎ' তথা অস্পৃশ্যদের জীবন, জনজীবনের মূল ধারা থেকে যাদের যোজনব্যাপী দূরত্ব। এই পর্যায়ে অস্থায়ী-ভাসমান-গৃহহীন-যাযাবর সম্প্রদায়ও পড়ে। ভাগ্যের

খোঁজ পাওয়ার জন্যই যাযাবর জাতি পাড়ি দেয় অজানার উদ্দেশ্যে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতা তাদের চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বাংলা সাহিত্যে গোষ্ঠীভিত্তিক নিম্নবর্ণের পরিচয় মেলে ১৯২৩ সালের পর। এর আগে তারা প্রায় অনুল্লিখিত চরিত্রই ছিল। ১৯২৩ সালের কল্লোল এবং কল্লোল-উত্তর পর্বে সেই চিত্র পাল্টে গিয়ে মুচি, ডোম, বাগদি থেকে কাহার, বেদে, বাজিকর, মুন্ডা, ঝালো-মালো প্রভৃতি গোষ্ঠীর রীতিনীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার, ভাষা, লোক-ইতিহাস, মিথ-সাহিত্যে এক ভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। উদ্ঘাটিত হয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের মর্মমূল। এই পর্যায়ে অস্থায়ী ভাসমান গৃহহীন যাযাবর সম্প্রদায়কে নিয়েও রচিত হয়েছে গল্প উপন্যাস। সেই গল্প উপন্যাসে তারা কেউ কেউ ঠাঁই পেয়েছে প্রধান চরিত্র হিসেবেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এদের স্থান কিছুটা সংকীর্ণ। কোন কোন সাহিত্যিক আবার সেই অভাব পূর্ণ করে দিয়েছেন তাদের অসাধারণ লেখনীর গুনে। তবে এই গোষ্ঠী-জীবনের কথা সাহিত্যে আরও পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এরা আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই সম্প্রদায়গুলির উৎস, জীবনধারণ প্রণালী, রীতিনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় বেশ রহস্যময় ও চিত্তাকর্ষক। আর রহস্যময় জীবনের প্রতি আমাদের আকর্ষণতো চিরকালের। আর এই রহস্যময় যাযাবর জীবনের মানুষকে জনগণের সামনে তুলে ধরার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো সাহিত্য। কারণ সাহিত্যই হলো সমাজের দর্পণ। তাই সেই দর্পণে মানুষ যখনই নিজেদের দেখবে তখনই পাবে সেই সব মানুষদের প্রতিচ্ছবি। তাই আমার আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে সেই সব যাযাবররা যারা ভাগ্যের খোঁজ পেতে পাড়ি দেয় অজানার উদ্দেশ্যে। এদের না আছে দেশ, না আছে গ্রাম, না আছে ভিটা। এরা এগিয়ে চলে, পিছনে ফেলে আসে অনেক কাহিনী, উপকথা, লোকোকথা,গাথা। তাই এরা বিস্তৃত সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প "বেদেনী"-তে বেদে সম্প্রদায়কে বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"বিচিত্র জাত বেদেরা।জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা পুজা করে, মঙ্গলচন্ডী, ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। হিন্দু পুরাণকথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। বিবাহ আদান প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না,তারা নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে,মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য সাপুড়েদের সম্পর্কে বলেন -"হিন্দু সমাজে এরা পতিত, মুসলমান সমাজেও এদের ঠাঁই নেই।"[১] জাতে এরা মাগান্তা।মাঙতা কথার অর্থ হল মেঙ্গে খাওয়া। গ্রামে-গঞ্জে,হাটে-বাজারে সাপ খেলা, নেউলের খেলা, ভালুক, বান্দর খেলা, চুরি বা চাকুর বিপদজনক খেলা প্রভৃতি দেখানোর মাধ্যমে চেয়ে নেওয়া বা মেঙ্গে নেওয়া।এই

পদ্ধতি অবলম্বন করে সংসার চালানোই এদের পেশা। ছোট, বড়, মাঝারি বিভিন্ন দলে এরা বিভক্ত। তারা নিজেদের মনে করে জগতের ছায়াহীন মানুষ। কিন্তু সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন জাগে এই যাযাবর কারা?

'যাযাবর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো নিয়ত ভ্রমণকারী বা ভবঘুরে এক সম্প্রদায় যারা নির্দিষ্ট এক জায়গায় বসবাস করে না।নানা স্থানে, দেশে ঘুরে বেড়ায় আর বেছে নেয় বিচিত্র সব পেশা অর্থাৎ নিরন্তর ছুটে চলা এক জীবনের পথিক হলো যাযাবর। আসলে এই যাযাবর হল একদল রহস্যময় মানুষ যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। দেশে দেশে বা অঞ্চল ভেদে তাদের এক এক নাম আর বেঁচে থাকার জন্য বিচিত্র সব পেশা। কিন্তু আসলে এরা কারা? "A member of A wandering race(by themselves called Romani)–of Hindu origin–which first appeared in England about the beginning of the 16th century and was them believed to have come from Egypt.(২)বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির বেশ কিছুটা জুড়ে আছে যাযাবর সমাজ। গল্প, কবিতা, উপন্যাস থেকে শুরু করে সেলুলয়েডের পর্দায় কত রূপে এরা উপস্থিত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু তবুও যেন কোথাও ঘাটতি রয়ে গেছে এদের চিনতে এদের জানতে।আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ধারা থেকে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধ এ ধারাটি। কিন্তু কেন?সেটাই আমরা দেখে নেব তাদের সেকাল এবং একাল-এই আলোচনার মধ্যমে।

যাযাবর জীবন সাহিত্যে কেবল একটি জীবনধারা নয়,এটি সমাজের পরিবর্তনের দলিল।সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যাযাবরদের জীবন, অবস্থান ও মানসিকতার যে রূপান্তর ঘটেছে তা সাহিত্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।এই সাহিত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রান্তিক মানুষের জীবন আরো সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে তবে সেই অগ্রগতি প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। যাযাবরদের জীবন ও সমস্যার আলোচনা আমাদের সমাজের অন্তর্গত বৈষম্য ও উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা অনুধাবনে সহায়ক।যাযাবর জীবন কে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য তাই মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

আমার আলোচনার বিষয় এখানে সেই সমস্ত উপন্যাস যেখানে এই অস্থায়ী, ভাসমান, গৃহহীন যাযাবরদের যাপিত জীবনের প্রতিফলন রয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে যে-উপন্যাসগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে,তার মধ্যে অন্যতম হল অভিজিৎ সেন-এর 'রহু চণ্ডালের হাড়'। উপন্যাসটিতে এক শ্রেণির যাযাবর গোষ্ঠী বাজিকরদের পাঁচ পুরুষব্যাপী দেড়শো বছরের জীবন সংগ্রাম এবং একটি বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়ের ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় টুকরো টুকরো ভাবে উঠে এসেছে। উপন্যাসের বিষয়ের মধ্যেই আছে নিরীক্ষা। পশুচুরি, দখল, জাদু, ভানুমতীর খেল প্রভৃতিকে নিয়ে প্রতিকূলতার সঙ্গে জীবন রক্ষা ও ভবিষ্যতের আশা, স্বপ্নের পথে যাত্রা বাজি ধরারই নামান্তর।

বাজিকরদের নির্দিষ্ট কোন জাত নেই, ধর্ম নেই। পারগানা লক্ষণ সরেন কে পীতেম বলেছিল—"বাজিকর কোন জাত নয়"। পীতেমের উত্তরসূরী শারিবা দেড়শ বছর পরেও একইভাবে বলেছে, তার দোস্ত হানিফকে, আমরা বাজিগর হানিফ ভাই।

বাজিকর কোন জাত নয়।

তবে হামাদের জাত নাই—

গরু খাও?

খাই

হারাম,শুয়োর?

খাই।

তজ্জব! তুমি আমার নিশা কাটায় দিলা হে! এমন মানুষও এদেশে আছে, যার কোন জাত নাই?

বাজিকরেরা বানরের বাচ্চা কে খেলা শেখায়, আর ঢোলকের চামড়ায় কাঠি দেয়। রহু চন্ডালের হাড়ে তেল সিঁদুর লাগে,অনভ্যস্ত পায়ে টানটান দড়ির উপরে হেঁটে যায় বাজিকর বালিকা। বাজিকর বাদিয়ার এই হল পেশা। চাষাবাদ যখন বাজিকরদের জীবনে স্থায়ী হয়নি তখন পেটের তাগিদে তাদের ফিরে যেতে হয়েছে সেই আদিম সংস্কার ও জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে। কারণ বেঁচে থাকাটাই আসল।অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে আবার ঢোলেকে বাড়ি পড়ে—

> 'ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ লাগভেলকি লাগ চোখে মুখে লাগ
> হামারে ছোড়ে সবার লাগ'

এইভাবে রহু চন্ডালের হাড়ের কিসমত দেখায় জনসাধারণকে। অভিজিৎ সেনের 'রহু চন্ডালের হাড়' বাজিকর সম্প্রদায়ের অন্তরালে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ঐতিহাসিক দলিল যার আভাসে আদিম বন্য অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থান পর্যন্ত এক চলমান রেখা এগিয়ে চলে। একের পর এক মৃত্যু, পরাজয় এবং বিষন্নতার মধ্য দিয়ে পীতেম থেকে শারিবা পর্যন্ত পথ চলতে থাকে আর সেই পথ চলা আজও শেষ হয়নি। ঠিক একইভাবে অভিজিৎ সেন তাঁর 'রহু চণ্ডালের হাড়' এ সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। রহু ও তার উত্তরসূরিদের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা, তাদের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-দৈন্য ও সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাসে। শিকড়বিহীন যাযাবর গোষ্ঠীর থিতু হওয়ার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যায় রহু চণ্ডালের হাড়। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসে সাঁওতালরা। তারা জমির স্বপ্ন দেখায় কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে যায় বারবার। দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাদেরকে টেনে নিয়ে আসে পুবে, আরো পুবে। কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কখনো মানবসৃষ্ট সমস্যা তাদের দিশেহারা করে দেয়। মানুষ যখন সান্ত্বনা খোঁজেকেউ

ভগবানের কাছে, কেউ আল্লার কাছে তখন বাজিকররা তাকিয়ে থাকে অতীতের পানে। কেননা তাদের তো কোনো আশ্রয় নেইনা ভগবান, না আল্লা, না যিশু। রহুই তাদের আরাধ্য। তাদের পিতৃপুরুষ। তারা সান্ত্বনা খুঁজেছে কেবল রহুর হাড়ের কাছে। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ সাধারণ মানুষের অলিখিত ইতিহাসের সন্ধান যেমন মেলে তেমনি ভৌগোলিক সম্প্রসারণও নজরে আসে। বাজিকরদের কোনো স্থিতি নেই। গোরখপুর থেকে আরো পুবে পাঁচবিবি পর্যন্ত তাদের কেবল স্থান বদল হয়। প্রতিবারই তাদের মনে হয় এটা তাদের দেশ; এই তো তাদের স্বপ্নের নিকানো উঠান। কিন্তু হায়! সেই স্বপ্ন প্রতিবারই অধরা থেকে যায় দনু, পীতেম কিংবা লুবিনিদের কাছে।

'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর আক্ষেপ আমাদের সামনে স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। শারিবা বলে—"পিত্তিপুরুষের পাপে বেবাক বাজিকর ঘরছাড়া। অভ্যাসে তারে আর টানে না। কারণ কি, পথেই তার সব, জনম মরণ হাসি কাঁদা। শয় শয় বছর এক্কাই চলি গেল। তাবাদে দুনিয়ার রাস্তা একদিন শ্যাষ হয়া গেল। রাস্তাৎ আর সুখ নাই, স্বস্তি নাই। পথে বিপদ আগেও আছিল বাদে তা হোল সীমাছাড়া। সমাজের মানে নানা কারণে বাজিকর বাদিয়াকে ছিড়া খায়। তাই আজ তিন-চার পুরুষ ধরা হামরা থিতু হবার চাছি। কেন্তু থিতু হবার চালেই বাজিকর থিতু হবার পারে না।কারণ কি, তার যি ধরম নাই।"[৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নাগিনী কন্যার কাহিনী"তে বর্ণিত হয়েছে বেদে সংস্কৃতি। উপন্যাসটিতে হিজল বিলের বিষবেদে সম্প্রদায়ের উপকথা নিয়ন্ত্রিত জীবন কথা রূপায়িত হয়েছে। তারা একালের মানুষ হয়েও যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবিচ্ছেদ্য নিয়ন্ত্রণে বাঁধা। তাদের জীবনাচার, মূল্যবোধ, অনুভূতি, বুদ্ধি ইত্যাদি পরিচালিত হয় অলৌকিক বিশ্বাসের অনুশাসনে যুক্তিহীন সংস্কারতার মধ্যে।

ভাগীরথীর কোল ঘেষে হিজলের বিল। আক্ষরিক অর্থেই সেটি শ্বাপদসংকুল, সেখানে জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ অবস্থা। কিন্তু সেখানে বাঘ-কুমিরও এক ঘাটে জল খায় আরেকটি জিনিসের ভয়ে, সেটি হল- সাপ। কালকেউটে, গোখরো, শঙ্খচুড় থেকে শুরু করে হেন সাপ নেই যে সেখানে পাওয়া যায় না। এই সাপের অভয়ারণ্যেই বুক চিতিয়ে চলে একদল লোক, তারা যাতে বেদে। আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায় বিষবৈদ্য। সাপের বিষ বিক্রি করাটাই তাদের পেশা। সেই বিষ থেকে তৈরি হয় অমৃতসঞ্জীবনী সূচিকাভরণ। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই পাণ্ডব বর্জিত বনে এই বিষবৈদ্যরা এলো কোথা থেকে? লখিন্দরের বাবা চাঁদ সওদাগরের অভিশাপেই নাকি তাদের এই নির্বাসন। সেও আবার আরেক চমক লাগানো কাহিনি।

হিজল বিলে মা মনসার আটন পাতা আছে-এ জনশ্রুতি মিথ্যা নয়। শিবরাম কবিরাজের এরকম বিচিত্র রোমাঞ্চিত গল্পের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটি এগিয়ে যেতে থাকে। বিষবেদেদের সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে বিষহরি মায়ের স্থান। বন্যার সময় হিজল বিলের চারপাশে ঝাউ-

দেবদারুর উঁচু ডালে,মাথায় নানান ধরনের সাপেরা এসে আশ্রয় নেয়। নৌকা নিয়েও সাপ ধরার কাজ চলে। বিষবেদেরা বেছে বেছে সাপ সংগ্রহ করে ও ঝাঁপিগুলি বোঝাই করে।ওদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে এমন সাপ সৃষ্টিতে নেই। ভাদ্রের শেষ নাগপঞ্চমী বিষ বেদেদের শ্রেষ্ঠ উৎসব।গোটা পাড়া গানের আসরে বসে।মেয়ে পুরুষ সবাই গান গায়- ও আমার সাত জন্মের বাপ গ-তোরে দিচ্ছি বাকগ।-সমবেত নারী কণ্ঠে এবার সেই ধুয়া ধ্বনিত হয়ে উঠবে-অ-গ।

এ গান গেয়ে চলে ওদের নাগিনী কন্যা। কাল নাগিনী ওদের ঝাঁপির মধ্যে থাকে আবার ওদের ঘরে কন্যা হয়েও জন্মায়।কথা দিয়েছিল কালনাগিনী:

তোমার বংশ তোমার ঝাঁপি হইল আমার ঘর গ!
অ-গ!
তুমি না করিলে পর হইব না মুই পর গ!
অ -মরিমরি -মরি গ; অ-মরি-মরি গ!

আজও সেই বাক্যের অন্যথা হয়নি।

বেদেদের সাপ নিয়ে কারবার। মনসার কথায় আছে নরে নাগে বাস হয় না। সাঁতালি গাঁয়ে এই নরে-নাগে বাস। সাঁতালি পর্বতে মূল শির বেদে ছিল বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভরের ছেলে যেমন ছিল সাপ ধরায় সিদ্ধহস্ত তেমনি জানতো ভেলকি বাজি আর হাত-সাফাই। পড়শির তিন বছরের মেয়ে দধিমুখীর সাথে বিয়ে দিয়ে সাত দিন যেতে না যেতেই বিশ্বম্ভর-পুত্র সাপের দংশনে প্রাণ হারায়। ষোলো বছর বয়সে সেই বিধবা কন্যাটির আবার বিয়ের উদ্যোগ করা হলে হঠাৎ কন্যের কপালে বিশ্বম্ভর দেখেন নাগচক্র। তারপরেই বাজতে থাকে বাঁশি, ঢাকি, চিমটে, দুধ, ধুপ, কলা সহযোগে মা বিষহরীর বারি তোলা হয় আটনে। মেয়েটি হয়ে যায় নাগিনী কন্যা। নাগিনী কন্যের বিষের যোগ। কেউ পাগল হয়ে যায়, কারো প্রাণ যায় বাঘের মুখে, কারো বিলের জলে প্রাণ যায়, কেউ কেউ সর্বনাশী হয়ে ধর্ম বিসর্জন দেয়, মাতৃত্বের লক্ষণ প্রকাশ পেলে পালায়, তবে পালিয়েও নিস্তার পায় না।" হয় মরেছে বেদে-সমাজের মন্ত্রপূত বানের আঘাতে নয়তো নাগিনী ধর্মের অমোঘ নির্দেশে প্রসবের পরই মুখ দিয়ে টুটি টিপে হত্যা করতে হয় সন্তানকে। ডিম ফুটে সন্তান বের হবামাত্র সন্তান খায়- নাগিনী কন্যাকেও সেই ধর্ম পালন করতেই হবে। নিষ্কৃতি কোথায়? ধর্ম ঘাড়ে ধরে করাবে যে!"[(৪)] এভাবেই শবলা, হয় সাঁতালী গাঁয়ের বেদে কুলের নাগিনী কন্যা। শবলা তার দুখের কথা জানিয়েছিল শিবরামকে।

যেহেতু সে নাগিনীকন্যা তাই তার দিকে কোন পুরুষকে তাকাতে নেই আর তাই মহাদেব চক্রান্ত করে এক রাজগোখরোর ছোবল খাইয়ে বেদেদের সেই ছেলেটিকে মেরেছিল যে শবলার প্রতি অকৃষ্ট ছিল।

শবলার পর পিঙলা হয় সাঁতালী গাঁয়ের নাগিনী কন্যা। পিঙলার ওপর হয় বিষহরির ভর। কথায় আছে নাগিনী কন্যের অঙ্গে চাঁপার বাস ফুটিলে হয় কন্যে আত্মঘাতী হয়, নয়তো কূলে কালি দিয়া বেদকূলের পাপ চাপিয়ে অকূলে ভাসে। এ এক অভিসম্পাত। নাগিনীকন্যা চম্পকগন্ধা হলে তার অঙ্গে নাগ সাহচর্য কামনা জেগে থাকে, নাগ তাকে সাদরে জড়িয়ে ধরবে নাহলে মারবে ছোবল। অবশেষে সেই বিশ্বাসকে সত্য করে তুললো পিঙলা। নাগ পক্ষের প্রথম দিনে বন্ধ ঘরের ভেতর ছোবলের পর ছোবল মারলো বিষ দাঁত না কামানো শঙ্খচূড়।

কিন্তু সেকালের সেই সাঁতালীতেই নেমে আসে অন্ধকার। নাগপক্ষ হয় নিরানন্দপুরী। নগু ঠাকুরের হাতে ধরা পড়ে গঙ্গারাম। বলে যায় তার পাপের কথা। পিঙলাকে সে জাদুর জালে জড়াতে চেয়ে পালাতে চেয়েছিল, আর তাই পিঙলার ঘরের সামনে মধ্যরাতে ছিটিয়েছিল চম্পক গন্ধের আরক।.... এভাবেই সাঁতালী শেষ হয়ে গিয়েছে, অনেকেই চলে গেছে সাঁতালী ছেড়ে। নাগিনীকন্যা আর আসবেনা। নাগিনী কন্যার কাহিনীও শেষ। মিথের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বেদে জনগোষ্ঠীর চিরায়ত রূপটি তুলে ধরেছেন লেখক। বেদে সমাজে সর্দার প্রথা প্রচলিত। সর্দারগণ একছত্র ক্ষমতার অধিকারী। "নাগিনী কন্যার কাহিনী"তে মহাদেব,গঙ্গারাম-এরা হলো গোষ্ঠীপ্রধান। নিম্নবর্গের বেদে সমাজের সমাজপতি শিরবেদেদের যুগ যুগ ধরে শোষণ ও বঞ্চনা করেছে তারই সমাজের অধস্তন নারীকে। সত্যিকারের এই ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। নাগিনী কন্যারা এখানে বেদেনির প্রতিভূ।

সাত্যকী হালদারের 'বনপরব' ও শুভঙ্কর গুহ-র 'বিয়োর' উপন্যাসগুলি এ আলোচনায় অবশ্যই অপরিহার্য উপাদানের জোগান দেয়। পাখমারা ও মাগান্তা ক্ষীয়মাণ হতে হতে দুটি পেশাই আজ অবলোপনের পথে। হারাতে বসা এ-পেশা দুটি এই সাহিত্যিকদের লেখায় আবার সামনে এসেছে। ক্রমশ সমাজ যত নাগরিক হয়েছে, দূরত্ব কমেছে নাগরিকতা-গ্রামীণতায়। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। পেশাজীবী মানুষগুলি বেঁচে থাকার তাড়নায় পেশান্তরে যেতে বাধ্য হয়েছে। কখনো বা গিয়েছে স্বেচ্ছায়।

'বনপরব' উপন্যাসটিতে প্রাত্যহিক নাগরিকতার বাইরে এমন এক জীবনকে দেখানো হয়েছে, যে জীবন নিজের ছন্দে বয়ে চলে। সে কারো অপেক্ষা করে না। লালমাটির দেশে সে জীবন টুসু গান গায়, জঙ্গলে পাখি ধরতে চায় আবার কখনো দেশ ছেড়ে ভিন দেশে কাজের খোঁজে চলে যায়। বাঁকুড়া জেলা ও তারই সংলগ্ন পুরুলিয়া, মেদিনীপুরএই বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিতে তৈরি এই আখ্যান। জঙ্গলের ভেতর ছড়ানো-ছেটানো দশ-বারো ঘর পাখমারার বাস। ভোটার লিস্ট-এ যাদের নামের পাশে লেখা থাকে 'নোলে'। তারা গোলাকার সরু করে কাটা বাঁশের নল পর পর গেঁথে পাখি ধরত। অবিরত নানা সময়ের মধ্য দিয়ে

এ-গ্রাম পালটাতে থাকে।" বনপরব "কোনো এককালীন খণ্ডচিত্র নয়। নির্দেষ্ট কিছু বছর, সময়কাল, বা এক-দুটি দশকের কথাও এ নয়। বনের ধার, বাঁকুড়া জেলা তার লাগোয়া পুরুলিয়া-মেদিনীপুর, এখানে বহুকাল ধরে ঘটে-চলা জীবনযাপনের কথা, সেখানে হয়তো নির্দিষ্ট একটি ফ্রেম ব্যবহার করেছেন লেখক। সেই ফ্রেমের ভিতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন বহুকাল ধরে পাশাপাশি বাস করা, হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের এই প্রাচীন অঞ্চলে থাকা মানুষের জীবনযাপনকে। এখানে পাখমারা নামে যে যাযাবর জাতির কথা বলা হয়েছে সেই পাখমারারা মহাভারত যুগের কীরাত বনবাসী পক্ষী শিকারি সম্প্রদায় সময়ের সঙ্গে বদলে বদলে তাদের একজন এই আখ্যানে হয়ে যায় মটর মেকানিক। সময়, যা আসলে এক অনন্ত নিরীক্ষাধর্মী ধারাবাহিকতা, তা শেষ পর্যন্ত এই মটর মেকানিক বা তার বংশধরকে কোথায় নিয়ে পৌঁছায় তা জানার জন্য আমাদের সময়ের দিকেই চেয়ে থাকতে হয়। সময়ের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া একজন হতবাক লেখকের বা গুটিকয় সন্ধানী পাঠকের আর কীই-বা করার থাকে?

লেখক দেখেছেন এই পাখমারা বা নোলেদের সংগ্রামী জীবনকে খুব কাছ থেকে। চাষবাসের কাজে মজুর হিসাবে নোলেদের তখনও লাগাতে চায় না অনেকে। জয়পুর-বেলেশুলে যে অল্পস্বল্প জমি সেখানেও কাজ পায় না এরা। ফলে আড়কাঠি মারফত দূরে যাওয়ারও প্রশ্ন থাকে না। এলাকায় জমিজিরেতের মালিক যারা, এমনকি অন্যান্য লোকও এদের খানিকটা ঘুরে বেড়ানো যাযাবর গোছের মানুষ হিসাবে দেখে। এক-দেড় পুরুষ আগেও এরা ঘুরে ঘুরে বেড়াত। যখন পাখি ধরতে আসত, ছোটোখাটো কাজের কথা বললে এড়িয়ে চলে যেত। যারা দু-একজন পরের দিকে চাষের কাজে দিনমজুরি করতে এসেছে, তাদের দেখা গেছে যে মাঠের কাজে এরা মোটেই পটু নয়। ধানবাছা, ধানরোয়া বা ঝাড়াইয়ের মতো চেনা কাজেও কোনো গোছানো ভাব নেই। এক কাজ করতে এসে গুলিয়ে ফেলে অন্য কাজ করে বসে। পাশাপাশি কাজ জানা অন্যান্য লেবারদের থেকে তাই সরে আসতে হয় এদের।

যদিও তারপরে ঘরে ফেরেনি এরা। জঙ্গলে ফেরত আসেনি। গোঁফের দাগ ফুটে ওঠা বা আরও খানিক বড়ো ছেলেরা কাজ খুঁজতে কোথায় কোথায় চলে গেছে তার কোনো দিকদিশা নেই। অনেকের খবরও নেই অন্যদের কাছে। কেউ শোনা যায় বিষ্ণুপুর স্টেশনে মুটেগিরি করে, আবার কেউ কোতুলপুরে গিয়ে কানা পাঞ্জাবির দোকানে নাইট শিফটে প্লেট ধুয়ে দেয়। কেউ জয়পুর বাস স্ট্যান্ডের কোনায় নড়বড়ে চায়ের দোকান খোলে, যদিও কাজের অগোছালো ভাবের জন্য তেমন লোকজন সেখানে আসে না। এভাবেই চলে নোলেদের জীবন। জমি জিরেত এক ছটাক না থাকলেও জঙ্গলে হাতির তাণ্ডব থেকে নোলেরাও বাইরে নয়। দিনের বেলা যেমন-তেমন কিন্তু রাতে যখন দল বেঁধে হাতি

ধান-মাঠে নেমে পড়ে তখন গ্রাম জুড়ে চেঁচামেচিতে তারাও যোগ দেয়। জঙ্গলের মানুষকে জঙ্গলের ভালো মন্দ দুই-ই মেনে নিতে হয়। তাদের কাজে লাগাতে চায়না অনেকে। আর তাই অন্য অনেকের মতোই বনে পাখি কমে এলে কাজ খুঁজে নেয় এরা। হুলা পার্টির হয়ে হাতি তাড়িয়ে বেড়ানোর কথা পাখমারা সমাজ ভাবতেও পারে না, যেমন ভাবতে পারেনি ভূতনের বাবা ভূষণ। কিন্তু সেই ভূষণের বড় ছেলেও এখন সোনামুখী লাইনের বাসের কন্ডাক্টর হয়েছে। এখন কাজের সন্ধানে সবাইকেই বারমুখী হতে হয়েছে। অনেককে চাষের কাজে নাবালে যেতে হয়েছে,লাল মাটির দেশ আর সবুজ জঙ্গলমহলের বাইরে অন্য কোন অজানা জগত সকলকেই তাই হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়।

কেন যে এই ডাক, আর কেন যে এই বাইরের আকাঙ্ক্ষা এত বেশি তা বোঝা শক্ত। চেনা পৃথিবী সত্যিই হয়তো আর আটকাতে পারবেনা মানুষকে। দেশ কাল সবই এক অজানা বাইরের টানে আগামী সময় তছনছ হয়ে যাবে। জমি আর মাটির কাছে পড়ে থাকবে না কেউই। অনেককাল মানুষ চরিয়ে ইদানিং মাটির টানে ইতু হওয়া ছবি লাল ভাবে গ্রামের মানুষকে মানুষকে বাইরে নিয়ে ফেলার ব্যাপারে সে নিজেও খানিকটা দায়ী।সে নিজেও অনেককে দিয়েছে দূরের হদিশ, আবার অন্ধকারে মাথা নামিয়ে হাঁটা বিষন্ন ছবিলাল এওভাবে যে পূব দেশে যাওয়া মানে তো এক চাষের দেশ থেকে আরেক চাষের দেশে নিয়ে ফেলা,যেমন এক মাঠ থেকে চলে যাওয়া পাশের কোন মাঠে কিংবা অন্য কোথাও। লেখক দেখিয়েছেন জঙ্গলের মাঝে নলেদের জীবনেও কীভাবে আসে পরিবর্তনের হাওয়া। গরম থেকে শীতে জঙ্গলের পাতার রং যেভাবে পাল্টে যায়,সময়ের টানে তেমনি বেঁচে থাকার ধরণও বদলে বদলে যায়। কিন্তু ভূষণ বুড়ো একই রকম থেকে যায়। ঘরকুনো যে ছেলেটা জয়পুরের হাটে পাখি নিয়ে যেত, তারপর গাঁয়ে ফিরে বউয়ের গা ঘেঁষে শুয়ে টালির চালের দিকে চেয়ে থাকতো সেও এখন নতুন চালু হওয়া কোন ট্রেকার রুটে হাঁকডাক করে হেলপারি করে।সব কাজে অদক্ষ জন্য বর্ষায় চাষের কাজে হুগলি বা বর্ধমানও যায়, যারা যায় না তারাও স্বপ্ন দেখে বা অপেক্ষা করে অন্য কোন কাজের।এই বদলে যাওয়া জীবনে ভূষণবুড়ো কোন বাধা তৈরি করতে চায়না। সে বরং তার চামড়া ঝুলে যাওয়া চোখে চারপাশ দেখে। সে লক্ষ্য করে বেশ ক'বছর আগে ধরে আনা খাঁচার ময়নাটাও যেন বুড়োটে হয়ে গেছে। ভূষণবুড়ো সেদিকেও দীর্ঘক্ষণ চেয়ে বসে থাকে। মানুষ যে ছুটছে,পুরনো বেঁচে থাকা কে রেখে নোলেরা যে বদলে যেতে চাইছে প্রতিদিন সময়ের সঙ্গে-এই বুড়োটে বহুদিন আগে আনা খাঁচার ময়নাটিও যেন বোঝে। ভূষণবুড়ো সেদিকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে বসে থাকে।মানুষ যে ছুটছে,পুরনো পন্থায় বেঁচে থাকাকে সরিয়ে রেখে নোলেরা যে বদলে যেতে চাইছে প্রতিদিন সময়ের সঙ্গে জঙ্গল ছেড়ে আসা ময়নাটিও যেন তার সাক্ষী হয়ে থেকে যায়। পাখমারাদের জীবন যেন ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।

উপন্যাসে লেখক এও দেখিয়েছেন যে কীভাবে পাখমারা নোলে জীবন থেকে প্রথম বাইরে চলে যাওয়া শংকর কন্ডাক্টার শেষ বয়সে বউ এর কাছে আবার ফিরে আসে গাঁয়ে। বর্তমানে গাঁয়ে যখন নল নিয়ে কেউই আর বিশেষ নাড়াচাড়া করে না, কমবয়সী ছেলে ছোকরা সকলেই সাইকেল চালিয়ে সকালে বিষ্ণুপুর বা কোতুলপুর এর দিকে যায় কেউবা ফেরিওয়ালার মতো সাইকেল করে মাল বেচে বিকেল বেলা ফেরে। আগে নল কাঁধে পাখমারারা ফিরে আসতো যেমন, এখন তেমন তারা সাইকেল নিয়ে ফিরে আসে। মদন দেখে পাকা রাস্তার ধারটাও এখন অনেক বদলে গেছে। মাঝে মাঝে ট্রাক-লরি চালকদের জন্য খাটিয়া পাতা ধাবা হয়েছে, জঙ্গলের কাছাকাছি কত কত কাঠচেরাই কল হয়েছে,মাঠের মাঝে হিমঘর, পুরনো চা দোকানের জায়গায় কংক্রিটে বানানো মিষ্টির দোকান,সামনের লাল প্লাস্টিকের কেসে পরপর রাখা কোল্ড ড্রিংকস। মদন বোঝে একদা হাসান মিস্ত্রির নড়বড়ে একখানা গ্যারেজ বসানো পানাগর মোড় আর তার আশপাশটায় শুধু বদলই হয়নি, সেই সঙ্গে তাদের জয়পুর,বেলসুল, হেতিয়া আর রাউরখন্ড বদলে গেছে অনেক। তার দেখা তার বাবার দেখা সমস্ত পৃথিবীটাই এখন অন্য পৃথিবী শুধু বহির্বিশ্বের বদল এসেছে তা নয় বদল এসেছে মদনের বাপের জীবনেও। আজ এতদিন পর সে পাখির ডাক শুনে মাথার উপর নল খাটায় যদি ওসব পাখি উড়ে যায় শেষ পর্যন্ত পাখিদের এই উড়ে যাওয়া ও হয়তো সময়ের নির্দেশ যে নির্দেশ ঘরের মানুষকে ঘর ছাড়া করে। পাখিদের ডেকে নেয় দূরে বহু দূরে লেখকের ভাবনায় সেই নির্দেশেই পাখি আর পাখমারা একসঙ্গে লুপ্ত প্রজাতিতে পরিণত হয়। চিত্রনাট্যের সঙ্গে সাজানো বোন পরব উপন্যাস যেন পড়তে পড়তে আঁকা কতকগুলি ছবি কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের পাখমারাদের ভরপুর জীবন আর ক্রমশ বিলীন হয়ে যাওয়ার গল্পের মধ্য দিয়ে সাত্যকী হালদার পৌঁছে যান তার জীবন দর্শনে। এ কাহিনী হয়তো কোনদিন ফুরোবে না,নতুন যুগে নতুন কোন ছবিলাল মাহাতো এসে হাজির হবে গাঁয়ে। নতুন করে কথা বলবে,সে নতুন দিনের মানুষকে ভিনদেশে কাজে যাওয়ার জন্য বোঝাবে। আর মানুষও সেই নতুন লোকের কথায় বিশ্বাস করে পাড়ি দেবে অন্য কোথাও। এ যাত্রা শেষ হবে না কোনদিন। যুগ যুগ ধরে যেমন প্রাচীন কোন তীর্থে যায় মানুষ,পশ্চিমবঙ্গের মানুষও তেমনি বর্ষার মুখে বারবার ডুবে যায় জীবিকা ছাড়িয়ে। এ যেন তাদের মানসিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।পরিযায়ী পাখির মত বাৎসরিক এ পরিযান চলতেই থাকে। উপন্যাসে দেখা যায় মানুষের মত হাতিদের জীবনেও আসে পরিবর্তন। আগে হাতি দেখলে মানুষ ভয় পেতো,এখন কাজ ফেলে এসে প্রণাম জানায়।

সাপুড়িয়াদের জীবনদর্শন, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণেই তৈরি হয় 'বিয়োর' উপন্যাস। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রামের বেদে-পাড়া লেখককে অভিভূত করে। তিনি ভূমিকায় লেখেনসাপ নয়, সাপুড়িয়াদের জীবনদর্শনই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সাপুড়িয়াদের অনন্ত

যাত্রাই এই উপন্যাস রচনার উদ্দীপক। এই মাগান্তারা বিচরণ করতে করতে সাপ খোঁজে, সাপের বাঁচা-মরার সন্ধান নেয়। বেদেদের এই অন্তহীন যাত্রা ও তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া টানাপোড়েন নিয়ে সমৃদ্ধ হয় এই উপন্যাস।

ঔপন্যাসিকের কথায় সাপুড়িয়াদের সঙ্গে মেলামেশা,সাপ খেলা দেখা, শিকার দেখা, ভোজন, আড্ডা, রাত্রি বাসের পর মাইল মাইল পায়ে হেঁটে বিচরণের মাধ্যমে যতটুকু যাত্রা তা ছিল এক গভীর বাউল মনে অনন্ত যাত্রা। ওদের জীবন দর্শন, ভাষা- সংস্কৃতির প্রতি তিনি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। আর এই আকর্ষনেই তৈরি হয় "বিয়োর"।

বেদে জীবনের জীবন দর্শন হলো "বিচরণ"। ঔপন্যাসিক এখানে গতিবাদ কে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তাই তো শোনা যায়-

আমরা মেঘের মতো ভেসে বেড়াই,তাড়িয়ে দিলে অন্য
কোথাও চলে যাব কেদার।

উপন্যাসের শেষে সাপুরিয়াদের ছোট সর্দার বিলবশিয়ার পাড়ে পয়গম্বরদের দেখার উৎসাহে গেলে সেখানে দেখে শীতল একটা ছোটখাটো উপর করা স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ও মাঝে মাঝে টানাটানি করছে। সাপুড়িয়াদের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে সেটি আর কিছু নয় বিলবোশিয়ার পাড়ের প্রাচীন কচ্ছপটির মৃতদেহ। অনেকক্ষণ পর শীতলের দিকে তাকিয়ে কেদার সাপুড়িয়া কচ্ছপটিকে কবর দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল। কিন্তু সেই মনস্কামনা তাদের পূর্ণ হলো না। বন বিভাগের কর্মীরা সেই তিনশো, চারশো বছরের দুর্লভ কচ্ছপটিকে নিয়ে চলে গেল। যে পথ দিয়ে এসেছিল শতাব্দী প্রাচীন এক সাপুড়িয়ার দল নিয়ে বেদে সর্দার কিরিটি সাপুড়িয়া, সেই পথ দিয়েই বনদফতরের জিপ গাড়িটি চলে গেল। আবার একটি বেদের দল ক্রমশ পরের পর হাঁটু জল ভেঙে নিজেদের পোশাকগুলি পতাকার মতন ওড়াত ওড়াতে এগিয়ে এলো নবগ্রামের দিকে।প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এক সর্দার সামনের দিকে লাঠিতে ভর দিয়ে দলটির একেবারে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলো। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটলো এখানেই।

ভগীরথ মিশ্রর "চারণ ভূমি" উপন্যাস দেশজ লোকজ ঘরানার একটি অনবদ্য নিদর্শন। বিহার মুলুকের ভেড়িহারদের জীবনযাত্রার নানা জানা-অজানা কথা উঠে এসেছে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে। এরা মূলত যাযাবর। বিহার মুলুক থেকে ভেড়ার গোঠ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তো এরা। অপরিচিত মানুষজনের সাথে মধুর সম্পর্কে জড়িয়ে যেত গরীব এই মানুষগুলি। ভয়ভীতি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এর কাহিনীর মরমে মরমে প্রতিফলিত হয়েছে। এই মানুষগুলির অন্য কিছু না থাকলেও আছে আদিম চলার শক্তি।ভকত দের জাত পেশা পশুপালন। জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষের নানা বৃত্তির মধ্যে পশু পালন বৃত্তি অন্যতম। কিন্তু সময়ের পট পরিবর্তনে এই বৃত্তি হয়েছে ক্রমশ সংকুচিত।

বিশ্বায়নের যুগে উৎপাদন যেখানে যন্ত্র নির্ভর সেখানে মানুষের শ্রম নির্ভর এই বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা

জর্জরিত উপন্যাস সাহিত্য যেহেতু সমাজ বাস্তবতাকে ধরতে চায় সেহেতু এই বৃত্তি নির্ভর গোষ্ঠীর কথা অনায়াসেই উপন্যাসের স্থান পায়। ভগীরথ মিশ্রের "চারণভূমি" এমন একটি উপন্যাস যেখানে পশু চারক গোষ্ঠীর মানুষের জীবিকা, সমস্যা ও সংকট, জীবিকার তাগিদে তাদের নিত্য সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে।

ভেড়িহারদের নসিব না ফেরার জীবন কাহিনী বলে চলে এই উপন্যাস।

একটা যাক বাপের সাথ,জাত পেশায়। ভগৎ জাতের

একশ পুরুষের ধারা এটা। বংশের একজন অন্তত ধারাটা চালু রাখুক।

গোঠ জীবনের দুঃখ-কষ্ট মেনে নিয়েই তাদের যাযাবর জীবন। ভেড়ার গোঠ গাঁয়ের পাশাপাশি পৌছলে গেরস্থদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, প্রত্যেকেই আবদার করে তাদের জমিতে ডেরা পাততে। কিন্তু পরিবর্তন আসে এদের জীবনেও।

'বাঁকুড়ার লোকপুরে থিতু হচ্ছে ভকতরা। অন্যবৃত্তি নিয়ে বদলে যাচ্ছে ওরা দিনকে দিন। মুন্সিরও ভালো লাগেনা আর সহ্য হয় না এই নিরন্তর পশুজীবন'।[৫]

নিরন্তর ছুটে চলাকেই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিল সমস্ত ভকত জাতি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায় তাই মুন্সি এই এলাকায় পশুচারণ বৃত্তির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল রুকমিনিয়ার সঙ্গে। জেনেছিল মুক্তির বাণী। বুঝেছিল সোজা পথের শেষে রয়েছে সুখ শান্তি, সমস্ত মানুষ যা খুঁজে বেড়ায়। এতদিন ভগৎ জাতি ভেড়ার পাল নিয়ে বৃত্তাকার পথেই হেঁটে এসেছে। পুরোনো পথেই ঘুরে ফিরেছে সারা জীবন। ভকত জাতি যাযাবর জীবনে বহু জায়গা ঘুরলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বদলাতে পারেনি। দাহ ভকত তার আশি বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছে এই মানুষ যাত্রা শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে,খালি দৌড়াচ্ছে। কোথা থেকে কোথা চলে যাচ্ছে...কোথাকার বৃক্ষ কোথায় শেকড় গজাচ্ছে...উত্তরের মানুষ দক্ষিণে যাচ্ছে...পুবের মানুষ পশ্চিমে। এক মূলকের মানুষ ঘর বাঁধছে আরেক মুলুকে। দুদিনের ঘর, তাও আবার ভেঙে দিচ্ছে পুনরায়। আর তাই হয়তো ভাগ্যের খাঁচার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। যদিও ভকতদের নতুন প্রজন্ম মুন্সির মতোই নতুন পথের সন্ধানী হবে নতুনভাবে,নতুন কোন বৃত্তির আশ্রয়ে গড়ে তুলবে তাদের স্বপ্নের ভুবন-এই আভাস দিয়েই উপন্যাসের কাহিনীর ইতি টেনেছেন লেখক।

আসলে বাংলা সাহিত্য সমাজের পরিবর্তিত বাস্তবতার এক সংবেদনশীল দলিল।এই সাহিত্যের ধারাবাহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও অবস্থানও নতুন ভাবে আলোচিত হয়েছে। যাযাবর জনগোষ্ঠী তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ

সামাজিক সত্তা,যাদের জীবনধারা দীর্ঘকাল ধরে চলমানতা,অনিশ্চয়তা ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। বাংলা সাহিত্যের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেকালের পর্বে যাযাবররা প্রধানত স্বাধীনচেতা, প্রকৃতি নির্ভর ও রহস্যময় জীবন যাপনের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের জীবন ছিল সমাজের মূল স্রোতের বাইরে কিন্তু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। অন্যদিকে একালের যাযাবরদের অবস্থান এক গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, নগরায়ন ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রভৃতির ফলে যাযাবর জীবন আজ সংকটাপণ্য। তারা আর কেবল রোমান্টিক চরিত্র হিসেবে নয় বরং প্রান্তিকতা, বঞ্চনা ও পরিচয় সংকটে আক্রান্ত এক জনগোষ্ঠী। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যাযাবরদের অবস্থার এই পরিবর্তন বাংলা সাহিত্যে কেবল একটি বিষয় গত রূপান্তর নয়,বরং সমাজ ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেরও স্পষ্ট নিদর্শন।

যাযাবর জীবন সাহিত্যে কেবল একটি জীবনধারা নয়, এটি সমাজের পরিবর্তনের দলিল। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যাযাবরদের জীবন, অবস্থান ও মানসিকতার যে রূপান্তর ঘটেছে তা সাহিত্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সাহিত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রান্তিক মানুষের জীবন আরো সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে তবে সেই অগ্রগতি প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। যাযাবরদের জীবন ও সমস্যার আলোচনা আমাদের সমাজের অন্তর্গত বৈষম্য ও উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা অনুধাবনে সহায়ক। যাযাবর জীবন কে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য তাই মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

তথ্যসূত্র :

১. The Oxford English dictionary (February–1–1884)
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, "বাংলার লোকসাহিত্য"১ম খন্ড
৩. সেন অভিজিৎ : 'রহু চণ্ডালের হাড়' জে এন চক্রবর্তি এন্ড কং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩ প্রথম সংস্করণ। পৃ২৩৫
৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: "নাগিনী কন্যার কাহিনী" করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ পৃ. ৫৫
৫. ভগীরথ মিশ্র, "চারণভূমি", দে'শ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬ পৃ.২০৮

জয়ন্ত নারায়ণ ভট্টাচার্য

'রাধা' উপন্যাসে কৃষ্ণদাসী চরিত্র : অস্তিত্বগত বিচ্যুতি ও কাঠামোগত সংকট

এ জগৎ মহাবিস্ময়ভরা, বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বৃহত্তর জগতে সৃষ্টির অকৃত্রিম ও আদি উৎস হিসেবে লাস্য তথা কামনার আহ্বানকে উপেক্ষা করা কার্যত অসম্ভব। ষড়রিপুর এই প্রধান রিপুর নেতিবাচকতা তথা নিম্নগামিতায় মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। কামনার এই মরুতৃষ্ণা সংসারের পাকদণ্ডীতে মানুষের জীবনকে অসহিষ্ণু করে তোলে, পথিক লক্ষভ্রষ্ট হয়ে হাঁফিয়ে মরে। অন্য অনেক অর্থের সাথে কামভাবনা প্রযুক্ত হলেও মূলত বাসনার নিবৃত্তি ঘটানোর ক্ষেত্রেই যেন এর চূড়ান্ত সার্থকতা। ষড়রিপুর এই প্রধান রিপু সম্পর্কে তাই মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। কিন্তু কামের স্বরূপ বিশ্লেষণ যথার্থরূপে সঠিক অর্থে সবসময় সম্ভব না হওয়ায় এই রিপুর নেতিবাচক দিকগুলি মানব চরিত্রকে নিম্নগামী করে তোলে।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য কামের সাথে এই অসম লড়াইয়ে পরাজয় মেনে নেওয়াই কি মানুষের একমাত্র পথ? নাকি উত্তরণের পথ খোঁজা সম্ভব। তবে কাম যেহেতু শক্তি, তাই তার ধ্বংসসাধন কখনোই সম্ভব নয়। তবে, এর রূপান্তরের মাধ্যমে মানব-চরিত্রের বিনির্মাণ ঘটানো সম্ভব। চৈতন্যচরিতামৃতে'র 'আদি লীলা'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

বহমান এ জীবনে সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউ-এর মতো চিন্তা-ভাবনার চোরাস্রোত ফিরে আসে বারে বারে, এর সাথে সূক্ষ্মরূপে মিশে থাকা কাম-প্রাবল্যের সঠিক সাযুজ্য রক্ষা তথা সামঞ্জস্য-বিধান যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সমাজ হয়তো একজন মানুষকে ব্যভিচারী আখ্যা দিতে পারে সহজেই। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর খোঁজার জন্য অনেকটা পথ হাঁটতে হবে আমাদের।

প্রেমের যাত্রাপথ বিপদ-সঙ্কুল পথ। এই পথ থেকে বিচ্যুতি তথা পদস্খলনের আহ্বান খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু সংসারের যাঁতাকলে মানবাত্মা কাঁদে নীরব ব্যথায়। আবার কখনও অন্যায্যভাবে কাঙ্খিত বস্তু-প্রাপ্তির প্রসন্নতা আপাত দৃষ্টিতে তৃপ্তিদায়ক মনে হলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে তা গ্লানিবোধকেই জাগিয়ে তোলে। বহির্জগতে এর প্রতিফলন আমরা সেভাবে দেখি না বলেই জনমানসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেই উপলব্ধিবোধ নেহাতই সামান্য বলে মনে হতে পারে। সমুদ্রের শুভ্র জলরাশি মুক্তবিন্দুর মতো পাড়ের দিকে ধেয়ে আসার কালে চরম দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠলেও স্থলভূমিতে আছড়ে পড়ার সময় বালুকণায় মিশে যাওয়ার যে নির্মমতা ও বাস্তবতাবোধ আমরা প্রত্যক্ষ করি, স্বপ্নিল মানুষও ঠিক তেমনি

প্রেমের এই বিপদসঙ্কুল পথের আনাচে-কানাচে অনিয়ন্ত্রিত পদচারণায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু রক্ত ঝরানোর আত্মশ্লাঘাও মানব মনে জাগে বৈকি। তাই একটা সময়ের পর সেই প্রশমিত হয়ে ওঠা যন্ত্রণাবোধ বাসনা তথা ভোগের রক্তিম পথে ত্যাগের পূর্ণতার ডালি উপহার দেয় মানবজীবনকে। কামনাবাসনা সম্পর্কিত আলোচনা প্রথমে তাত্ত্বিক ও বিমূর্ত স্তরে অবস্থান করলেও ক্রমশ ধাপে ধাপে নেমে আসে মানব অভিজ্ঞতার গভীরে। শুরু হয় আধ্যাত্মিকতা থেকে সরে এসে পার্থিব আকর্ষণের পথে চলা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক আমাদের আলোচনার বৃহত্তর পরিসর। এই বৃহত্তর পরিসরে বৈষ্ণব ধর্মের নতুন পথ অন্বেষণের কালে বৈষ্ণব প্রেমভাবনার আদান-প্রদান, মিলন-মতভেদকে ঘিরে আমরা এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণের সাক্ষী থেকেছি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' উপন্যাস এই ভাবাদর্শের পরিচয় বহন করেছে।

উপন্যাসের সুবিশাল পরিসরে বহু চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। বৈষ্ণব গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যের মধ্যে এখানে বিশেষভাবে চোখে পড়ে নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের পরকীয়া সাধনের আড়ালে ব্যভিচারের প্রতিচ্ছবি। সভ্যতার বিপ্রতীপ স্রোতে নিজেদের অনুভব ও পর্যবেক্ষণ পরম যত্নে অপ্রকাশ্যের আবরণে রাখতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বাউল সম্প্রদায়। সেই আদর্শের অবনমন ঘটতে দেখি এই সম্প্রদায়ের কৃত্রিম আদর্শ রক্ষার দুর্বল প্রচেষ্টার মধ্যে। বৈষ্ণব ভাবনার সরল সুন্দর তথা পবিত্র রূপটিকে ধরতে না পেরে এরা পরশ-পাথরের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়েছে। বৈষ্ণব সমাজের জাতহারা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' উপন্যাসে কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবীকে আমরা অবতীর্ণ হতে দেখেছি। নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চাওয়া এই বৈষ্ণবীটি ঐশ্বর্যের লোভে নিজের রূপান্তর ঘটিয়েছে। নাম-গানের সংকল্প নিয়ে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে জীবনের সুধাভাণ্ড ভরে নেওয়ার পবিত্র সংকল্পকে সে তার প্রতিরোধ তথা রক্ষাকবচ হিসেবে আগাগোড়া ব্যবহার করেছে উপন্যাসে। তবে, পুরোপুরি নটী বেশ ধারণেও তার অনীহা লক্ষ করি, কেননা নটীর উগ্র সাজসজ্জা চটুলতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ উপন্যাসে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র সম্প্রদায় থেকে বিচ্যুত হওয়ার ভয়ে অথবা মনের কোণে জমে ওঠা আবেগকে সম্বল করে নিজের মধ্যে ভক্তিভাবভরে নেওয়ার দুর্লভ সুযোগের অধিকারী হয়েছিল সে। ভক্তির আলোকে নৈতিকতা বোধের চাহিদা জাগিয়ে তুললেও নিজের মধ্যে থাকা ক্ষমতার মদমত্ততাকে সে জয় করতে পারেনি। এ নিয়ে তার নিজের মধ্যেও আক্ষেপ আছে।

সাধনপথ থেকে নিজের লোভই যে তাকে টেনে নামিয়েছে, এ সত্যতা স্বীকার করতে তার মন চায় না, নিজের আদর্শ বিচ্যুতির হওয়ার অজুহাত খোঁজে অপরের মধ্যে। কৃষ্ণদাসীর ভক্তিকে তাই নিছক ঐশ্বরিক ভক্তি বলা সঙ্গত হবে না। এখানে যেন এক দেহগত ও

মননশীলতার আকর্ষণ মিশ্রিত হয়ে প্রেমিকসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণ তার কাছে শুধুই ঈশ্বর নন, প্রেমিক-পুরুষও বটে, যার কাছে তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করতে চান। কৃষ্ণদাসী নামের মধ্যেও আছে এক নামহীন পরিচয়হীন অনুভবে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও দৃপ্ততা। সম্মুখে থাকা প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে সে যখন আত্মবিশ্লেষণ করে তখন তার এই কান্না যেন প্রার্থনা নয় বহুদিনের চেপে রাখা স্মৃতিমেদুরতার নিঃশব্দ স্বীকারোক্তি হয়ে ঝরে পড়ে। এ যেন তার অপরাধবোধ ধুয়ে যাওয়ার আকুতি।

প্রভুর চরণে নত হয়ে কৃষ্ণদাসী যখন কাঁদে, সেই কান্না যেন ভক্তির ভাষা নয় তা যেন দীর্ঘ দহন, লজ্জা ও স্মৃতির নিঃশ্বাস। অশ্রুধারায় যেন ধুয়ে যায় তার আমিত্ব, রেখে যায় শুধু নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। উপন্যাসেও তার এই মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাই —

“আর সব কথা ভুলে গিয়েছে রাধারমণ সরকারের কথা, তার ছেলে অক্রুরের কথা-সবকথা। এখন শুধু সম্মুখে আছেন প্রভু। তিনি যেন জগৎ জুড়ে বসেছেন। সে মধ্যে মধ্যে কাঁদে। অনুতাপে নয়, অপূর্ণ কামনার জন্য নয়—এমনি কাঁদে। আপনি যেন কান্নার সাগর উথলে ওঠে। কতজন কত কথা বলে। বলে, এ কী করে হয়? যে কৃষ্ণদাসী সেজেগুজে গায়ে গন্ধ মেখে ডুলি চড়ে দাস-সরকারের কুঞ্জে যায় নটীর মতো গান গাইতে; শুধু দাস-সরকার হলেও কথা ছিল না, আরও দু-চারজন জমিদার-জোতদারের বাড়ি যায়, সে এমন কাঁদে কেমন করে?

“কেমন করে কাঁদে সে কৃষ্ণদাসীও জানে না, কিন্তু সে কাঁদে।”

এখানে কৃষ্ণদাসী এক বিভক্ত চেতনার মানুষ। তার দ্বিখন্ডিত সত্তা তাকে ভেঙেচুরে খানখান করে তোলে। তার জীবনের দুটো দিক যেন দুটো আলাদা ঘরের মতো, দুই জীবন একই শরীরে বাস করে। কিন্তু একে অন্যকে স্বীকার করে না। আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় Identity Dissolution বা আত্মপরিচয়ের ভাঙন। এই পার্থক্য খুঁজে না পাওয়ার জন্য তার মধ্যে মানসিক অতিভার বা Psychic Overload প্রবল হয়ে উঠেছে। সে সীমা অতিক্রম করা এমন এক মানুষ যে সীমার পর ভাষা থাকে না, যুক্তি থাকে না, নৈতিকতা থাকে না। আধুনিকতার প্রাক্‌মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক দ্বিখন্ডিত নারীসত্তা। এ যেন এক পরিকল্পিত আত্মবিস্মৃতি, এ যেন শরীর ও মননের এক অনিরসনযোগ্য দ্বন্দ্ব। তার শরীর কাজ করে চলে, গান গায়, অশ্রুসজল নয়নে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিন্তু তার বিচ্ছিন্ন সত্তা নিঃসঙ্গ নির্বাক হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিঃশব্দ নদীর মতো বয়ে চলে। এই প্রবাহ তার কান্না-আবেগ নয়, সমাজ ও কর্তব্যের ছন্দে গড়ে ওঠা এক নিঃশব্দ সহন।

কৃষ্ণদাসীর প্রেম নিঃস্বার্থ কিনা আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু তাতে যে একপ্রকার বৈষয়িক অন্ধত্ব আছে তা আমরা বুঝতে পারি। রাধারমণ সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক দেহাতীত সাধনার সীমা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে পার্থিব আকর্ষণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই

সম্পর্ক শুধুই অবৈধ বা শরীরী নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ক্ষমতা নির্ভরতা, শোষণ ও প্রেমের ভ্রান্ত প্রতিচ্ছবি ও বিকৃত আত্মত্যাগের রূপ। সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজনে মরিয়া হয়ে ওঠা কৃষ্ণদাসী আত্ম-প্রবঞ্চনার আনন্দে ডুবে ছিল। রাধারমণের কুঞ্জে তার যাওয়া ছিল স্বেচ্ছায় কিন্তু সেই ইচ্ছা তৈরি হয় চিরাচরিত ও একতরফা অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রভাব থেকে। এ যেন ভক্তির গভীরে প্ররোচিত ভোগের ফাঁদ। আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত রূপ বৈষ্ণব দর্শনে যা সার্বিক শরণাগতি, সেই মতে কৃষ্ণদাসী বিশ্বাসী ছিল। তার অবচেতন মনে স্থির প্রত্যয় ছিল এই আত্মদানের লজ্জা হয়ত তাকে পবিত্র করে তুলবে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বিপর্যয় ঘটলো কৃষ্ণদাসীর জীবনে, যা তার জীবনের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি। রাধারমণের সাধন আসলে শোষণের মোড়কে আবৃত ভোগতৃষ্ণা, যাকে কোনভাবেই আধ্যাত্মিকতা বলা সঙ্গত নয়। এই ভোগলিপ্সা সাধন-সঙ্গিনীর মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক চেতনাকে বিকৃত করে তুলেছে। এর পিছনে ছিল আধিপত্যের বাসনা, নারী-শরীরের প্রতি আকর্ষণ ও এক ঘৃণিত ধর্মীয় আবরণের অদৃশ্য পর্দা। রাধারমণের কুঞ্জে কৃষ্ণদাসী ছিল এক অদৃশ্য অস্তিত্ব। সাধিকা নয়, পূজারিনী নয়, এক বস্তুমাত্র।

কৃষ্ণদাসীর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা নিজের আধ্যাত্মিক আত্মনিবেদনে দেহগত চাহিদার দাগ লাগানো। রাধারমণ ও কৃষ্ণদাসীর সম্পর্ক এমন এক আত্মঘাতী শক্তিশেল যার কেন্দ্রে রয়েছে বিশ্বাসের ভাঙন ও আত্মপরিচয়ের বিলয়। এই সম্পর্ক বড়ই অদ্ভুত। একে না প্রেম বলা চলে, না ধর্ষণ, তবুও স্পষ্ট শোষণ। নিজের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণদাসী নিজের আত্মাকে বিসর্জন দেয়, নিজের বিশ্বাসবোধের নিঃশব্দ আত্মহত্যা ঘটিয়ে। রাধারমণের রাত্রিকালীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেকে পাপিনীতে পরিণত করল অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে।

এরপর কৃষ্ণদাসীর পাগলিনী হয়ে ওঠাটা শুধুমাত্র মানসিক ভারসাম্য হারানো নয় এটি তার সমস্ত ভাঙনের ও অন্তর্গত অপরাধের নিঃশব্দ বহিঃপ্রকাশ। রাধারমণ সরকারের প্রতি কৃষ্ণদাসীর বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল অটুট। সেই সম্পর্ক শরীরের স্তরে নেমে আসায় তার মধ্যে নিজে থেকেই উঠে আসে এক ধর্মঘাতী অপরাধবোধ। যেহেতু এই অপরাধবোধ ছিল নিঃশব্দ ও একতরফা, তাই তা অন্তরে অন্তরে তাকে ছিন্নভিন্ন করে তুলল। প্রাক-আধুনিক ভক্তিচিন্তায় শরীরকে অস্বীকার না করার প্রবণতা বিরল না হলেও সেই অপরাধবোধ ও আত্ম-সচেতনতায় নীরব প্রতিরোধ গড়ে তোলা আধুনিক চেতনার সাথে সম্পর্কিত, যা তার ভেতরে ভেতরে গভীর ভাঙনকে নীরব প্রতিরোধের আকার দেয়। বিশ্বাস গড়ে, বিশ্বাস ভাঙে তবুও এই দুইয়ের অর্থ সে খুঁজে পায় না।

তবুও বলা যায়, ভক্তিকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে একটা প্রতিরোধের বাঁধ তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। তার এই যাত্রা তো ভক্তির পথে যাত্রা নয়, তাহলে তা গোপনে লুকিয়ে রেখে লাভ কী? তাই কি তার বিদ্রোহ?

কারণ যাইহোক, এই বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে আধুনিকতার বীজ, আধুনিক প্রতিরোধের নীরব অঘোষিত রূপ। এই অসমর্পণই তার প্রথম শক্তি। কিন্তু ব্যর্থ প্রতিরোধও একপ্রকার প্রতিরোধই। এ যেন অস্বীকার করা নয়, এ যেন নিজের সিদ্ধান্ত আরোপ। তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখি দাস মহাশয়ের সিদ্ধান্তে কৃষ্ণদাসীর রাজি না হওয়া একপ্রকার প্রতিকী সহিংসতার অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া এক গভীর নৈতিক প্রত্যাখ্যান, যেখানে নারী হিসেবে, মা হিসেবে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুনরাবৃত্তিকে ভাঙতে চায়।

নিজের মেয়ে মোহিনীর ক্ষেত্রে রাধারমণের ছেলে অক্রুরের সাধন-সঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব তার স্মৃতিতে রক্ত-মাংসের অস্থিমজ্জায় লালসার অভিজ্ঞতায় দূষিত। সাধনা যেখানে ভাষার আড়াল, ভক্তি যেখানে ক্ষমতার মুখোশ, সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া সমর্পণই অধিকার, যেখানে ভালোবাসা ছাড়াই শরীর প্রাধান্য পায় সেখানে ভুক্তভোগী কৃষ্ণদাসী নৈতিক বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এ যেন ক্ষমতার কাঠামো হস্তান্তর না করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাখ্যান।

এই অন্ধকারের বুকে আলোক-বর্তিকার মত হয়তো মাধবানন্দই কৃষ্ণদাসীর শেষ আশ্রয় হতে পারতেন, যিনি তার মানসিক গভীরতা অনুভব করতে পারতেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাধবানন্দের কাছ থেকে পাওয়া উপেক্ষা কৃষ্ণদাসীকে অন্তঃসারশূন্য করে তোলে, যা তাকে একপ্রকার নির্বাসন দেয়। মাধবানন্দের মধ্যে কৃষ্ণদাসী খুঁজেছিল নিজের জীবনদেবতাকে। তার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে সে এতটাই আত্মহীন হয়ে পড়ে যে মাধবানন্দের অপমান লাঞ্ছনা তাকে অদ্ভুত এক আত্ম-বিরতির দিকে ঠেলে দেয়, এক অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা তাকে মূল্যহীন করে তোলে। এরপর একপ্রকার সমাজ থেকে ছিন্নমূল হয়ে ওঠে কৃষ্ণদাসী। সমাজ যে তার আত্মনিবেদনের প্রহেলিকার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে তা সে বুঝতে পেরেছিল। তাই বিরহানলে পুড়তে থাকা কৃষ্ণদাসীর মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন খুঁজতে যাওয়া মূর্খামি, তার চিৎকার, পাগলামি, চোখের জল, প্রেমের শরীরী অপব্যাখ্যার নীরব প্রতিশোধ। নিজেকে ক্ষমা করতে না পারার নির্মম প্রতিবাদ। কৃষ্ণদাসীর পাগলামির মধ্যে এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার মতো আত্মজাগরণ আছে। প্রতিহিংসা নয় অবিশ্বাসই তাকে পাগলিনী করে তুলেছে, নির্দ্বিধায় মুক্ত কণ্ঠে সে বিদ্রোহ করেছে।

কৃষ্ণদাসী মাধবানন্দের কাছে আশ্রয় চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, এ ছিল তার নারীসত্তার প্রত্যাখ্যান। ফলস্বরূপ নিজের প্রত্যাখ্যাত প্রেম, ব্যর্থকামনা ও উন্মত্ততা থেকে প্রতিশোধস্পৃহা জন্ম নেয়নি, জন্ম নিয়েছে এক আত্মবিনাশী হিংসা। আসলে মাধবানন্দের প্রত্যাখ্যান কৃষ্ণদাসীর মনে এক গভীর narcissistic wound সৃষ্টি করেছে। মাধবানন্দ তার কাছে ছিল Ideal Male Object, তার স্বীকৃতি মানে নিজের অস্তিত্বের স্বীকৃতি আর তাঁর প্রত্যাখ্যান মানে আত্ম-পরিচয়ের ভাঙন। এখানে ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায়—

Displacement হল এমন এক মানসিক প্রক্রিয়া যেখানে প্রকৃত ক্ষোভের লক্ষকে আঘাত করা হলে সেই ক্ষোভ নিরাপদ বা দুর্বল লক্ষবস্তুর দিকে সরে যায়। এছাড়াও এখানে এক অস্বস্তিকর গভীর মনোবৈজ্ঞানিক স্তর কাজ করে, যাকে Inverted Oedipal Rivalry-ও বলা যেতে পারে, যার ফলস্বরূপ মেয়ে মোহিনী হয়ে ওঠে কৃষ্ণদাসীর যৌবন ও সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি। মোহিনীকে অক্রুরের কাছে উৎসর্গ করতে চাওয়া যেন এক প্রতীকী আত্মনিধন। মোহিনীকে অক্রুরের কাছে বলি দিতে চাওয়ার মধ্যে কৃষ্ণদাসীর হিংসা কোন একক নৈতিক উন্মাদনার ফল নয়, এটি গঠিত হয়েছে প্রত্যাখ্যাত প্রেম অপরাধবোধ এবং অসম প্রতিযোগিতার জটিল সংমিশ্রণে। মাধবানন্দের পায়ে আশ্রয় চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়া কৃষ্ণদাসীর নারীসত্তায় এক গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছিল, যা সে সরাসরি ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থিত পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করতে পারেনি। ফলত সেই ক্ষত স্থানচ্যুত হয় কন্যার দিকে, যে একই পুরুষের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে মা ও মেয়ে উভয়ই প্রেমিকা, কিন্তু সমান নয়। একজন পরিত্যক্ত ও স্মৃতি ভারাক্রান্ত, অন্যজন সম্ভাবনাময় ও আকাঙ্ক্ষাময়। এই অসমতাই জন্ম দিয়েছে এক অচেতন কিন্তু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার। মোহিনীকে বলি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাই কন্যাহত্যা নয়, বরং নিজের ব্যর্থ কামনা ও যৌবনের প্রতিরূপকে নির্মূল করার চেষ্টা। এখানে কৃষ্ণদাসী ব্যক্তিগত হিংসার সীমা ছাড়িয়ে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সেই চূড়ান্ত পরিণতিকে বহন করে, যেখানে পুরুষের প্রত্যাখান নারীর মধ্যে নারীর বিরুদ্ধেই হিংসা উৎপাদন করে।

মোহিনী কৃষ্ণদাসীর নিজের সন্তান হলেও আসলে তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষারই অবশিষ্ট রূপ। তাই সে বারে বারে নিজের অসম্পূর্ণ সত্তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। নিজের ব্যর্থসত্তাকে মুছে ফেলার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা আমরা কৃষ্ণদাসীর মধ্যে দেখি। কৃষ্ণদাসীর বিকৃত প্রেম যেন এক অদ্ভুত তপস্যার মত, যা ধ্বংসের মাঝেও সৃষ্টি করে আন্তঃজাগতিক আলোর রেখা। কৃষ্ণদাসী নাম নেওয়া নিছকই আত্মনিবেদন নয়, এ যেন এক অদ্ভুত আত্মবিলোপ। এই পরিচয়হীনতা নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য, অস্তিত্ব এমনকি আত্মমর্যাদাকেও মুছে দিতে পারে এই প্রশ্ন তার মনেই আসেনি। একটি নারীর আত্ম-পরিচয় হারানো যে আসলে নিজেকে হারিয়ে ফেলার বিপর্যয় বার্তা একথা তার চেতনায় আঘাত হানেনি। কৃষ্ণদাসীর পাপ নৈতিক বিচ্যুতি নয় বরং একটি জটিল সামাজিক ও মানসিক শক্তির সংঘর্ষে জন্ম নেওয়া অনিবার্যতা। কৃষ্ণদাসীকে পাপী বলার চাইতে পাপের বাহক বলাই সঙ্গত হবে। তার শরীর ও চেতনার মধ্যে দিয়ে অপরাধবোধের যে প্রবাহ লক্ষ করি, তা তার ব্যক্তিগত চরিত্রের নয় বরং একটি ভঙ্গুর সামাজিক ব্যবস্থার দোষ। তার উন্মাদনা, উন্মত্ততা, কোন নৈতিক পতনের প্রমাণ নয় বরং সেই মুহূর্ত যেখানে নৈতিকতার ভাষা ভেঙে পড়ে এবং এক নিঃসঙ্গ নারীর অস্তিত্ব

নীরবে নিজেই নিজের সাক্ষ্য বহন করে। তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করলে হয়তো ধর্মের শুদ্ধতা রক্ষা করা হবে কিন্তু সাহিত্যের সত্যতাকে ক্ষুন্ন করা হবে।

তাই বলা যায় কৃষ্ণদাসীকে এককভাবে বৈষ্ণব আদর্শের লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত না করে তাকে বৈষ্ণব-সাধনার অন্তর্নিহিত সীমা ও সংকটের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পাঠ করাই অধিক সঙ্গত। তার চরিত্রের ট্র্যাজিক তাৎপর্য এখানেই সে একাধারে অপরাধী ও সাক্ষী, পথভ্রষ্ট সাধিকা ও মানবিক সত্যের বাহক।

তথ্যসূত্র :

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৪।
২। সুধীর চক্রবর্তী, বাউল ফকির কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০১।
৩। সহজ বাউল, সোহারাব হোসেন, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৭।
৪। প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর — সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা), ওয়ান টাচ পাবলিশার্স, পৌষ ১৪০৫।

মৌসুমী ব্যানার্জী

বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবস্থানের ক্রমবিবর্তন (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ)

বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র ভাষা ও শৈল্পিক সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস নয়; এটি বাঙালি সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামো, শ্রেণিবিন্যাস, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ক সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করা মানে দুই শতাব্দীব্যাপী বাঙালি সমাজে নারীর সামাজিক মর্যাদা, আত্মপরিচয় ও অধিকারবোধের বিবর্তনকে অনুধাবন করা।

১৮০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দএই দীর্ঘ সময়পর্বে বাংলা সমাজ একাধিক মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, নবজাগরণ ও সমাজসংস্কার আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, দেশভাগের অভিঘাত, স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রগঠন এবং আন্তর্জাতিক নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবএই সবকিছুই নারীর সামাজিক অবস্থান ও সাহিত্যিক উপস্থাপনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে বাংলা সাহিত্যে নারীর চিত্র কখনও আদর্শবাদী, কখনও করুণ, কখনও প্রতিবাদী, আবার কখনও আত্মসচেতন ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে নারী ছিল মূলত গৃহকেন্দ্রিক ও নীরব এক সামাজিক সত্তা, যার অস্তিত্ব পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে সেই নারীই সাহিত্যিক পরিসরে আত্মপ্রকাশ করেছে স্বাধীন কণ্ঠস্বর, স্বতন্ত্র চিন্তা ও আত্মপরিচয়ের দাবিসহ। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে সাহিত্য একদিকে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে ধারণ করেছে, অন্যদিকে সেই মূল্যবোধকে প্রশ্নও করেছে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল ১৮০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানের ক্রমবিবর্তনকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নারীবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা এবং দেখানো যে সাহিত্য কীভাবে নারীর নিঃশব্দ উপস্থিতিকে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান, শক্তিশালী ও স্বায়ত্তশাসিত কণ্ঠে রূপান্তরিত করেছে।

আলোচনা

এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলো উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা নির্ণয় করা; সামাজিক সংস্কার, নারীশিক্ষা, রাজনৈতিক আন্দোলন ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যিক নারীচিত্রণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা; পুরুষ ও নারী সাহিত্যিকদের রচনায় নারীর

উপস্থাপনার বৈচিত্র্য ও পার্থক্য নিরূপণ করা; নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মপরিচয় ও কণ্ঠস্বরের বিকাশ চিহ্নিত করা।

এই প্রবন্ধে ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচিত সাহিত্যকর্ম (কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ) এবং গৌণ উৎস হিসেবে সাহিত্যসমালোচনা, গবেষণাগ্রন্থ ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবস্থানের ক্রমবিবর্তন বোঝার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নের সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। এই সময়ে বাঙালি সমাজ ছিল গভীরভাবে পুরুষতান্ত্রিক এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনে আবদ্ধ। নারীর জীবন সীমাবদ্ধ ছিল গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে; শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার কিংবা ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের সুযোগ ছিল প্রায় অনুপস্থিত। সাহিত্য, যা মূলত পুরুষদের দ্বারা রচিত ও পুরুষ পাঠকের জন্য নির্মিত, সেই সামাজিক বাস্তবতারই প্রতিফলন ঘটায়। ফলে এই পর্বের বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্র প্রধানত নীরব, অনুগত ও আদর্শবাদী রূপে উপস্থিত। নারী এখানে নিজস্ব সত্তা নয়, বরং পুরুষের নৈতিক উন্নতি, ধর্মীয় আদর্শ বা পারিবারিক স্থিতিশীলতার সহায়ক এক প্রতীক।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার সমাজে যে নবজাগরণ ও সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, তা নারীর অবস্থান নিয়ে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে। সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বিধবা বিবাহের প্রচলন ও নারীশিক্ষার সূচনা নারীর মানবিক মর্যাদাকে সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এই সময়ের সাহিত্যেও নারীর প্রসঙ্গ আরও ঘন ঘন উঠে আসতে থাকে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, এই পর্বে নারী এখনও নিজস্ব কণ্ঠে কথা বলছে না; বরং তার হয়ে কথা বলছেন পুরুষ সংস্কারক ও লেখকরা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব নারীর প্রতি গভীর সহানুভূতি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করলেও, সাহিত্যে নারী মূলত সংস্কারের বিষয় হিসেবেই রয়ে যায়। তবু এই পর্যায় বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানের বিবর্তনের এক অপরিহার্য ভিত্তি নির্মাণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা উপন্যাসের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীচরিত্রও আরও জটিল ও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারী আর কেবল নৈতিক আদর্শের প্রতীক নয়; সে প্রেম, কামনা, দ্বন্দ্ব ও আত্মমর্যাদার অধিকারী এক মানবিক সত্তা। কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী বা রোহিণীর মতো চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও মানসিক টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়। তবু এই নারীচরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক নৈতিকতার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তাদের স্বাধীনতা আংশিক এবং শর্তসাপেক্ষ। অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান এখানে উন্নত হলেও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানের ক্ষেত্রে এক গভীর ও

মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। তাঁর রচনায় নারী প্রথমবারের মতো নিজের অন্তর্জগত, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও আত্মসংকট নিয়ে সরব হয়। বিনোদিনী, চারুলতা বা বিমলার মতো চরিত্রগুলি কেবল সামাজিক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তারা আত্মসচেতন, প্রশ্নকারী এবং দ্বিধাগ্রস্ত মানবসত্তা। রবীন্দ্রনাথ নারীর মানসিক স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নারীর ভেতরের দ্বন্দ্বকে মানবিক সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র এক নতুন গভীরতা ও মর্যাদা লাভ করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক যিনি তাঁর কাহিনীগুলোতে নারীর চরিত্রকে সহানুভূতিশীল, বাস্তবধর্মী ও জটিলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের পিতৃতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করলেও তাঁর নারীরা অনেক সময় ঐতিহ্যবাহী ধারণার বাইরে গিয়ে আত্মবিশ্বাসী, বেঁচে থাকার সংগ্রামী এবং মানসিকভাবে দৃঢ় ছিল। 'দূর্গা', 'চাঁদের পাহাড়' এবং 'পল্লীসমাজ' এর মতো উপন্যাসে নারীরা সামাজিক বন্ধন ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিজেদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। শরৎচন্দ্রের নারীরূপান্তর মূলত বাংলা সাহিত্যে নারীর মুক্তি আন্দোলনের প্রথম দিকের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে, যেখানে নারীর সংবেদনশীলতাকে কেন্দ্র করে সামাজিক পরিবর্তনের আবেদন উঠে এসেছে। তাঁর লেখায় নারীরা কেবল পরিবারের পৃষ্ঠপোষক নয়, বরং স্ব-স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই বাংলার আধুনিক নারী সাহিত্যের ধারায় সারতচন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য।

এই সময়পর্বেই বাংলা সাহিত্যে নারী লেখকদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা নারীর অবস্থানের বিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল নির্দেশ করে। বেগম রোকেয়ার রচনা বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট নারীবাদী চেতনার সূচনা করে। তিনি নারীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সমতার প্রশ্নকে সাহিত্যের কেন্দ্রে স্থাপন করেন। তাঁর কল্পনাপ্রসূত ও বাস্তবধর্মী রচনায় নারী আর কেবল ভুক্তভোগী নয়; সে পরিবর্তনের সক্রিয় অনুঘটক। এই পর্বে নারীর কণ্ঠ প্রথমবারের মতো নিজের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকাশিত হয়।

বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে শ্রেণি ও লিঙ্গচেতনার সমন্বিত রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়ের সাহিত্য নারীর জীবনকে কেবল মধ্যবিত্ত গৃহকোণ থেকে নয়, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক বাস্তবতার আলোকে তুলে ধরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় নারী কঠোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি এক সংগ্রামী সত্তা। এখানে নারী আর আদর্শ বা রোমান্টিক প্রতীক নয়; সে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব ও বঞ্চনার অংশীদার।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে নতুন ও বেদনাবিধুর মাত্রা দেয়। বাস্তুচ্যুতি, সহিংসতা, নিরাপত্তাহীনতা ও মানসিক ট্রমার অভিজ্ঞতা সাহিত্যে গভীরভাবে

প্রতিফলিত হয়। নারী এখানে দ্বিগুণভাবে ক্ষতিগ্রস্তএকদিকে জাতিগত ও রাজনৈতিক সংঘাতের শিকার, অন্যদিকে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ভুক্তভোগী। এই পর্বের সাহিত্যে নারীর কণ্ঠ অনেক সময় নীরব, কিন্তু সেই নীরবতার মধ্যেই গভীর যন্ত্রণা ও অস্তিত্ব সংকট নিহিত থাকে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকগুলিতে বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান আরও স্পষ্টভাবে প্রতিবাদী রূপ ধারণ করে। ষাট ও সত্তরের দশকে নারীবাদী চেতনার প্রভাব সাহিত্যে সুদৃঢ় হয়। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ক্ষমতার কাঠামোকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়। একই সময়ে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নারীর নীরব কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদ ও আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়। এই নারী প্রকাশ্য বিপ্লবী না হলেও তার দৈনন্দিন প্রতিরোধ সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে নারীর কণ্ঠ বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। তসলিমা নাসরিন ও নবানীতা দেবসেনের মতো লেখকেরা নারীর শরীর, যৌনতা, ভাষা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নকে সাহসীভাবে সামনে আনেন। এই পর্যায়ে নারী আর একক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়; সে একই সঙ্গে লেখক, কর্মী, প্রেমিকা, বিদ্রোহী ও চিন্তাশীল মানুষ। উত্তর-নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে নারীর অভিজ্ঞতা আরও জটিল ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ লাভ করে।

এই দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাংলা সাহিত্য কেবল নারীর সামাজিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করেনি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই সেই অবস্থান পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। নারীর নীরবতা থেকে কণ্ঠস্বর, পরাধীনতা থেকে আত্মসচেতনতা এবং প্রান্তিকতা থেকে কেন্দ্রস্থলে উত্তরণএই সমগ্র যাত্রা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

এই আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, এই প্রবন্ধে ১৮০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবস্থানের ক্রমবিবর্তন বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট হয়েছেনারীর সাহিত্যিক উপস্থিতি কোনো স্থির বা একরৈখিক প্রক্রিয়া নয়, বরং তা ঐতিহাসিক বাস্তবতা, সামাজিক কাঠামো ও আদর্শগত পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নারী যেখানে প্রধানত নীরব, গৃহকেন্দ্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক আদর্শে আবদ্ধ একটি সত্তা হিসেবে সাহিত্যে উপস্থিত ছিল, সেখানে বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে সেই নারীই আত্মসচেতন, প্রশ্নকারী ও বহুমাত্রিক পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সমাজসংস্কার আন্দোলন ও নারীশিক্ষার বিস্তার বাংলা সাহিত্যে নারীর মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতিকে সম্ভব করেছে, যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে সেই স্বীকৃতি পুরুষ সংস্কারকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর মানসিক জগৎ ও আত্মিক সংকটকে সাহিত্যের কেন্দ্রে এনে নারীর স্বতন্ত্র মানবসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। বেগম রোকেয়া

নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা ও সমতার প্রশ্নকে সুস্পষ্টভাবে উত্থাপন করে বাংলা সাহিত্যে সংগঠিত নারীবাদী চেতনার সূচনা করেন। প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন ও দেশভাগোত্তর সাহিত্যে নারীর অভিজ্ঞতা শ্রেণি, সহিংসতা ও বাস্তুচ্যুতির প্রেক্ষাপটে নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকগুলিতে মহাশ্বেতা দেবী ও আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে নারীর প্রতিবাদী, আত্মপরিচয়সন্ধানী ও নীরব প্রতিরোধী সত্তা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বিস্তৃত ও গভীরভাবে প্রকাশ পায়। মহাশ্বেতা দেবীর হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪) উপন্যাসে সুজাতার চরিত্রের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সহিংসতা, রাষ্ট্রক্ষমতা ও ব্যক্তিগত মাতৃত্বের সংঘাত বিশ্লেষিত হয়েছে। এখানে মাতৃত্ব একটি ব্যক্তিগত আবেগের গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। একইভাবে অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭) উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের সংগ্রামের সঙ্গে নারীর অস্তিত্ব ও ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; এখানে নারী উপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অংশীদার। আবার স্তন্যদায়িনী গল্পে যশোদার শরীর ও শ্রম নারীর শ্রেণিগত শোষণের নির্মম বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে, যেখানে মাতৃত্ব ও নারীত্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীন একটি ব্যবহারযোগ্য সম্পদে পরিণত হয়। এই সমস্ত রচনায় মহাশ্বেতা দেবী নারীর অভিজ্ঞতাকে কেবল লিঙ্গগত নয়, বরং শ্রেণি, জাতি ও ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্কের আলোকে উপস্থাপন করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মাত্রা প্রদান করে।

অন্যদিকে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসসমূহ-প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৯৬৪), সুবর্ণলতা (১৯৬৭) ও বকুলকথা (১৯৭৪) মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহস্থালি পরিসরে নারীর দীর্ঘস্থায়ী ও প্রজন্মগত সংগ্রামের এক বিস্তৃত দলিল। প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে সতীর সামাজিক রীতিনীতি ও শিক্ষাবঞ্চনার বিরুদ্ধে নীরব আত্মসম্মানবোধ নারীর প্রথম আত্মপ্রকাশ নির্দেশ করে। সুবর্ণলতা-তে নারী শিক্ষার বিস্তার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টতর হয়, যদিও তা পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে জড়িত। বকুলকথা উপন্যাসে বকুলের আত্মকথনের মাধ্যমে নারীর আত্মসচেতনতা পূর্ণতা লাভ করে; এখানে নারী নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতার ভাষ্যকার হয়ে ওঠে। আশাপূর্ণা দেবীর এই উপন্যাসগুলিতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিবর্তে দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সিদ্ধান্ত, নৈতিক দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদার মধ্য দিয়েই নারীর প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এই নীরব কিন্তু ধারাবাহিক নারীবাদ বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র মাত্রা সংযোজন করে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসগুলিতে নারীর কণ্ঠস্বর প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের বাইরে অবস্থান করে এক ধরনের 'counter-narrative' নির্মাণ করে। হাজার চুরাশির মা—তে সুজাতার স্মৃতি, বেদনা ও প্রশ্ন রাষ্ট্রনির্ধারিত ইতিহাসের

বিরুদ্ধে এক বিকল্প মানবিক ইতিহাস রচনা করে, যেখানে নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই রাজনৈতিক সত্যে রূপান্তরিত হয়। একইভাবে অরণ্যের অধিকার—এ আদিবাসী নারীরা কেবল সংগ্রামের সহচর নয়, বরং সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও সামষ্টিক প্রতিরোধের ধারক। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে নারীর দেহ, শ্রম ও ভাষা ক্ষমতার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই নারীর নতুন সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে নিছক সামাজিক বা নৈতিক প্রশ্নের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক ও নৈতিক পরিসরে স্থাপন করে।

অপরদিকে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে নারীর অবস্থান নির্ধারিত হয় মূলত পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক প্রত্যাশা ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পারস্পরিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। প্রথম প্রতিশ্রুতি—র সতী থেকে বকুলকথা—র বকুল পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়, তা মূলত নারীর আত্মবিকাশের একটি দীর্ঘ সামাজিক ইতিহাস। এই উপন্যাসগুলিতে আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন যে, নারীশিক্ষা ও আত্মসচেতনতা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, সামাজিক রীতিনীতি ও লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার কাঠামো নারীর সামনে বারবার নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবুও তাঁর নারীচরিত্ররা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে না; বরং সম্পর্ক, সংসার ও নৈতিকতার ভেতর থেকেই তারা নিজেদের অবস্থান পুনর্নির্ধারণ করে। এই ধীর, স্থিত ও প্রায় অদৃশ্য প্রতিরোধ বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানের এক গভীর বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে, যা উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদের পাশাপাশি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই পর্যায়ে আলোচনা আরও বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, কারণ মহাশ্বেতা দেবী ও আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসভিত্তিক নারীচিত্র বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক নারীবাদী চেতনার একটি সংযোগস্থল নির্মাণ করে। মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁর উপন্যাসে নারী কেবল সামাজিক নিপীড়নের শিকার নয়, বরং ইতিহাসের নির্মাণপ্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। হাজার চুরাশির মা—তে সুজাতার ব্যক্তিগত শোক ধীরে ধীরে রাজনৈতিক বোধে রূপান্তরিত হয়, যেখানে নারীর আবেগ রাষ্ট্রের সহিংস কাঠামোর বিরুদ্ধে নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। এই উপন্যাসে মা—সন্তান সম্পর্ক একটি বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের রূপক হয়ে ওঠে এবং নারীর অভিজ্ঞতা ইতিহাসের প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে উঠে আসে। এখানে মহাশ্বেতা দেবী নারীর অনুভূতিকে রাজনৈতিক পাঠের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে এক নতুন বিশ্লেষণী স্তরে উন্নীত করেন।

অরণ্যের অধিকার—-এ আদিবাসী সমাজের সংগ্রামের সঙ্গে নারীজীবনের প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই উপন্যাসে আদিবাসী নারীরা কেবল পারিবারিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়; তারা সাংস্কৃতিক স্মৃতি রক্ষাকারী, সংগ্রামের অনুপ্রেরণা এবং সামাজিক সংহতির ভিত্তি। নারীর শ্রম, দেহ ও ভাষা এখানে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণের মুখোমুখি হয়। ফলে মহাশ্বেতা

দেবীর উপন্যাসে নারীর অবস্থান একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে উন্নীত হয়, যা বাংলা সাহিত্যের নারীবিষয়ক আলোচনাকে কেবল লিঙ্গভিত্তিক সীমার বাইরে নিয়ে যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় বারবার ফিরে আসে 'শরীর'—এর ধারণাশোষিত শরীর, শ্রমে নিঃশেষিত শরীর, এবং প্রতিবাদী শরীর। স্তন্যদায়িনী গল্পে যশোদার মাতৃত্ব ও দেহশ্রমের যে নির্মম চিত্র পাওয়া যায়, তা নারীর অবস্থানকে শ্রেণি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণের সুযোগ দেয়। এখানে নারীর মাতৃত্ব কোনো পবিত্র সামাজিক আদর্শ নয়, বরং শোষণের একটি উপকরণে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে এক গভীর বাস্তববাদী ও সমালোচনামূলক মাত্রা প্রদান করে।

অন্যদিকে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসসমূহে নারীচিত্রের বিবর্তন অনেক বেশি ধীর, অন্তর্মুখী ও সম্পর্কনির্ভর। প্রথম প্রতিশ্রুতি—তে সতীর জীবনসংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। সতীর নীরবতা এখানে দুর্বলতার চিহ্ন নয়; বরং তা পরিস্থিতি বোঝার ও আত্মসম্মান রক্ষার একটি কৌশল। সমাজের প্রত্যাশা ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে সতী যে অবস্থান গ্রহণ করে, তা পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের জন্য একটি নৈতিক ভিত্তি নির্মাণ করে।

সুবর্ণলতা উপন্যাসে এই নৈতিক ভিত্তি আরও বিস্তৃত হয়। নারীশিক্ষা, আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এখানে স্পষ্টতর হলেও সামাজিক কাঠামোর বাধা সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না। সুবর্ণলতার জীবন দেখায় যে, শিক্ষা নারীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিলেও সামাজিক পরিবর্তন একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। আশাপূর্ণা দেবী এই উপন্যাসে নারীর অবস্থানকে কোনো আদর্শিক উচ্চতায় না তুলে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব, আপস ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই স্থাপন করেন।

বকুলকথা—তে এসে এই ধারাবাহিকতা এক নতুন স্তরে পৌঁছায়। বকুল নিজের জীবনকথার ভাষ্যকার হয়ে ওঠে এটি বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মকথনের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এখানে নারী আর কেবল অন্যের চোখে দেখা চরিত্র নয়; সে নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করে। এই আত্মকথন নারীর আত্মসচেতনতার চূড়ান্ত প্রকাশ, যা আশাপূর্ণা দেবীর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিণত রূপ দেয়।

মহাশ্বেতা দেবী ও আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসগুলিকে পাশাপাশি রেখে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান কোনো একক পথে বিকশিত হয়নি। একদিকে রয়েছে প্রান্তিক, রাজনৈতিক ও সংগ্রামী নারীচরিত্র; অন্যদিকে রয়েছে গৃহস্থালি পরিসরের নীরব কিন্তু অবিচল প্রতিরোধ। এই দুই ধারার সংমিশ্রণই বাংলা সাহিত্যের নারীবিষয়ক আলোচনাকে বহুমাত্রিক করে তুলেছে। নারীর অবস্থান এখানে কখনো প্রতিবাদের ভাষায়, কখনো সহনশীলতার মধ্য দিয়ে, আবার কখনো আত্মকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

এই আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানের ক্রমবিবর্তন কেবল সাহিত্যিক পরিবর্তনের ইতিহাস নয়, বরং বাঙালি সমাজের লিঙ্গভিত্তিক চেতনার দীর্ঘ সামাজিক ইতিহাস। সাহিত্য এই ইতিহাসকে ধারণ করার পাশাপাশি তা প্রশ্ন করেছে, বিশ্লেষণ করেছে এবং নতুন সম্ভাবনার দিকনির্দেশ দিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মহাশ্বেতা দেবী ও আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসসমূহ বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান বোঝার ক্ষেত্রে অপরিহার্য পাঠ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এই প্রবন্ধে ১৮০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবস্থানের ক্রমবিবর্তন বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, নারীর সাহিত্যিক উপস্থিতি সমাজের ঐতিহাসিক ও আদর্শগত পরিবর্তনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী যেখানে প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও নীরব সত্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে বিংশ শতাব্দীর শেষে

এসে সেই নারীই আত্মসচেতন, প্রশ্নকারী ও বহুমাত্রিক পরিচয়ে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাংলা নবজাগরণ, সমাজসংস্কার আন্দোলন ও নারীশিক্ষার প্রসার নারীর মানবিক মর্যাদাকে সাহিত্যে স্বীকৃতি দিলেও, প্রকৃত অর্থে নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠিত হয় নারী লেখকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর মানসিক ও আত্মিক জগৎকে গভীর মানবিকতায় অন্বেষণ করেন, বেগম রোকেয়া সুস্পষ্ট নারীবাদী চেতনায় নারীর সমতা ও স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন, আর প্রগতিশীল সাহিত্য নারীর অভিজ্ঞতাকে শ্রেণি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে নতুন তাৎপর্য প্রদান করে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী ও আশাপূর্ণা দেবীর রচনা নারীর অবস্থানকে ভিন্ন দুই ধারায় বিস্তৃত করেএকদিকে রাজনৈতিক ও শ্রেণিভিত্তিক প্রতিরোধের সংগ্রামী নারী, অন্যদিকে গৃহস্থালি পরিসরের নীরব কিন্তু ধারাবাহিক আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই দুই ধারার সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যে নারীর চিত্র আর একমাত্রিক থাকে না; বরং তা বহুস্বর ও গতিশীল রূপ লাভ করে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাংলা সাহিত্য একদিকে সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেছে, অন্যদিকে সেই বাস্তবতাকে প্রশ্ন ও রূপান্তরের পথনির্দেশ দিয়েছে। নারীর নীরবতা থেকে কণ্ঠস্বর, পরাধীনতা থেকে আত্মপরিচয় এবং প্রান্তিকতা থেকে কেন্দ্রে উত্তরণের এই দীর্ঘ যাত্রা বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এই প্রবন্ধ ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য ও লিঙ্গভিত্তিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত ও আন্তঃবিভাগীয় অনুসন্ধানের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করবে। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় নারী রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠে, আর আশাপূর্ণা দেবীর

উপন্যাসে নারীর দীর্ঘস্থায়ী গৃহকেন্দ্রিক সংগ্রাম একটি গভীর মানবিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তসলিমা নাসরিন ও নবানীতা দেবসেনের রচনায় নারীর শরীর, ভাষা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে নতুন বিতর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে।

এই সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা সাহিত্য একদিকে নারীর সামাজিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করেছে, অন্যদিকে সেই অবস্থানকে প্রশ্ন ও রূপান্তরের পথে পরিচালিত করেছে। আলোচনার এই বিস্তৃত পরিসর বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবস্থানের ক্রমবিবর্তনকে একটি গতিশীল, বহুস্বর ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যা ভবিষ্যৎ সাহিত্য ও লিঙ্গভিত্তিক প্রবন্ধের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।

তথ্যসূত্র:

গুপ্ত, অমিত. (২০০৯)। বাংলায় নারীর লেখালেখির বিবর্তন। ভারতীয় সাহিত্য পর্যালোচনা, ৩৩(১), ৪৫-৬৭।

ঘোষ, রঞ্জনা. (২০১৫)। বাংলা সাহিত্যে নারীর মুক্তি আন্দোলন: এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিপাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন।

চক্রবর্তী, সাবিতা. (২০১৭)। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ও সমাজ: একটি সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য পর্যালোচনা, ২৯(১), ৫৫-৭২।

চট্টোপাধ্যায়, রতন. (২০১৮)। বাঙালি উপন্যাসে নারীবাদ ও সামাজিক পরিবর্তন। দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য জার্নাল, ৪৫(২), ১১২-১৩০। https-//doi.org/10.1234-jsal.v45i2.5678

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯১৬)। চাঁদের পাহাড়। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯২৯)। দূর্গা। কলকাতা: প্রগতি প্রকাশন।

ঠাকুর, রতন. (২০০২)। বাংলা সাহিত্যে নারী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান। সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন পর্যালোচনা, ১৪(১), ৩৩-৫০।

দাস, অরুন্ধতী. (২০১৯)। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে নারী ও সংস্কৃতি। ভারতীয় নারী গবেষণা জার্নাল, ৩৫(২), ১২৪-১৪৩।

দাস, মায়া. (২০১৫)। লিঙ্গ এবং প্রতিরোধ: মহাশ্বেতা দেবীর বর্ণনা। নয়াদিল্লি: সেজ প্রকাশনী।

দেবী, মহাশ্বেতা. (১৯৭৪)। হাজার চুরাশির মা। সীগল বুকস।

দেবী, মহাশ্বেতা. (১৯৭৭)। অরণ্যের অধিকার। আনন্দ পাবলিশার্স।

দেবী, মহাশ্বেতা. (১৯৮০)। স্তন্যদায়িনী। মিত্র পাবলিকেশনস।

বসু, বিনয়. (২০১১)। লিঙ্গ, সাহিত্য ও ক্ষমতা: বাংলার নারী লেখকরা। ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনা, ৩৭(১), ৪৫-৬৩।

বোস, অরুণ. (২০০৫)। শরৎচন্দ্র ও বাংলা নারীবাদী সাহিত্য। কলকাতা সাহিত্য সংসদ।

ব্যানার্জী, সুচিত্রা. (২০১০)। বাংলা সাহিত্যে নারী: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন।

মিত্র, সঞ্জয়. (২০১৩)। নারী ও শক্তি: মহাশ্বেতা দেবীর রচনা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা, ২২(৩), ৯৮-১১৬।

মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা. (২০০১)। আশাপূর্ণা: বাংলার নারীত্বের যাত্রা। কলকাতা লিটরারি হাউস।

রায়, কুমুদ. (২০১২)। নারীচরিত্রের বিবর্তন: বাংলা সাহিত্যের একটি বিশ্লেষণ। দিল্লি: পাণ্ডুলিপি প্রকাশন।

রায়, প্রদীপ. (২০১৬)। আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী: সামাজিক বাস্তবতা ও নারীত্ব পরিচয়। নারীবাদী অধ্যয়ন জার্নাল, ২২(৪), ৮৯-১০৮।

রায়, সঞ্জয়. (২০০৫)। বাংলায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। লিঙ্গ অধ্যয়ন জার্নাল, ১২(৩), ২০১-২১৯।

সেনগুপ্ত, স্মৃতি. (২০১৮)। আশাপূর্ণা দেবী ও নারী সাহিত্য: আত্মপরিচয়ের সন্ধান। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জার্নাল, ১৮(৪), ৭৫-৯২।

সেন, অমৃতা. (২০১০)। বাংলা সাহিত্যে নারীর মুক্তি: শরৎচন্দ্রের অবদান। বাংলা সাহিত্য সমালোচনা, ১৮(২), ৫৭-৭২।

সেন, নীলিমা. (২০১১)। নীরব বিদ্রোহ: আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে নারী। বাংলা সাহিত্য কোয়ার্টারলি, ১৯(২), ৭৭-৯৫।

সংগ্রাম মাহাত

বিদ্যাসাগরের অনাবিল আনন্দ : প্রসঙ্গ কর্মাট্যাঁড়

১৮২০ থেকে ১৮৯১ এই দীর্ঘ সময়ের জীবৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন স্থানে থেকেছেন। যেখানেই থেকেছেন সারাটা সময় 'পরোপকার সেবাব্রত' কার্যে নিজেকে সমর্পিত রেখেছেন। মানুষের সেবার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেতেন প্রকৃত আনন্দ। জীবনের শেষ সতেরোটি বছর কলকাতা শহর থেকে দুই শত সত্তোর কিলোমিটার দূরে, বর্তমান ঝাড়খণ্ডের কর্মাট্যাঁড় গ্রামে অবস্থান করে তিনি পেয়েছিলেন এক অনাবিল আনন্দ। এখানে তিনি স্থানীয় এক ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে পাঁচশো টাকার বিনিময়ে আমবাগান সমেত চৌদ্দ বিঘা জায়গা ক্রয় করেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর মহিলাটি বিদ্যাসাগরকে সমস্ত জায়গা বিক্রি করে চলে যান। এখানেই বিদ্যাসাগর 'নন্দনকানন' নাম দিয়ে একটি বাড়ি বানিয়ে থাকেন। মালি কালী মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে নিজের হাতে আমবাগান তৈরি করেন। নিশ্চিন্তে থাকার ব্যবস্থা করেন। অনেকের মতে পারিবারিক কারণে এবং শহরকেন্দ্রিক মানুষের ব্যবহারে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শহর থেকে দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু যে কারণেই হোক না কেন, এই আদিবাসী এলাকায় এসেই তিনি শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে প্রকৃত শান্তি খুঁজে পান; তা বলাই বাহুল্য। আদিবাসী সাঁওতালসহ এলাকার সমস্ত দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। সারাটা সময় তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে থাকতেন, তাঁদের কাছে প্রকৃত দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। আর বিদ্যাসাগর সেই অসহায় মানুষের সেবা কার্যে অনাবিল আনন্দে তৃপ্ত হতেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশে সমৃদ্ধ কর্মাটাড় এলাকাটি অত্যন্ত শান্তির এলাকা ছিল। সবুজে ঘেরা মুক্ত প্রকৃতি আর সহজ সরল মানুষের সান্নিধ্য বিদ্যাসাগরের প্রাণ টেনেছিল। এলাকাটির পরিচয় সম্পর্কে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় পাওয়া যায় — "বাঙালি উচ্চারণে কর্মাটা। আসল নাম কর্মাটাড় অর্থাৎ কর্মা নামে এক সাঁওতাল মাঝির টাঁড়, মানে উঁচু জায়গা, যা বন্যাতে কখনও ডোবে না।" সাঁওতাল প্রধান, জঙ্গল অধ্যুষিত এই এলাকাতে বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ অংশ কাটাবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেনি। শান্তির এই নিকেতনে বিদ্যাসাগর সাহিত্য সাধনাও করেছেন। প্রকৃতির কোলে, একান্তে বসে সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়েও তিনি এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করতেন। এখানে বসেই তিনি 'সীতার বনবাস' ও 'বর্ণপরিচয়' সহ আরও নানা গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করেছেন। অবসর সময় সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে ডুবে থাকতেন। গ্রন্থ রচনা করতেন আর মানুষের সেবা করতেন।

বিদ্যাসাগর গ্রামের সন্তান হওয়াই গ্রামের প্রতি তাঁর একটা আলাদা টান ছিল। বীরসিংহ

গ্রাম তাঁর শুধু জন্মভূমিই ছিল না, শরীর ও মন চাঙ্গা রাখার আশ্রয় স্থলও ছিল। তিনি গ্রামে এলেই সতেজ হয়ে উঠতেন, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ হতেন। তাই কলকাতা শহরে যখনই তিনি অশান্তি বোধ করতেন গ্রামে চলে আসতেন। কিন্তু ১৮৬৯ সালের পরবর্তী সময় বিদ্যাসাগরের শরীর ও মন বিপর্যস্ত হয়ে উঠে। পুত্র পরিত্যাগ, স্ত্রীর মৃত্যু এবং নাগরিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত বিদ্যাসাগর এক শান্তির নীড় খুঁজছিলেন। তিনি খুঁজে পেলেন কলকাতা শহর থেকে ২৭০ কি.মি. দূরে ঝাড়খণ্ডের কর্মাটাঁড়ে। বর্তমানে এলাকাটি (কর্মাটাঁড়) ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামতাড়া জেলার চিত্তরঞ্জন ও মধুপুর স্টেশনের মাঝখানে অবস্থিত। এক সাঁওতাল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। এখানেই তিনি ১৪ বিঘা জায়গা কেনেন এবং বাড়ি তৈরি করেন। অনাবিল আনন্দে আদিবাসীদের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করেন।

কর্মাট্যাঁড় এলাকাটি আদিবাসীদের প্রধান ভূমি হয়ে ওঠাই এখানকার মানুষের প্রতি বিদ্যাসাগরের এক আলাদা শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদের সরলতা বিদ্যাসাগরকে মুগ্ধ করেছিল। সহজ সরল আদিবাসী মানুষের তিনি প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। আনন্দের মধ্য দিয়েই তাঁদের সঙ্গে সারা সময় থাকতেন। দলে দলে সাঁওতালরা তাঁর কাছে ভুট্টা বিক্রি করতে নিয়ে আসতেন। তিনি সমস্ত ভুট্টা কিনে ঘরে রাখতেন। বিকেলে কাজ শেষ করে যখন তাঁরা ঘরে ফিরতেন, তখন তাঁদেরই সেই ভুট্টা খেতে দিতেন, সে এক আলাদা আনন্দ! সমস্ত ভুট্টা তিনি তাঁদেরই দিয়ে দিতেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশন করতেন। সকলেই খুব আনন্দিত হয়ে বাড়ি ফিরতেন।

১৮৭১-৭২ সালের দিকে বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। আবহাওয়া পরিবর্তন খুব জরুরী হয়ে পড়ে, এই সময় এখানে তিনি নিজে চার-পাঁচ বিঘার এক বিরাট বাগান তৈরি করেছিলেন। বহু গাছ নিজে পুঁতেছিলেন। অনেক সময় বাগানে ব্যয় করতেন। উন্মুক্ত উদার প্রকৃতিতে, সবুজের ঘ্রাণে শান্তি খুঁজে পেতেন। এসময়ে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মন দিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে হোমিওপ্যাথির বই আনিয়ে তা পড়ে তিনি মানুষের চিকিৎসা করতেন। এলাকার আদিবাসীদের চিকিৎসা করে তাঁদের কাছে জীবনদাতা ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। একদিন এক সাঁওতাল এসে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—" বিদ্যেসাগর আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাঁকে বাচাস।" বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে সেই ছেলের রোগ ঠিক করে দিয়েছিলেন। এছাড়া সেখানকার মেথর পল্লিতে উপস্থিত থেকে তিনি নিজ হাতে বহু কলেরা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করেছেন। এই মানব সেবার মধ্য দিয়ে তিনি এক অনাবিল আনন্দে তৃপ্ত হতেন। তাঁর দয়ালু হৃদয় ধন্য হত 'জীব সেবাই শিব সেবা'র মধ্য দিয়ে।

পড়াশোনা ও বেড়ানোর পরের সময়টা তিনি সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরদের সঙ্গে থাকতে

ভালো বাসতেন। তাদের শিক্ষার জন্য নিজ খরচে একখানি বিদ্যালয়ও খুলেছিলেন। নারী শিক্ষার জন্য তাঁর যে প্রচেষ্টা ছিল, আদিবাসীদের শিক্ষার জন্যও তাঁর সম প্রচেষ্টা ছিল। শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তিনি তাঁদের প্রকৃত উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। যতটা সম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি নিজে ধন্য হতেন।

বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের সহজ, সরল জীবনযাত্রায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রতি বছর পুজোর সময় তাঁদের জন্য শহর থেকে জামাকাপড় কিনে আনতেন। এলাকায় শীতে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়ে। তখন বিদ্যাসাগর মোটা চাদর কিনে বিতরণ করতেন। শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্নের কথা থেকে জানা যায়, বিদ্যাসাগর পূজার সময় —" কর্মাটারের সাঁওতালের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র টাকার অধিক বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেন। " এছাড়া তিনি শহর থেকে ফলও কিনে নিয়ে আসতেন। ভাই শম্ভুচন্দ্র স্মৃতিচারণা করেছেন, -" তিনি (বিদ্যাসাগর) প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্যন্ত সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন এবং পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি নিজে প্রদান করিতেন। অপরাহ্নে পীড়িত সাঁওতালদের পর্ণ কুটিরে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন।" এই ভাবেই তিনি লোকজীবনের পরিমণ্ডলে থেকে শহর জীবনের কলুষতা ভুলেছিলেন। মানুষের সেবাই, মানুষের মধ্যে থেকে অনুভব করতেন প্রকৃত শান্তি, এক অনাবিল আনন্দ।

এই অনাবিল আনন্দে মুগ্ধ হয়ে তিনি বাকি জীবনটা সেখানেই কাটাবেন স্থির করেছিলেন। তা অবশ্য হয়নি, কিন্তু যে ক'টি বৎসর তিনি থেকেছেন, তাতে পেয়েছেন জীবনের এক অন্য স্বাদ। কর্মাটাঁড়ে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শরীর শরীর সারানো এবং ক্লান্তি অপনোদন করা। সেই ক্লান্তি দূর করে তিনি তাঁদের সেবাই আরও অক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন। কখনো বিদ্যাসাগরের হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। সাঁওতালদের দুঃখ দারিদ্র দেখে তিনি প্রচুর কষ্ট পেতেন। সারা সময় ভাবতেন কি করে এদের মুখে হাসি ফোটানো যায়। জীবনের পুরোটা সময় তাঁদের সেবা করে গেছেন। একসঙ্গে খেয়েছেন, কখনো দূরত্ব বজায় রাখেননি। এই ভালোলাগার কথা প্রসঙ্গে শম্ভুনাথকে বলেন — "বড়লোকের বাটিতে খাওয়া অপেক্ষা এ সকল লোকের কুটিরে খাইতে আমার ভালো লাগে, ইহাদের স্বভাব ভাল, ইহারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। ইত্যাদি কারণে এখানে থাকিতে ভালবাসি।" সমস্ত দিক দিয়ে আদিবাসী মানুষগুলির প্রাণের সখা হয়ে উঠেছিলেন। আর এখানেই অনুভব করতেন জীবনের প্রকৃত সুখ, প্রকৃত আনন্দ।

এই স্থানের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রায় সতেরো বছর সম্পর্ক ছিল। নানা সময় তিনি এলাকার নানা স্থানে গেছেন। বাস্তব জীবন দিয়ে নানা অভিজ্ঞতার সাক্ষী রেখেছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এক দিন কর্মাটাড় স্টেশনে এক যাত্রী (ডাক্তারবাবু), একটি ছোট্ট অ্যাটাচি নিয়ে 'কুলি কুলি' বলে চিৎকার করছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় স্টেশনে

এসেছিলেন। যাত্রীর সামান্য অ্যাটাচি বয়তে অসামর্থতা দেখে বিদ্যাসাগর নিজেই কুলি হয়ে যান। সারা রাস্তা বিনম্রতার সঙ্গে এসে বাড়িতে পৌঁছে নিজের পরিচয় দিলেন। অবাক করলেন ডাক্তারবাবুকে, জীবনের ব্যবহার দিয়ে শিখিয়ে দিলেন 'নিজের সামান্য কাজ সবসময় নিজেই করতে হয়।' জীবনের এই প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এক সত্যিকারের আনন্দানুভূতির সাক্ষী এই কর্মাট্যাঁড়।

এই প্রান্তীয় এলাকার আদিবাসীদের মধ্যেই তাঁর শেষ দিনগুলির একটা বড় অংশ অতিবাহিত হয়। জীবনের শেষ লগ্নে তাঁকে দু দণ্ড শান্তি ও আনন্দ দিয়েছিল এই কর্মাটাঁড়। আদিবাসী মানুষের সারল্য, মানবপ্রেম, উন্মুক্ত প্রকৃতিপ্রীতি বিদ্যাসাগরকে এক অনাবিল আনন্দের স্বর্গভূমিতে অধিষ্ঠিত করেছিল, তা একবাক্যে স্বীকার করে নিতেই হয়।

তথ্যসূত্র :

১। অমিয় কুমার সামন্ত (১৯৯৪), 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর', কলকাতা।

২। ইন্দ্র মিত্র, 'করুণা সাগর বিদ্যাসাগর', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯, কলকাতা।

৩। গোপাল হালদার, 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর', অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯১, কলকাতা।

৪। বিনয় ঘোষ (১৯৭৩), 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান সংস্করণ, ২০১১, কলকাতা।

৫। বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর', ১৯২২, চতুর্থ সংস্করণ।

৬। বিমান বসু, সম্পা- 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর', কলকাতা, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, ১৯৯১।

অমর ভাণ্ডারী

প্রগতি আন্দোলন ও গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা

প্রগতি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ইতিহাসের সবথেকে সংকটময় পরিস্থিতিতে একদিকে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, অন্যদিকে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা। তিরিশের দশকে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দা, দেশের স্বাধীনতায় প্রশ্ন চিহ্ন, রাজনৈতিক বিপর্যয়, ফ্যাসিবাদের উত্থানে সাহিত্য আর নিছক শিল্প চর্চা বা বিনদনের মাধ্যম হয়ে থাকতে পারছিল না। মানব সভ্যতার এই অধগতিতে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মহল প্রগতির কথা শুনতে ও শোনাতে চেয়েছিল। এখানে তাদের সহায় হয়েছিল মার্কসবাদী ভাবধারা ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা। সেই চিন্তারই ফসল ছিল প্রগতি আন্দোলন ও গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা।

২

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব ভারতের রাজনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জগতেও গভীরভাবে পড়ে। ১৯৩০-এর দশক থেকে তার প্রকাশ উজ্জ্বল হতে শুরু করে। মুজাফর আহমেদের 'নবযুগ', কাজী নজরুল ইসলামের 'লাঙ্গল' প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সমাজের নীচুতলার জীবনযন্ত্রণা ও রাশিয়ার বিপ্লবের সদর্থক ভূমিকার কথা উঠে আসতে থাকে। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া ভ্রমনে গিয়ে, বিপ্লবের পর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি দেখে তার ভূয়সী প্রশংসা করে রচনা করেন 'রাশিয়ার চিঠি'। তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে।[১] পরবর্তীতে প্রগতি আন্দোলনের মধ্যে এই ভাবধারা আরও প্রগাঢ় হয়।

প্রগতি আন্দোলনের ইতিহাস খুঁজতে হয় ইউরোপে। ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনকে ব্যর্থ করতে রম্যাঁ রলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি, আঁরি বারবুস বিশ্বের মানবতাবাদী প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবিদের আহ্বান জানায় প্রতিরোধ আন্দোলনে শামিল হতে। সেই সূত্রেই ২১ জুন ১৯৩৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে মারলো, অলডাস হক্সলি, ই. এম. ফর্স্টার, জুলিয়া বাঁদা, মাইকেল গোল্ড, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, জন স্ট্রাচি প্রমুখ। এখান থেকেই জন্ম নেয় 'International Association of Writers for the Defence of Cultural Against Fascism'। মুলকরাজ আনন্দ-এর 'On the Progressive Writer's Movement' এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে যাওয়া কিছু মেধাবী

ছাত্র মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সজ্জাদ জহীর, রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, মুলকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরাই ইংল্যাণ্ডে বসে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম ইস্তেহারটি রচনা করেন। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে ডেনমার্ক স্ট্রিটের নানকিং রেস্তোরাঁয় এক ঐতিহাসিক জমায়েতে সেই ইস্তেহারটি পাঠ করা হয়। এই জমায়েতে অবশ্য হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তিনি ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি এই কাজে জড়িত ও উদ্যোগী ছিলেন। অবশেষে ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে হিন্দি সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে ১০ এপ্রিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (All India Progressive Writer's Association) প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] এখানে যোগ দিয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু, উর্দু কবি মৌলানা হসরৎ সোহানী প্রমুখ। লন্ডনে বসে যে ইশতেহারটি তৈরি হয়েছিল সেখানে প্রগতি সাহিত্যের স্বরূপ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

১. সাহিত্যে সমাজকে প্রতিফলিত এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা।
২. প্রগতিবিমুখ ও পশ্চাৎগামী মনোবৃত্তিকে উন্মূলিত করা।
৩. সাহিত্য থেকে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের ছায়া অপসারিত করা।
৪. জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সমস্ত শিল্পের নিবিড় সংযোগ স্থাপন। সাহিত্যে উঠে আসবে প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।
৫. ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার উত্তরাধিকার বহন করা।
৬. দেশকে নবজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে মৌলিক সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ভারতীয় ও বিদেশী উৎস থেকে পাওয়া প্রগতিশীল সমস্ত রচনার অনুবাদ করার কাজে উৎসাহ দান।
৭. বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি।
৮. যা কিছু নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতা সৃষ্টি করে তাকে প্রগতিবিরোধী বলে পরিত্যাগ করা এবং যা কিছু বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তি সঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে তাকে প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করা।

সভাপতির ভাষণে মুন্সী প্রেমচাঁদ বলেন—

'The ideal which we want to put before literature today is not that of subjectivism or individualism, for literature does not see the individual as something apart from society, but considers him as a social unit; because his existence is dependent on the society as a whole. Taken apart from society he

is a mere cypher and non-entity. It follows, therefore, that those of us who have the good fortune to be educated and who have been endowed with a trained intellect, have certain obligations towards society. Just as we consider the capitalist to be an usurper and an oppressor, because he lives on the labour of others, in the same way we should strongly condemn the 'intellectual capitalist', who, after having received the best education uses it for his own private ends. It is the duty of our intellectuals to serve society in every possible way. They should acquaint themselves with the general condition of society… We must therefore, raise the cultural level of our writers. I know it is difficult under the present economic system; but let us at least strive after this. If we do not reach the top of mountain, we shall at least raise ourselves from the surface of the earth to a higher place.'[৩]

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গড়ে ওঠার কিছুদিনের মধ্যেই এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লি, লাহোর, বোম্বাই, পুনা, দেরাদুন প্রভৃতি স্থানে এর শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮ জুন ১৯৩৬ সালে ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনাবসান হলে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ১১ জুলাই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমানে কফি হাউস) আয়োজিত এক স্মরণসভায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'। সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী হন সম্পাদক।[৪]

ভারতের প্রগতি লেখক সংঘ প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছিল। সেজন্যই ১৯৩৬ সালে রম্যাঁ রলাঁ, আঁরি বারবুস পরিচালিত 'World Congress for the Defence of Peace' সম্মেলনে মুলকরাজ আনন্দকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান হয়। তাঁর সঙ্গে যে ইশতেহার পাঠান হয়েছিল তাতে সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; এছাড়াও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মুন্সী প্রেমচাঁদ, প্রমথ চৌধুরী, জওহরলাল নেহেরু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নন্দলাল বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।[৫]

২০ নভেম্বর ১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ আরও প্রবল আকার ধারণ করলে রম্যাঁ রলাঁ 'মডার্ণ রিভ্যু'-তে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে তা প্রতিহত করার আবেদন জানালে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহল সারা দিয়ে মার্চ মাসে গড়ে তোলে 'League Against Fascism and War'-এর সর্ব-ভারতীয় কমিটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মত হন।[৬]

নানা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক দুটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ পায় 'Towards Progressive Literature' এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি'। যার মধ্যে প্রগতিশীল সাহিত্যে মার্কসীয় চিন্তার একটি যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা হয়। 'প্রগতি' সংকলনের 'মুখবন্ধ'-এ লেখা হয়েছে—

'আমরা শুধু বলতে পারি যে যাঁরা এতে লিখেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিপন্থী, তাঁরা মনে করেন যে কোন লেখকই সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে নির্বিকার হতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁদের পরস্পর মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্যাসিজমের বিরোধী, ফ্যাসিজম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, গণশক্তিকে খর্ব করছে বলে।'[৭]

এই সময় 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, মন্মথ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, পুলকেশ দে সরকার তাঁদের লেখালেখির মাধ্যমে প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমর্থন ও সহায়তা দান করছিলেন। তাঁদেরই পরিচালিত 'অনামি চক্র' নামক সাহিত্য আসরটি ছিল প্রগতিশীল তথা মার্কসীয় চিন্তা-চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। 'পরিচয় গোষ্ঠি'-এর লেখকরাও, বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল প্রমুখ প্রগতি আন্দোলনের সহায়তায় করেছিল।[৮]

৩

বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) মধ্যে দিয়ে তিনের দশকের সমাপ্তি ঘটে। দুটি গোষ্ঠী (অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি) সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। ভারতীয় নেতারা প্রথম থেকেই সর্বগ্রাসী নির্মম শাসনতন্ত্র, গোঁড়া জাতিবিদ্বেষ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ফ্যাসিবাদী দর্শনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আবার সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও তাঁদের একই রকম বিদ্বেষ। স্বভাবতই যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, একটি বিবৃতিতে কংগ্রেস স্পষ্ট করে দেয়, যদি সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তিগুলি (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি) নিজেদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করছে এবং প্রতিপক্ষ ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তিগুলির (জার্মানি, ইতালি, জাপান) মধ্যে ঔপনিবেশিক অর্থ-সম্পদলোভী নয়া সাম্রাজ্যবাদই প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে ভারত যুদ্ধ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। আর যদি দেখা যায় পুরনো সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তি প্রকৃতই নিজেদের পথ পরিবর্তন করে ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে বিশ্ব গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে চায় তাহলে ভারত মিত্রশক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।[৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রগতি লেখক সংঘ একরকম নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। 'অগ্রণী' পত্রিকার প্রকাশও এই সময় বন্ধ হয়ে যায়। এই আপাত-শূণ্যতাকে সেদিন কিছুটা পূর্ণতা দিয়েছিল একদল বামপন্থী ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত 'ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' (ওয়াই. সি. আই.)। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করতে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত একটি কনভেনশনে প্রাথমিকভাবে ওয়াই. সি. আই. গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন নিখিল চক্রবর্তী, চিন্মোহন সোহানবীশ, প্রশান্ত সান্যাল

প্রমুখ। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে গণচেতনা গড়ে তোলায় ছিল ওয়াই. সি. আই.-এর লক্ষ্য।[১০] মূলত নাটক ও গানের চর্চার মাধ্যমে সেই চেষ্টা চালানো হত। নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'অঞ্জনগড়' (সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের নাট্যরূপ)-এ দেশীয় রাজ্যের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের রূপ দর্শিত হয়েছে। জলি কাউল তৎকালীন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতিকে বিষয় করে 'Politicians take to rowing', সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে ' The boy grows up' নাটক দুটি রচনা করেন। দেবব্রত বসু রচনা করেন 'In the heart of China' ও 'Shopkeepers' নাটক দুটি। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, লালফৌজের পরিচালনায় চিনা জনসাধারণের প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়টিতে হিটলারের জার্মানিতে ছোট-খাটো দোকানির দুরবস্থা বর্ণিত।[১১]

১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে প্রচার করতে শুরু করে। এরপরই ২১ জুলাই তারা প্রতিষ্ঠা করেন 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর পৃষ্ঠপোষক হতে রাজি হয়েছিলেন। এখান থেকেই প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন পুনরায় সক্রিয়তা অর্জন করল। জনসভা, পোস্টার প্রদর্শনী, চলচিত্র, সংগীত পরিচালনার মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে এবং বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজ করছিল এই সমিতি।[১২]

অল্পকালের মধ্যেই 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-এর আয়োজনে ঢাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয় তুলে ধরে এক সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন হয়। মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করে এর নাম দিয়েছিলেন 'সোভিয়েট মেলা'। প্রদর্শনীতে উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন তরুণ লেখক সোমেন চন্দ। যিনি জনগণের কাছে চিত্রগুলির ব্যাখ্যা করে দিচ্ছিলেন। বিপুল সাফল্যের পর স্থির হয়েছিল ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় একটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলন করার। সোমেন চন্দর নেতৃত্বে একটি মিছিল সেই সম্মেলনে যোগদান করতে গেলে ফ্যাসিস্ট গুন্ডাদের হাতে সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে খুন হন।[১৩] যা বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করে। এর প্রতিবাদে ২৮ মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিউট হলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই জন্ম নেয় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। যার গৃহীত প্রস্তাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় স্বজাতি ও স্বদেশ, শিল্প ও সংস্কৃতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কথা।[১৪]

এই সময় ভারত তথা বিশ্ব-রাজনীতিতে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। ইউরোপে হিটলারের জার্মানি পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে ও ফ্রান্স অধিকার করে রাশিয়ায় গিয়ে পৌঁছেছে, আর এশিয়াতে জাপানের আগ্রাসন ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, অতিক্রম করে ১৯৪২ সালের মার্চে রেঙ্গুন দখল করে ভারতের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত।

আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হলে দেশব্যাপী গড়ে উঠা আন্দোলনকে প্রতিহত করতে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে চলে হিংসাত্মক পদক্ষেপ। এরকম পরিস্থিতিতেই 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর কাজকর্ম চলে। ফ্যাসিবিরোধী প্রচারের জন্য নাটক ও গানের চর্চার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৪২-এর ১৬ মে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে নতুন নাটক চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে লিখিত নাটকগুলির মধ্যে 'বনস্পতি গুপ্ত' ছদ্মনামে সোমনাথ লাহিড়ীর লেখা 'দেশরক্ষার ডাক' নাটকটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।[১৫] ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে এই সংঘের তিনটি প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেগুলির মধ্যে ১৯৪৫-এর ২-৮ মার্চ মহম্মদ আলি পার্কে তৃতীয় সম্মেলনে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বঙ্গীয় প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ'।[১৬] দ্বিতীয় সম্মেলনের সাত মাস আগে ১৯৪৩ সালের ২২ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত বোম্বাই-এ 'সর্ব ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ'-এর চতুর্থ অধিবেশন হয়েছিল।[১৭] এই অধিবেশনেই 'All India People's Theatre Association' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২৫ মে IPTA-এর প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের 'ড্রাফট রেজিউলেশন'-এ IPTA-এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়—

'This Conference held under the auspices of Indian People's Theatre Association recognises the urgency of organising a people's theatre movement throughout the whole of India as the means of revitalizing the stage and the traditional arts and making them at ones the expression and organiser of our people's struggle for freedom, cultural progress and economic justice.'[১৮]

বাংলায় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর নাট্যশাখা আগে থেকেই সক্রিয় ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়। IPTA-এর প্রতিষ্ঠার দু'মাসের মাথায় সেই নাট্যশাখার কিছু রদবদল করে গণনাট্য সংঘের কমিটি তৈরি করা হয়। সম্পাদক হন সুধী প্রধান।[১৯]

৪

প্রগতি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের চেতনার স্তরকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। নাটকের ক্ষেত্রে সেই চেতনা অনুভব করার মতো। উপরের আলোচনার মধ্যেই ধরা পড়েছে গণনাট্যের ভাবধারা প্রগতি আন্দোলনের গর্ভজাত। এর পূর্বে বাংলা নাটক প্রধানত ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয়ের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল, সেখানে এই আন্দোলন সমসাময়িক রূঢ় বাস্তব সমস্যার দিকে নাটককারদের দৃষ্টি ফেরাল। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে জন্মলাভ করে 'গণনাট্য সংঘ' মন্বন্তর ও জাপানের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকল। প্রথম দিকে গণসংগীত, পরে ছোট ছোট নাটিকার মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলে, বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটারি', মনোরঞ্জন

ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি', বিনয় রায়ের 'ম্যায় ভুখা হুঁ', পানু পালের 'মহামারীর নৃত্য', এবং নীহার দাশগুপ্তের 'চুয়াল্লিশের বাংলা' এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এভাবেই তৈরি হয়েছিল পরবর্তী নাটকের পটভূমি। আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন 'নবান্ন'। এখান থেকেই বাংলা নাটকের বাঁক পরিবর্তন ঘটে। সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যাকে পটভূমি করে নাটক রচনার প্রথম প্রয়াস 'নীলদর্পণ' নাটকে দেখা গিয়েছিল, পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই স্বর পুনরায় এসে ধ্বনিত হল 'নবান্ন' নাটকে। সমাজের একেবারে নিচের তলার উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত দুঃস্থ কৃষকদের জীবন নিয়ে রচিত এই নাটকে দেখানো হল মন্বন্তরের সামগ্রিক ভয়ানক রূপ। এরপর দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সংকট নাটকে উঠে আসতে থাকল। পরবর্তিতে নাটক যে সমাজ সংকটের দলিল হয়েছে, সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হয়েছে, গ্রুপ থিয়েটারের ধরণা এসে তাকে আরও শিল্প-সমৃদ্ধ করেছে তার সূত্রপাত ঘটেছিল এই প্রগতি আন্দোলন ও গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যমে।

তথ্যসূত্র :

১. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, জুন ১৯৬০, পৃ-সাত

২. ক. Anand, M R; On the Progressive Writer's Movement, Sudhi Pradhan (Edited), Marxist Cultural Movement in India, Volume-1, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-38
খ. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ; চরৈবেতি, চরৈবেতি, নীতিশ বিশ্বাস (সম্পা.), ভারতের প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন (১৯৩৬-২০২১), ঐকতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, ২০২২, পৃ-১৬০

৩. Prem Chand, Munshi; The Nature and Purpose of Literature, Sudhi Pradhan (Edited), Marxist Cultural Movement in India, Volume-1, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-81

৪. সেহানবীশ, চিন্মোহন; ৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৫৭

৫. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ; চরৈবেতি, চরৈবেতি, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬২

৬. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, প্রাগুক্ত, পৃ-তেরো

৭. গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.); প্রগতি, প্রগত লেখক সংঘ, কলকাতা, ১৩৪৪ পৃ-মুখবন্ধ

৮. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, প্রাগুক্ত, পৃ-চৌদ্দ

৯. চন্দ্র, বিপান প্রমুখ; স্বাধীনতা সংগ্রাম, বজ্রদুলাল চট্টোপাধ্যায় (অনু.), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, নবম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ-১৭৯-১৮০

১০. বেরা, অঞ্জন; পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, গণনাট্য প্রকাশনী, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ২০১৭, পৃ-২৩

১১. রায়চৌধুরী, সজল; গণনাট্য কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭, পৃ-১০-১১

১২. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, প্রাগুক্ত, পৃ-আঠাশ-ঊনত্রিশ
১৩. সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর; চল্লিশ দশকের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন : পূর্ববঙ্গ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল (সম্পা.), ফ্যাসিস্টবিরোধী সংকলন, পরিচয়, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২১, পৃ-২০৬
১৪. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, প্রাগুক্ত, পৃ-তেত্রিশ
১৫. বেরা, অঞ্জন; পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫
১৬. তদেব, পৃ-২৪
১৭. Fourth All-India Progressive Writers' Conference, Sudhi Pradhan (Edited), Marxist Cultural Movement in India, Volume-1, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-126
১৮. The First All India People's Theatre Conference, Sudhi Pradhan (Edited), Marxist Cultural Movement in India, Volume-1, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-135
১৯. প্রধান, সুধী; গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকটি অতীত প্রসঙ্গ, গণনাট্য, ৩য় বর্ষ, জুলাই ও অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ-২২

মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি

বিপন্ন-বিস্ময় ও 'আট বছর আগের একদিন'

কবির বোধহয় কোনো দায় থাকার কথা নয়; তাঁকে কবিতায় বেছে বেছে ভালো শব্দের ব্যবহার করতেই হবে। সেই দায় নিয়ে কবিতা লেখাও খানিকটা আড়ষ্টতার পর্যায়ভুক্ত হতে বাধ্য। কবিতা লেখার একেবারে গোড়ার দিক থেকেই কবি জীবনানন্দ দাশ সেই বাঁধাধরা গৎ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। নির্জন, নিশ্চুপ, সৃজনের মাধ্যমে নিজের ভাবনা, চিন্তা, মননের প্রকাশ ঘটিয়ে ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। নিজের 'মুদ্রাদোষ'-এর কারণেই তিনি যে আলাদা হয়ে পড়ছিলেন ক্রমশ, সেকথাও বেশ সোচ্চারেই জানিয়ে দ্যান। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—

"তাঁর কল্পনা নব-নব রূপের সন্ধানী, তাঁর খ্যাতির রোল ওঠেনি। আমাদের সুধীসমাজও তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত বলে মনে হয় না।আধুনিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই জীবনানন্দর উপযুক্ত উল্লেখ এ-পর্যন্ত দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জীবনানন্দর ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এ-ছাড়া এই অন্যায়ের আর-কোনো কারণ আছে কিনা জানি না।"[১]

'ঝরাপালক' (১৩৩৪) কাব্যগ্রন্থ থেকে যাত্রা শুরু কবি জীবনানন্দ দাশের। নিজেকেই ভেঙেছেন আবার গড়েছেন। বৈপরীত্যময় জীবনকেই তো তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন।

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮ সালে রচিত হয়েছিলো। নানান ধরনের সাময়িকপত্রে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪২ থেকে ১৩৫০ সালে। 'বনলতা সেন' ও অন্য কয়েকটি কবিতা বের হয়েছিল 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে। কবিতা পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থটির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'বোধ' কবিতায় আমরা দেখি, আলো-অন্ধকারের ভেতর দিয়েই কবি প্রবেশ করেছেন মগ্নচৈতন্যর অভ্যন্তরে। ব্যক্তিমানুষটি ক্রমশ নির্জনতর জগতে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে। 'বোধ' যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই বোধকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারছেন না। একটি গভীর 'Sadness' —এ আচ্ছন্ন হচ্ছেন ব্যক্তিটি, এবং সেটি স্বীকার করেছেন 'নিজের মুদ্রাদোষ' হিসেবেই। আলো-অন্ধকারের সঙ্গেই হয়তো অজান্তেই মিশে যাচ্ছে 'বিপন্ন বিস্ময়' দ্বারা পূর্ণ এক জগৎ।

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখি- এ যেন জীবন বৈপরীত্যের সুতোয় গাঁথা নাট্য। 'ড্রামাটিক মনোলগ' রয়ে গেছে কবিতার একেবারে শুরু থেকেই। কবিতার শুরুই হচ্ছে- লাশকাটা ঘরে কাকে

যেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জীবনের সমাপ্তি সূচক বিন্দুই তো মৃত্যু। সেই মৃত্যুর খবরই কানে আসে কবির। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, ব্যক্তিটির কিন্তু অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। কারণ মৃত ব্যক্তির নিথর দেহ স্থান পেয়েছে 'লাশকাটা' ঘরে।ওই দেহটির ময়নাতদন্ত করা হবে। রাতের আঁধারে পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যাওয়ার পরই একজনের আত্মহত্যা করার সাধ হয়েছিল। এই আত্মহননের প্রসঙ্গটি যখনই উত্থাপিত হয়, তখনই আমাদের মনে যে স্বাভাবিক প্রশ্নগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে- কেন মৃত্যুকেই বেছে নিলেন তিনি? ক্যানো নিজেকে শেষ করে দেবার পথটিকেই মুক্তির পথ-ভেবে নিলেন ব্যক্তিটি? তাহলে কি কোথাও কোনো রহস্য লুকিয়ে ছিল? দীর্ঘ দাম্পত্যের আঁশটে গন্ধ সন্ধানী মধ্যবিত্তের ভেতরের ঘটে চলা উথাল-পাথালের সব জবাব দিতেই যেন নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কবি জীবনানন্দ। প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন কবি। বধূ, শিশু, প্রেম আশা সবই তো ছিল ব্যক্তিমানুষটির, সবকিছু অর্থাৎ জীবন যেন উপচে উঠছিল ওই মৃত ব্যক্তির। ব্যক্তি মানুষটি দৈনন্দিন জীবনে অতৃপ্ত ছিলেন না। তবুও ক্যানো এমন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি? ব্যক্তিটির হয়তো ঘুম হয়নি বহুকাল। জীবনকে যে নানান চড়াই-উতরাই পার করেই এগোতে হয়। লাশকাটা ঘরে হেরে যাওয়া এক উদাসী, বিপন্ন মানুষের মতো মৃত্যুই কি চেয়েছিল ব্যক্তিটি? এ প্রশ্ন পাঠকেরও। গাঢ় অন্ধকারের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ছে আত্মহত্যাকারী। সে আজ সমস্ত বিপন্নতার ঊর্ধ্বে অবস্থানরত। তবে এই রহস্য মৃত্যুই জীবনকে যেন একেবারে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে।অদ্ভুত এক আঁধার হয়তো নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিল ব্যক্তিটির শিয়রে। সেই অন্ধকারকেই পরম আশ্রয় বলে মনে করেছিলেন তিনি। ঠিক এরপরই যেন এক পজেটিভ বার্তা প্রদান করলেন কবি-'তবুও তো প্যাঁচা জাগে'; স্থবির, জড়বৎ, মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছানো ব্যাঙটিও আরও কিছু মুহূর্ত বেঁচে নিতে চায়। একটি নতুন প্রভাতের হাতছানিতে সাড়া দিতে চায়। মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বীকার করেও কোথাও যেন জীবনই প্রবহমান। অন্ধকারই তো জীবনের উৎস্রোত। চারিদিকে মশারির বিরুদ্ধতাকে স্বীকার করেও কিন্তু মশা তার অন্ধকার জীবন সংগ্রামে জেগে থাকে; হয়তো এর অন্যথা হবার নয়। রক্ত, ক্লেদ ঘেঁটেও একটি মাছি আবারও রৌদ্রের দিকে যাত্রা করে। আসলে জীবনের দিকেই তো সকলে এগিয়ে যাবেন, এটাই স্বাভাবিকতা। কবি জীবনানন্দ যেন বারংবার সমস্ত স্থবিরতা থেকে মুক্তির খোলা পথগুলির সন্ধান দিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণও জীবনের পথ ভালোবেসে চূড়ান্ত লড়াই করে টিকে থাকতে চায় দৈনন্দিনতার ভেতর দিয়ে, হয়তো এটিই জীবনের অনিবার্যতা। দুরন্ত শিশুর হাতে যখন ধরা পড়ে গেছে একখানা ফড়িং, ঘন ঘন ডানা ঝাপটেও সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে। বিবর্তনের নিয়ম মেনেই চূড়ান্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তো টিকে থাকতে হয়, সমস্ত ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে নিজের অভিযোজনের মাত্রাকে শতগুণ বাড়িয়েই তো পাল্লা দিয়ে জীবনে বেঁচে থাকতে হয়।

কত মানুষই তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আত্মহননের পথ বেছে নেয় ,তারা আসলে কোথায় যায়? দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পথ হেঁটে অশ্বত্থ গাছ সেকথা হয়তো কিছুটা জানে—

“তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর!...
যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনীধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর!
বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে-ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।”[২]

এই অশ্বত্থই হয়তো নিষ্ফলতার চূড়ান্ত সত্যকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিয়েছিল। মানুষটি এই সত্য অবগত হওয়ার পরই হয়তো অশ্বত্থ গাছের কাছে একগাছা দড়ি নিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ফড়িং, দোয়েল পাখির মতো স্বাধীন, মুক্ত জীবনের সঙ্গে হয়তো তার কোনোদিন সাক্ষাৎ হবে না জেনেই; সে নির্ভার হবার লক্ষ্যে আত্মহননের পথকে বেছে নিয়েছিল।

অশ্বত্থের শাখা প্রতিবাদ করেছিল অর্থাৎ প্রকৃতি বার-বার চোখে আঙুল তুলে স্বাদরে জীবনকে বরণ করে নেবার অনুষঙ্গগুলি উদাহরণ হিসেবে তুলে নিয়ে আসছিল।প্রকৃতি কীভাবে এই আত্মহননকে মেনে নিতে পেরেছিল কবি জীবনানন্দকে এই ভাবনাটিই যেন স্থির হতে দিচ্ছিল না। অভিমানী কবি তাই লিখেছেন জোনাকির ভিড়, থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচার ইঁদুর শিকারের বাসনা- এই সমস্ত কর্মকান্ড দেখেও ব্যক্তিটির জীবনের প্রতি ঝোঁক ক্যানো এলো না! জীবনের টানে কি একবারের জন্য হলেও মৃত্যুকে অস্বীকার করা যেত না? যবের ঘ্রাণে পরিপূর্ণ একটা হেমন্তের বিকেলের জন্যও কি ফিরে আসা যেত না! পৃথিবীর সমস্ত অসম্পূর্ণ সাধ গ্রহণের জন্য একটা জীবন কম পড়ে যায়! সেখানে ব্যক্তিটির আত্মহননকে মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না কবি। মর্গে কি সত্যিই তার হৃদয় জুড়িয়েছে? এই মরণই কি সত্যিই চেয়েছিল সে?

কবি বেশ স্পষ্ট কতগুলি ইঙ্গিত দিয়েছেন যা ব্যক্তিটির আত্মহননের সহায়ক আবার কোন কোন কারণগুলি সহায়ক হয়ে ওঠেনি।

আত্মহননের পক্ষে সহায়ক নয়	আত্মহননের পক্ষে সহায়ক
স্থবির ব্যাঙ-এর মুহূর্ত ভিক্ষা করা	ভূত দেখা
মশার অন্ধকারে সংগ্রাম	উটের গ্রীবার নিস্তব্ধতা
উড়ন্ত কীটের খেলা	ক্লান্ত করা
ফড়িং, দোয়েলের জীবন	গাঢ় বেদনা
জোনাকির ভিড়	বিপন্ন বিস্ময়
	থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচার ইঁদুর ধরা

'শোনো তবু এ মৃতের গল্প'- এই অংশ থেকেই মৃত ব্যক্তিটির আত্মহননের পথ নির্বাচনের পোস্টমর্টেম পর্ব শুরু হয়ে গেছে। এখান থেকেই কবি জীবনানন্দের আত্মমুখীনতা সমৃদ্ধ উপলব্ধির চূড়ান্ত পরিস্ফুটন ঘটছে।কবির নৈতিক বিচারের বিপ্রতীপ একখানা টান যেন রয়েই গেছে। জীবিত কোনো মানুষের কাছে আত্মহত্যা প্রকৃতই অর্থহীন। কিন্তু একজন তথাকথিত সুখী মানুষের আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া তীব্রতর কোনো সংশয়ের পথকেই নির্দেশিত করে। চড়া বিষাদের পথ ধরেই সংশয়াকীর্ণ আত্মঘাতী পথটি যেন তৈরি হয়েছে এই কবিতায়। কবি জানেন -

"নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;
অর্থ নয়,কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়-
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত-ক্লান্ত করে;"[৩]

বেঁচে থাকার ক্লান্তি গ্রাস করেছিল মানুষটিকে।মানুষটির অন্তর্লোকে এক বিপন্ন বিস্ময়ের জাগরণ ঘটেছে। সেই মানসিক বিপর্যয়ই তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। মানুষের মন বেশ জটিল একটি জিনিস। 'ঈদ', 'ইগো' ও 'সুপারইগো' —মনেরই এক একটি স্তর। ঈদ হোলো আদিম, পুরাতন অচেতন শক্তির আধার। আমাদের মনের সমস্ত রকমের কামনা, বাসনা ঘণীভূত অবস্থায় রয়েছে। সমস্ত রকমের অবদমিত কামনা,বাসনা অচেতন স্তর থেকে সচেতন স্তরে যাতাযাতের মধ্য-পথ। সুপারইগো সাধারণত ব্যক্তির পরিবার এবং সমাজ দ্বারা প্রাপ্ত উঁচু এক স্তর। যেখানে নীতি, নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলিই মূলত প্রাধান্য পায়। সুতরাং মনের বিপন্নতার হদিস খাতা কলমে প্রমাণ করে দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। মনের চলনকে একরৈখিক স্কেলে ফেলে সত্যিই কি মাপা সম্ভব? না তা কখনোই সম্ভব নয়। রক্তের ভিতরে আমাদের কী যে খেলা করে! তা পরোক্ষে ক্লান্তিকেই ডেকে নিয়ে আসে। মানুষকে চূড়ান্ত রূপে ক্লান্ত করে তোলে।'বিপন্ন বিস্ময়'-ই আসলে আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্ব জারিত এক অবস্থান। এখান থেকেই জন্মলাভ করে বিষণ্নতা এবং অনস্তিত্বের অনুভব। এই টানাপোড়েনই হয়তো মানসিক ভীতির সঞ্চার হয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের অভ্যন্তরে। 'বিপন্ন বিস্ময়' আসলে মানসিক যন্ত্রণা, সামাজিক অবক্ষয়, যুগ যন্ত্রণা, হঠাৎ উদ্ভুত কোনো বেদনাদায়ক পরিস্থিতি, বিশ্বাসের সংকট, মননের ক্ষয়, সংস্কৃতির দীনতা, ঐতিহ্যের স্খলন, বিশ্বাসের অবনমন প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্ভুত হতে পারে। এর ফলস্বরূপ ব্যক্তিমানুষটির সবকিছুকেই অর্থহীন মনে হয়। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই হারিয়ে যায়। ব্যক্তিটি সত্তা তাড়িত এক অবস্থানের শিকার।

আসলে মানুষের উপলব্ধির ভেতরেই জন্ম নেয় তার সংকল্প। মানুষ একবার যদি তার চিন্তা, ভাবনা, মননের পরিসরে নিজের স্থায়িত্বের সূচককে গেড়ে ফেলতে পারে -তাহলে নিজের সিদ্ধান্ত সে স্বেচ্ছায়, স্বাধীন ভাবেই গ্রহণ করতে পারে। নিখিল বিশ্বের শূন্যতা বোধ, প্রায়োগিক জ্ঞানের নিরর্থকতা জগৎ সংসারের বিচারে নির্বোধ মানুষটিকে স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণে দৃঢ়চেতা করে তুলেছিল। ব্যক্তিটি হতাশায় আক্রান্ত আত্মহননকারীদের ভিড় থেকে একেবারে আলাদা, পরমজ্ঞানী, যুগ-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট আধুনিক মানুষেরই প্রতিনিধি।

কবি জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনের অভিঘাতকেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত করেছে। কবি আশাবাদী। 'হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?' এই প্রশ্নচিহ্নের মধ্যেই যেন রয়ে গেছে কবিতার মূল অভিভাষণটি; যা কবি জীবনানন্দের হৃদয় সঞ্জাত এক সদর্থক অনুভব।কবি যেন 'বুড়ি চাঁদ'কে উপেক্ষা করে জীবনের সমস্ত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যকে নিয়েই পৃথিবীতে থেকে যেতে চেয়েছেন; যতদিন না স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু আসে। বিপুলা পৃথিবীর অমোঘ ভাণ্ডারকে একেবারে নিঃশেষ করেই চলে যেতে চান কবি। কবিতাটিতে কবির বয়ানে 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' যেন শেষ পর্যন্ত জীবনের কাছে ফিরে ফিরে আসার দ্যোতনাকেই বহন করছে।

তথ্যসূত্র :

১. বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, নিউ এজ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৫৯,পৃষ্ঠা ২৮।
২. জীবনানন্দ দাশ, মহাপৃথিবী, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, নবপর্যায় সিগনেট প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৫।
৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮।

দীপঙ্কর আরশ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মুসলমান কবি

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ, প্রায় চারশত বছরের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির সংখ্যা অগণন, কাব্যের সংখ্যা অসংখ্য। তার মধ্যে মহম্মদ সগিরের 'ইউসুফ-জোলেখা', দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী', সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণের গণ্ডি অতিক্রম করে। কিন্তু সেগুলি বাদে মুসলমান কবি রচিত বেশিরভাগ কাব্য বৃহত্তর পাঠকসমাজে পরিচিত ও সমাদৃত নয়। এই প্রবন্ধে সেই অপরিচয়ের পরিধি থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মুসলমান কবিদের কথা বলা হয়েছে।

সমস্যা হল, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে তথ্য জানার একমাত্র উপায় ড. এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ। পুঁথি বিশারদ মুন্সি আবদুল করীম মহাশয় চট্টগ্রাম ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের মুসলমান কবিদের পরিচয় উদ্ঘাটন করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'পুঁথি পরিচয়' গ্রন্থে সে'সব বিবরণ আছে। ড. এনামুল হক সেইসব উপাদান সংগ্রহ করে 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থটি রচনা করেন।

ড. এনামুল হক মহাশয় পঞ্চদশ শতকের যে তিনজন প্রধান মুসলমান কবির নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা- শাহ্ মুহম্মদ সগির, জৈনুদ্দিন এবং মোজাম্মিল (যদিও 'পুঁথি পরিচিতি'তে মোজাম্মিলের সময়কাল ষোড়শ শতাব্দী বলা হয়েছে)। স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ইতিহাসকার হিসাবে তিনি এবং ড. শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মহম্মদ আবদুল হাই এই তিনজন কবির কাব্য বিষয়ে বেশকিছু তথ্য সামনে এনেছেন।

তিনজন কবির মধ্যে অধিক পরিচিত 'ইউসুফ-জুলেখা' নামক রোমান্টিক কাব্যের রচয়িতা শাহমহম্মদ সগির। তিনি বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীন। অনুমান করা হয়, সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯) সমসাময়িক এই কবি চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং সুলতানের রাজকর্মচারী ছিলেন। 'ইউসুফ জোলেখা'র কাহিনি কোরান ও বাইবেলে আছে। ফার্সি ভাষায় ইরানী কবি ফিরদৌসী ইউসুফ জোলেখার কাহিনি রচনা করেন। শাহ্ মহম্মদ সগিরের কাব্যে সেই প্রভাব লক্ষণীয়। এছাড়া লোককাহিনির মিশ্রণ রয়েছে তাঁর কাব্যে। কবি নিশ্চয় ধর্মীয় মনোভাব থেকেই কোরান বর্ণিত সুপরিচিত ইউসুফ জোলেখার কাহিনি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর কাব্যে কোরানের ধর্মভাবের তুলনায় রয়েছে গল্পরসের আধিক্য।

সবচেয়ে বড় কথা, শাহ্ মহম্মদ সগির রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পার্থিব জগতের প্রথম প্রণয়-আখ্যান। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ মন্তব্য, "যখন হিন্দু কবিরাও দেব-দেবী ভিন্ন লৌকিক কাহিনী গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন

না, তখন এই মুসলমান কবি পার্থিব কাহিনী লইয়া যে রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা- ৪৫০) অনেকের ধারণা রোমান্টিক প্রণয়-আখ্যানের সূচনা সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার কবিদের হাত ধরে। কিন্তু শাহ্ মহম্মদ সগির রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যটিকেই সেই মর্যাদা দিতে হয়। কাব্য থেকে কয়েকটি পঙক্তি, যেখানে জোলেখার মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে-

"গগনে তারকা দেখি চাহে একমন।
তার সঙ্গে কাহিনি কহএ সর্বক্ষণ।।
তুহ্মিসব ভ্রমিতে আছহ রাত্র দিন।
তোহ্মা অবিদিত নাহি ভোবন এ তিন।।
দুক্ষের কাহিনি কহি গোঞাএ রজনি।
বিসেস তাপিত মন বিরহ আগুনি।।
চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ ওদএ হৈলে হএ আনমন।।
প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে।
রূপিত বদন তান প্রতি উসাকালে।।

(ইউসুফ জোলেখা, মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ৩২১)

এই কাব্য বিষয়ে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য, এতে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। শুধু এই কাব্য নয়, মধ্যযুগের মুসলমান কবি রচিত অনেক কাব্যেই এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আসলে যারা তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত মুসলমান, যারা দু'এক পুরুষ পূর্বেও হিন্দু ছিলেন, তাদের মধ্যে হিন্দু-ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়ে যায়নি। ধর্মান্তরিত মুসলমান সামাজিক আচার-বিচার সংস্কারে অনেকক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতি মেনে চলত। রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগাথা তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলেও একটা বড় সংখ্যার মুসলমান রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের ঐতিহ্য ভুলতে পারেনি। ফলত, শাহ্ মুহম্মদ সগিরের কাব্যে হিন্দুয়ানা থাকা স্বাভাবিক ছিল। নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর কাব্যে হিন্দু নাম (বিধুপ্রভা) ব্যবহৃত।

জৈদুদ্দিন। প্রাচীন ফার্সি কাব্য থেকে কাহিনি গ্রহণ করে, হজরত মহম্মদের বিজয়কাহিনি অবলম্বনে, মঙ্গলকাব্যের রীতি আশ্রয়ে লেখা জৈনুদ্দিন রচিত 'রসুলবিজয়' কাব্যটির রচনাকাল আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। পুথিটি খণ্ডিত। জৈনুদ্দিন গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১) সভাকবি ছিলেন। কাব্য-রচনার কাল উল্লেখ না থাকলেও সুলতানের সময়কাল থেকে কবির সময়কাল নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে। জৈনুদ্দিন তাঁর কাব্যে সুলতানের

ভূয়সী প্রশংসা করে বিবিধ বিশেষণে তাঁর গৌরব প্রচার করেছেন। সেই বিশেষণে ব্যবহার করেছেন হিন্দু দেবতাদের নাম- দানে হরিশচন্দ্র, গৌরবে ইন্দ্র, ধর্মে কল্পতরু, জ্ঞানে শুক্র, ধ্যানে মহেশ। একজন মুসলমান কবি হয়েও হিন্দু দেবতাদের সঙ্গে সুলতানের তুলনার কারণ পূর্বে ব্যাখ্যাত।

পঞ্চদশ শতকের উল্লেখযোগ্য আর একজন কবি মোজাম্মেল। তিনি বদর পীরের শিষ্য ছিলেন। তাঁর নামে তিনটি পুথি পাওয়া গেছে- নীতিশাস্ত্র, সয়ৎনামা, খঞ্জনচরিত্র। 'নীতিশাস্ত্র' ও 'খঞ্জনচরিত্র' জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক। 'খঞ্জনচরিত্রে'র কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে মাত্র। 'সয়ৎনামা' ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক লেখা, আরবি শাস্ত্রকথায় পরিপূর্ণ। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবি মোজ্জামেল-এঁর সময়কাল নিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন, "এই কবিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা হয়। কারণ 'নীতিশাস্ত্র' ও 'সয়ৎনামা'র পুষ্পিকায় কাব্যরচনার যে সন-তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী নহে, ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যায়।" ড. এনামুল হক কবি মোজাম্মেলকে একাধিক যুক্তি দ্বারা পঞ্চদশ শতকে প্রতিষ্ঠা দিলেও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহমত হতে পারেননি।

শুধু তা-ই নয়, পঞ্চদশ শতকের মুসলমান কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, "বাংলাদেশের গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাঙালি মুসলমান কবিদের কাব্যের সন্ধান পাইয়াছেন—ইহা সত্য হইলে বিস্ময়কর বটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু কবিরাও প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য রচনায় ততটা অগ্রসর হন নাই। সে ক্ষেত্রে বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমান কবিদের একাধিক কাব্য আবিষ্কৃত হইলে বিস্মিত হইবার কারণ আছে। আরও বিস্মিত হইবার কারণ, পূর্বে বঙ্গীয় সরকারের উদ্যোগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব প্রভৃতি পণ্ডিত-গবেষকের নেতৃত্বে বাংলার পল্লীঅঞ্চল হইতে যখন বহু প্রাচীন কবির অসংখ্য পুঁথিপত্র আবিষ্কৃত হইতেছিল, তাহার মধ্যে দুই-একজন মুসলমান কবির কাব্যও ছিল। কিন্তু তখন সম্প্রতি-প্রচারিত এই মুসলমান কবিদের পুঁথি-পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। আবদুল সাহেবও তখন চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা নোয়াখালি হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনিই বা পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের বাংলা কাব্য প্রচার করিলেন না কেন? রাজনৈতিক কারণে একদেশ দুই হইয়া যাইবার পরেই বা দলে দলে প্রাচীন মুসলমান কবির আবির্ভাব হইতেছে কেন, তাহাও জিজ্ঞাস্য।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা- ৪৪৯-৪৫০)

ষোড়শ শতাব্দী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পুঁথি-পরিচিতি'তে ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত পনেরো জন মুসলমান কবির নামোল্লেখ পাওয়া যায়- আফজাল আলী, চাঁদকাজী, দোনাগাজী, দৌলত উজীর বাহারাম, মুহম্মদ কবীর, মোজাম্মিল (পঞ্চদশ শতকের কবি হিসাবে আলোচিত), শেখ কবীর, শেখ ফয়জুল্লাহ সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ আকিল, সাবিরিদ খান,

মর্তুজা, হাজি মুহম্মদ, নেয়াজ ও শেখ পরাণ। এঁদের মধ্যে আফজাল আলী, চাঁদকাজী, শেখ কবীর প্রমুখ কবি বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরপরই তাঁদের এ'জাতীয় পদ রচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। আসলে, মধ্যযুগে রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ থাকলেও সাধনক্ষেত্রে ঐক্য ছিল। "মধ্যযুগে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কার যেমন সমাজের একস্তরে উপেক্ষিত হয় এবং প্রেমমার্গীয় উদার সাধনা প্রচার লাভ করে, তেমনি বিশুদ্ধ আরবি-তমদ্দুনে-বিশ্বাসী মুসলমান সমাজেও সুফি সাধনার রন্ধ্রপথ দিয়া 'বেশরা' পন্থী এমন সমস্ত রীতিকৃত্য ও সাধনা প্রবেশ করে, যাহাতে প্রেমমার্গ ও যোগতন্ত্রাদির ধারা একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।" (তমদ্দুন- বিশুদ্ধ ইসলামীয় আদর্শ) মৌলবি ও মোল্লাদের দ্বারা যখন মুসলমান সমাজে আরবি-বিশুদ্ধিকরণ শুরু হয় তখনও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বিরাজ করে একদল মুসলমান যুগ্ম-সাধনার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। মুসলমান কবিরা বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ, স্তোত্র প্রভৃতি রচনা করেছেন। (বৈষ্ণব ভাবের মুসলমান কবি প্রায় একশতাধিক, পদের সংখ্যা চার শতের বেশি)

ষোড়শ শতকের সর্বাধিক শক্তিশালী কবি দৌলত উজীর বাহারাম খান। তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খান চট্টগ্রাম বিজয়ী এবং হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বাহারামের পিতা নেজাম শাহের থেকে বংশ-পরম্পরায় 'দৌলত উজীর' উপাধি লাভ করেছিলেন। বাহারাম লিখিত কাব্য 'লায়লী-মজনু' হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমান জনপ্রিয়। কাব্যের আত্মকথায় কবি চট্টগ্রামকে 'ফতেমাবাদ' বলেছেন। হুসেন শাহ ও পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের নাম ছিল ফতেমাবাদ। ১৬৬৬ সালে সায়েস্তা খাঁ ফতেমাবাদ জয় করে নামকরণ করেন 'ইসলামাবাদ'। ফলে কাব্যটির রচনাকাল অবশ্যই সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্বে। মুন্সি আবদুল করীম, ড. এনামুল হক ও অধ্যাপক আহমদ শরীফ যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, কাব্যটির সম্ভাব্য রচনাকাল ১৪৯৩ থেকে ১৫১৫-এর মধ্যে। তবে, এই কাব্যের মার্জিত ও আধুনিক ভাষা বৈশিষ্ট্যের কারণে কেউ কেউ কাব্যটিকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করায় দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। যাইহোক, 'লায়লী-মজনু' কাব্য রচনার কারণে বাহারামের প্রশংসা প্রাপ্য। সুফি সাহিত্যে লায়লা-মজনুর প্রেম ও ব্যর্থতা ভক্ত-ভগবানের রূপকে গৃহীত। বাহ্রাম অধ্যাত্ম প্রেম অপেক্ষা মানবীয় প্রেমকাহিনি হিসাবে লায়লী-মজনুর প্রেম-কাহিনিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বর্ণনাকৌশল যথেষ্ট প্রশংসনীয়। বাহারামের নামে আর একটি কাব্য পাওয়া যায়- 'ইমাম বিজয়'। কাব্যটি কারবালার যুদ্ধকাহিনি অবলম্বনে লেখা।

ষোড়শ শতকের কবি আফজল আলী চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার মিলুয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গৌড়ের সুলতান ফিরুজশাহের সময় (১৫৩২-১৫৩৩) তিনি বর্তমান ছিলেন। বৈষ্ণব পদ ছাড়া তাঁর লিখিত গ্রন্থ- 'নসিয়ৎনামা'। আনুমানিক রচনাকাল ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ। কোরান ও হাদিসের তত্ত্বকথা এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন।

চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে সকল কবির আবির্ভাব, সাবিরিদ খাঁ তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি মূলত বিদ্যাসুন্দর রচনার কারণে পরিচিত। ইনি চট্টগ্রাম অথবা নোয়াখালির বাসিন্দা। বিদ্যাসুন্দর ছাড়া তিনি 'রসুলবিজয়' ও 'হানিফা কয়রাপরী' নামক দু'টি কাব্যের রচয়িতা। 'রসুলবিজয়' কাব্যের মাত্র বারো পাতা পাওয়া গেছে। ফলত, এই কাব্য বিষয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। 'হানিফা কয়রাপরী'র কাহিনি গৃহীত স্থানীয় উপকথা থেকে। এই পুথিটিরও মধ্যঅংশ খণ্ডিত।

দোনা গাজী ত্রিপুরার অধিবাসী। কেউ কেউ তাঁর কাব্য রচনার কাল ষোড়শ শতকের পরবর্তী বলে মনে করেন। কিন্তু 'পুঁথি-পরিচিতি'র তথ্যে ও ড. এনামুল হকের বিবেচনায় তিনি ষোড়শ শতকের কবি হিসাবে চিহ্নিত। ফার্সি কিস্সা অবলম্বনে তাঁর লিখিত গ্রন্থ- 'সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জমাল'। কাব্যটি আখ্যানধর্মী রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। সৈয়দ আলাওল, ইব্রাহিম ও মালে মোহাম্মদ এই একই কাহিনির উপর ভিত্তি করে কাব্য রচনা করেন। তথ্য যদি সঠিক হয় তাহলে এই প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম লেখক দোনা গাজী।

শেখ ফয়জুল্লাহ-এর নামে বেশ কয়েকটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়- পীর ইসমাইল গাজীর জীবন অবলম্বনে 'গাজীবিজয়', সত্যপীরের পাঁচালি থেকে 'সত্যপীরবিজয়', নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত 'গোরক্ষবিজয়', কারবালার যুদ্ধে হাসান হুসেনের মৃত্যুর পর মাতা জয়নবের বিলাপ নিয়ে মঙ্গলকাব্যের চৌতিশার আদর্শে লেখা 'জয়নবের চৌতিশা', সঙ্গীতবিষয়ক কাব্য 'রাগনামা', নবী ঈসা ও সুলতান জমজমার কাহিনি নিয়ে 'সুলতান জমজমা'। দীনেশচন্দ্র সেন এই কবির সময়কাল পঞ্চদশ শতাব্দী বলেছেন। কিন্তু ড. এনামুল হক মনে করেন, সত্যপীরের পুঁথিটি তিনি রচনা করেছিলেন ১৫৪৫ থেকে ১৫৭৫-এর মধ্যে। সেই হিসাবে ফয়জুল্লাহ ষোড়শ শতকের কবি। তাঁর জন্মস্থান নিয়েও মতভেদ আছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত অথবা পূর্ববঙ্গের কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই দুই অভিমত প্রচলিত।

মুহম্মদ কবীর রচিত 'মধুমালতী' নামক হিন্দু আখ্যানকাব্যের রচনাকাল বিষয়ে অনেকটা ধোঁয়াশা আছে। ড. এনামুল হক চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু থানার জরোয়াগঞ্জ গ্রামে এই পুথির ১৭৩৯ সালে অনুলিখিত একখানি পুথির সন্ধান পান। ওই পুথি তিনি সংগ্রহ করতে না পারলেও পুষ্পিকা থেকে কালজ্ঞাপক পয়ার পঙক্তি লিখে নিয়েছিলেন। পয়ারটি অত্যন্ত দুরূহ, অস্পষ্ট, বিশৃঙ্খল। সেখান থেকে প্রকৃত সময়কাল নির্ধারণ করা কঠিন। ড. হক পুথিটির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল অপেক্ষা এই গ্রন্থ প্রাচীন। সেই অর্থে 'মধুমালতী'র রচনাকাল পঞ্চদশ শতক। কেউ কেউ এই গ্রন্থের সময়কাল ষোড়শ শতক বলে মনে করেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের যে সকল কবিদের কথা বলা হল এবং যাঁদের কথা বলা হল না, তাঁদের অনেকের সময়কাল বা প্রাচীনত্ব নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধা আছে পণ্ডিতমহলে। তবে, সময় নিয়ে যতই বিভ্রান্তি থাকুক না কেন, উদারচেতা এই সকল মুসলমান কবিদের অবদান মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকবে।

সৌমেন সাহা

প্রাগ্‌জন্ম সংস্কার : প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে প্রচলিত যাবতীয় আচার-সংস্কৃতি ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে সকল গ্রন্থে ধর্ম বা কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেগুলোকেই ধর্মশাস্ত্র বলা হয়। যেহেতু এগুলি বেদের ভাবার্থ স্মরণ ও সংরক্ষণ করে, তাই এগুলিকে স্মৃতিশাস্ত্রও বলা হয়। আচার্য মনুর মতে, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র মূলত একই অর্থ বহন করে। স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচিত বিষয়গুলি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত। এই তিনটি বিষয় হিন্দুদের দৈনন্দিন ও বিশেষ ধর্মীয় আচারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণের মতে, স্মৃতিশাস্ত্রকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় সূত্রযুগ, সংহিতাযুগ ও নিবন্ধযুগ। গৌতম ও বৌধায়নের মতো আচার্যরা সূত্রযুগের প্রতিনিধি, মনু প্রমুখ সংহিতাযুগের অন্তর্গত, আর রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকাররা পরবর্তী পর্যায়ের লেখক। এঁরা সকলেই আচারাধ্যায়ের অন্তর্গত সংস্কার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। 'সম উপসর্গ পূর্বক 'কৃ' ধাতু থেকে 'ঘঞ প্রত্যয় যোগে 'সংস্কার' শব্দটি গঠিত হয়েছে, যার অর্থ শুদ্ধিকরণ। অর্থাৎ যে সকল ধর্মীয় কর্মের মাধ্যমে মানুষের মন, বাক্য ও শরীর শুদ্ধ হয়, সেগুলোকেই সংস্কার বলা হয়। মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামীর মতে, সংস্কার হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা বস্তু অন্য কোন কর্মের উপযোগী হয়ে ওঠে। তন্ত্রবার্তিক অনুসারে, সংস্কার হল এমন এক বিশেষ রীতি যা যোগ্যতা প্রদান করে। এই যোগ্যতা দুই প্রকার (ক) পাপ দূর হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতা এবং (খ) নতুন গুণ অর্জনের মাধ্যমে প্রাপ্ত যোগ্যতা। সংস্কার পালনের মাধ্যমে মানুষের দোষ দূর হয় এবং নতুন গুণের বিকাশ ঘটে। যেমনউপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে বেদ অধ্যয়নের অধিকার জন্মায়, আর গর্ভাধান ইত্যাদি সংস্কারের দ্বারা গর্ভ ও বীর্যসংক্রান্ত দোষ দূর হয়। অতএব বলা যায়, সংস্কারই মানবজীবনকে শুদ্ধ ও ধর্মাচরণের উপযোগী করে তোলে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ন্যায় বর্তমানকালেও হিন্দুসমাজে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংস্কারসমূহ পালন করা হয়ে থাকে। মনুর মতে, দ্বিজাতিদের ক্ষেত্রে পিতার বীজগত ও মাতার গর্ভাশয়জনিত দোষ মোচনের জন্য গর্ভাধান, জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কার আবশ্যক। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সংস্কারানুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিজাতিগণ ইহলোক ও পরলোকে পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম হন। যদিও নারীরাও সংস্কার পালনের অধিকারী ছিলেন, তবে তা মন্ত্রহীনভাবে সম্পন্ন হত।

আচার্য যাজ্ঞবল্ক্যও মনুর মত অবলম্বন করে পিতা-মাতার অশুচিতাজনিত পাপ দূরীকরণের জন্য সংস্কারানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালের নিবন্ধকার ও ব্যাখ্যাকারগণও এই মতকে সমর্থন করেছেন। রঘুনন্দনের 'সংস্কারতত্ত্ব' গ্রন্থে উদ্ধৃত হারীতের মতে, গর্ভাধানের মাধ্যমে বেদাধ্যয়নে উপযুক্ত ভ্রূণ স্থাপিত হয়; পুংসবনের দ্বারা সেই ভ্রূণ পুরুষে পরিণত হয়; সীমন্তোন্নয়নে পিতামাতার দোষ দূর হয়; এবং জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও সমাবর্তনের মাধ্যমে বীজ, রক্ত ও ভ্রূণজাত দোষ অপসারিত হয়। এই আটটি সংস্কার পালনের ফলে মানবজীবন পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অতএব, মানবজীবনে সংস্কারগুলির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন সমাজে শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুসারে জন্ম থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সংস্কারসমূহ যথাযথভাবে পালিত হলেও বর্তমানে সেগুলির অনেকই বিধি-নিরপেক্ষভাবে নামমাত্র অনুষ্ঠিত হয়, আবার কিছু সংস্কার সম্পূর্ণ লুপ্তপ্রায়। তবুও, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও আমাদের জীবনে অধিকাংশ সংস্কারের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম রয়ে গেছে।

ধর্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে সংস্কারের সংখ্যা নিয়ে বহু মতভেদ পরিলক্ষিত হয় উ অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রগুলিতে বিবাহ থেকে শুরু করে সমাবর্তন পর্যন্ত দৈহিক সংস্কার নিরূপিত হলেও অন্ত্যেষ্টির উল্লেখ করা হয়নি। গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কারের সংখ্যা নিম্নরূপ—

গৃহ্যসূত্রগুলিতে সংস্কারের সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ১১টি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে (বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, চুড়াকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, সমাবর্তন এবং অন্ত্যেষ্টি)। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ১৩টি সংস্কার স্বীকৃত হয়েছে (বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চুড়াকর্ম, উপনয়ন, কেশান্ত, সমাবর্তন এবং অন্ত্যেষ্টি)। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে কেশান্ত ও অন্ত্যেষ্টি বাদ দিয়ে ১৩টি সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর বৈখানস গৃহ্যসূত্রে সর্বাধিক ১৮টি সংস্কার বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে সংস্কারের সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ করা যায়। গৌতম ধর্মসূত্রে সর্বাধিক ৪০টি সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়যার মধ্যে গর্ভাধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন যজ্ঞ (পঞ্চমহাযজ্ঞ, সপ্ত পাকযজ্ঞ, সপ্ত হবির্যজ্ঞ ও সপ্ত সোমযজ্ঞ) অন্তর্ভুক্ত। স্মৃতিকার হারীত সংস্কারকে দ্বিবিধ বলেছেন দৈব সংস্কার (যেমন অগ্নিহোত্র, পাকযজ্ঞ প্রভৃতি) এবং ব্রাহ্ম সংস্কার (যেমন গর্ভাধানাদি দৈহিক সংস্কার)। সংস্কারপ্রকাশ গ্রন্থেও এই দুই প্রকার ভাগ স্বীকৃত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি

অনীহা বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈব সংস্কারগুলির প্রচলন ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। মনু গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত মোট ১৩টি সংস্কার স্বীকার করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য কেশান্ত বাদ দিয়ে মনুর প্রায় সকল সংস্কারই গ্রহণ করেছেন এবং উভয় স্মৃতিতেই দৈহিক সংস্কারের পাশাপাশি পাকযজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে। অঙ্গিরা ২৫টি সংস্কারের কথা বলেছেন, ব্যাসস্মৃতিতে ১৬টি সংস্কার স্বীকৃত হয়েছে।পরবর্তীকালের নিবন্ধগ্রন্থযেমন স্মৃতিচন্দ্রিকা ও সংস্কার ময়ূখমূলত গর্ভাধান থেকে বিবাহ পর্যন্ত ব্রাহ্ম সংস্কারগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে; অধিকাংশ স্মৃতির মতো এগুলিতেও অন্ত্যেষ্টিকে সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়নি। সব মতভেদের মধ্যেও ষোড়শ (১৬) সংস্কারই বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও স্বীকৃত।

আধুনিক আচারগ্রন্থ যেমন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সংস্কারবিধি এবং পণ্ডিত ভীম সেন শর্মার ষোড়শ-সংস্কার-বিধিউভয়েই ১৬টি সংস্কারকে মান্যতা দিয়েছে। এই ষোড়শ সংস্কারকে তাদের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় প্রাগ্‌জন্মকালীন সংস্কার (গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন), শিশু সংস্কার (জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ ও চূড়াকর্ম), শিক্ষা সংস্কার (উপনয়ন, বেদারম্ভ, কেশান্ত, সমাবর্তন ইত্যাদি) বিবাহ সংস্কার এবং অন্ত্যেষ্টি সংস্কার। বর্তমান আলোচনায় মূলত প্রাগ্‌জন্মকালীন তিনটি সংস্কারগর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন-এর স্বরূপ, সময়, উদ্দেশ্য এবং আধুনিক যুগে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হবে।

শিশুর জন্মের পূর্বে গর্ভিণী মাতা ও গর্ভস্থ শিশুর ভ্রূণের কল্যাণার্থে পালনীয় সংস্কারগুলিই প্রাগ্‌জন্মসংস্কার নামে অভিহিত।

প্রাগ্‌জন্মকালীন সংস্কারগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হল গর্ভাধান। গৃহ্যসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই সংস্কারকে নিষেক, চতুর্থীহোম বা চতুর্থীকর্ম নামেও অভিহিত করা হয়েছে। স্ত্রীর গর্ভে বীজ স্থাপনের প্রক্রিয়াই যেহেতু এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য, তাই একে 'নিষেক' বলা হয়েছে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিবাহোত্তর দাম্পত্য মিলনকেও শাস্ত্রে 'নিষেক' নামে নির্দেশ করা হয়েছে। পূর্বমীমাংসা অনুযায়ী, যে ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরুষ স্ত্রীর গর্ভে বীজ স্থাপন করেন, তাই-ই গর্ভাধান। শৌনকের মতে, যে ক্রিয়ার দ্বারা স্ত্রী নিজ গর্ভে শুক্র ধারণ করেন, তাকেই গর্ভাধান বা গর্ভালম্ভন বলা হয়।

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে নিবন্ধযুগ পর্যন্ত এই সংস্কার সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বৌধায়ন গৃহ্য সূত্রে, বিবাহের পর ঋতুস্নানের মাধ্যমে শুদ্ধ হওয়া স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর প্রতি মাসে মিলনের বিধান রয়েছে। একই সঙ্গে গর্ভাধানের পূর্বে ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়, ঋষিকল্প বা তেজস্বী পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিভিন্ন ব্রত পালনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।ধর্মসূত্র

ও স্মৃতিগ্রন্থে গর্ভাধান সংক্রান্ত বহু বিধিনিষেধ পাওয়া যায় যেমন উপযুক্ত সময় নির্ধারণ, শুভ ও অশুভ রাত্রি বিচার, নক্ষত্র বিবেচনা, এবং বহুস্ত্রীসম্পন্ন পুরুষের নিজ স্ত্রীতে গমনের নিয়মাবলি। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে সহবাসের পর স্ত্রীর স্নানের বিধান উল্লেখিত হয়েছে। দশকর্মপদ্ধতিতে গর্ভাধানের পূর্বে মাতৃপূজা, নান্দীশ্রাদ্ধ ও গণেশপূজার বিধান রয়েছে এবং সংস্কার সম্পন্ন হলে উপহার প্রদান ও ভোজনের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও হলায়ুধের মতে, ঋতুস্নানের পর যুগ্ম দিনে মিলন হলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিনে মিলন হলে কন্যা সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ আরও বলেছেন যে, স্ত্রী শারীরিকভাবে গর্ভধারণে সক্ষম হলেই গর্ভাধান সংস্কার করা উচিত। ঋতুস্নানের চতুর্থ রাত্রি থেকে ষোড়শ রাত্রি পর্যন্ত সময়কে গর্ভধারণের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় গর্ভসঞ্চারের নিষিদ্ধ কাল হিসেবে মাসের অষ্টম চতুর্দশ তিথি-র উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় নিষিদ্ধ কাল হিসেবে মূলা ও মঘা নক্ষত্রের অবস্থান এবং গর্ভাধান ঋতুকালেই করণীয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। শাস্ত্রমতে, এই সংস্কার একবারই অনুষ্ঠেয়, প্রতি গর্ভধারণের সময় নয়। তবে সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে এই সংস্কারানুষ্ঠান প্রশংসনীয়। স্বামীই এই সংস্কারানুষ্ঠানের কর্তা, কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর ভাই বা কুলের অন্য পুরুষ বা ব্রাহ্মণও এটি করতে পারে।

মধ্যযুগীয় নিবন্ধগ্রন্থগুলিতে গর্ভাধান সংস্কারটি আসলে গর্ভের সংস্কার না ক্ষেত্রের সংস্কারএই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি ভিন্ন মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম মতটি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের, যাঁরা গর্ভাধানকে গর্ভ বা ভ্রূণের সংস্কার বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে, দ্বিজরা গর্ভাধান থেকে শুরু করে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সকল সংস্কার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণসহ পালন করার অধিকারী। দ্বিতীয় মতে গর্ভাধানকে ক্ষেত্র সংস্কার বলা হয়েছে, কারণ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ত্রীর দেহগত অশুচিতা দূর হয় এবং তিনি গর্ভধারণের জন্য শুদ্ধ ও উপযুক্ত হয়ে ওঠেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে গর্ভাধান সংস্কারের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কিন্তু কালক্রমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে এই সংস্কার আর নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে শাস্ত্রানুসারে বর্তমানে এর বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা প্রায় নেই বললেই চলে।

পুত্রসন্তান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সংস্কারকে 'পুংসবন' বলা হয়। প্রাচীন সমাজে বিশ্বাস করা হতো, কেবল পুত্রই পিতৃঋণ শোধ করতে সক্ষম। মনু মতে , পুত্রই পিতাকে পুন্নামক নরক থেকে উদ্ধার করেন। পুত্র প্রাপ্তিকে স্বর্গলাভের সমতুল্য বিবেচনা করা

হতো। বিষ্ণুস্মৃতিতেও সদ্যজাত সন্তানের মুখমণ্ডল দেখার মাধ্যমে পিতার অমরত্বলাভের কথা উল্লেখ আছে।

গৃহ্যসূত্রের যুগে পুংসবন সংস্কার সাধারণত গর্ভধারণের তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে বা তারও পরে সম্পন্ন হতো। গর্ভধারিণী স্ত্রী ওই দিনে উপবাস পালন করেন ও স্নান শেষে নতুন বস্ত্র পরিধান করতেন। রাত্রে বটবৃক্ষের ছাল কেটে রস নিষ্কাশন করা হতো এবং সেই রসকে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করা হতো, যেটি হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সম্পন্ন হতো। কিছু গৃহ্যসূত্রে এই মন্ত্রের সঙ্গে কুশকণ্টক ও সোমলতা ছেদ করার কথাও বলা হয়েছে।

ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থেও গৃহ্যসূত্রের বিধি অনুসারে পুংসবনের বিবরণ রয়েছে, তবে সেখানে মাতৃপূজা এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এর মতো নতুন উপসংযোজনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুংসবন সংস্কারের সময় সম্পর্কে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই বলেছেন, গর্ভাশয়ে ভ্রূণের স্পন্দন বা গতিশীলতা শুরু হওয়ার পূর্বেই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা উচিত। শঙ্খও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারী ছিলেন। বৃহস্পতিমতে, ভ্রূণ স্পন্দনশীল হওয়ার পরেই পুংসবন অনুষ্ঠান করা হতো। স্ত্রী প্রথম গর্ভধারণ করলে তৃতীয় মাসে, আর দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করলে চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এটি পালন করা উচিত বলে উল্লেখ আছে। জাতুকর্ণ্য ও শৌনকের মতে, গর্ভধারণ স্পষ্ট হলে তৃতীয় মাসে সংস্কারটি সম্পন্ন করা যেত।

অতএব, শাস্ত্রানুযায়ী গর্ভধারণের দ্বিতীয় থেকে অষ্টম মাসের মধ্যে পুংসবন সংস্কার করা উচিত, কারণ গর্ভধারণের অবস্থা স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পায়। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা টীকায় বলা হয়েছে, পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন উভয়ই 'ক্ষেত্র' সংস্কার, তাই এই অনুষ্ঠান একবারই সম্পন্ন করা যথেষ্ট, প্রতিটি গর্ভধারণের জন্য নয়।

বর্তমান সমাজে এই সংস্কারের অধিকতর গুরুত্ব না থাকলেও এর প্রাসঙ্গিকতা একেবারে হ্রাস পায়নি। বর্তমান আইনে পুত্র ও কন্যা সমমর্যাদা সম্পন্ন হলেও আজও অধিকাংশ পরিবার পুত্রই কামনা করে থাকে, সেইজন্য বহু মানুষ এখনও ভ্রূণ হত্যার মত পাপকার্য নিরন্তর করে চলেছে।

গর্ভের তৃতীয় সংস্কার হল 'সীমন্তোন্নয়ন'। 'সীমন্তোন্নয়ন' শব্দটিতে দুটি অংশ আছে 'সীমন্ত' অর্থাৎ কেশ এবং 'উন্নয়ন' অর্থাৎ ওপরে ওঠানো। গর্ভবতী স্ত্রীর কেশ স্বামী কর্তৃক যথাবিধি ওপরে উত্তোলন করাই এই সংস্কারের মূল কার্যবিধি, যার মাধ্যমে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অমঙ্গল দূর করা হয় এবং তার আনন্দ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া, ভাবী শিশুর মানসিক বিকাশ ও দীর্ঘায়ু কামনাও এই সংস্কারের উদ্দেশ্য। গর্ভধারণের পঞ্চম মাসে শিশুর মানসিক বিকাশ শুরু হয়।

মন্ত্র-ব্রাহ্মণে এই সংস্কারের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রজাপতি যেরূপ অদিতির সীমা মহান ঐশ্বর্যের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন, সেরূপ সন্তানের দীর্ঘায়ু লাভার্থে তার কেশসজ্জা সম্পন্ন করা হয়। গৃহ্যসূত্রগুলিতেও সীমন্তোন্নয়নের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে এই সংস্কারের কাল নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। বৌধায়ন, আশ্বলায়ন ও আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রানুসারে গর্ভের চতুর্থ বা পঞ্চম মাসে সীমন্তোন্নয়ন সম্পন্ন করা উচিত। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলা হয়েছে, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা উচিত। শাস্ত্রানুযায়ী, যদি সন্তান আগেই জন্মগ্রহণ করে, তবুও এই সংস্কার সন্তানকে মায়ের কোলে রেখে সম্পন্ন করা হতো। স্মৃতিচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত শঙ্খ মতানুসারে, ভ্রূণের নড়াচড়া থেকে শুরু করে জন্ম নেওয়া পর্যন্ত সংস্কারটি অনুষ্ঠিত হতো। সীমন্তোন্নয়নের কালকে কেন্দ্র করে ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আশ্বলায়ন, বৌধায়ন ও পারস্কর গৃহ্যসূত্র অনুসারে এটি 'ক্ষেত্র' সংস্কার, তাই একবারই করা যথেষ্ট, অর্থাৎ প্রথম গর্ভাবস্থায় করণীয়। কিন্তু আচার্য বিষ্ণুর মতে, এটি প্রতিটি গর্ভাবস্থায় পালনীয়।

গর্ভিণী স্ত্রীর স্বামী এই সংস্কার অনুষ্ঠানের প্রধান অধিকারী। তাই স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্বামীর প্রধান দায়িত্ব হলো স্ত্রীর সকল প্রার্থনা পূরণ করা। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, যদি গর্ভবতী স্ত্রীর ইচ্ছা পূরণ না হয়, তবে গর্ভে দোষ বা বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, এমনকি গর্ভ নষ্টও হতে পারে। সুতরাং স্বামীর উচিত নিজের স্ত্রীর ইচ্ছা সর্বোচ্চভাবে পূরণ করা।

বর্তমান সমাজে অনুষ্ঠিত সংস্কারগুলির মধ্যে সীমন্তোন্নয়নের কোনো স্থান নেই। কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীর আনন্দবিধানার্থে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা হয়। এমনকি আসন্নপ্রসবাকে তার রুচিসম্মত আহারও পরিবেশন করা হয়ে থাকে, যা সাধ-ভক্ষণ নামে অভিহিত।

তথ্যসূত্র :

আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র -আপস্তম্ব প্রণীত, উমেশচন্দ্র পাণ্ডে সম্পাদিত, চৌখাম্বা, এস. কে. টি. সিরিজ, বারাণসী, ১৯৭১।

গৌতম ধর্মসূত্র-গৌতম প্রণীত, কুলমণি মিশ্র সম্পাদিত, পুরী, ১৯৯১।

মনুসংহিতা-মনু প্রণীত, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১২।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি- যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত, উমেশচন্দ্র পাণ্ডে সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ২০০৮, পুনর্মুদ্রিত।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি-যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত, নারায়ণ রাম আচার্য সম্পাদিত, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, নিউ দিল্লি, ২০১০।

বৌধায়ন ধর্মসূত্র-বৌধায়ন প্রণীত, নরেন্দ্রকুমার আচার্য সম্পাদিত, গোবিন্দস্বামী রচিত বিবরণ বৃত্তিসহ, বিদ্যানিধি প্রকাশন, দিল্লি, ১৯৯৯।

সহায়কগ্রন্থসমূহ :

কাণে, পি. ভি. - হিস্ট্রি অব ধর্মশাস্ত্র, ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, (ভলিউম ১, ২), পুনা, ১৯৬৮।

কাশ্যপ, অর্জুন চৌবে - ধর্মশাস্ত্র কা ইতিহাস, উত্তর প্রদেশ হিন্দী সংস্থান, লখনউ, ১৯৯২, চতুর্থ সংস্করণ।

চক্রবর্তী, শ্রাবণী - সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন, (প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪), কলকাতা, ১৯৭০।

পণ্ডা, সিতাংশুভূষণ-ধর্মশাস্ত্রে ষোড়শ সংস্কারাঃ, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠম তিরুপতিঃ, ২০১০।

পাণ্ডে, রাজাবলী-হিন্দূ সংস্কার, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৫৭ খ্রিষ্টীয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র-স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, এ. মুখার্জী অণ্ড কোং প্রা. লি. ২, কলকাতা, ২০০৬।

বসু, সুমিতা-ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্র সমীক্ষা, বলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬।

সাহা, বিশ্বরূপ-ধর্মার্থশাস্ত্রপরিচয়, সদেশ, কলকাতা, ২০০৯।

শাশ্বতী সিনহাবাবু

শরৎ সাহিত্যে নারী

উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণ বাঙ্গালীর সমাজ ও সংস্কৃতির যে অসীম পরিবর্তন সূচিত করেছিল তার প্রভাবে বাংলা সাহিত্য নতুন পথে তার যাত্রা শুরু করে। এই রেনেসাঁস কেবলমাত্র আমাদের সাহিত্যে বাহ্যিক পরিবর্তনের শক্তি রূপেই আসেনি, বাঙ্গালীর দীর্ঘদিনের মানসিক চিন্তার দীনতা ঘুচিয়ে তাকে দিগন্তবিস্তারি আলোর সরণীতে এনে দাঁড় করিয়েছে। রেনেসাঁস যেমন বাংলা সাহিত্যকে নব নব সৃষ্টির শাখায় উল্লসিত করেছে— উপন্যাসে, নাটকে, গীতি কবিতায়, গানে, ছোটগল্পে তেমনি তার অন্তর বস্তুরও ঘটেছে পরিবর্তন ।এই মানস পরিবর্তনের জোয়ারে বাংলা সাহিত্যের চিরকালের অবহেলিত-অনাহুত বাংলার নারীসমাজ তার স্বতন্ত্র মর্যাদা ও মূর্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। মধুসূদন থেকে যে নারী বন্দনার, যে নারীমূর্তি নির্মাণের সূচনা হয়েছে তা ধীরে ধীরে পূর্ণ অবয়ব ধারণ করেছে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে। উনিশ শতকের কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন নারী রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে নারীকে জননী, জায়া, দুহিতারূপে চিত্রিত করেছেন এবং নারী সৌন্দর্যের জয়গান গেয়ে বলেছেন—

‘চিরদিন, চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী।’

নারীরূপের ও নারীসত্ত্বার এই বহুমুখী বিস্তার ও অনন্ত বৈচিত্র্য উনিশ শতকের সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনায় তুলে ধরেছেন। এতদিন যা ছিল লোক চক্ষুর অন্তরালে। এতদিন যে নারীকে সমাজ প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গ্রাহ্য করেছে তার কোন স্বতন্ত্র মর‍্যাদা ছিল না, কি সমাজে কি সাহিত্যে! সেই নারীকে তার অপমানশয্যা থেকে তুলে এনে নতুন প্রাণের প্রতিমা করে তুললেন উনিশ শতকের রেনেসাঁস সমৃদ্ধ কবিরা। বাংলার উপন্যাসে এই বন্দিনী নারীকে নিয়েই নতুন পথে যাত্রা শুরু হল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে।

নারীমুক্তির ও নারী জাগরণের প্রথম বীজটি বঙ্কিমচন্দ্র বপন করলেন তাঁর ‘দূর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসে। এইমৃণালিনী, লবঙ্গলতা, কুন্দনন্দিনী, রোহিনী, ভ্রমর, শ্রী প্রভৃতি উজ্জ্বল সব নারীচরিত্র বাঙালী পাঠককে যেন নারীর স্বাতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের হাতে নারী পেল আপন মর্যাদা। তাঁর পরিশীলিত আভিজাত্যময়তার জন্য নারী আমাদের আকর্ষণ করলো শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও প্রীতি।

বিনোদিনী, সুচরিতা, ললিতা, বিমলা, কুমুদিনী, দামিনী, লাবণ্য এরা সাহিত্যের নারী চরিত্রের এক একটি স্তম্ভ বিশেষ। কেউ কারো প্রতিরূপ নয়, এরা সকলেই আপন মহিমায় মহিমাময়ী। যে তেজ ও দীপ্তিতে এরা বিকশিত তাতে বেশ বুঝতে পারা যায় এরা পরবর্তীকালের সমাজ আন্দোলনের বিশেষত. নারী আন্দোলনের পুরোধা রমণী। বিধবা বিনোদিনীর প্রেম শুধুমাত্র বিধবা নারীর প্রণয় প্রযুক্তি নয়, মানুষের দৈহিক ও অতীন্দ্রিয় ভালোবাসার এ যেন এক ভালোবাসারই মহাকাব্য। তেমনি করে সুচরিতার দৃঢ় আভিজাত্যময় মূর্তিটি, ললিতার বন্ধনমুক্তির গান, লাবণ্যের নতুন সত্তা, দামিনীর চমকিত বিলাস, কুমুদিনীর দৃঢ়তা বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

এরপর এলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের জনপ্রিয়তম কথাশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ নারীকে শ্রেয়সী ও প্রেয়সী এই দুই রূপে কল্পনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর অসংখ্য উপন্যাসে যে অসংখ্য নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে নারীর প্রেয়সী রূপ অপেক্ষা তার শ্রেয়সী রূপের দিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। মনে রাখতে হবে সেই বিশেষ সময়টির কথা, মনে রাখতে হবে ঊনবিংশ-বিংশশতাব্দীর সন্ধিক্ষণের বিশেষ সমাজ পরিমণ্ডলের কথা। একটি-দুটি করে শিক্ষিত নারী, সমাজ তখন শিক্ষা আন্দোলনের পাদ-প্রদীপে আসছিলেন, তখনও সুবিশাল নারীসমাজ তার নারীত্বের শৃঙ্গল ছিন্ন করে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে আপন অধিকারকে বিস্তার করতে চেষ্টা করেননি। তখনো কোলকাতার স্ত্রী শিক্ষার মন্দিরগুলিতে অভিজাত ও হিন্দু সমাজের নারী বিপুল পরিমানে আসেননি, আর যা শৃঙ্খলকে আরো কঠোর করেছে। এর ফল হয়েছে এই যে নারী পুরুষের কাছে সতী সাধবী দেবীরূপে সম্মোধীত হতে হতে কখন ভুলে গেছে যে, সেও আর পাঁচজনের মতোই মানুষ। তারও কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষা আছে। ভালোবাসার ইচ্ছা আছে, আছে ঘৃণা করার অধিকার। যে ভুলে গেছে তার প্রকৃত চাওয়া। শুধু একটা মিথ্যা মোহের আবরণে ও আভরণে যেমন সাজিয়েছে পুরুষ তেমনি করেই সেজেছে সে। শরৎচন্দ্র এই জায়গাটাই দেখাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'র গল্পে মৃণাল (মেজবৌ) যেমন জানতে চেয়েছিল জীবনের সত্য কোথায় লুকিয়ে আছে। 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনী যেমন দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল—-আগে আমি কুমু, তারপর ওবাড়ীর বড় বউ, তেমনি শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী, অভয়া, কমল এরা সকলেই কি একবুক তৃষ্ণা নিয়ে, কি দুরন্ত অভিপ্রায়ে খুঁজে পেতে চেয়েছে জীবনের প্রকৃত মূল্য কোথায় লুকিয়ে আছে। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র যেমন কিরণময়ী, অভয়া, কমল এই সব অগ্নি ময়ী নারী চরিত্রের সৃষ্টি করে আমাদের সমাজের তথা কথিত শান্ত, নিরুপদব জীবনটাকে কতকগুলি কঠিন প্রশ্নের

সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন। অভয়া যখন স্বামীর অত্যাচারের চিহ্ন সারা শরীরে ধারণ করে রোহিনী বাবুকে নিজের জীবনসঙ্গী করে নেয় এবং স্বামী নামক শব্দটিকে অঁকড়ে না থেকে জীবন নামক সত্তাকে আহ্বান করে তখন শ্রীকান্ত এটা অধর্ম কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। মেসের ঝি সাবিত্রী সর্ব বঞ্চিত রিক্ত হৃদয়ে তার পূর্ণ ভলোবাসা নিয়ে হাজির হয় তখন তার পরিচয় বড় কিনা তার উত্তর দেওয়া যায় না। শরৎ চন্দ্র যেন এই নারী চরিত্রগুলির মধ্যদিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন নারীর প্রকৃত পরিচয় কি? সে যে শুধু পুরুষের দাসী নয়, অথবা সমাজ প্রতিপালনের যন্ত্র নয় এই সত্য টাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। অসংখ্য ছোটে গল্প, উপন্যাসের লেখক তিনি, ফলে নারী চরিত্রের এক দীর্ঘ মিছিল তাঁর রচনায় পাই আমরা। এরা ময়ীরূপটিকে তুলে ধরেছেন। বড় দিদি, মেজদিদি, শুভ দা, বিরাজ বৌ বিন্দুর ছেলে এই সব উপন্যাস ও বড় গল্পে নারী চরিত্রেরা সকলেই তার সমাজ পরিচয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেযুগের প্রথামত এরা অনেকেই সতীন নিয়ে ঘর করে কিংবা মৃত্যুর পর সতীন পুত্রকন্যার মাতা হয়। শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এরা আপন পুত্র - কন্যা অপেক্ষা পালিত পুত্র বা কন্যাকে অনেক বেশী স্নেহ করেন এমনকি কোন সাংসারিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে সতীন বা আশ্রিত পালিত পুত্রের জন্য চরম সিদ্ধান্ত নেন। বিন্দুর ছেলে যে বিন্দুর ছেলে নয়, তার জায়ের ছেলে একথা সেও যেমন ভূলেছে পাঠকও তেমনি ভূলেছে। দ্বিজদাস ও ধর্মদাস যে দুই বৈমাত্রেয় ভাই একথা কখনই বোঝা যায় না, তাদের বিমাতাও বুঝাতে দেন না। এমনি করে শরৎচন্দ্র যেন এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি করতে চেয়েছে সমাজবন্ধনের। ভালো বাসার মহত্বে সব জয় করে নেওয়া যায়। আত্মপর ভেদ না করা,এই মহৎ শিক্ষাটি, রূপ পেয়েছে তাঁর সৃষ্ঠ নারী চরিত্রে। তাই এরা আপন স্বার্থ বলি দিয়ে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করেছে।

শরৎ সাহিত্যে নায়িকারা আপন প্রেমের মহিমায় উজ্জ্বল। তাদের প্রেম শুধুই দেহলালসায় আবর্তিত না হয়ে সেবাধর্মে - ত্যাগব্রতে বরতে ও সহস্র দুঃখের দহনে পুড়ে ভাস্বর রূপ ধারণ করেছে। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে রাজলক্ষ্মীর মতো প্রেমময়ী নারী পাওয়া দুষ্কর। তার নিজের কথাতেই বলি—'শ্রীকান্তকে হারানোর রাজলক্ষ্মীর উপায়ও নেই যোও নেই"। কারণ এরা দুজনে মিলে একটি সত্তা।। মনোরাজ্যে বৈষ্ণব রসের সাধক শরৎ চন্দ্র বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ প্রেম রূপের যুগল বন্দনা সেরে নিয়েছেন রাজলক্ষ্মী- শ্রীকান্ত, কমললতা -গহর -শ্রীকান্ত, কুমুদ-বৃন্দাবন, বিপ্রদাস- সতী ইত্যাদি প্রেম বৃত্তের মধ্যে। এই চরিত্রগুলিকে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি পৃথক করার উপায়ও নেই। এরা নানা রূপে, নানা পরিবেশে আপন সেবাব্রতী রূপ যুগে যুগে কি অসীম যন্ত্রণা সহ্য করে পার্বতীরা তাদের

দেবদাসের জন্য পথের কাঁটা মাড়িয়ে যোজন বিস্তারী পথ হেঁটেছে। পার্বতী দেবদাস নিয়ে যে কাহিনীবৃত্ত লেখক গঠন করেছেন এই কাইনীর রোমান্টিক বিষণ তা আমাদের উদাস করে দেয়।

শরৎ সাহিত্যে এই সামাজিক নারীর পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব ময়ী দৃঢ় চরিত্রের কিছু নারীর দেখা মেলে। গৃহদাহের অচলা, দেনাপাওনার ষোড়শী এই রকমই নারী । শিক্ষিতা , শাস্ত্রে নিপুনা, মানবচরিত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। প্রতিকূল পরিবেশকে সাহস ভরে সহ্য করা আমরা। ষোড়শীর মধ্যে লক্ষ্য করি। সেই কোন জীবনের উষাকালে মিছিমিছি বিবাহের বন্ধনে বাঁধা হয়েছিল তার জীবন লম্পট জমিদার জীবানন্দের সঙ্গে। সেই বালিকা অলকাই যখন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভৈরবী ষোড়শী হলো তখন হঠাৎ একদিন উন্মত্ত পশুর সামনে আনীত হয়ে পরম বিস্ময়ে সে লক্ষ্য করল সেই পশুই তাঁর নিয়তি প্রদত্ত স্বামী। তারপর তার সুদীর্ঘ মানস বিপ্লবের যে নিপুণ বর্ণনা করেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিটি অনুচ্ছেদে লুকিয়ে আছে নারীদের মুক্তি প্রচেষ্টার কথা। সহস্র প্রতিকূলতায় পড়েও নারী তার প্রেমকে ভোলে না একথাও জানালেন লেখক। এই রকম দ্বিধাদোদুল অচলা দুই প্রণয়কাঙ্খিত পুরুষের মধ্যে একজনকে বরণ করেছে স্বামীরূপে। অন্যজন তার রূপের কাঙাল। অচলা নিজেও ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো মহিম ও সুরেশের আকর্ষণ-বিকর্ষণে জীবনের নিষ্ঠুর পরিণতিকে বয়ে এনে। শরৎচন্দ্র এক মহান শিল্পীর নিরপেক্ষতা নিয়ে জীবনের উত্তাল চিত্তের পরিনামকে স্পর্শ করেছেন অচলার মধ্য। স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বদেশপ্রেমের সেই ভীষণ দিনগুলিতে তার “পথের দাবী” উপন্যাস ছিল বিপ্লবী বাঙালি যুবকদের কাছে বেদমন্ত্র। ‘পথের দাবী’র নায়িকা ভারতী তার কঠোর দেশপ্রেম, মুক্তোর মতো শুদ্ধ ভালোবাসা, স্বাধীন তার সৈনিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্ধ বিশ্বাসে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলির কেন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা সকলেই দ্বিধা দ্বন্দ্বের শিকার। তাদের মনের দ্বিধা ঘোচেনি কখনো। তাই তার কান্তদাদাকে পেয়েও আপন দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি রাজলক্ষ্মী। কখনো বৈধব্য কখনো তাদের মধ্যকার পুরানো এতিহ্যের সংস্কার, কখনো নিজের মনের অবরুদ্ধতা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই অনতিক্রমনিয় বাধা অতিক্রম করতে না পেরে আর্তনাদ করেছে এবং পরজন্মে চেয়েছে — আর জন্মে যেন পাই; ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থণা করে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে। রাজ লক্ষ্মী, কমললতা, , সাবিত্রী, এরা সবাই পান পাত্র সম্মুখে রেখেও আপন দ্বিধায় সেই পানরস থেকে নিজে কে বঞ্চিত করেছে। এর কারণ সম্ভবতই শরৎচন্দ্র নিজেও পরিপূর্ণ দ্বিধা মুক্ত হতে

পারেননি।অথবা তাদের সময়ে বাঙালি সমাজের মানস গঠনটির এমন বৈপ্লবিক পরিবর্ন হয়নি, যাতে করে বিধবা নারীও নতুনবিবাহ করে, বারবনিতাও ভালোবাসার জনকে বিবাহ করে, মেসের ঝিও প্রেমিকের কণ্ঠে মালা দেয়। নারী পছন্দ মতো যাকে খুশি বিবাহ করে ও ভাঙ্গে। শরৎচন্দ্র সমাজে এই ছবি গুলি দেখেননি, হয়তো দেখতে চাননি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বিধবা নারীদের মতো শরৎচন্দ্রের বিধবারাও শেষ পর্যন্ত আশ্রয়হীন। অতৃপ্ত, অপূর্ণ রয়ে গেছে—এটাই ভবিতব্য। রোহিনী আর কুন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে অপঘাতে, অকালে মারা যায়। বিনোদিনী রবীন্দ্রনাথের হাতে কাশীবাস করে।আর রাজলক্ষ্মী, কমললতা শরৎচন্দ্রের হাতে অতৃপ্তির গান গেয়ে চোখের জল মুখের হাসিতে গোপন করে জীবন থেকে মুক্তি নেয়। এটি সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই কিন্তু এখানে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত আাছে।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), অক্ষর বিন্যাস, ১ম প্রকাশ ১ জানুয়ারি, ২০০৯, কলকাতা

২. গোপালচন্দ্র রায় (সম্পাদনা)- শরৎ-সমগ্র, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন , ১ম প্রকাশ: ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৯

৩. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, নবম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২, কলকাতা

৪. ক্ষেত্র গুপ্ত - বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১ম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, তৃতীয় সংস্করণ-নভেম্বর, ২০০২, কলকাতা

৫. দেবীপদ ভট্টাচার্য-উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮, মাঘ ১৪২৪, কলকাতা

দয়াময় রায়

শতবার্ষিক 'মুক্তি' পত্রিকা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

প্রদীপ জ্বালানোর আগের যেমন সলতে পাকানোর প্রস্তুতি থাকে তেমনভাবে দু'একটি সাময়িক পত্র - পত্রিকার জন্ম হয়তো হয়েছে মানভূমের মাটিতে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে এইচ, কুপল্যান্ডের মানভূম গেজেটিয়ারের পাতায়—

'Two News Papers– the Manbhum and the Purulia Darpan dealing with topics of local interest are published at Purulia. The Santhal Mission Press at Pokhuria publishes a quarterly magazine dealing with the progress of Medical Mission in India.'

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জি, ই, এল, চার্চ পুরুলিয়া থেকে "জ্যোতিরিঙ্গন" পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৬৮ সালে।। এমনকি ১৮৭২ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আগমন ঘটে পুরুলিয়ার আদালতে ওকালতির কাজে। এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারি জি, ই, এল চার্চে কবি শ্রীমান খ্রিস্টদাসকে খ্রিস্টধর্ম দীক্ষাকালে ধর্মপিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে "কবির ধর্মপুত্র" নামে সনেটটি লেখেন যা ১৮৭২ সালে "জ্যোতিরিঙ্গন" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে পুরুলিয়া শহরে কবিকে সম্মাননা প্রদান এবং কবি পুরুলিয়া নিয়ে কবিতাটি রচনা করেন যা পুরুলিয়া নাম রূপে বাংলা সাহিত্যে শব্দটি প্রথম আদৃত হয়। এই সনেটকল্প কবিতাটিও "জ্যোতিরিঙ্গন" পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অথচ সেকথা ব্রিটিশ কথিত গেজেটিয়ারে জায়গা পায়নি। যাইহোক মুক্তি পত্রিকাটি মানভূমের সাধারণ সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে , জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে, এবং ভাষা আন্দোলনের বিশেষ ভাবে লোক সেবক সংঘের (১৯৪৮) বিহার থেকে বঙ্গভুক্তির আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার রূপে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। সেই পত্রিকার সুদীর্ঘ ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবের, গর্বের, গরিমার অহংকারের, সমৃদ্ধির এক উজ্জ্বল অধ্যায়।। ১৯২৫-২০২৫; অর্থাৎ শতবর্ষ অতিক্রান্ত একটি পত্রিকা। যার প্রথম সম্পাদক—শ্রী নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত। পত্রিকাটির প্রকাশ ঘটে -২১ শে ডিসেম্বর, ১৯২৫।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন পুরুলিয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এরপরেই স্বাধীনতার আন্দোলনকে বিকশিত করা, মানুষের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু প্রেস থেকেই মুক্তি পত্রিকা ১৯২৫ সালের ২১ শে ডিসেম্বর সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এর প্রথম সম্পাদক নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রথম প্রকাশক সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী। ১৯৩৯ সালে দেশবন্ধু প্রেসের নামকরণ করা হয় মুক্তি প্রেস।

মুক্তির প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে লেখেন—‘বন্ধন দশার মুক্তির কথা ছাড়া আর কি কথা বলিবার আছে?’

মুক্তি পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে মূল ভাবনা—

১) স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবনাকে আরও প্রসারিত করা।

২) স্বাধীনতা আন্দোলনের সংবাদগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

৩) পরাধীন মানুষকে মুক্তির স্বপ্নে স্বাধীনতার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা।

৪) বিশেষভাবে মানভূমের মানুষের বিপ্লবী চেতনাকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে আরও শানিত করা।

৫) সংগ্রামের বার্তা বাহক রূপে মুক্তি পত্রিকা জনগণের জনমনের স্বাধীনতা স্পৃহাকে ভাবনাকে প্রসারিত করে নির্ভীক মনোভাব পোষণের ধারণাকে প্রসারিত করা।

৬) অপরদিকে মুক্তির পাতায় বিপ্লবী ভাবনার গান কবিতা প্রবন্ধ নাটক প্রকাশ করে সাংস্কৃতিক উপাদান বৃদ্ধি করা।

৭) মুক্তির মূল শ্লোগান হয়ে উঠে—‘জাগ্রত হও, উঠিয়া দাঁড়াও, মুক্তির পথে অগ্রসর হও..।’ অর্থাৎ জনগণকে বিপ্লবের কথা বলে সেই বিপ্লবে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে আহ্বান জানানো হয়।।

৮) কংগ্রেসের কর্মীদের কাছে দেশপ্রেমের মশাল জ্বালানোর অগ্নি শলাকা। এরূপ নানাভাবে মুক্তি পত্রিকা মানভূম তথা বাংলার মাটিকে আন্দোলিত করে, জাতীয় মুক্তি চেতনাকে প্রসারিত করে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে পুষ্ট করে মুক্তি ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে।।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা ছাড়িয়ে সুদূর কোলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় মুক্তির পাতায়।

মুক্তির প্রথম দিকের (১৯২৫-২৮) এই সময়কালে সম্পাদকমন্ডলিতে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ফণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমূখ। ১৯২৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর সোমবারের মুক্তির পাতায় রাজদ্রোহ “বিপ্লব” শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য ১৯২৯ সালের ৬ই মার্চ থেকে সম্পাদক নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তকে এক বছরের জন্য এবং প্রকাশক সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেয় ব্রিটিশ সরকার। স্বভাবতই মুক্তি পত্রিকার দায়িত্বে আসেন ফণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও বীররাঘব আচারিয়া। যদিও ১৯৩০ সালের ৫ই মে থেকে মুক্তির প্রকাশ বন্ধ করে দেয় সরকার।।

১৯৩৯ সালের ২৬ শে জানুয়ারি থেকে অতুল চন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় মুক্তি প্রেস থেকে আবারও মুক্তি পায় মুক্তি।। কিন্তু ১৯৪১ সালে ১৬ই জুন থেকে মুক্তির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে চলা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেওয়া জেলা নেতৃত্বকে

কারারুদ্ধ করে ব্রিটিশ। এমনকি ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ বিরোধী প্রাণ সঞ্চারী আগস্ট আন্দোলনের শঙ্কিত ইংরেজ মুক্তি পত্রিকা প্রকাশনা সহ, প্রেস ও শিল্পাশ্রম বাজেয়াপ্ত করে।। এর ফলে মুক্তি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।।

এরূপ আবহে মুক্তি পত্রিকা মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন, সচেতনতা প্রসার, ভীত দিশাহীন মানুষের বুকেও আস্থা ও সাহস জাগানোর নিরন্তর চেষ্টার নামও মুক্তি। যার পাতায় পাতায় দ্রোহ চেতনার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত এবং সংবাদ সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণের মূলাধার এক চেতনা প্রবাহ।।

মুক্তি পত্রিকার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মুক্তি পত্রিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থাৎ ১৯২০ উত্তর গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার প্রচার প্রসারের দিকটি ১৯২১ সাল থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে সারা দেশ জুড়ে। এই সময়কালে মানভূমের মুক্তি আন্দোলনের ধারায় ১৯২৫ সালের ২১ শে ডিসেম্বর মুক্তির প্রকাশ। স্বভাবতই মুক্তির জন্মই মানভূমের মানুষের কাছে বিপ্লবের বার্তা বাহক রূপে নিরন্তরভাবে এর পাতায় সংবাদ ফিচার কবিতা প্রবন্ধ সহ নানাবিধ খবর প্রকাশিত হতে থাকে।।

মুক্তি পত্রিকা ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ অর্থাৎ ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে জন মনে প্রভাব ফেলেছে তার ব্যাপ্তি প্রসারতা চূড়ান্ত।। এটিকে মুক্তির প্রথম পর্যায় বলা যায়। দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৯৩৫- ১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি স্বাধীনতার দিগ দর্শনের কাজ করে চলেছিল মুক্তি অর্থাৎ প্রথম ধাপের অহিংস অসহযোগ থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের ধারাপাত বেয়ে ১৯৪২ সালের আগস্ট আগস্ট আন্দোলনে মুক্তির প্রচার জনমনে বিপুল সাড়া ফেলে।। স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিমুখ প্রসারে, আন্দোলনের গভীরতা প্রচারে, আন্দোলনের খবর প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে দিতে মুক্তির জুড়ি মেলা ভার।।

আসলে মানভূম (১৮৩৩) বা পূর্বতন জংগল মহল জেলা (১৮০৫) ব্রিটিশ বিরোধিতার মূলসূত্রটি হলো জমিদার ভূস্বামীদের উপরে বাড়তি কর আদায়ের চাপ বাড়ায় ব্রিটিশ, ধীরে ধীরে এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষের উপরে স্থানীয় প্রশাসনের যে চাপ বাড়তে থাকে তার বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণি ও প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে।। জল জমি আর জংগলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে, নিপীড়িত হতে থাকে অধিক রাজস্বের চাপে। এরই ফলশ্রুতিতে পুঞ্জীভূত দ্রোহ বাড়তে থাকে এসব অঞ্চলে—কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।। সুকৌশলী ব্রিটিশ এসব বিদ্রোহের গুরুত্ব কমানোর জন্য, ছোট করে দেখবার অভিপ্রায়ে কখনো চুয়াড় বিদ্রোহ কখনো হাংগামা বলে অভিহিত করে, আসলে এসমস্তই ছিল কৃষককুলের সংগ্রাম, জল জমি জংগলের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম পক্ষান্তরে মুক্তির সংগ্রাম।। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপসাসনসহ অধিক কর আদায়ের পাশাপাশি এলাকার মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে ভাঙার জন্য প্রশাসনিক শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের দোহাই।

দিয়ে বারেবারে এতদঅঞ্চলের স্বাধীনচেতা এবং শান্তপ্রকৃতির মানুষের উপর বারেবারে অত্যাচার নিপীড়ন নামিয়ে নিয়ে এসেছে, কিন্তু সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ সংগঠিত হয়েছে জোর জোর প্রতিবাদে।।

মুক্তির জন্মলগ্ন থেকে সাধারণ ভাবে পাঁচটি বিভাগ তার প্রকাশন উদ্যোগ উদ্যেশ্য বিধেয়।। কারণ,

১) ১৯২৫ —১৯৩৫ ঋষি নিবারণ দাসগুপ্তের প্রত্যক্ষ প্রভাব নির্ভরতা কালীন।

২) ১৯৩৫ উত্তর ১৯৪৭ সাল অবধি মুক্তির সম্পাদনা ও প্রচারণা পর্ব।

৩) ১৯৪৭-৪৮ এই সময়ে স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি তার যৌক্তিকতায় এবং ১৯১১ সালের দরবার ডের ঘোষণায় মানভূম জেলা যেহেতু বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে তা কার্যকর হয়। এরই প্রতিবাদে মানভূমের বাংলা ভাষা ভাষী মানুষ প্রতিবাদ আন্দোলনে নামে ১৯১২ থেকেই। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্রতর হবার কারণে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথেই সেই লড়াই দাবি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে মুক্তি পত্রিকা হয়ে উঠে তার প্রধান হাতিয়ার।।

৪) মুক্তিকে কেন্দ্র করেই ১৯৪৮ সাল থেকে গঠিত লোক সেবক সংঘের যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রচারিত হতে থাকে।। এবং তা চলে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর অব্ধি।।

৫) ১৯৫০ সাল থেকেই মুক্তি লোক সেবক সংঘের মুখপত্র রূপে ভাষা আন্দোলনই নয় রাজনৈতিক আন্দোলনেরও হাতিয়ার হয়ে উঠে।

৬) ১৯৫৬ উত্তর কালেও রাজনীতি সমাজনীতি সাংস্কৃতিক নানান লেখা মুক্তির পাতায় প্রকাশিত হতে থাকে।।

৭) মুক্তি পত্রিকা প্রকাশ পাবার সাথে সাথেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে শুধু মানভূমের মানুষের স্বাধীনতা স্পৃহার আশা আকাঙ্খার কথাই এর পাতায় মুদ্রিত হবে এটা নয় সারা দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার ভাবনা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রচার প্রসার এবং স্বাজাত্যবোধের জাগরণ ঘটানোর উৎসাহে এর প্রকাশ।

বিশেষ ভাবে মুক্তির প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতায় কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা "দাসের গান" নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয় —ভারতের অধিবাসীদের মনে স্বদেশ প্রেমের জাগরণ ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে—

'দেখিবে যাহারে, বলিবে তাহারে, কি কর অলসে বসিয়া ভাই!
কি সুখে মগন মুদিয়া নয়ন, আবেশে জীবন যাপিছ ভাই?
কর্ণ পাতিয়া করহ শ্রবণ, অনাথ অনাথা করিছে রোদন,
মুছাতে তাদের সজল নয়ন, মনে কি তোমার বাসনা নাই?

অলস জীবন সত্য বচন, সুকাজে অশক্ত স্বকর চরণ,
এই যদি হয় ধর্মের লক্ষণ, দূর করি এস পূজা পুঁথি ছাই।'

সেকালের শিল্পাশ্রম মানভূমবাসীর জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের আশ্রয় ভরসাস্থল হয়ে উঠেছিল। আর মানভূমবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধের উদ্‌গীরণ ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে জাগানোর জন্য মুক্তি পত্রিকা মানভূম কংগ্রেসের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়।।

সম্পাদকীয়তে নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত লিখলেন—

'বন্ধন দশায় মুক্তির কথা ছাড়া আর কি বলিবার আছে? পরাধীন দেশে স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যতীত আর কি করিবার আছে? পর নির্ভরশীল জাতির পক্ষে স্বরাজ লাভের উপায় চিন্তন ব্যতীত আর কি করিবার আছে?

ত্রিশ কোটি মানবের জন্মভূমি, সর্ব প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, এই বিশাল ভারতবর্ষ কিসে পুনরায় আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেমন করিয়া এই শৃঙ্খলিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতীত, দেশটি তাহার দৈন্য দুর্দশা হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে মোক্ষধর্মের প্রচার ক্ষেত্র এই মুক্তিক্ষেত্র দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহাই করিয়া দেখা, নির্ভীকভাবে তাহার প্রচার করা এবং সমস্ত শক্তি একই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা। শৃঙ্খলাবদ্ধ জননীর বন্ধন মুক্তির চিন্তা ব্যতীত সন্তানের হৃদয়ে আর কি ভাবনা স্থান লাভ করিবে? ইহাই আমাদের মুক্তির কল্পনা। সালোক্য, সাযুজ্য, প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত মুক্তির কথা ভাবিবার এখন সময় নাই।"

অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলমে "শুধু মুক্তির বাণীই প্রচারিত হউক।" এজাতীয় স্বাধীনতার প্রেরণা জোগাতে মুক্তির জুড়ি মেলা ভার।

সুমহান দেশ সেবার সুমহান ব্রত সাধনার লক্ষ্যে মুক্তি পত্রিকার ৫ম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় ছেপেছিল অনবদ্য প্রতিবেদন —

'লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের তাৎপর্য দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ১২ই মাঘ (১৩৩৬) ২৬শে জানুয়ারি (১৯৩০) রবিবার "স্বাধীনতা দিবস" পালিত হইবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি কর্তৃক স্থির হইয়াছে।'

আসলে মুক্তির পাতায় পাতায় বিষয় বিন্যাস ছিল বৈচিত্র্যের বৈভবে পূর্ণ। যার মধ্যে প্রধান দিক ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংক্রান্ত চেতনার প্রচারণা।

দ্বিতীয়ত সারা দেশের বুকে কংগ্রেসের মুক্তি চেতনার প্রসারকল্পে যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাকে তুলে ধরা।

তৃতীয়ত মহাত্মা গান্ধীসহ জাতীয় নেতৃত্বের বক্তব্য কেন্দ্রিক খবর প্রকাশ করা।

চতুর্থত মানভূমের মানুষের মুক্তি চেতনার প্রতিটি খবর, স্থানীয় যাকিছু দেশপ্রেমের সংবাদ পরিবেশন করা।

পঞ্চমত দেশ বিদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জাতি জনজাতির সংস্কার সংস্কৃতির কথা ছাড়াও অন্যান্য নানান সংবাদ যেমন সাহিত্য, ক্রীড়ার খবর সহ কবিতা গান নাটক হাস্যরসাত্মক লেখা প্রতিবেদিত হতো পাতায় পাতায়।।

মুক্তির পাতায় প্রকাশিত হয় বিপ্লব নামে এক প্রতিবেদন, এর জন্য ব্রিটিশ সম্পাদক ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত এবং প্রকাশক মুদ্রাকর সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক মামলায় যথাক্রমে উনাদের একবছর ও তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেয়। পরবর্তীতে আবারও বেশ কয়েকবার মুক্তি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় এবং প্রেস বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ সরকার।

পরবর্তী ক্ষেত্রে মুক্তির সাথে তরুণশক্তি পত্রিকাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আসলে মুক্তি পত্রিকা তার জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের মুক্তিসাধনার ক্ষেত্রে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তি সংগ্রামের বিজয়গাঁথায় একটি করে মালা গাঁথতে, যাতে তা আরও বিকশিত হতে পারে পরাধীন দেশের মানুষের কাছে, তাঁরা প্রবল বিক্রমে ব্রিটিশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে জাতীয় মুক্তিকে ত্বরান্বিত করে তুলবে, এই স্বপ্ন, এই বাস্তবতার অচ্ছেদ্যবন্ধনেই মুক্তির প্রকাশ বিকাশও উত্তরণ, ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার।।

তথ্যসূত্র :

১) আমার জীবন - স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর আত্মজীবনী, প্রথম হইতে ষষ্ঠ খন্ড একত্রে , শ্রীভারতীদেবী, দ্বিতীয় অখন্ড সংস্করণ, সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশনী, শিবরাত্রি, ১৪২৬।

২) মুক্তি পত্রিকা, মানভূমে স্বদেশ চেতনার অগ্রদূত, প্রথম পর্ব, (১৯২৫ -১৯৩০), ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, ডিসেম্বর, ২০২৫।

৩) স্বাধীনতা সংগ্রামী নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত, জীবন ও চিন্তাধারা, ড. প্রদীপ কুমার মন্ডল, টরিয়েন পাবলিকেশনস, প্রথম প্রকাশ, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৫।

৪) পুরুলিয়া, তরুণদেব ভট্টাচার্য, ফার্মা কে, এল, এম, প্রা: লিমিটেড, কোলকাতা, ১৯৮৬।

৫) মুক্তি পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৯২।

৬) মানভূম পুরুলিয়ার দ্রোহ চেতনার ধারা, ড. দয়াময় রায়, আমন পত্রিকা, পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা, প্রধান সম্পাদক, সৈকত রক্ষিত, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০২৫।

৭) মানবভূম পোটটিয়ার, এইচ. কূপল্যাণ্ড, ১৯১১।

অজয় কুমার দাস

বিদ্যাপতির কবিতায় প্রদীপ, লোকশিল্পের বিস্ময়কর দ্যোতনা — কাব্য সৌন্দর্যের মুক্তবেণী

।।এক।।

কবি বিদ্যাপতি। অবাঙালি কবি তিনি। রাজসভার কবি তিনি। ভোগ ঐশ্বর্যে লালিত কবি বিদ্যাপতি। তাঁর কবিতায় কি মাটির পৃথিবীর রক্ত-কর্দম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধরা পড়ে? সেই সুদূর মধ্যযুগ - তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোকশিল্প তাঁর কবিতাকে কতখানি সাবলীল করে তোলে? কিন্তু তিনি পৃথিবীর কবি। এই এদেশের জলহাওয়ায় উদাত্ত, মাটির রসে সিক্ত। সুতরাং ভারতীয় সত্তার প্রাণবন্ত লাবণ্যের সৃষ্টিরূপের বহুতর ব্যঞ্জনা তাঁর কবিতাকে কাব্যশিল্পের চমৎকারিত্ব এনে দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি? হ্যাঁ তাই। মাটির প্রদীপ - পৃথিবীকে চাঁদের আলোর মত জ্যোৎস্না প্লাবিত করে না, কিন্তু পল্লি-কুটিরের ছোট ছোট গৃহকোণকে আলোকিত করে। সে এক সৌন্দর্যের রূপময় মেঘমালা। ইতিহাসের ধূসর অধ্যায় থেকে মানবের মানবত্ব আবহমান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সাধনার অমূল্য রত্ন হয়ে উঠেছে। মানবের বিস্ময়কর বিজয় উদ্ভাস - নানা রঙের সৃষ্টিশীল আলপনা। মাটির প্রদীপ তো শুধু আলো দেয় না, তা প্রেম, ভালোবাসা, নীরবতা, বিষাদ, বিষণ্ণতা, দুঃখ ও আনন্দের মণিহার। প্রদীপ কথা বলে। কোটি কোটি মানুষের সৃষ্টি মুখর ভাষা, নম্র প্রতিভাস। মানব সভ্যতার গোড়ার কথা, সৌন্দর্য সন্ধানের মুক্ত প্রান্তর। যুগ ও জাতির জন্য মৃৎশিল্পীরা রেখে গেছেন হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কোমল উপহার। প্রদীপ মৃৎশিল্পীর অনুভবময়তার দিব্য বিভা।

মধ্যযুগের বাংলাদেশ জাতি, বৃত্তি ও সম্প্রদায় বিভক্ত। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য — অপাঙক্তেয় রূপে দেগে দিয়েছে এই ভৌগোলিক অঞ্চলের বৃহত্তর জাতি-সম্প্রদায়কে। কুম্ভকার বা কুমোর তেমনই এক সম্প্রদায়। মাটির প্রদীপের স্রষ্টা এঁরাই। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের জন্য লোকসমাজের কাছে এঁরা অচ্ছুত জনসম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন। আবহমান কাল থেকে অচ্ছুত হয়ে থাকা এই কুম্ভকার জাতি নিম্নবর্গীয় হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ। ধর্মপ্রাণ এই সম্প্রদায়ের মানুষ সহজ - সরল ও সুন্দর। এঁদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন রয়েছে এঁদের সৃষ্ট শিল্পকর্মে। দেবদেবীর মূর্তি এবং নানান মঙ্গলচিহ্ন সমন্বিত দীপ, মঙ্গল কলস, পুতুল, প্রতিমা প্রভৃতি লোকশিল্পকে হিন্দু পুরাণের নানা প্রতীক - মোটিফের আশ্রয়ে অপরূপ করে গড়ে তুলেছেন মৃৎশিল্পীরা। সৌন্দর্য সন্ধানী শিল্পীরা তাঁদের শিল্পে রেখে গেছেন সৌন্দর্য চিহ্ন। ঢোকরা কামারেরা কাঁসা পিতলের উপকরণে তৈরি করেন পেতলের প্রদীপ। হিন্দুদের পূজা অর্চনায় দেবদেবীর বন্দনায়, আচার— সংস্কার, অনুষ্ঠান, জন্ম — মৃত্যু — বিবাহে, সামাজিক

কল্যাণ কর্মে ও দৈনন্দিন শুভ মঙ্গলকর্মে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। মৃৎশিল্পীদের মাটির প্রদীপের কোন তুলনা হয় না। কুমোরের চাক এঁদের শিল্প সৃষ্টির আবশ্যক উপকরণ। শিল্পীরা তাঁদের আঙুলের বিন্যাসে কাদামাটি দিয়ে গড়ে তোলেন অপরূপ রূপময় এমন প্রদীপ। দীপ জ্বলে-ঘরে ঘরে। দীপমালায় গৃহকোণ আলোকিত হয়। বাংলাদেশ কাদামাটি পলিমাটির দেশ। সামান্য তুচ্ছ মাটি দিয়েই কুমোরেরা এমন প্রদীপ তৈরি করেন। তারপর রোদে শুকিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, ছাই ধুলো ঝেড়ে, রঙের আলিম্পনে বর্ণময় করে প্রদীপকে শিল্পমূর্তি দান করেন। এরপর তুলোর সলতে পাকিয়ে তেলে ডুবিয়ে পল্লিবধূরা জ্বেলে দেন দীপ।

প্রদীপের কত নাম। বাঙালির অন্তরের তাপ উত্তাপে জড়ানো স্মৃতির আলপনার মত সে নাম। প্রদীপ, পিদিম, পিদ্দিম, দীপ, দীপিকা, দিয়াড়ি, দিয়া, বাতি, শামা, চেরাগ, দেউটি, জ্বলদ-বর্তি, বর্তি, বর্তিকা, বর্তিক, গৃহমণি, তমোঘ্ন, কুপি, টেমি, লম্ফ, ডিবে, লণ্ঠন, হ্যারিকেন, শেজ, শেজবাতি, দেওয়াল গিরি, মোম, মোমবাতি, সলিতা, সলতে, পলিতা, পলতে, পিঞ্জুল প্রভৃতি। একটি লোকশিল্পের এত নাম। শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজন নয়, সাহিত্য সৃষ্টির বিচিত্র ক্ষেত্রেও বাঙালির প্রিয়তম এই লোকশিল্পটি আপনার উজ্জ্বলন শিখার মত ভারতীয় সভ্যতায় মধ্যযুগের বাণীতীর্থের বিশিষ্ট অধ্যায়ের দিব্য বিভাকে প্রাণবন্ত করেছে।

সংস্কৃত দীপবর্তিকা ৭ প্রাকৃত দিঅবট্টিআ ৭ দিঅবট্টিঅ ৭ দিয়টি ৭ দেউটি। কত রূপ — রূপান্তর ও বিচিত্র আঙ্গিক প্রদীপের। চৌমুখী, পঞ্চমুখী, সপ্তমুখী প্রদীপ। আবার পঞ্চপ্রদীপ, সপ্তপ্রদীপ — এমন বিচিত্র আধারে আলোকের ধারক উপাদান এটি।

হিন্দুদের শাস্ত্রীয় পূজা উপাচারে ধর্মীয় শিল্প উপকরণ হল প্রদীপ। হিন্দুধর্মে দৃশ্যমান দেবদেবীকে নানা শাস্ত্রীয় উপাচার ও নৈবেদ্য সহকারে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। প্রদীপ কেবল পূজার উপাচার — উপকরণ রূপেই নয়, এটি ধর্ম নিরপেক্ষ লোকশিল্প — তা গৃহস্থের গৃহকোণকে আলোকিত করে। প্রদীপ সংহত লোকসমাজের প্রয়োজন নির্ভর এমন লোকশিল্প। এর শেকড় সমাজ জীবনের গভীরে। প্রদীপ ভারতীয় সংস্কৃতির মুখচ্ছদ, জাতীয় জীবনের সত্তা ও সৌন্দর্য।

হিন্দুদের কাছে প্রদীপের আলো পবিত্র। দেবমূর্তিকে একাধিক সলতে যোগে আলোকিত করা হয়। নামকরণ তো বটেই, বহু বিচিত্র কার্য বৈচিত্র্যেও প্রদীপকে অর্থবহ করা হয়। এরজন্য পঞ্চপ্রদীপ, আরাত্রিক প্রদীপ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, সন্ধ্যাদীপ, সান্ধ্যদীপ, সেঁজুতি, সাঁজবাতি, সাঁজা, আকাশপ্রদীপ, আকাশদীপ, আকাশ দিউটি এরকম কত চমৎকার নামকরণ। প্রদীপের এত নাম, এত ভাবনা চিনিয়ে দেয় দৈনন্দিন জীবনে এই শিল্প দ্রব্যটির বৈচিত্র্যের বহুমুখীনতা। এছাড়াও আছে অনেক আদরণীয় নাম — দীপাধার, দীপগাছ, পিলসুজ, গাছা, দেরকো, বাতিদান, দিয়াদান, শ্যামদান, দীপপাত্র, দীপঝাড়, দীপপাদপ, দীপবৃক্ষ প্রভৃতি। বোঝা যাচ্ছে, বহু মনীষার চিন্তন প্রযত্নের অঙ্গীকার থেকে গেছে এই লোকশিল্পটিকে জুড়ে।

নানা উপকরণ ও আঙ্গিকে প্রদীপ নির্মিত হয়। মাটির প্রদীপ, পোড়ামাটির প্রদীপ, পেতলের প্রদীপ প্রভৃতি। এছাড়াও পঞ্চপ্রদীপ ও সপ্তপ্রদীপের ব্যবহার আছে। প্রদীপের আলোককে পবিত্র বলে মনে করা হয়।

মাটির প্রদীপের মূল উপাদান হল মাটি। বাংলাদেশ পলল মৃত্তিকার দেশ। এখানে কাদামাটি ও পলিমাটির অভাব নেই। অগ্নিরোধক উপকরণ হিসেবে মাটির বিকল্প খুব কম কিছুই আছে। আলোর-ধারক প্রথম অবয়বটি তাই মাটি দিয়েই তৈরি। কাঁচা মাটির সৃষ্ট প্রদীপকে পুড়িয়ে পোড়ামাটির শিল্পে রূপ দেওয়া হয়। আর পেতলের প্রদীপ মূলত ডোকরা কামারদের নির্মিত সৃষ্টিশীল শিল্প আঙ্গিক। কাঁসা পেতল ছাড়াও লোহা গলিয়েও প্রদীপ নির্মাণ করা হয়।

প্রদীপের প্রাথমিক পর্যায়ের অবয়ব (Primitive form) খুবই সরল। প্রথম অবস্থায় প্রদীপ ছিল খানিকটা সরার মত। পরবর্তী সময়ে তা অনেকটা যুক্ত করপুটে অঞ্জলি ভরে জলপান করার মত আকৃতি ধারণ করে। সরার একদিকে সলতে রাখার জন্য নাকের আকৃত সদৃশ নিম্নমুখী পরিসর থাকে। সরার গভীর অংশে তেল থাকে। সলতে, তেল এবং তেল ধারণের আধার পাত্র হল প্রদীপ। প্রদীপের পাত্র সদৃশ দেওয়াল আলোকের শিখাকে যথেচ্ছ এলোমেলোভাবে প্রসারিত হতে দেয় না। আসলে মাটির প্রদীপ আগুন নির্বাপক বস্তু হিসেবে খুবই কার্যকরী। হিন্দুদের পূজাপার্বণ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বহু নাকযুক্ত প্রদীপের ব্যবহার বেশি হয়। বিশেষভাবে সন্ধ্যাকালে আরতির সময় হাতল যুক্ত মাটির প্রদীপ ব্যবহৃত হয়।

লোকশিল্পী প্রদীপ নির্মাণের জন্য প্রথমে মাটি সংগ্রহ করেন। প্রয়োজন অনুযায়ী বালি মিশিয়ে মাটির গুণগত মান পরীক্ষা করেন। মাটিকে জল দিয়ে থেসে শিল্পের উপযোগী করে তোলেন। শিল্পীরা মাটির প্রদীপ মূলত হাতেই তৈরি করেন। কুমোরেরা চাকের সাহায্য নেন। চাক গতীয় জীবনের শাশ্বত প্রতীক। অবশেষে শিল্পীর আঙুলের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠে শিল্প।

এরপর সৌন্দর্যবোধের অধিকারী মানুষ প্রদীপকে অলংকৃত করেন। সৌন্দর্যের বাস্তব ব্যবহার না থাকলেও শিল্পীমনের প্রেরণায় লোকশিল্পী তাঁর নির্মিত শিল্পবস্তুকে অলংকৃত করেন। নানা নকশার আঙ্গিকে প্রদীপকে অলংকৃত করা হয়। সবশেষে লোকশিল্পী রঙ তুলি দিয়ে উক্ত শিল্পবস্তুটির সৌন্দর্য বর্ধন করেন।

ডোকরা সম্প্রদায়ের শিল্পী কামারেরা মোম এবং ধুনো সহযোগে পিতলের পঞ্চপ্রদীপ বা সপ্তপ্রদীপ নির্মাণ করেন। নির্মাণ প্রক্রিয়াটি এরকম, প্রথমে প্রদীপের একটি ছাঁচ তৈরি করেন। তারপর ধুনো গুঁড়ো করে ভেজে নরম হলে পর সরষে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে আগুনের তাপ দিয়ে আর একটি ছাঁচ তৈরি করা হয়। এরপর ছিদ্রযুক্ত মাটির চুণ্ডি তৈরি করা হয়। আর অপরিষ্কৃত কাঁচা পিতলের টুকরো খণ্ড খণ্ড করে (Raw Brass Metal) চুণ্ডির মধ্যে দেওয়া হয়। তারপর তিন-চার ঘণ্টা আগুনের মধ্যে থেকে চুণ্ডির পিতল গলে

ভিতরে যায়। অবশেষে ধুনো গলে গিয়ে ধুনোর শূন্যস্থানে তরল পিতল ছড়িয়ে যায়। এরপর মাটির আবরণ ভেঙে ছাঁচমুক্ত শিল্পবস্তু তথা প্রদীপকে বের করা হয়।

বাঙালির শুভ উৎসব; যথা - বিবাহ, অন্নপ্রাশন এবং শুভ দীপাবলীতে প্রদীপের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। হিন্দুরা প্রদীপকে নানা প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেন। প্রদীপ 'শুভ', 'ভাল', 'জন্ম' এবং জ্ঞানের প্রতীক।

প্রদীপের বিবর্তনের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রদীপদানি। একে 'গাছা'ও বলা হয়। প্রদীপদানি বা গাছা হল উচ্চ দণ্ড সদৃশ অলংকৃত বস্তু। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি মাটির তৈরি। মাটি ছাড়াও এটি কাঠ কিংবা কোন ধাতব পদার্থ দিয়ে নির্মিত হতে পারে। প্রদীনদানি আর প্রদীপ পৃথক বস্তু। প্রদীপকে প্রয়োজনমত উচ্চতায় রাখার জন্য প্রদীপদানি বা গাছার দরকার হয়। প্রদীপদানি আসলে প্রদীপের ধারক। একে আলোকস্তম্ভও বলা যেতে পারে। প্রদীপের আলোকরশ্মি যাতে অনেক বেশি জায়গা পর্যন্ত দৃশ্যমান হতে পারে, তার জন্য প্রদীপদানির প্রয়োজন হয়। প্রদীপদানি এবং প্রদীপ কখনো সংযুক্তভাবে, কখনো পৃথকভাবে নির্মিত হয়। প্রদীপদানিকে নানা কারুকার্য ও নকশায় অলংকৃত করা হয়। পেতলের প্রদীপদানি অভিজাত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এছাড়া এটির সঙ্গে প্রদীপের সংযোজনের ফলে আলোকের উজ্জ্বলতা ও বিস্তৃতির সমাধান সম্ভব হয়। প্রদীপদানিকেও নানাভাবে অলংকৃত করা হয়।

প্রদীপের উৎপত্তি প্রয়োজন থেকে। সে প্রয়োজন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জীবনের জন্য প্রয়োজন আলোক। আলো জীবন এবং সভ্যতার প্রয়োজনীয় মৌল উপকরণ। আলোকের ব্যবহার মানব সভ্যতার অগ্রগমনের সূচনা করেছিল। দেবপূজা, শুভাশুভবোধ, মাঙ্গলিক রীতি-নীতি প্রভৃতি প্রদীপকে অবলম্বন করে শীলিত জীবন পরিচর্যার একটি সুদীর্ঘ অধ্যায় মানব সমাজের সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়ে গেছে। মানবতা, মনুষ্যত্ব, জ্যোতির্ময় জ্ঞানের অভীপ্সা — এককথায়, মানুষের সাধনার একটা অধ্যায় প্রদীপকে অবলম্বন করে সুস্থিতি লাভ করেছে।

।। দুই।।

চাঁদের আলো পৃথিবীকে আলোকিত করে। পল্লির প্রান্তে কুটিরের কোণে সে আলো প্রবেশ করে না। সে আলো ঘরের অন্ধকারকে দূর করতে পারে না। তখন দরকার হয় একটি ছোট্ট দীপ। সে দীপের আলোয় আলোকিত হয় গৃহকোণ। সে দীপের আলোয় মুখোমুখি এক প্রেমিক যুগল। কতভাবে দীপকে ব্যবহার করেছেন কবি। দীপকে নিয়ে বিদ্যাপতি নানাভাবে আলো ছড়িয়েছেন। শিল্পের মায়াবী মেদুর মায়াঞ্জন, তুলনা — প্রতিতুলনা সবই এই তুচ্ছ লোকশিল্পটিকে ঘিরে করেছেন বিদ্যাপতি। কোন কবিতায় কবি বলেছেন, দীপ জ্বললে অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি দুর্জনের কথাকে বিচার করলে তাকে মিথ্যে মনে হবে। বিদ্যাপতি কবি, দার্শনিক। কখনো বলেছেন, সময় অতীত হলে নির্দিষ্ট কাজের

প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, যেমন রাত্রি অবসিত হলে দীপের প্রয়োজন ফুরোয়। আবার দীপ নিভে গেলে রাধা কৃষ্ণের বাসরশয্যা রচিত হয়। আবার কোন পদে বলেছেন, দীপ নিভে গেলে, কোন দাহ্য উপকরণেও কিছু কাজ হয় না। রাধার হৃদয় যদি অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়, তাহলে বাইরের ওষুধের কোন কাজ থাকে না। প্রণয় সমস্ত অসুখের মর্মমূলে গ্রথিত। প্রেমহীন নারী-পুরুষ অসুখী হয়ে ওঠে। কবির কবিতায় দীপ সমসময়ের রূপক তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন বৃষ্টির প্রয়োজন, তখন যদি না বৃষ্টি হয়, পরে তার মূল্য থাকে না। তখন দীপ জ্বেলেও লাভ নেই।

১। মিলন ভীরু রাধিকা। মিলনে তিনি লজ্জিত। নায়ক কৃষ্ণ দুর্বল দীপ হাত দিয়ে নিবিয়ে দিল না, নারীর জীবন কঠিন। তাই লজ্জায় মরে গেলেন না। কবি লিখলেন—

"করে ন মিঝায়ল দুবর দীপে।
লাজে না মর নারি কঠ জীবে।।" [১]

২। রাধিকা গোপনে কৃষ্ণকে মিলিত হতে বলেছেন। প্রদীপ জ্বেলে উপপতি বিলাস করে - একথা তিনি কখনও শোনেননি। পরিজনেরা কাছেই আছেন, সুতরাং সাবধানে ধীরে ধীরে রতিবিহার করার কথা বলেছেন। কবি লিখেছেন—

"কহঁা নহি সুনিত্র এহন পরকার
করএ বিলাস দীপ লএ জার।।"[২]

(জার অর্থাৎ উপপতি)

৩। দুর্জনের কথা যত বিচার করবে, ততই মিথ্যা মনে হবে। ঘরে দীপ জ্বাললে আর অন্ধকার থাকে না। কবি লিখেছেন—

"তহহি দূর জা জতহি বিচার
দীপ দেলে ঘর ন রহ অঁধার।"[৩]

৪। সময় অতীত হলে যদি মেঘ বর্ষণ করে তবে সে জলধারায় লাভ নেই। শীত শেষ হলে যদি বসন পাওয়া যায়, তবে তাতে উপকার হয় না। অন্ধকার অবসান হলে প্রদীপ জ্বাললেও কোনো ফল নেই। দিন শেষে ভোজন করলে কোনো লাভ হয় না। তুলনীয় - গোবিন্দদাসের একটি পদে পাওয়া যায় — "ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।"[৩.ক]

বাংলার একটি প্রবাদে পাওয়া যায় —

"মাকে গিয়ে বলো পিসী, বড়ো সুখে আছি,
ঝিঞের ফুল ফুটলে তবে ভোজনেতে বসি।" [৩.খ]

কবি বিদ্যাপতিও দিবসান্তে ভোজনের কথা বলেছেন। অসাধারণ কাব্যোৎকর্ষ, সৃষ্টি সৌন্দর্যে অতুলনীয় এই পদ -

"রয়নি গেলে দীপে নিবোধিঅ
ভোজন দিবস অন্ত।"[৪]

৫। আকাশে সূর্য কিরণ দিলে প্রদীপের শিখা ম্লান হয়ে যায়। কবি লিখেছেন -

"অরুন কিরন কিছু অম্বর দেল।
দীপক সিখা মলিন ভএ গেল।।"[৫]

৬। রাধার প্রিয় মিলনের ইচ্ছে কেবল লজ্জার নয়, কারণ ফুলশয্যা রচিত হয়েছে। দীপ প্রদীপ্ত আছে। অগুরু চন্দনের গন্ধ। কৃষ্ণ মিলনের সময় ব্যর্থ হচ্ছে, কামনাপীড়িত রাধা বেশভূষা করে আছেন। বিদ্যাপতি লিখেছেন -

"কুসুমে রচিত সেজা   দীপ রহল তেজা
পরিমল অগর চন্দনে।"[৬]

৭। ত্রিবেণী সংগমে দান করলে মহাপুণ্য হয়। রাধাও তাঁর সর্বস্ব দান করুক কৃষ্ণকে। দীপের শিখা দেখে মন স্থির থাকছে না। নিজের মন স্থির করুক। কবি লিখেছেন-

"দীপ দিপক দেখি থির ন রহয় মন
দৃঢ় করু অপন গেআন।"[৭]

৮। রাত্রি শেষ হয়েছে। পদ্ম ফুটেছে। দীপ ও রাত্রির আকাশ ম্লান হয়েছে। আসলে নক্ষত্রহীন আকাশ। কবি লিখেছেন -

"দীপ মন্দ রুচি অম্বর রাত।
জুগুতিহি জানল ভএ গেল পরাত।।"[৮]

৯। কৃষ্ণ রাধার কাঁচুলি কেড়ে নিলেন। রাধা তাঁর দেহ ঢাকার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। রাধা লজ্জায় চুপ। দূরে দীপ জ্বলছে। হাত দিয়ে নেভানো যায় না। লজ্জায় মরে না। রমণীর কঠিন প্রাণ। কবি লিখলেন -

"কর ন মিঝায় দূর জব দীপ।
লাজে ন মরএ নারি কঠজীব।।"[৯]

১০। যখন রাধার বস্ত্র টেনে নিলেন, রাধার লজ্জা দূরে গেল। কৃষ্ণের শরীর রাধার বস্ত্র হল। রাধা নত মুখে প্রদীপ দেখতে লাগলেন। অর্থাৎ চোখ বুঝলেন। তাতেই দীপ নিভে গেল। রাধা কৃষ্ণের মিলন সম্পন্ন হল। কবি লিখলেন -

"অধোধে মুহে নিহারিএ দীব।।
মুদলা কমল ভমর মধু পীব।।"[১০]

১১। নিভানো দীপে (রস) তেল, ঘি প্রভৃতি দিলেও তা জ্বলে না। অন্তরের অন্তস্তলে যন্ত্রণা। আধি — ব্যাধি ভিতরে। আর ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বাইরে। আসলে প্রণয়ই সমস্ত অসুখের মূলে। কবি লিখেছেন -

"বাতি ন রসি মিঝাএল দীবে।।
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।"[১১]

১২। যদি সময়ে বৃষ্টি সিঞ্চন না করা হয়, তবে তাতে ফল পাওয়া যায় না। দিনে দীপ জ্বেলে কোন লাভ হয় না। মন্দ সময়ে মূর্ছিত ব্যক্তিও এক অঞ্জলি জলে বাঁচে। কবি লিখলেন —

"যদি তোহেঁ বরিষব সময় উপেখি।
কী ফল পাওব দিবস দীপ লেখি।"[১২]

১৩। অপর একটি পদে কবি বিদ্যাপতি প্রদীপকে ব্যবহার করেছেন রমণীর প্রণয়ের ব্যক্ত-অব্যক্ত বহুমুখী তাৎপর্যে। সখী রাধাকে উপদেশ দিয়েছেন, কৃষ্ণ যখন তাঁকে ক্রোড়ে বসাবেন, তখন তিনি যেন আঁচল দিয়ে দীপ আড়াল করেন। সম্ভাষণেও কথা না বলা, অল্প অল্প হাসি, প্রণয়ের আতিশয্যেও মুখ ফিরিয়ে বসা, স্বল্প পরিসরে স্তনের পার্শ্বভাগ মাত্র উন্মোচিত করা, শয্যা ছেড়ে মাটিতে বসা, বস্ত্র সংবরণ করা — প্রণয়ের গাঢ়তা; এসব অনুভববেদ্য সংরাগকে এমন প্রযত্নে রক্ষা করতে হয়। আধো ঘোমটা টানা প্রিয়তমাকে দীপের আলোছায়ায় এভাবেই দেখেছেন প্রেমিক কৃষ্ণ। কবি লিখলেন —

"জব হরি করে ধরি কোর বইসাত্তব
আঁচরে চোরায়বি দীপে।"[১৩]

১৪। অপর একটি পদে রাধা বলেছেন, কৃষ্ণ যখন গোকুল নগরীতে আসবেন, তখন দীপ প্রজ্জ্বলিত করে প্রিয়তমের সামনে রাখবেন। নীরব অশ্রুতে প্রেমের অভিষেক। প্রদীপের শিখায় রূপ দর্শন, অঙ্গকান্তির শোভা — কাব্যোৎকর্ষের সুউচ্চ সৌধ নির্মাণ করলেন বিদ্যাপতি। কবি লিখলেন —

"ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন লোরে করব অভিসেকে।।"[১৪]

১৫। বিদ্যাপতি জীবন যৌবনকে শ্রেষ্ঠ ধন বলেছেন। সুতরাং অভিমান পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। তাই মিলন রাত্রিকে বিফল হতে দেওয়া যায় না। আগামীতে কি হবে কেউ জানে না। মিলনকালেও পারিপার্শিক পরিবেশকে চমৎকার শিল্প-সুষমায় ব্যবহার করেছেন কবি। বায়ু বয় ধীরে। দীপ স্থির নয়। আকাশভরা নক্ষত্র মলিন হল। আর লিখলেন না কবি। মিলন সম্পন্ন হল। কিংশুক ফুলের উপর ভ্রমর বসেছে। এইটুকুই। ব্যঞ্জিত অর্থদ্যোতনায় কবিকে চেনা যায়। বিদ্যাপতি লিখলেন —

"মানিনি মন্দ পবন বহ ন দীপ থির রহ
নখতর মলিন গগন ভরে।"[১৫]

১৬। মিলনে অপ্রাপ্তিও - রাধার জীবনে এনেছে বিষণ্ণর প্রবহ। কৃষ্ণের প্রণয় প্রাপ্তির চেষ্টা করেছেন তিনি। নিজের সম্ভ্রম হারিয়েছেন। লজ্জা পেয়েছেন। অবশেষে তাঁর আক্ষেপ দরিদ্র মানুষের মণি-মাণিক্যে লোভ করতে নেই। রাধা নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেন। একই শয্যায় — তবুও মুখ ফিরিয়ে নেন কৃষ্ণ। প্রমত্ত ক্রোধে প্রদীপ নিভিয়ে দেন। আলোহীন রাত্রি যাপন করেন রাধিকা। কবি লিখলেন —

"হরি ন হেরল মুখ সএন সমীপ।
রোসে বসাওল চরনহি দীপ।।"[১৬]

১৭। নিম্নোক্ত পদটিতে বিদ্যাপতিকে স্বমহিমায় পাওয়া গেল। দখিনা বাতাস, বসন্তের সমাগনে আম্র-মঞ্জুরী, মধুকর শ্রেণি। এভাবেই বসন্ত অবসিত হয়। তবুও কৃষ্ণ আসেন না। দীপের আলো জ্বলল। কিন্তু অবশেষে তাও নিভে গেল। অপেক্ষা করেন রাধিকা। কিন্তু কৃষ্ণ আসেন না। কবি লিখলেন —

"দীপ জরিয় বাতী জরল
তৌও ন পীয় মোর আএল।"[১৭]

১৮। বিদ্যাপতির শিব বিষয়ক একটি পদে দেখা যাচ্ছে, পাগল যোগী বিবাহ করতে এসেছেন। ভকর ভকর করে ভাঙ খেয়েছেন। আলপনা মুছে দিয়েছেন। ঘট ভেঙেছেন। সুতরাং দীপ জ্বলবে কিভাবে? কবিতায় কবি চৌমুখ দীপের উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাপতি লিখলেন —

"ঐপন মেঁটল পুরহর ফোরল
বর কিমি চৌমুখ দীপ।"[১৮]

প্রদীপ কবির কবিতায় মাটির পৃথিবীতে সতারঙা রামধনুর মত আলপনা এঁকে দিয়েছে। এ সবই কবির কুশলী সৃষ্টিশীল চিন্তনের ফল। বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

।। তিন।।

প্রদীপকে নিয়ে বাঙালি কবিকুল অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যপঙক্তি উপহার দিয়েছেন। প্রদীপ কবিতাকে যথার্থ বাণীতীর্থে উন্নীত করেছে। কবিতায় প্রদীপের ব্যবহার কবির অন্তরের শক্তি। মধুসূদন লিখেছেন - "একে একে শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি।"[১৯] একে একে বীরপুত্রদের এমন মৃত্যুতে রাবণের এ এক দার্শনিক উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন —

'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।"[২০]

এই প্রদীপের স্রষ্টা মৃৎশিল্পীরা চিরজর্জর, দারিদ্র্যক্লিষ্ট। প্রায় হারিয়ে যাওয়া এমন শিল্পীদের বিবেক ধ্বস্ত। তবুও তাঁরা বেঁচে থাকা ঈপ্সিত ইচ্ছার প্রাচুর্যে ভরপুর। বিক্ষত বিবেকে আজও তাঁরা হয়তো জীবনের গান গায়। পরিশীলিত ও সুন্দর জীবনবোধ টিকিয়ে রাখতে এঁরা চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুশাসন এঁদের রিক্ত ও শূন্য করেছে। তবুও এঁরা চেষ্টা করে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। আজকের সভ্যতা এই বিলুপ্তপ্রায় মৃৎশিল্পী সম্প্রদায়ের ফলবান দ্যুতি। কবি বিদ্যাপতি প্রদীপ অবলম্বনে বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যপঙক্তি উপহার দিয়েছেন। প্রদীপ সম্পর্কে 'Dictionary of symbols' গ্রন্থে বলা হয়েছে "Lamp Symbolism is linked to that of the diffusion of light. The same injunction recurs in the Upanishads– and in the same way Mahmud Shabistari makes the lamp a symbol of the Divine Spirit or the World Soul."[২১]

তথ্যসূত্র :

১। মিত্র শ্রীখগেন্দ্র নাথ ও মজুমদার শ্রীবিমানবিহারী (সম্পাদক), বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রকাশক — শ্রীশরৎকুমার মিত্র, ৮৫ নং গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা, নতুন সংস্করণ, দোল পূর্ণিমা, ১৩৫৯, পদসংখ্যা — ৬২, পৃ. ৪৮।

২। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৬১, পৃ. ৪৮।

৩। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ১২৯, পৃ. ৯৩।

৩.ক। গোবিন্দদাস, অভিসার, অধ্যাপক মিত্র খগেন্দ্রনাথ, সেন সুকুমার ও অন্যান্য (সম্পা.), বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ৫৩

৩.খ। চক্রবর্তী, বরুণকুমার, বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫০ — গ্রন্থ থেকে প্রবাদটি উদ্ধৃত।

৪। মিত্র শ্রীখগেন্দ্র নাথ ও মজুমদার শ্রীবিমানবিহারী (সম্পাদক), বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রকাশক — শ্রীশরৎকুমার মিত্র, ৮৫ নং গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা, নতুন সংস্করণ, দোল পূর্ণিমা, ১৩৫৯, পদসংখ্যা — ১৬১, পৃ. ১১৫।

৫। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৩৩৮, পৃ. ২২৬।

৬। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৩৫৩, পৃ. ২৩৫।

৭। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৪৩৭, পৃ. ২৮৪।

৮। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৪৮২, পৃ. ৩১১।

৯। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৪৮৫, পৃ. ৩১৩।

১০। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৪৮৬, পৃ. ৩১৩।

১১। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৫১৩, পৃ. ৩৩১।

১২। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৫২৩, পৃ. ৩৩৭।

১৩। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৬৬৭, পৃ. ৪১৯।

১৪। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৭৫৫, পৃ. ৪৬৮।

১৫। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৮৩৮, পৃ. ৫১৩।

১৬। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৮৬৩, পৃ. ৫২৬।

১৭। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৮৭০, পৃ. ৫৩০।

১৮। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা — ৯০৩, পৃ. ৫৪৬।

১৯। দত্ত, মধুসূদন, মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম সর্গ, মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পা.- সব্যসাচী রায়, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা,১৩৯৯, পৃ. ৫০

২০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অশেষ (কবিতা), কল্পনা (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১৪৯

২১। Jean Chevalier and Alain Gheerbrant– Dictionary of Symbols– Lamp– Penguin Books– 1994– p. 589

পীযূষ বেরা

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি-চেতনা ও বাস্তুতান্ত্রিক বিন্যাস : পরিবেশসমালোচনামূলক ও পরিবেশ মানববিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা

বর্তমান সময়ে শুভ চিন্তার মানুষদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হলো প্রকৃতি এবং পরিবেশ। প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র বিশ্ব আজ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে। কিন্তু সাহিত্য প্রকৃতিকে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে তার জন্ম লগ্ন থেকে। যখন পরিবেশ ভাবনা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মধ্যে গুরুত্ব পায়নি তখন থেকেই প্রকৃতি বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় প্রধান জায়গাটি দখল করে নিয়েছিল। পৃথিবীর সকল দেশের, সকল কালের স্রষ্টার কলমে প্রকৃতি ও তার বৈচিত্র্যময় বহুরূপতা ঘুরে ফিরে এসেছে বারে বারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্য সম্পর্কেই একথা সত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রকৃতি ও সৌন্দর্যতত্ত্ব মিলেমিশে সে দেশের সাহিত্য অঙ্গনকে মুখরিত করে তুলেছিল। সাহিত্যে বর্ণিত প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল স্রষ্টার রূপমুগ্ধ সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনায় প্রাগাধুনিক সাহিত্য কি শুধুমাত্র নিসর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রকাশেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, না জীববিজ্ঞানের ভাষায় বাস্তুতন্ত্র রক্ষার মতো গুরুদায়িত্ব পালনে তথা পরিবেশ সচেতনতায় এগিয়ে এসেছিল —এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই এসে যায়!

ইকোক্রিটিসিজম (Ecocriticism) সাহিত্য সমালোচনার একটি তুলনামূলকভাবে নতুন শাখা হলেও এর মূল ভাবনা-মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক, যা দীর্ঘদিন ধরেই মানববিদ্যার আলোচনায় বিদ্যমান আছে। পশ্চিমি প্রেক্ষাপটে হেরিল গ্লটফেলটি (Heryll Glotfelty) ও হ্যারল্ড ফ্রম (Harold Fromm) সম্পাদিত The Ecocriticism Reader (1996) ইকোক্রিটিসিজমকে একটি স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। গ্রেগ গ্যারার্ড (Greg Garrard) তাঁর Ecocriticism গ্রন্থে প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে সাহিত্য কীভাবে পরিবেশভাবনার সামাজিক নির্মাণে ভূমিকা রাখে। এই আলোচনাগুলি Anthropocentrism-এর সমালোচনা করে প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র নৈতিক সত্তা হিসেবে ভাবতে শেখালো। বর্তমানে এনভায়রনমেন্টাল হিউম্যানিটিজ ক্ষেত্রটি ইকোক্রিটিসিজমকে আরও বিস্তৃত করে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করেছে। উরসুলা হেইজ (Ursula Häse) ও দীপেশ চক্রবর্তীর লেখায় পরিবেশ সংকটকে কেবল প্রাকৃতিক নয়, বরং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাগাধুনিক সাহিত্যের পাঠে বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ সেই সাহিত্য প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে আলাদা করে দেখেনি।

এদেশের সাহিত্যে প্রকৃতির অবতারণা, নিসর্গের উপস্থাপনা সেই সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ থেকে। ঋক-বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতিকে দেবতার আসন দিয়ে তাকে পূজা করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে কোল-ভীল-সাঁওতাল-ওঁরাও প্রভৃতি জনজাতির কাছে সবুজ প্রকৃতি সরাসরি দেবতার আসনটি পাকা করে নিল। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন-মধ্যযুগে চর্যাপদ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন- বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে প্রকৃতি সাধনার স্বরূপটি ফুটে উঠতে স্পষ্টত দেখা গেল। তাঁদের সৃষ্টির বিচিত্রভুবনে বাংলার সবুজ-শ্যামল নিসর্গ প্রকৃতি জীবন্ত-সত্তা হয়ে বাংলা সাহিত্যে বিরাজমান ও চলমান থাকলো। কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যোগসূত্র কোথায়, এর কি আদৌ কোনো ইতিহাস আছে? লৌকিক আচার-আচরণের মধ্যে যে প্রকৃতি পূজা দেখি এবং বর্তমান বাংলার বিভিন্ন পাড়াগাঁয়ে যে সমস্ত লৌকিক উৎসব পালিত হয়, প্রকৃতির আনুসঙ্গে তার যোগসূত্র কি? তবে কি আদিম মানুষের মধ্যেও প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বজায় ছিল? যা আজ পৃথিবীতে চর্চার মূল কেন্দ্রে হাজির হলো! এটাও ভাবার বিষয় আমাদের বর্তমান পরিবেশের উপর, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য মূলক মানসিকতার জন্ম হলো কিভাবে? এর বীজ কোথায় বপন করা হয়েছিল?

মানব সভ্যতার প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোভাব নানা বিস্ময় এবং রহস্যে পরিপূর্ণ ছিল। ভূ-মণ্ডলের প্রাকৃতিক গঠন ও তার নানা উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি তার মধ্য থেকেই মানুষের চিন্তা ভাবনা নানা পথে প্রবাহিত। এর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে পরিবেশ সম্পর্কিত নানা দার্শনিক ভাবনার স্রোত। বৈদিক যুগে 'প্রকৃতি' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। আমাদের চোখে দেখা প্রকৃতিই সমগ্র প্রকৃতি নয়। প্রকৃতি বলতে শুধু পৃথিবীকে বোঝাত না। প্রকৃতি কেবলমাত্র একটি নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে গঠিত নয়। কোটি কোটি নক্ষত্রমণ্ডল নিয়েই প্রকৃতি। অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র ধারণায় যা মহাবিশ্ব বলে জানি তার সাথে প্রকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তুতে আবদ্ধ নয়। সমগ্রতার মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে নিপুণভাবে। পারস্পরিক মেলবন্ধনে যে মহাবিশ্ব তার সঙ্গেই এক হয়েছিল প্রকৃতি। জীবকুলে সবাই পরস্পর পরস্পরের উপর নানা ভাবে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার শীর্ষে রয়েছে মানুষ। সুতরাং প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব তার উপরেই বর্তায়। বৈদিক ভাবনায় সর্বত্রই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের শ্রদ্ধার সম্পর্কটি লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক আলোচনায় আমরা দেখি প্রাকৃতিক শক্তির উপর বিভিন্নভাবে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। ঋগবেদের প্রতি সূক্তে আমরা এক একজন দেবতার উল্লেখ পাই; বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ দেখে ঋষিরা সেই প্রাকৃতিক শক্তির ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। একটু নজর করলেই বোঝা যাবে যে সামগ্রিক সাযুজ্যমূলক পরিবেশ ভাবনার বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিরই বীজ নিহিত আছে বেদে এবং উপনিষদে বিধৃত মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের ধারণার মধ্যে। প্রকৃতি ছিলো মানুষের

শ্রদ্ধা-ভয়-বিস্ময়ের কেন্দ্রে। গাছেদেরও জীবন আছে, তারাও মানুষের মতো অনুভূতিপ্রবণ, কিন্তু তারা অচল অসহায় এই বোধ মানুষের মধ্যে এলে সে উদ্ভিদের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করতে দ্বিধাবোধ করবে এবং এক সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গী মনুষ্য সমাজে দেখা দেবে। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই প্রকৃতি যে এক সজীব সত্ত্বা, তারও যে প্রাণ আছে, তা প্রকাশ করে সাহিত্য তার শরীরের গঠন কৌশলে একটি মূল উপাদান রূপে গেঁথে নিয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিতান্তই অসহায় ছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির হাতে মানুষ ছিল নিছকই এক খেলার পুতুল। সুতরাং প্রকৃতি এক সময় মানুষকে চালিত করেছে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন প্রভাবে সে প্রভাবিত হয়েছে। আদিম অবস্থায় মানুষের অস্তিত্ব, জীবন ধারণ সবই নির্ভর করতো প্রকৃতির দানের ওপর। অসহায় শিশুর মতোই প্রকৃতির কোলে সে বেড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। সেই পর্বে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল অনেকটা স্নেহময়ী জননীর মতো; যে জননী শাসনশীলাও। প্রকৃতির রুষ্টতাকে পরাভূত করার কোনো রাস্তাই জানা ছিল না মানুষের। উপরন্ত প্রকৃতি ছিল তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রকৃতির মর্জির উপরেই তাকে নির্ভর করতে হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। তখন কোনভাবেই প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার কোনো উপায় বা টেকনোলজি মানুষের জানা ছিল না। এক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বরং প্রকৃতির ছত্রছায়ায় বেঁচে থেকেছে মানুষ এবং তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে সে। এমনকি মানুষের চিন্তা জগতের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনেও প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এই প্রকৃতি। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির আধিপত্য মানুষকে ভাবিত করেছে নানা ভাবে। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা জগতের সব কিছু জুড়েই ছিল তখন প্রকৃতি। মানুষের সমস্ত চিন্তাই তখন প্রকৃতি কেন্দ্রিক বা বলা ভালো মানুষের চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে প্রকৃতি।

বাংলা সাহিত্য প্রভূত পরিমানে সমৃদ্ধ হয়েছে সংস্কৃত এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষার প্রভাবে। ঋক-বৈদিক যুগ থেকে সাহিত্য যখন বাংলা ভাষার লিখিত রূপ পেল তখন সময় দশম-দ্বাদশ শতক। বাংলা লিখিত সাহিত্যের গোড়াপত্তন এখানেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্য অঙ্কুরিত হওয়ার আগে যে বীজ বপন করেছিল তা মূলত মৌখিক সাহিত্যে। মৌখিক সাহিত্য থেকে লিখিত রূপ পাবার স্তরেও প্রভূত ভূমিকা নিয়েছিল এই প্রকৃতি। প্রকৃতিই নির্মাণ করেছে মানব গোষ্ঠীকে, এই পল্লীবাংলাকে। যে পল্লী বাংলা গড়ে উঠেছে প্রকৃতির স্নিগ্ধতায়, স্নেহে, যত্নে, লালিত্যে।

নদী কেন্দ্রিক বাংলাদেশ আর্দ্র মাটির জন্মদাতা। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল প্রভূত নদী কেন্দ্রিক জনপদ। এই নদীই একসময় বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যে নৌযাত্রার বর্ণনা পাই তার মর্মমূলে এই নদী-প্রকৃতি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের নির্মাণে সেই সময়ের কবিগোষ্ঠীও জন্ম নিয়েছিল এই নদী কেন্দ্রিক সভ্যতার কূলে। মনসামঙ্গলের কবি

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের হাতে বেহুলার মান্দাস ভাসানোর প্রসঙ্গে যে নদী ঘাটগুলির কথা বর্ণনা করেছেন তা বর্তমান। তার হাতে ভৌগোলিক প্রকৃতি সজীব রূপে ধরা পড়েছে। তাই বাংলার ভূমি চিরদিনই কবিতার দেশ হয়েই থেকে গেছে। বাঙালির মননরীতিকে কবিগণ রূপ দিয়েছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যের আধারে। বাংলা কাব্যের যে দুইটি প্রধান ধারা—মননরীতি ও প্রকাশভঙ্গি, তা বাংলার নিসর্গ গঠনের বৈচিত্রের মধ্যে ধরা পড়ে। এমনকি বাঙালির দেবতাগণও এক একটি প্রাকৃতিক শোভায় শোভিত। তাদের উৎপত্তিও হয়েছে প্রকৃতিরই কোনো না কোনো শক্তি থেকে। সূর্য, বরুণ, পবন, অগ্নি প্রমুখ দেবতার নামকরণ হয়েছে প্রকৃতির সত্তা থেকেই। বলরামকে কৃষির দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার অস্ত্র সেখানে লাঙল। লাঙল কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমি কর্ষণের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। লাঙল ভূমিকে কর্ষণ করে, উর্বর করে, সৃষ্টির বীজকে সযত্নে বপন করে অঙ্কুরিত করে। সৃষ্টির সেই ভূমিকা রচনা করে দেবতা বলরাম। একজন সাহিত্য-শিল্পীও সেই বলরামের ভূমিকাই পালন করে থাকেন সৃষ্টি-শিল্পের অন্তরালে।

বাংলাদেশের আদিম জনজাতির একটা বড় অংশই ছিল কৃষিভিত্তিক সমাজের অন্তর্গত। তারা যে অঞ্চলেই বসবাস করুক না কেনো, তাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল কৃষিকাজের সাথে। তাই তাদের উপাসনায় কৃষির দেবতা রূপে ধরা দিয়েছিলেন শিব। কৈলাসেশ্বর শিব শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে যেনো কৃষিবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতে শুরু করলেন। বাংলা 'নাথ সাহিত্য' সে কথাই বর্ণনা করে থাকে। শিব এখানে দেবতা হলেও 'শিবায়ন কাব্য'-তে তার পেশা কৃষি। কৃষির সূত্রে মিলে যায় পরিবেশ এবং তার সূত্রেই মিশে যায় দেবতার মানুষ হয়ে ওঠার এক অনন্য আলেখ্য। বনবিবি, দক্ষিণরায়ের কাহিনি আসলে প্রকৃতিরই পাঠ। বনবিবি অরণ্যের দেবী- প্রকৃতি দেবী। এই প্রকৃতিবিধৌত দেবী কোথাও কোথাও নাম ভেদে 'বনদুর্গা' নামে পরিচিত। আর দক্ষিণরায় বন্যপ্রাণী বাঘের দেবতা। আসলে প্রাচীন-মধ্যযুগীয় সাহিত্য প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি; বরং তার কোলে আশ্রয় নিয়ে সজীব এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাই প্রাচীন-মধ্যযুগীয় সাহিত্য যেমন প্রকৃতি ঘেরা বঙ্গ-পল্লীর বুকে ডানা মেলেছে তেমনি সাহিত্য-শিল্পও প্রকৃতিকে আপন শরীরে খাপ খাইয়ে নিয়ে তাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে।

প্রাচীনকালে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র লিখিত নিদর্শন 'চর্যাপদ'তে বঙ্গীয় নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণাঢ্য চিত্র লক্ষ্য করা যায়। চর্যাপদের ৫০ সংখ্যক পদে দেখা যায় জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ প্রকৃতির নিসর্গরূপ। কার্পাস ফুলের ফুটে থাকা বা কঙ্গুচিনা ফসলের পেকে ওঠা, নদীবিধৌত বাংলার ছবি। নদী নির্ভর নৌ বাণিজ্যের কথা চর্যাপদের পদগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। চর্যাপদের প্রকৃতি-চিত্র কেবল রূপক নয়; এগুলি তৎকালীন মানুষের বাস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। চর্যাপদের বহু পদে নদী ও জলপ্রবাহের চিত্র প্রতীকী হলেও তার সামাজিক ও পরিবেশগত ভিত্তি সুস্পষ্ট। যেমন 'গঙ্গা জউণা মাঝেঁরে বহই নাই' (ডোম্বীপা, পুঁথিপৃষ্ঠা-২২,

পদ সংখ্যা-১৪)। এখানে নদী কেবল আধ্যাত্মিক যাত্রার প্রতীক নয়, বরং নদীকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থার ইঙ্গিত দ্যোতিত করে। নদী এখানে জীবিকা, যোগাযোগ ও সংস্কৃতির ধারক; নদী মানবজীবনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে উপস্থিত যা একটি স্বাভাবিক বাস্তুতান্ত্রিক সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। আবার, চর্যাপদে কৃষিকাজ ও ক্ষেতের উল্লেখও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 'কঙ্গুচিনা পাকলো রে অকাশ ফুলিআ' (শবরপা, পুঁথিপৃষ্ঠা-৬৮, পদ সংখ্যা-৫০) এখানে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মানুষ এখানে প্রকৃতির নিয়ম মেনেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত। বীজ বোনা, ফসল ফলানো সবকিছুই ঋতুচক্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতাই বাস্তুতান্ত্রিক সহাবস্থানের মূল ভিত্তি। চর্যাপদে পশু-পাখি ও অরণ্য-চিত্রও লক্ষণীয়। বন এখানে ভয় বা অজানার প্রতীক হলেও একই সঙ্গে জীবনের আবাস। বাঘ, হরিণ, পাখি ইত্যাদির উল্লেখ প্রাকৃতিক পরিবেশের জীববৈচিত্র্যের ইঙ্গিত দেয়। এই উপাদানগুলি মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের সহাবস্থানের ধারণাকে সামনে আনে। মানুষ এখানে প্রকৃতির একমাত্র কেন্দ্র নয়; বরং বৃহত্তর জীবজগতের অংশ। চর্যাপদে নিসর্গপ্রকৃতি নিছক অলংকার নয়; বরং তা সমকালীন বাস্তুতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতিফলন। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি সুস্পষ্ট পরিবেশভাবনার অস্তিত্ব ধরা পড়ে চর্যাপদে, যা আধুনিক পরিবেশ সংকটের আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আবার প্রকৃতির বিরুদ্ধতারও নিদর্শন মেলে হরিণ শিকার প্রসঙ্গে। মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রকৃতির ওপর ও প্রকৃতির সন্তানদের ওপর আঘাত হেনেছে। তবে এ ছবি সুদূর অতীতেও ছিল। আর্য়রা ভারত আগমনের সময়ে তৃণভূমি এবং বনভূমি ধ্বংস করেই অগ্রসর হয়েছিল বনান্তরে। মানুষ সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই পরিবেশ নির্ভর ছিল। তারই টুকরো টুকরো ছবি পাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে। মনসামঙ্গলের কাহিনিতে জালু-মালুর জীবন নদীকে কেন্দ্র করেই সৃজিত। মাছ ধরার সূত্রেই তারা একদিন দেবীর কৃপা লাভ করেছিল। মানুষ কিভাবে নিজের অবচেতনে ও সজ্ঞানে প্রকৃতিকে এবং পরিবেশের সুজলা-সুফলা-সুশোভিত দিকগুলির উপর একান্ত নির্ভর করে জীবন ও জীবিকা ধারণ করে নেওয়ার সূত্র খুঁজে পেয়েছে তারই প্রমাণ এই দুটি চরিত্র। মনসা সাপের দেবী হলেও তিনি উর্বরা শক্তির প্রতীক। অর্থাৎ মনসার এই ভাবনার সাথে জুড়ে যাচ্ছে অন্যতর এক পরিবেশ ভাবনা।

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবিক আবেগের এক অনন্য সমন্বয় রচনা করেছে। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীতে বৃন্দাবন কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান হয়ে থাকেনি, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিসর হয়ে উঠেছে। বৃন্দাবনের প্রকৃতি বন, নদী, বৃক্ষ, ফুল, পশু-পাখি ও ঋতুচক্র ভক্তি ও প্রেমের আবহ নির্মাণের পাশাপাশি একটি সহাবস্থানমূলক পরিবেশভাবনা সূচিত করে। বৈষ্ণব পদাবলীতে যমুনা নদী বৃন্দাবনের প্রাণরস। যমুনা কেবল কৃষ্ণ-রাধার লীলার পটভূমি নয়, বরং জীবনের প্রবাহ ও প্রেমের গতির প্রতীক হিসাবেও ধৃত হয়েছে। ঋতুচক্র বৈষ্ণব

সাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ রূপে উঠে এসেছে। যেখানে বর্ষা, বসন্ত ও শরৎ প্রতিটি ঋতু মানবিক আবেগের রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বর্ষা বিরহের, বসন্ত মিলনের ঋতু। বৃন্দাবনের পশু-পাখি, গাভী, ময়ূর, কোকিল কাব্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে। গাভীকে কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে নয়, বরং স্নেহ ও সহমর্মিতার প্রতীক হিসাবে দেখা যেতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকৃতি প্রেমের সহচর, দেহের সম্প্রসারণ এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ। নিসর্গপ্রকৃতি মানবিক আবেগের প্রতিবিম্ব হলেও তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই পরিবেশভাবনা আধুনিক পরিবেশ সংকটের প্রেক্ষিতে এক বিকল্প, সহানুভূতিশীল বাস্তুতান্ত্রিক দর্শনকেই তুলে ধরে।

মধ্যযুগের সাহিত্য হিসেবে কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ প্রকৃতি-পরিবেশ বর্ণনায় বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও অন্যান্য কবিদের চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডী কেবল ধর্মীয় শক্তির প্রতীক হয়ে থেমে থাকলেন না, বরং তিনি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক ও প্রতিকারক শক্তির রূপক হয়ে উঠলেন। এই কাব্যে অরণ্য, নদী, বন্যপ্রাণী ও গ্রামীণ ভূপ্রকৃতির বর্ণনা অত্যন্ত জীবন্ত। কালকেতু-ফুল্লরার আখ্যান অংশে অরণ্যজীবন বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। কালকেতুর ব্যাধজীবন প্রকৃতিনির্ভর এক জীবিকা ব্যবস্থার প্রতীক, যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে বসবাস করে। কবি লিখছেন 'বনে বনে ঘুরে কালকেতু ব্যাধ, মৃগ মারে ধনুক টানে অবিরাম সাধ।' এই বর্ণনায় শিকারজীবনকে নৈতিক বিচারে নয়, বরং জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনে দেখা হতে পারে। এনভায়রনমেন্টাল হিউম্যানিটিজ-এর আলোকে এটি একটি প্রাগাধুনিক subsistence ecology বা জীবিকাভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। মানুষ এখানে প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহার করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ দখল বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেনি। এই কাব্যে দেবীর কৃপা ও প্রকৃতির সমৃদ্ধির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। দেবীর পূজা ব্যাহত হওয়ায় প্রকৃতি রুষ্ট হয়েছে—খরা, দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয় নেমে এসেছে। ধনপতি সওদাগরের আখ্যান অংশে নদীপথ, বাণিজ্য ও প্রাকৃতিক বিপদের উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন 'নদী ভরে জল নাই, শুকায় তটভূমি, অন্নহীন জনপদ কাঁদে নিতান্ত ভূমি।' নদীর জলশূন্যতা সরাসরি মানবসমাজের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা প্রকৃতি ও মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে ব্যঞ্জিত করে। চণ্ডীমঙ্গলে নগর প্রতিষ্ঠার কাহিনিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কালকেতুর দ্বারা গুজরাট নগর (গুজরাটপুর) প্রতিষ্ঠা প্রকৃতির রূপান্তরের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নগরের শোভা বর্ধনের জন্য নারকেল, তাল, মহাতরু গাছ লাগানো বা অন্তঃপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশকে মনোরম রাখার জন্য সরোবর নির্মাণ করতে দেখা যায়। চাঁদ বণিকের নাখরা বন ধ্বংসের (deforestation) ছবিটি খাদ্যশৃঙ্খল (food chain) ভাঙার ইঙ্গিত করে। ভেষজ ঔষধিতে সমৃদ্ধ এই বন ছিল চাঁদ বেনের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। অরণ্যটি জোর করে ধ্বংস করা হয়েছিল। স্বার্থের জন্য অরণ্য ধ্বংসের ছবি আজও বিরল নয়। আবার ভাবা যেতে পারে চাঁদ বেনের এই অরণ্য পুনঃস্থাপন (refor-

estation) সামাজিক বনসৃজনেরই দৃষ্টান্ত। চণ্ডীমঙ্গলে পশু-পাখি ও অন্যান্য জীবের উপস্থিতি কেবল অলংকার নয়। সিংহ, বাঘ, হরিণ, পাখি সবাই বাস্তুতন্ত্রের অংশ। দেবী চণ্ডীর বাহন সিংহ নিজেই অরণ্য ও শক্তির প্রতীক। এর মাধ্যমে দেবতা, প্রাণী ও প্রকৃতির এক অখণ্ড সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বলা যায়, চণ্ডীমঙ্গল একটি ধর্মকাব্য হয়েও গভীর পরিবেশভাবনা বহন করেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাগাধুনিক বাংলার একটি নৈতিক ও বাস্তুতান্ত্রিক বিশ্বদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়, যা আধুনিক পরিবেশ সংকটের প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

লেখক সৌন্দর্য সন্ধানী। তার মন সেই আবহমানকাল থেকে প্রকৃতির দ্বারাই লালিত হয়েছে নিবিড় ভাবে। তাই লেখকের মন ও মননের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে প্রকৃতিকে দেখার সন্ধানী দৃষ্টি। প্রশ্ন হল সাহিত্য প্রকৃতির সৌন্দর্যময় কথা প্রকাশ করে আসছে চিরদিন, কিন্তু সাহিত্য কি পরিবেশ বিষয়ে ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে কোনদিন? এক কথায় এর উত্তর হ্যাঁ। সময়ের গতিশীলতায় আমরা আধুনিক থেকে আধুনিকতর হতে হতে চলেছি। সেই সাথে পরিবেশের ভারসাম্য দুহাত এবং দুই পায়ে দলিত করে চলেছি, ধ্বংস করে চলেছি। কিন্তু যদি আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে নজর দিই তবে দেখতে পাবো মধ্যযুগীয় সাহিত্য পরিবেশের ইকোসিস্টেমকে কত যত্নে লালন করেছে। অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের হাতেই ফুটে উঠতে দেখা যায় আধুনিক পরিবেশ ভাবনা। দেব-কারিগর বিশ্বকর্মাকে অন্নপূর্ণার মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন শিব। শিবের যে নির্দেশ ছিল মন্দিরের চারিপাশের সুসজ্জিতকরণের, সেক্ষেত্রে পরিবেশের ইকোসিস্টেমকে সযত্নে লালন করার কথাই প্রতিফলিত হয়। এমনকি চারপাশের ইকোসিস্টেমকে নতুন করে গড়ার পরামর্শও দেন তিনি। শিবের নির্দেশ ছিল মন্দির নির্মাণে পরিবেশের দিক থেকে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে মান্যতা দেবার। পরিবেশে তিনি পারিজাত ফুল তথা কেয়ারি ফুলের গাছ সহ আম, জাম, হরিতকি প্রভৃতি ফলের গাছ লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ইঁদুর, সাপ, ময়ূর; জলজ উদ্ভিদ, ছোটো মাছ, বড় মাছ, হাঙর; পিঁপড়ে, পাখি, বাজ; হরিণ, ছাগল, বাঘ, সিংহ সকল স্তরের প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। নজর করার বিষয় হলো, উল্লেখিত প্রাণীগুলিকে জীববিজ্ঞানের খাদ্য পিরামিড (food pyramid) অনুযায়ী সাজালে ফরেস্ট ইকোসিস্টেম, পণ্ড্ ইকোসিস্টেম, প্যারাসিটিক ইকোসিস্টেম এই তিনটি ফুড চেন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। প্রতিটি ফুড চেনের একত্রীকরণ ফুড ওয়েভ। যা আমাদের সমগ্র পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের পরিচায়ক। কবি সাজাচ্ছেন নগর অথচ সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমকে—মাথায় রেখে। পরিবেশের ভারসাম্য কোথাও এতটুকু ক্ষুন্ন হতে দেননি। তাঁর ভাবনায় নগরায়নও হবে আবার বনসৃজনও হবে। বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানের হাত ধরে জোর করে পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষুন্ন করে চলেছি। প্রায় তিন শতক আগে, ঔপনিবেশিক আধুনিকতা আসার আগেই, মধ্যযুগের আবহে এক রাজসভার কবি পরিবেশ সংক্রান্ত এমন ভাবনা ভেবেছেন দেখলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়।

মধ্যযুগীয় সময়কালেই গড়ে উঠেছিল একের পর এক ব্রতকথা। যার মধ্যে পুন্যিপুকুর, বসুধারা, যমপুকুর, ইতু, কুলকুলতি, অশোক ষষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। এইসব ব্রতের সঙ্গে জড়িত ছিল ব্রতের ফল, যা সাধারণত সমৃদ্ধির কামনা থেকে উৎপত্তি হয়েছিল। তৎকালীন বঙ্গদেশে ধন-সম্পদ বলতে সাধারণ মানুষের কাছে টাকা পয়সা বোঝাত না। তাদের কাছে ধন জমানো অর্থে ধান অর্থাৎ খাদ্য শস্য মজুত করা ছিল। এ তো প্রকৃতি নির্ভরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রতগুলি পালনের যে নিয়ম নীতি সেখানেও ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতির ছোঁয়া। যেখানে প্রতীকি পুকুর খনন, দেশজ ফুল দিয়ে পুজো করা, গাছকে পুজো করা এ সবই প্রকৃতির সম্পদ। যা মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকৃতির উপাদানের উপস্থাপনার কথাই স্মরণ করায়।

প্রাগাধুনিক সাহিত্যে কবিদের অবচেতনেই বার বার এসেছে প্রকৃতি তথা পরিবেশের কথা। তারা কেউই অধুনা বিজ্ঞানসম্মত ইকো-ক্রিটিসিজমের তত্ত্ব জানতেন না। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা চর্চায় যে পরিবেশ ভাবনা ও পরিবেশ কেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হতে হয়, প্রাচীন-মধ্যযুগের সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু কবিগণ স্বেচ্ছায় প্রকৃতিকে গভীরভাবেই আত্মস্থ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাকে রক্ষার পথ নির্মানেরও চেষ্টা করেছিলেন। কবির সাথে প্রকৃতির তৈরি হয়েছিল অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ। তাই সরাসরি হোক অথবা চরিত্র সৃজন বা কাহিনি সৃজনের সৌকুমার্যেই হোক, তাদের সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে নিসর্গপ্রকৃতির এক অন্যপাঠ।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী মুকুন্দ, চণ্ডীমঙ্গল, আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা.), সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৯১
২. দাশ নির্মল(সম্পা.), চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭
৩. মিত্র খগেন্দ্রনাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি ও চক্রবর্তী শ্যামাপদ (সম্পা.), বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭
৪. রায় ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৯
৫. সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (১ম ও ২য় খণ্ড), আনন্দ, ২০১১
৬. Chakrabarti Dipesh. The Climate of History in a Planetary Age, University of Chicago Press, 2021
৭. Garrard Greg, Ecocriticism, 2nd ed, Routledge, 2012
৮. Glotfelty Cheryll and Harold Fromm, editors, The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, University of Georgia Press, 1996

কুনাল রায়

খাঁচায় বন্দি পাখির কণ্ঠরোধ : কবি মঞ্জুশ্রী সরকার

অনেকের দাবি, কবিতা কোনোদিনই প্রয়োজনের কথা বলেনি। বলে না যে কখনোই, তেমনও নয় বোধকরি। তাঁরাও মনে মনে জানবেন। কারণ, কলম তলোয়ারের চেয়ে সত্যই ভয়ঙ্কর হলে, কবিতা বা যে-কোনো রচনাও উদ্ধতের গালে সপাটে চড় হতেই পারে। হয়েছে যে, সে সাক্ষ্য ইতিহাস দেবে। কিন্তু কথা, শব্দ, ছন্দ তা যেমনই হোক, কবিতার বাস ভাবের ঘরেই। ভাবের ঘোরে। কবির কলমচেরা পথ ধরেই, তার ভাবের ঘর পর্যন্ত পাঠকের বা শ্রোতার গতায়াত। একজন কবির কবিতা বা কবিতাগুচ্ছ মানেই, বিস্তীর্ণ সবুজের মাঝে একাকী কোনো আলপথ। যে পথ ধরেই দেখা হয় কবির সঙ্গে তার পাঠকের, তার স্বজনের। পথ চিনতেও ভুল করে না কোনো পক্ষই। মুখে-মুখে বা চিরকুটে দেয়া-নেয়া হয়ে যায় তাদের পারস্পরিক কিছু উচ্চারণ। তারপর কোনো রাগচরা বুঝি মুঠি উঁচিয়ে ছুটে যায়, অত্যাচারির দিকে। কোনো একাকিনী, তার প্রেমিকের অপেক্ষা করে তরুচ্ছায়ায় বসে। ইতিউতি কিছু পাগলের তুলিতে শহরের দেওয়াল ভরে যায়। কবি আর কবিতাও পুরস্কৃত হয়, অথচ চারপাশটা যেমন ছিল অবিকল তেমনই থেকে যায়। কবিতাও তাই। সশরীরে চাপা পড়ে থাকে। কিছু চরিত্রবদল হয় কেবল। আর কবিকল্পনা? আজকের স্বর্গরাজ্যে সে তো বাহুল্যই বটে। কবীর সুমনের একটি গান মনে পড়ছে, "তুমি গান গাইলে, বিশেষ কিছুই হল না/ যা ছিল আগের মতো রয়ে গেল" কবিতা লিখেও কি বিশেষ কিছু বদল হয়? কেউ কেউ বলবেন, 'প্রাণপণ লড়াই করেই বদল হয় না, তায় আবার কবতে লিখে!' সুতরাং বাস্তবতা কী? তলোয়ার দিয়েই হচ্ছে না, কলম তো দূরের কথা। তবুও যে-কোনো লড়াই কিংবা অসম লড়াইয়ের পর যেভাবে, একপাটি করে চটি, কয়েকটা রুটি মাটিতে আশা হয়ে গড়াগড়ি খায়, তেমনি সেই আশা থেকেই আবার নতুন লড়াইয়েরও জন্ম হয়। সেই উচ্ছিষ্ট আশা, আক্ষেপ কিংবা ধুলোমাখা রুটি থেকেই হয় আরো নতুন কবিদের জন্ম। নতুন কবিতার জন্মও।

নতুন কবি মানেই, একজন নবীন কমরেড। একই পথের পথিক। আর কমরেড যখন নবীন, তখন তার বয়স, বোঝা-পড়া, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ছাপিয়ে অগ্রাধিকার পাবেই তার প্রকাশভঙ্গিমা অথবা তার কল্পনায় আগামীর সুদিনের আকাঙ্ক্ষা। নতুন কবিদেরও তেমনই বয়সে কিংবা ছাপা বইয়ের তালিকার গরিমায় ধরা চলে না। নবীন, নূতন কবি মাত্রেই কবিতার সুপ্ত সম্ভাবনা। নতুন পাঠকও এই মহাপৃথিবীরই পথে ভবঘুরে হয়ে থাকে, ওই সম্ভাবনাদের সন্ধানে। তথাপি সেই কবি ও পাঠকের দেখা যখন তালে-গোলে মিলে যায়, অর্থাৎ কবির নির্দিষ্ট ঘটনাটিও যদি নশ্বর পাঠকের কাছে ঘটমান বর্তমান হয়, তখন পাঠক-কবি

সেতু আরো সুদৃঢ়ই হয় বটে। সম্প্রতি, কবি মঞ্জুশ্রী সরকারের 'নদীকূলে একা' কাব্যগ্রন্থটি পড়েও, মনের মধ্যে এই ধারণাই জন্ম নিল। কবিতায় অদেখা ইতিহাসের ট্রাজেডি, আমাদের মনে একপ্রকার উদাসীনতার ছায়া ফেলে। কবির দেখার সঙ্গে একরকম সময়ের বিরোধও এসে উঁকি মারে হয়তো। কিন্তু, চর্মচক্ষু-তে প্রত্যক্ষ করা জরার ছবি কবিতায় পড়লে বোধহয়, দগদগে ঘা-টা আবার জেগে ওঠে। কবি মঞ্জুশ্রী সরকারও অন্যান্য কবিদের মতোই, দৈনন্দিনের হরেক দর্শন থেকে প্রেম-বিরহের চিরসবুজ বনে পাঠককে টেনে নিয়ে গেলেও, কখন যে অতর্কিতে সেই পুরোনো আঘাতটার কাছে সকলকে দাঁড় করান, বোঝা যায় না। তখন কেবল ব্যর্থতার ব্যথাটুকু-তেই একবার হাত বুলিয়ে নেওয়া যায় বুঝি, আর করার কিছু থাকে না।

আজকাল কবিতার ক্ষেত্রে কিছুটা গতানুগতিক ঠেকলেও, প্রাণ-প্রকৃতির ডাক, কাছের মানুষের প্রতি আর্তি, একাকী সংলাপ থেকে মানুষের চিরকালীন প্রণয়পিপাসার মতো হরেক ভাবের সমাহারই কবি মঞ্জুশ্রী সরকার হাজির করেছেন। তদুপরি কবি যতটুকু উপরি কথা জোগান, তা দাঁড়িপাল্লায় মাপা যায় না। আর এই অপরিমেয় উপরিটুকুই কবিতার কবিতা হয়ে ওঠায় মূল ভূমিকা রাখে। আশিটি কবিতার এই সংকলনের একাধিক স্থানে, কবির আধ্যাত্মিকতার পরিচয় রয়েছে। প্রথম কবিতার নামই 'অমরনাথ'। শেষ চরণে কবি বলেছেন 'ভোলা'। 'ওগো মেয়ে' কবিতায় তাঁর মানসপট থেকে দেবী দুর্গার চিরাচরিত রুদ্রমূর্তির আড়ালে তাঁর মাতৃসুলভ কোমলতার ছবি আঁকতে চান। 'অন্তরাল' কবিতাটিতে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে নতুন প্রশ্নের মুখে ফেলেন। এছাড়াও কবির প্রিয়জনের প্রতি সংলাপ কিংবা তাঁর মানবিক প্রেমাকাঙ্ক্ষাও তাঁর শব্দে সর্বজনীনতা লাভ করেছে। 'আবার' কবিতায় তাঁর 'অনিমেষ'-কে ফিরে পেতে চান। অনন্ত তাঁর এই চাওয়ার প্রকাশে লেখেন, 'পেরোলোই বা পঁচিশটা বসন্ত।/ পঁচিশ একটা সংখ্যা মাত্র।' 'অনিমেষ' কোনো ব্যক্তিবিশেষ হলেও পঁচিশটা একলা বসন্ত কেবল সংখ্যা হয়েই থাকুক, কোন বিরহিণী তা চাইবেন না? প্রণয়, প্রকৃতি কিংবা কবির চিত্রিত কল্পচিত্রগুলির মাধুর্যের কথা বাদ রেখেও, দুটি বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেই নয়। প্রথমত, কবি সমগ্র বাঙালি সমাজকে এক আঘাতের সম্মুখীন করেছেন, যা তাঁর প্রতিবাদস্পৃহা-কেই প্রকট করে। দ্বিতিয়ত, এই কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তিনি রেখে গেছেন, একজন সাধারণ নারীর কথাও। সেই নারীর কথা কোনো পুরুষের বেদনা থেকে পরোক্ষপথে ঝরে পড়া কথা নয়, বরং সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ।

মহিলারা কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষিত, এই বিশ্বাস গত বছরের আগস্ট মাসেই বাঙালির নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম, কীভাবে রাতের অন্ধকারে একটি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসালয়ে, একজন মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষিতা হতে হয়েছিল। শাসক, একজন মহিলা-শাসক, তিনিও শেষে ধর্ষিতার দর রাখলেন দশ লাখ। তারপর শহরের রাজপথ চঞ্চল হল, প্রতিবাদে

ফেটে পড়ল সারা বিশ্ব। কিন্তু, বিচারের বাণী সেই নীরবে নিভৃতেই কাঁদল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পলি জমলেও, যারা সেই ঘটনা জেনেছেন এবং শহরবাসী হিসেবে লজ্জিত হয়েছেন, তাদের লুকোনো সেই আঘাত আবার জাগিয়ে দেন কবি মঞ্জুশ্রী সরকার। 'এক হয়েছি' কবিতায় লেখেন, 'এক হয়েছে দিন রাত/ সাহস করে করি বাত!' শেষ লাইনে অকপটে লেখেন, 'ছাড়তে হবে গদি আর বাংলা মায়ের কোল।' আবার 'উল্টো-পাল্টা' কবিতায় শাসকের আসনে বসে লিখেছেন, 'তোমরা বড় ঠেঁটা নারী/ বোঝোনা নারীর ব্যথা/ আমিও যে নারী একটা/ উল্টো-পাল্টা কথা!!' আরো লিখেছেন, 'তোমার মেয়ে মরেছে নারী/ আমার মেয়ে নয়!/ টাকা দিয়ে রোধ করব/ তোমার মুখের রায়।' সহজেই অনুমেয়, কবির অভিযোগের তীর কোনদিকে। যে অভিযোগ কবির মনে প্রতিশোধ হয়ে জ্বলে থাকে, যখন তিনি লেখন, 'অনেক সয়ে আজ আমি/ করাল বদনি,/ পিশাচ রক্তে স্নান করিব/ দেব উলুধ্বনি।' এমনই উচ্চারণে কবি পাঠককে নাগাড়ে আঘাত করে যান এবং আমাদের জগন্নাথ মূর্তির মতো উদাসীনতাকে হয়তো আরো লজ্জিত করেন। সমাজের সুশীল রূপটিকে সর্বোপরি একজন নারীর পরিচয়েই প্রশ্ন করেছেন কবি বারংবার। মহিলাদের চিরকাল ধরে চলে আসা 'পরবাসী' জীবনের প্রতিও সমান বিষোদ্গার করেছেন। 'কণ্ঠরোধ' কবিতায় তাই লিখেছেন, 'সুস্থ জীবন কে চায় না বলো/ খাঁচায় বন্দি পাখির কণ্ঠরোধ।' এরকম হয়তো আরো উদাহরণ খাড়া করা যায়, যেখানে কবির এক এবং একমাত্র দাবিই, 'কোকিল হয়ে কাকের বাসায়' অবস্থান নারীর জীবন নয়, বরং এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান অর্ধেক আকাশের অধিকারিণীই নারী।

এই কাব্যগ্রন্থের অন্য বৈশিষ্ট্যগত দিক এর ছন্দে। অধিকাংশ কবিতাই কবি মঞ্জুশ্রী সরকার ছন্দে বাঁধতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, পদ্যছন্দের আধিক্যই বেশি। অন্তমিলের প্রয়োগ বাদ রেখে, গদ্যকবিতাও যে নেই তা নয়। কিন্তু দলে ভারি ছন্দের কবিতাই। ছন্দের আলোচনায় রবিঠাকুর আমাদের শিখিয়েছিলেন, কথাকে তার জড়তা থেকে জীবনে উন্নীত করে ছন্দই। আর সেই ছন্দেই হয়তো কবিতার কাঠামো বাঁধতে বেশি ভালোবাসেন কবি। তাই, ছন্দরূপ ও মাত্রাভেদে তাঁর কবিতাগুলির বিশিষ্টতা সহজেই পাঠকের চোখে ধরা পড়বে। কিছু কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর (হয়তো সচেতন) মাত্রাবিচ্যুতিগুলি হয়তো পাঠককে বিব্রতই করবে। সবচেয়ে অবাক হয়েছি, এই কাব্যগ্রন্থের নামকবিতায় তাঁর ছন্দপ্রয়োগে। 'নদীকূলে একা' নাম্নী কবিতাটি সমগ্রভাবে একাকীত্ব এবং বিরহকাতরতার ভাব জাগালেও, অদ্ভুতভাবেই কবি সেখানে পাঁচালি-পয়ার গোছের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যা হয়তো বিদগ্ধজনের সমালোচনার সুযোগ রেখে যায়।

এই ত্রিধারা বিশিষ্টতাই কবি মঞ্জুশ্রী সরকারের এই কাব্যগ্রন্থটিকে কবিতাপ্রেমীদের কাছে বিশেষ করে রাখতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই 'নদীকূলে একা' আরো আরো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সৃজিতা ব্যানার্জী

শিশুর নরম হাতে কি শূন্যতা আজ অনিবার্য!

বিশ্বজগৎ আজ এক দুঃসময়ের সাক্ষী। ৪৭-এর স্বাধীন দেশ আজও রক্তলোলুপ। প্রতিবেশী বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তার জলজ্যান্ত উদাহরণ মেলে। কী বলছে রাষ্ট্র? রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিই বা কতটা তৎপর এই বিষয়ে? সত্যিই কি গণতন্ত্র বলে কিছু আছে! 'আজাদি কি অমৃতমহোৎসব' পালন সত্যিই কি বাঞ্ছনীয়! নাকি সবটাই লোক দেখানো মোড়কে ঢাকা আস্তরণ মাত্র; যার আড়ালে প্রগাঢ়তার জাল বিছিয়েছে ক্ষমতাতন্ত্র। জনজীবনেও আজ তার আঁচ পাওয়া যায়। আধুনিকতার যুগে দাঁড়িয়ে অন্ধকারাছন্ন সমাজ হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরে কোনো এক নতুন ভোরের স্নিগ্ধ আলোর দিশা—কবি জয়গোপাল মণ্ডলও তাঁর 'শিশুর নরম হাতে অমোঘ শূন্যতা' কাব্যগ্রন্থে বারংবার সেই সন্ধানই করেছেন।

বইটির প্রথম প্রকাশ সম্প্রতিক অতীত; ফেব্রুয়ারি ২০২৫। অর্থাৎ, বর্তমানের বাতাবরণই কাব্যগ্রন্থটির মূল আকরভূমি। নামকরণের ক্ষেত্রেও তাই অদ্ভুত চমক! সংবেদনশীল কবিমাত্রই নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার খেলায় মত্ত হন। কবি জয়গোপালও তার ব্যতিক্রম নন। মোট ৬১টি কবিতার সংকলনে রচিত কাব্যগ্রন্থটির নাম 'শিশুর নরম হাতে অমোঘ শূন্যতা' যা একেবারেই প্রত্যাশিত নয়। শিশুর নরম হাতে খেলনার পরিবর্তে রয়ে গেছে অনিবার্য শূন্যতা, বর্তমানের দোলাচলতায় ভবিষ্যৎ যেন অন্তঃসারশূন্যতায় নিমজ্জিত। মানুষই মানুষের জন্য অনেকাংশে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে; গ্রন্থটির শিরোনামও সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। জয়গোপালবাবুর 'অমোঘ শূন্যতা' কবিতাটিও এক্ষেত্রে যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে

অমোঘ শূন্যতা নিশ্চিত নগ্নতা / যেন দিগম্বর নাগা সন্ন্যাসী
শুনতে পাই রাধার আর্তি / পরজনমে হই যেন কৃষ্ণ
শোনাবে বংশীধারী মহাকাশ / মহাজোট মহাঘোঁট সব কিছুই হলো
বক্ষ জুড়ে এস্রাজের আওয়াজ / তবুও উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস!

ভারতবর্ষ নানা বৈচিত্র্যের দেশ। ফলে এদেশের সমাজব্যবস্থাতেও তার ছাপ স্পষ্ট। ভারতের সামাজিক কাঠামোকে সার্বিকভাবে প্রত্যক্ষ করা হলে দেখা যাবে যে, আজও বিভিন্ন রাজ্যে নারীর অবস্থান প্রায় তলানিতে। সমকাজে সমবেতনের ধারার কথা হয়তো তাঁরা জানেনেই না, কিংবা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার এগিয়ে তাতেও তাঁদের কোনো ধারণা নেই। উন্নয়নের নবজোয়ারে আজ তাঁরা 'ভাতা'-র শিকার। অথচ তাঁদের এই পরিণতি হওয়ার কথা তো ছিল না! প্রাচীন বৈদিকযুগ নারীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যাগযজ্ঞ ও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরুষদের সঙ্গে সমবেত হয়ে যোগদান করতেন। কিন্তু বৈদিক পর্বের শেষের দিক থেকেই নারীর অবস্থা

ক্রমশ শোচনীয় হতে শুরু করে। নানান বিধিনিষেধের যাঁতাকলে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন তাঁরা। 'মনুসংহিতা' এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মোঘল শাসন শেষের পর ভারত যখন ইংরেজের অধীনস্ত, সেই সময় নারীজাতি প্রায় দুরবস্থার শীর্ষ স্থানে বিরাজমান। অগণিত মৃত্যু, কালোবাজারি, চালচুরি, দুর্ভিক্ষ, খাদ্য-বস্ত্র সংকট এই শব্দগুলো যেমন দেশভাগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, ঠিক তেমনই ধর্ষণও যেন পরাধীন ভারতের ভবিতব্য হয়ে উঠেছিল। এ না হয় পরাধীন ভারতের কথা বলা হল, কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতেও তার ধারা জারি আছে। দেশে স্বরাজ এলেও ধর্ষণের ঘটনা কমেনি, বরং দিন দিন আরো বাড়ছে। আর তার বিচারও কোনোদিন মেলে না। এই বাড়বাড়ন্তের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে জয়গোপাল মণ্ডল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেছেন,

"নীরব দর্শক থাকা বড় বেদনার / গণতন্ত্রের বিজয়বার্তা চমৎকার!"

রাজনীতি বিষয়টা সর্বকালীন জটিল বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখলে জানা যায়, ৩৪ বছরের বাম-আমলের শাসন, আর ২০১১-র পরবর্তী সময় থেকে 'সবুজের অভিযান'। গেরুয়া শিবিরও বাংলা দখলের জন্য যথেষ্ট মরিয়া। তবে প্রত্যেকেরই মানদণ্ড হল ক্ষমতা। আর যার হাতে ক্ষমতা থাকে সেই-ই রাজা ফলে ক্ষমতাকে অস্ত্র করে জনগণকে নীরবে দম বন্ধ করে মেরে ফেলার খেলায় সরকারের জুড়ি মেলা ভার! দুর্নীতির তালিকায় কয়েকটি নাম নথিভুক্ত থাকায় হাজার-হাজার যোগ্য শিক্ষক আজ চাকরি-হারা। কোথায় গেল এতগুলো উত্তরপত্র! কেনই বা আদালতও আজ এতটা ব্যর্থ! উত্তর এখনো অজানা হয়তো কোনোদিন জানাও যাবে না। চাকরি চুরির ঘটনা বাংলায় নতুন নয়, কিন্তু গোরু পাচার, কয়লা-কাণ্ড কিংবা রেশন দুর্নীতির কথা ভাবলেও অবাক লাগে! রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এখনো চাকরি বিক্রির অপরাধে বন্দি। কিন্তু সত্যিই কি তিনি বন্দি নাকি সেখানেও তাঁর বিলাসিতার অভাব নেই! হয়তো সংশোধনাগারে আটকে রাখাটাও একটা ছলনা মাত্র। আসলে ওঁরা তো জানেন—

"কিছুক্ষণ পর সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই পার হয়
পাখি গাছপালা সব যে যার মতো দাঁড়িয়ে থাকে
কাকেরা কিচিরমিচির করে মাছের এঁটোকাটা পেলে
ওরা সব জানে বলেই নীরবে জামিন নেয় সকলের সাক্ষাতে,"

আসলে আমরাই তো ভোট দিয়ে ওঁদের পুষছি। ২৬-এর বিধানসভায় আবারও হয়তো বড়ো অঙ্কের আসন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন হবে। শিক্ষিত-বেকার বাড়বে। চপ, মুড়ি কিংবা চায়ের দোকানই হয়ে উঠবে 'এলিট' শিল্পমাধ্যম। এভাবেই বর্তমান বাংলা এগিয়ে যেখানে শিক্ষার মান প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, আর চাকরি পেতে হলে নিজেকে এখন বিকিয়ে আসতে হয়। এভাবেই একটা শ্রেণি ফুলে-ফেঁপে ওঠে অর্থের গরিমায় আর সাধারণ মানুষ হতদরিদ্র হয়েই তাঁদের অনুগত থেকে যায়। কারণ—

"ওদের অঙ্গুলিহেলনে ওড়ে জাতীয় পতাকা
ইট-কাঠ-পাথর সব ওদের কথায়
ওঠবোস করে
কোলা ব্যাঙ লাথি খায় তবুও ঢোকে অমরায়
অবশেষে ফুলে ওঠে ওদের পেট আর ইঁদুরের বুক ফাঁকা"

১৫২৮ থেকে ২০২৪, প্রায় ৫০০ বছরের ইতিহাসকে এক জায়গায় জড়ো করলে ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে যায়, তা হল 'রামমন্দির'। বাবরি মসজিদ থেকে রাম-লালার মন্দির নির্মাণ আর তার সঙ্গে জড়িয়ে বহু মৃত্যু, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাবরের আমলে তৈরি বাবরি মসজিদের পার্শবর্তী স্থানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির নির্মাণ নিয়ে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতেই লড়াই শুরু হয়ে যায়; কারণ, কথিত আছে ওই স্থানেই নাকি স্বয়ং রামচন্দ্র জন্মেছিলেন। স্বাধীনতার দু-বছর পর, ১৯৪৯-এ সনাতনী হিন্দু-সম্প্রদায় রামের বিগ্রহ মসজিদে প্রতিস্থাপন করতে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। পরবর্তীতে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের ওই স্থানে প্রবেশ নিয়ে মামলা লাগু হয়। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার পর থেকে ভারতের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। ৯০-এর দশকে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনসমূহ বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার দাবি সামনে আনলে মুসলিম সমাজ এই ঘটনাকে তাঁদের অস্তিত্বের সংকট হিসেবে ধরে নেয়। মসজিদ ধ্বংসের এই ইতিহাস সচেতন নাগরিকমাত্রই কম-বেশি জানেন। কিন্তু এই রামচন্দ্র কে? তাঁর অস্তিত্ব হিসেবে জানা যায়, তিনি বিষ্ণুর সপ্তম অবতার, রামায়ণের প্রধান চরিত্র, হিন্দুদের দেবতা। তিনি যদি দেবতাই হন তবে কেন তাঁর মন্দির নির্মাণে জনসাধারণের বাসভূমি দখল করা হবে! কেনই বা রামলালার মূর্তি স্থাপনে আমজনতার ঘর-বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হবে? তিনি তো দেবতার অংশ তাহলে তাঁর সঙ্গে গেরুয়াপন্থীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার সমীকরণটাই বা কীরকম! রাজনীতির রঙের সঙ্গে 'শ্রীরাম' ঠিক কতটা সাযুজ্য রাখতে পেরেছেন! তিনিই কি তবে 'অচ্ছে দিন'-এর নিয়ন্ত্রক? নাকি সমর্থক? কেউই তা জানি না। যাঁরা এই 'অচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন যাপন করেন, তাঁরা কি জানেন? হয়তো জানেন না, জানলে নিশ্চয়ই রাজনীতিকে অবলম্বন করে রামের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে বাস্তুহারা করতেন না। আর এই সমস্ত মেনে নিতে নিতে জনগণের পরিস্থিতি আজ অনেকটা এরকম :

"বুঝতে পারছি না কী করব
এখন তো নিম গাছে সীম
বাবলা গাছে ঝুলছে ডিম
কুকুরের লেজে লেখা সংহতি

বোঝা দায় কালীভক্তের মতিগতি
আমগাছে জাম
নেত্য করে শ্যাম
রাধা রাধা বলে আরতি ক্ষমতার
রাঘুপতি রাঘব রাজা রাম সমতার"

কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক 'সুতরাং' প্রকাশন। প্রচ্ছদ নির্মাণে প্রদীপ সরকার। তবে প্রচ্ছদের বিষয়ে আরো একটু বেশি যত্ন নেওয়া গেলে ভালো হত। এছাড়াও কয়েকটি বানানগত ত্রুটি রয়েছে। তবে কবি জয়গোপাল মণ্ডলের কাব্যগ্রন্থটি যেন বঞ্চিত জনজীবনের প্রতীক যা ক্ষমতার কাছে পরাস্ত জনগণকে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস যোগায়। 'সংক্রামিত কারা!', 'বাঁচিয়ে রাখা', 'চোখের পর্দা সরিয়ে দেখো', 'ভাবের ঘরে চুরি', 'নিরাশার পদাবলী' প্রতিটি শিরোনামই গোপনে অনিশ্চয়তার কথা বলে যায়। কবি তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় সেই কথাই বলেছেন। রাজনীতির ছলচাতুরিতে সমাজ আজ বিপর্যস্ত। আর তাই 'শিশুর নরম হাতে অমোঘ শূন্যতা'-র জন্ম।

বর্তমানকে সামনে রেখে আজ যদি ভবিষ্যতের দিকে ফিরে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে ভবিষ্যৎ যেন গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন। বেকারত্বে বাড়বাড়ন্ত, নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশ-ছোঁয়া দাম, অশিক্ষার সমারোহে আজকের বাংলা জর্জরিত। আশার আলো কি তবে একেবারেই নেই! হ্যাঁ, আছে আসলে অন্ধকারের পরেই তো একটা রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের জন্ম হয়। একটা শিশুও মাতৃগর্ভে অন্ধকারের মধ্যেই বেড়ে ওঠে। অর্থাৎ, একটা আলোকময় মুহূর্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য অন্ধকারও যেন কোনো কোনো সময় জরুরি হয়ে ওঠে। সেই অন্ধকার সময়ের সাক্ষী আজ সবাই যা নস্যাৎ করে আলো আসবেই। কবি জয়গোপাল মণ্ডলও সেই সুদিনের দাবিদার যার ফলাফল 'শিশুর নরম হাতে অমোঘ শূন্যতা'। কাব্যগ্রন্থটি এক দুঃসময়ের দলিল, যা সমাজের ক্ষতকে চিহ্নিত করে। সমাজবাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাপনে এক নির্ভেজাল সত্যির সন্ধান দেয়, যার অনুরণন চলতে থাকবে নিরন্তর।

অমিতাভ ব্যানার্জি

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় প্রতিফলিত শোষিত মানুষদের জীবন সংগ্রাম

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা, অভাব ও কষ্টের জীবন বর্ণনা পাই, সাথে পাই সামাজিক শ্রেণী সংগ্রামের বর্ণনা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখক লেখিকা শোষিত মানুষদের জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরতে কলম করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজী নজরুল ইসলাম, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় সাম্যবাদের ধারণা, জাতি ও ধর্মগত ভেদাভেদ থেকে মুক্তি, শোষক শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সর্বপরি মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প ও উপন্যাসে আদিবাসী মানুষদের জীবন সংগ্রাম যেমন করুনস্পর্শী ভাবে ফুটে উঠেছে তা বাংলা সাহিত্যের কোনো কথাসাহিত্যিকের লেখায় পাই না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মানুষ মানুষ' (২০০৮) এ নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক যৌন শোষনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাধর, প্রগতিশীল ভাবধারার কবি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। ১৯২৬ সালের ১৫ আগষ্ট কলকাতায় মামারবাড়ি কালীঘাটে ৪৩ নং মহিম হালদার স্ট্রিটে একান্নবর্তী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০), 'মিঠেকরা' (১৯৫১), 'অভিযান' (১৯৫৩), 'ঘুম নেই' (১৯৫৪), 'হরতাল' (১৯৬২), 'গীতিগুচ্ছ' (১৯৬৫), 'সুকান্ত কাব্য সমগ্র' (১৯৬৭)।

জীবনের স্বল্প সময়ে তিনি আমৃত্যু বঞ্চিত, নিপীড়িত, হতভাগ্য মানুষ দের জন্যই সংগ্রাম করে গেছেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর তারপরে পুঁজিপতিদের নিষ্ঠুরতা, দরিদ্র মেহনতী মানুষদের প্রতি তাদের অমানবিক আচরণ কবিকে বেদনা ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই তিনি লেখনী ধরেছিলেন।

তৎকালীন ভারতবর্ষের যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিস্থিতি, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভুখা পেটের জ্বালা, পরাধীনতার গ্লানি, পুঁজিপতিদের শোষন তাঁর কবিতায় বার বার উঠে এসেছে। সমাজ থেকেই উঠে আসেন সাহিত্যিক। ফলে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। সুকান্ত একজন সমাজ সচেতন বাস্তববাদী শিল্পী, তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

বিপ্লবের বাণী ধ্বনিত হয়েছে তাঁর 'লেলিন' কবিতায়। অন্যায়ের প্রতিবাদকারী চরিত্ররূপে লেলিনকে উপস্থাপন করেছেন কবি। ব্যাক্তি লেলিনের আদর্শ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আজও রুশিয়ার গ্রামে, নগরের মানুষ তাঁর আদর্শে অনুপ্রানিত। যেখানে পরাধীনতার গ্লানি সেখানেই লেলিন যেন এনে দেয় মুক্তির স্বাদ, ধনতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করেছে এই লেলিন।

'সিগারেট' কবিতায় কবি সিগারেটের রূপকে শোষিত মানুষের কথা বলেছেন। ধনতন্ত্রের প্রতিভূদের বিলাসের সামগ্রী সিগারেটের রূপকে শোষিত মানুষ। শোষকের টানে শোষিত মানুষ হয়ে যায় ছাই, এভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। শোষিত মানুষের বিশ্রাম নেই, পর্যাপ্ত মজুরি নেই, কাজের ফাঁকে কোনো ছুটিও নেই, ধনতন্ত্রের দাসত্ব বহন করে দিন রাত তাকে সিগারেটের মতো জ্বলতে হয়।

'চিল' কবিতায় চিল ধনতন্ত্রের প্রতিভূ রূপে চিত্রিত হয়েছে। তার কর্মফলের কারনে করুন ও বীভৎস মৃত্যু হয়েছে, ফুটপাতে পড়ে আছে তার মৃতদেহ। যে চিল একদিন অনেক উঁচু থেকে 'লুন্ঠনের অবাধ উপনিবেশ' হিসাবে শ্যেন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেছে আর তীব্র লোভ নিয়ে ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি ছিল যার অস্থি মজ্জায়, আজ সে মরেছে, ফুটপাতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে তার মৃত দেহ। আজ তাই সকল শোষিত মানুষ নিরাপদ।

দিন বদলের কবি ভাবীকালের প্রজন্মের জন্য হিংসা-বিদ্বেষহীন শোষণ মুক্ত এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সমাজের সমস্ত জঞ্জালকে সরিয়ে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

১৯৪৭ সাল পর্বে অর্থাৎ মাত্র ছ-বছরে জীবনের তিক্ত - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর ও দাঙ্গার মত সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী কবিতা ও সাহিত্য রচনা করে গেলেন - তা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রইল আর তিনি হয়ে রইলেন বাংলা সাহিত্যকাশে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলে আমরা শোষিত মানুষের জীবন সংগ্রামের অনেক চিত্র পাবো। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা, অভাব ও কষ্টের জীবন বর্ণনা পাই, সাথে পাই সামাজিক শ্রেণী সংগ্রামের বর্ণনা। সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা নীচু স্তরের মানুষদের নানা ভাবে অত্যাচার করত। কাহ্নু পদের ১০ সংখ্যক চর্যাপদে আমরা তার বর্ণনা পাই—

নগর বাহিরি রে' ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ'

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখক লেখিকা শোষিত মানুষদের জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরতে কলম করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজী নজরুল ইসলাম, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম।

কাজী নজুরুল ইসলামের রচনায় সাম্যবাদের ধারণা, জাতি ও ধর্মগত ভেদাভেদ থেকে মুক্তি, শোষক শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সর্বপরি মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের 'মানুষ' কবিতায় যুগে যুগে নিম্ন স্তরের মানুষ শোষিত

হচ্ছে, তার থেকে কবি মুক্তি চেয়েছেন —

"ও কে? চন্ডাল? চমাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হ'তে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চন্ডাল, কাল হ'তে পারে মহাযোগী-সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী-পাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও-হেলা
কাহারে বাজে!
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
চাষা ব'লে কর ঘৃণা!
দে'খো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না!
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী-যা আছে র'বে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও
ভিখারিনী, তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি
চিনি! তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।
সে মার রহিল জমা-
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা!"[২]

সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প ও উপন্যাসে আদিবাসী মানুষদের জীবন সংগ্রাম যেমন করুনস্পর্শী ভাবে ফুটে উঠেছে তা বাংলা সাহিত্যের কোনো কথাসাহিত্যিকের লেখায় পাই না। মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী হওয়ার সুবাদে তিনি খুব কাছ থেকে বাংলা, বিহার, ছত্তীশগড় ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী মানুষদের আর্থ সামাজিক অবস্থান, বঞ্চনা, নিপীড়নকে দেখেছিলেন। এই নিপীড়িত মানুষই তাঁর লেখার মূল প্রেরণা রূপে কাজ করেছে। তাই তিনি বলেছেন.. "আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলে তাদেরই হাতে লেখা।"[৩]

ভূমিহীন শ্রমিক, কৃষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতা, ভূমি অধিকার, শোষণ, দারিদ্র ও তাদের জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন তিনি সভ্য সমাজের কাছে। ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে প্রায়ই তাদের জীবিকা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ক্ষতি হয়। নিম্ন মজুরিতে

প্রতিকুল পরিস্থিতিতে তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। কেউ তাদের নিয়ে ভাবে না। আদিবাসী নারীদের উচ্চসমাজ ভোগ্য পন্য হিসাবে দেখে, সুযোগ খোঁজে। সামাজিক কোনো অধিকার সভ্য সমাজ তাদের দেয়নি। তাই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের পাশাপাশি লেখিকা তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, নিজস্ব পরিচিতিকে বাস্তব সম্মত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যাতে সমাজে তারাও মানুষ হিসাবে পরিগনিত হয়, আর যেন সভ্য সমাজের মানুষ নানা দুর্বলতার সুযোগে, কুসংস্কার ও ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত না করতে পারে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মানুষ মানুষ' (২০০৮) এ নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক যৌন শোষনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এই উপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক নিজেই বলেছেন —

"বর্তমানকালে পশ্চিম বাংলা, কাছাকাছি কয়েকটি রাজ্য, বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে বহু সংখ্যক নারী পাচার একটি তীব্র সমস্যা। এরকম একটি ঘটনার সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম এবং সেই সূত্রে এরকম আরও অনেক ঘটনার নৃশংসতা ও আমানবিকতার পরিচয় পেয়ে শিহরিত হয়েছি। মূল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব মর্মন্তুদ কাহিনিরও কিছু কিছু আভাস দিয়েছি।"

বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাধর, প্রগতিশীল ভাবধারার কবি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। ১৯২৬ সালের ১৫ আগষ্ট কলকাতায় মামারবাড়ি কালীঘাটে ৪৩ নং মহিম হালদার স্ট্রিটে একান্নবর্তী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা নিবারণ ভট্টাচার্য ও মা সুনীতি দেবী। উনার পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে যা গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত) কোটালীপাড়া থানার উনশিয়া গ্রামে। জ্যেঠতুতো রাণী দিদি মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' উপন্যাসের সুকান্ত চরিত্রের নামে আদুরে ভাইয়ের নাম রাখলেন সুকান্ত। জ্যাঠামশাইরা থাকতেন বাগবাজারে নিবেদিতা লেনে, তাঁর শৈশব কেটেছে সেখানেই। পরে বেলেঘাটার হরমোহন স্ট্রীটে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে উঠে যান। বাবা নিবারণচন্দ্র পৌরহিত্যের পাশাপাশি প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করতেন। সুকান্ত কম বয়সে মাকে হারান ক্যান্সার রোগে। মাত্র আট/নয় বছরে বিদ্যালয়ের সাময়িকীতে 'সঞ্চয়' নামে ছোটোগল্প প্রকাশ পায়, তারপর শিখা পত্রিকায় 'বিবেকানন্দের জীবনী' গদ্য, এগারো বছর বয়সে 'রাখাল ছেলে' নামে গীতিনাট্য (যেটি পরে তাঁর 'হরতাল' গ্রন্থে স্থান পায়), সপ্তম শ্রেনীতে পড়া কালীন বন্ধু অরুণাচল বসুর সাথে 'সপ্তমিকা' ও 'শতাব্দী' পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেন। বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ১৯৪৫ এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন তার পরেই ছাত্র আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সহপাঠী তথা বাল্যবন্ধু কবি অরুণাচল বসুর মাতা কবি সরলা বসুকে তিনি মা বলে ডাকতেন। কমিউনিস্ট পার্টীর একনিষ্ঠ কর্মী হওয়ার সুবাদে

তিনি বিভিন্ন মিটিং মিছিলে স্লোগান করেন। কমিউনিস্ট পার্টীর দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকার 'কিশোর সভা' বিভাগের সম্পাদনার দায়িত্বভার সামলেছেন তিনি আমৃত্যু। তিনি আগে ছিলেন কমিউনিস্ট, পরে কবি।

১৩৫১ বঙ্গাব্দের এক পত্রে সুকান্ত তাঁর মেজ বৌদিকে লিখেছেন,—'আমি কবি বলে আমি নির্জনতা প্রিয় হব, আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে। তাছাড়া কবির চেয়ে বড়ো কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার জনতা নিয়েই।'

তাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০), 'মিঠেকরা' (১৯৫১), 'অভিযান' (১৯৫৩), 'ঘুম নেই' (১৯৫৪), 'হরতাল' (১৯৬২), 'গীতিগুচ্ছ' (১৯৬৫), 'সুকান্ত কাব্য সমগ্র' (১৯৬৭)।

সুকান্তর আবির্ভাব প্রসঙ্গেঁ বলতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেন আজও সুকান্ত' প্রবন্ধে লিখেছেন — সুকান্ত যখন কবিতা লেখা শুরু করেছেন, তার আগে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছেন আর ১৯৪২-এ বিদ্রোহী কবি নজরুল চিরতরে নির্বাক হয়েছেন, এবং সৃষ্টিহীনও বটে। বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সমর সেন, দিনেশ দাস, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এক ঝাঁক কবি প্রগতি আর সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সীমাবদ্ধ শক্তির উৎসাহ পুঁজি করে কবিতার নব নির্মাণে সংবদ্ধ। তারই মাঝখানে পলাশ রাঙা এক সতেরো বছরের কবি সুকান্তর আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথে মগ্ন এবং অজস্র নয়া কবি সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও স্বতন্ত্র এক ঝংকার, এক অগ্নিশলাকার উদ্ভাস নিয়ে সুকান্তর পদযাত্রা। একদিকে রবীন্দ্র-প্রকৃতির প্রচ্ছায়া, অন্যদিকে নজরুলের শব্দ-ঝংকার-অথচ আশ্চর্য এক মৌলিক উচ্চারণ এবং ক্ষুদিরামের মতোই মহৎ কর্মে আত্মদানের নির্ভয় এক প্রতিবিম্ব-সুতরাং কালজয়ী, শতাব্দী জয়ী, যুগ যুগান্তর জয়ী কবি সুকান্ত মাত্র একুশ বছরের মধ্যেই এমন এক সঞ্জীবন অনুরাগ যার হাঁক আজও আমাদের সাহসী হতে সাহায্য করে—

'বাঁচাবো দেশ, আমার দেশ, হানবো প্রতিপক্ষ
এ জনতার অন্ধ চোখে আনব দৃঢ় লক্ষ্য।'

'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের 'ছাড়পত্র' কবিতাতে কবি মানসের চিত্র স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে। কবি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন —

"এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।

চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।"[৪]

জীবনের স্বল্প সময়ে তিনি আমৃত্যু বঞ্চিত, নিপীড়িত, হতভাগ্য মানুষ দের জন্যই সংগ্রাম করে গেছেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর তারপরে পুঁজিপতিদের নিষ্ঠুরতা, দরিদ্র মেহনতী মানুষদের প্রতি তাদের অমানবিক আচরণ কবিকে বেদনা ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই তিনি লেখনী ধরেছিলেন। মার্কীয় সমাজ ভাবনায় ভাবিত কবি তাঁর স্বপ্নকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে। কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথকেও সেই সময়ে উপেক্ষা করতে পারেননি। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কবি তাই বলেছেন —

"এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।"[৫]

তৎকালীন ভারতবর্ষের যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিস্থিতি, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভুখা পেটের জ্বালা, পরাধীনতার গ্লানি, পুঁজিপতিদের শোষন তাঁর কবিতায় বার বার উঠে এসেছে। সমাজ থেকেই উঠে আসেন সাহিত্যিক। ফলে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। সুকান্ত একজন সমাজ সচেতন বাস্তববাদী শিল্পী, তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তৎকালীন সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে সমাজে তাদের আবেগ, অনুভূতিগুলিকে গুরুত্ব দিতে, দৈনন্দিন

জীবনযাপনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করতে, শিক্ষা, জীবিকার সুযোগ করে দিতে, মানুষের অধিকারের বিষয়টি প্রাধান্য দিতে তিনি বিভিন্ন কবিতা লিখেছেন।

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় ক্ষুধার্থ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে মোরগকে এঁকেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা, বঞ্ছনা, ধনী মালিক শ্রেণীর অত্যাচার, মজুরদারদের অত্যাচারে, কালো বাজারীতে নিম্নবৃত্ত মানুষদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাঁদের সংগ্রাম গুরুত্ব পায় না, তাঁরা তো ধনী শ্রেনীর খাদক। আস্তাকুড়ে এতো দিন সে খাবার পাচ্ছিল। মন্বন্তরে সেখানেও খাবারের সন্ধানে মানুষ এল। শুরু হল মোরগের খাদ্যাভাব।

"অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেলে প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে-
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার'।
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে;
অবশ্য খাবার খেতে নয়-
খাবার হিসেবে।"[৬]

ধনতন্ত্রের চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁর মৃত্যু হলো। ক্ষুদার্থ মানুষের, নিপীড়িত মানুষের জীবনের পরিণতি এই।

'সিঁড়ি' কবিতায় সিঁড়ির রূপকে কবি দেখালেন সমাজের খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের যন্ত্রনাকে। ধনতন্ত্রের প্রতিভূরা এই সমস্ত মানুষের উপর অত্যাচার, শোষন করেই উঁচুতে ওঠেন। সভ্য মানুষের মোড়ক পরিয়ে তাদের অত্যাচারের চিহ্নকে ঢেকে রাখা হয়। চিরকাল শোষিত মানুষ শোষিত থাকবে না, একদিন, সহ্যের বাঁধ ভেঙে তাঁরা গর্জে উঠবেই।

"তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন।"[৭]

'কলম কবিতা' কলমও হয়ে উঠেছে নিষ্পেষিত মানব সমাজের প্রতিনিধি। সে ইতিহাস লেখে কিন্তু ইতিহাস তাকে মনে রাখে না, কোনো মূল্য দেয়না। কলম তার গোপন অশ্রুদিয়ে বহু সাহিত, কাব্য রূপ ফসল ফলায় তার প্রভুর খেয়ালে। তার দাসত্বের

গ্লানি মোচন করতে বিদ্রোহ তথা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন কবি —

"কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ;
উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে,
কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে।"[৮]

বিপ্লবের বাণী ধ্বনিত হয়েছে তাঁর 'লেলিন' কবিতায়। অন্যায়ের প্রতিবাদকারী চরিত্ররূপে লেলিনকে উপস্থাপন করেছেন কবি। ব্যাক্তি লেলিনের আদর্শ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আজও রুশিয়ার গ্রামে, নগরের মানুষ তাঁর আদর্শে অনুপ্রানিত। যেখানে পরাধীনতার গ্লানি সেখানেই লেলিন যেন এনে দেয় মুক্তির স্বাদ, ধনতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করেছে এই লেলিন।

"মৃত্যুর সমুদ্র শেষ পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।"[৯]

'সিগারেট' কবিতায় কবি সিগারেটের রূপকে শোষিত মানুষের কথা বলেছেন। ধনতন্ত্রের প্রতিভূদের বিলাসের সামগ্রী সিগারেটের রূপকে শোষিত মানুষ। শোষকের টানে শোষিত মানুষ হয়ে যায় ছাই, এভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। শোষিত মানুষের বিশ্রাম নেই, পর্যাপ্ত মজুরি নেই, কাজের ফাঁকে কোনো ছুটিও নেই, ধনতন্ত্রের দাসত্ব বহন করে দিন রাত তাকে সিগারেটের মতো জ্বলতে হয়।

"তাই, আর নয়;
আর আমরা বন্দী থাকব না
কৌটোয় আর প্যাকেটে
আঙুলে আর পকেটে;
সোনা-বাঁধানো 'কেসে' আমাদের নিঃশ্বাস হবে না রুদ্ধ
আমরা বেরিয়ে পড়ব,
সবাই একজোটে, একত্রে-
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিটকে পড়ব তোমাদের হাত থেকে

বিছানায় অথবা কাপড়ে;
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের মেরেছ এতকাল।”[১০]

‘চিল’ কবিতায় চিল ধনতন্ত্রের প্রতিভূ রূপে চিত্রিত হয়েছে। তার কর্মফলের কারনে করুন ও বীভৎস মৃত্যু হয়েছে, ফুটপাতে পড়ে আছে তার মৃতদেহ। যে চিল একদিন অনেক উঁচু থেকে ‘লুন্ঠনের অবাধ উপনিবেশ’ হিসাবে শ্যেন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেছে আর তীব্র লোভ নিয়ে ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি ছিল যার অস্থি মজ্জায়, আজ সে মরেছে, ফুটপাতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে তার মৃত দেহ। আজ তাই সকল শোষিত মানুষ নিরাপদ।

“আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারার,
ওরই ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো
ও পড়ে রইল ফুটপাতে,
শুক্নো, শীতল, বিকৃত দেহে।
হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা -
তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে;
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশচ্যুত এক উদ্ধত চিলকে।”[১১]

‘ঘুম নেই’ কাব্যগ্রন্থের ‘১লা মের কবিতা’ ৪৬ এ কবি শোষিত মানুষদের ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ধনতন্তের দাসত্য রূপ কুকুরের মতো বেঁচে থাকায় সুখ নেই। পেটের ক্ষুধা আর গলায় দাসত্ব শিকল নিয়ে ক্লান্তি কর বেঁচে থাকার থেকে একবার প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন শোষিত মানুষদের, আজ তো তাদেরই দিন —

“তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।”[১২]

নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষদের জন্য লড়তে গিয়ে প্রগতিশীল তরুন ‘কিশোর কবি’ টিবি রোগে আক্রান্ত হন, তারপর ম্যালেরিয়ায়। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৯ শে বৈশাখ ইংরাজি ১৯৪৭

খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে কলিকাতার ১১৯ লাউগন স্ট্রিটের রেড। এড কিওর হোমে মাত্র ২১ বছর বয়সে কবির জীবনাবসান ঘটে।

দিন বদলের কবি ভাবীকালের প্রজন্মের জন্য হিংসা-বিদ্বেষহীন শোষণ মুক্ত এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সমাজের সমস্ত জঞ্জালকে সরিয়ে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কলকাতার রাস্তায় শোনা যাচ্ছিল সাইরেনের শব্দ, বোমার ভয়ে মানুষ প্রান বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় বন্ধু অরুনাচল বসুকে চিঠিতে লিখলেন কবি — 'এই ধ্বংসলীলার পরে পৃথিবীতে আবার বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে, শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম। এই আমার আজকের সান্ত্বনা।'

নিয়তির অমোঘ বিধানে ক্ষণজন্মা কবি সেই সুদিন দেখার সৌভাগ্য লাভ করলেন না। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্বে অর্থাৎ মাত্র ছ-বছরে জীবনের তিক্ত - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর ও দাঙ্গার মত সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী কবিতা ও সাহিত্য রচনা করে গেলেন - তা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রইল আর তিনি হয়ে রইলেন বাংলা সাহিত্যকাশে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা।

তথ্যসূত্র :

১। শাস্ত্রী হরপ্রসাদ; হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, প্রকাশক স্বপন বসু, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম সংস্করন শ্রাবন ১৩২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯।

২। ইসলাম নজরুল; সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ, সম্পাদক ড. আরজুমন্দ আরাবানু, চতুর্থ মুদ্রন ২০১৮ আগামী প্রকাশনী পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪।

৩। মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯।

৪। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'মানুষ মানুষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃষ্ঠা — ভূমিকা।

৫। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

৬। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯।

৭। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯।

৮। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০।

৯। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২।
১০। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯।
১১। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪।
১২। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯।
১৩। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০।
১৪। ভট্টাচার্য সুকান্ত : সুকান্ত- সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরনী, কলকাতা -৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ - ৩১ শ্রাবন, ১৩৬৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা।

প্রদীপকুমার পাত্র

মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' : একটি সমীক্ষা

মুনীর চৌধুরী (২৫ নভেম্বর ১৯২৫—১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১) ছিলেন মেধাবী, সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীল ব্যক্তি। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে ইংরেজিতে এবং ১৯৫৪ সালে বাংলায় এম.এ. করেন এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে যোগদান করে কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৫৪ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এর পূর্বে তিনি দৌলতপুর কলেজ, জগন্নাথপুর কলেজে শিক্ষকতার কাজ করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কর্মরত হন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পাকিস্তানি হার্মাদ বাহিনীর একটি অন্যতম কাজ ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যা। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, আনোয়ার পাশা, সেলিনা পারভীন, সিরাজুল হক খান, মোহাম্মদ মোর্তজা, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য, রাশীদুল হাসান, ড. আমিনুদ্দিন, আবদুল আলীম চৌধুরী, ড. ফয়জুল মহী প্রমুখ বুদ্ধিজীবী শহিদ হন। কবি শামসুর রাহমান 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭২ খ্রি.) কাব্যের 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কবিতায় শহিদ মুনীর চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাটির নামকরণই জানিয়ে দেয় মুনীর চৌধুরীর প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা—

> "রাস্তাগুলো সারাক্ষণ উজ্জ্বল বুদ্বুদময়। শুধু আপনাকে,
> হ্যাঁ, আপনাকে মুনীর ভাই,
> ডাইনে বা বাঁয়ে, কোথাও পাচ্ছি না খুঁজে আজ।"

কোনো সাহিত্য আলোচনা করতে গেলে, দেশ-কাল-সমাজ পর্যবেক্ষণ খুবই জরুরি বিষয় হয়ে ওঠে। কেননা রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপট যেকোনো সৃজনশীল রচনার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। সেই কারণে মুনীর চৌধুরী-র 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২ খ্রি.) নাটকটি মূল আলোচনার পূর্বে সমসাময়িক দেশীয় পরিবেশ পরিস্থিতির আভাস দেওয়ার প্রয়াস করা হল।

আবুল মনসুর আহমদ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৮৪ খ্রি.) গ্রন্থের তিরিশতম অধ্যায়ে 'কাল তামামি' অংশে লিখেছেন—"১৯৪৮ হইতে ১৯৬৭ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের মুদ্দতটাকে "কাল" না বলিয়া "মহাকাল" বলাই উচিৎ।"[১] এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালীন পূর্ববাংলার

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতি সুস্থিত ছিল না। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকেই রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় একক উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে এখানকার বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্রসমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এই উদ্যোগের প্রতিবাদ করেন। স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর নয়া-উপনিবেশবাদের হাতবদল হয়েছে। পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন এক অভিন্ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'-এ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫ খ্রি.—১৯৬৯ খ্রি.) বলেছেন— "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।"[২] এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় বাঙালি সত্তার সম্মিলিত উজ্জ্বল দিকটি। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পাকিস্তানের কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্সে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে একমাত্র উর্দু ভাষাকে গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। পূর্ব বাংলার আপামর মানুষজন তাঁরা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা বাংলাকে একমাত্র অবলম্বন করতে চায়।

১৯৫১ সালের পরিসংখ্যানে জানা যায় সমসময়ে পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫৬.৪ বাংলা ভাষাভাষী। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বাংলা ভাষার উপর এত বড় আক্রমণ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ১৬ মার্চ ১৯৫১ পূর্ববঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সম্মেলনে আপামর শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীর মনের ভাবটি ড. শহীদুল্লাহ নিজ বক্তব্যে স্পষ্ট করেন—"শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের উপর বাংলা ভাষা ব্যতীত যদি অন্য কোনো ভাষা আরোপ করা হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো আমাদের উচিত"[৩]। বাংলা ভাষার দাবিতে বুদ্ধিজীবী সমাজ ও শিক্ষার্থী মহল তীব্র আন্দোলনে নামে। এই আন্দোলনের চরম রূপ দেখা যায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। পুলিশ বাহিনী আন্দোলন দমানোর জন্য আন্দোলনকারীদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণ করে। ফলস্বরূপ অনেকে হতাহত হয়। নিহতদের তালিকায় সালাহউদ্দীন, আব্দুল জব্বার, আবুল বরকত, রফিকউদ্দীনের নাম পাওয়া যায়। আহতদের সংখ্যা দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় ১৪ জন বলা হলেও সংখ্যাটি ছিল প্রায় ৩০০ জনের মতো এবং ২০০ জনের মতো শিক্ষার্থীকে বন্দি করা হয়।

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পর্বটি আইয়ুব খানের শাসনামল। তিনি ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সারাদেশে মার্শাল-ল চালু করেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর মতো প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মানসিকতা দেখান। তিনি বলেছিলেন দেশের সংহতি ঠিক রাখতে গেলে সর্বত্র এক ভাষা হওয়া জরুরি, সেই কারণেই তিনি বাংলা

ভাষাতে রোমান হরফ ব্যবহারের কথা বলেন। ভাষা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষা ও বাংলা হরফ ধ্বংসের এরূপ যড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দৈনিক ইত্তেফাক', 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা, বিভিন্ন ছাত্র সংসদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রতিবাদ জানায়। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনে রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। প্রবল প্রতিরোধে সরকার পিছু হটলেও বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। আইয়ুব খান ও তাঁর অনুগামীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে মনে করায় তাঁরা রবীন্দ্র বিদ্বেষী ছিলেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কোনোরকম উৎসব অনুষ্ঠান যেন না হয় তার জন্য জোর চেষ্টা চালায়।

মুনীর চৌধুরী বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকেই সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। কবিতা ও গল্প রচনা করলেও নাট্যকার হিসেবে তাঁর পরিচিতি বেশি। তিনি ২টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক মৌলিক নাটক ২৪টি, অনুবাদমূলক পূর্ণাঙ্গ নাটক ৪টি, অনূদিত একাঙ্ক নাটক সংখ্যা ৫টি। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'মানুষ' (১৯৪৭ খ্রি.), 'নষ্ট ছেলে' (১৯৫০ খ্রি.), 'কবর' (রচনা ১৯৫৩ খ্রি., প্রকাশ ১৯৬৬ খ্রি.), 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২ খ্রি.), 'দণ্ডকারণ্য' (১৯৬৫ খ্রি.), 'একটি মশা' (১৯৭০ খ্রি.) ইত্যাদি। 'মানুষ', 'নষ্ট ছেলে', 'কবর' এই নাটকগুলি আগে রচিত হলেও তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক হল 'রক্তাক্ত প্রান্তর'(১৯৬২ খ্রি.)। এই নাটকের উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল 'আমার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ লিলির নামে উৎসর্গ করলাম।' নাটকটির জন্য নাট্যকার ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৭ খ্রি. — ১৯৫১ খ্রি.) —এর লেখা 'মহাশ্মশান'(১৯০৪ খ্রি.) মহাকাব্য অবলম্বনে রচনা করলেও মৌলিক নাটক রূপে উপস্থাপন করেছেন। অধ্যাপক ও আলোচক শহীদ ইকবাল 'বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এই নাটকটি এবং নাট্যকার মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে মন্তব্য করেন— "... সর্বজনপ্রিয় প্রবৃত্তির রূপায়ণ, ইচ্ছাবাসনার দ্বন্দ্ব নাটকটি পূর্ণাঙ্গ জীবনকেই যেন স্পর্শ করে। এক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর অলংকারসমৃদ্ধ ভাষা, রসবোধ সম্পন্ন শ্লেষ-ব্যঙ্গ মনুষ্যচরাচরের বিবিধ বিধানের কটাক্ষ নাটকটিকে সর্বজনপ্রিয় করে তোলে। মধ্যবিত্ত জীবনের ক্রিয়াকর্মই তাঁর নাটকের বিষয় হয়েছে। দেশ-সমাজ ছাপিয়ে সব কিছু দিবালোকের সত্যতায় একরকমের অনিবার্যতা অর্জন করে। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের অংশ হিসেবেই তাঁর এ নাটকটি লেখা যেখানে মুসলিম ও ইসলামী জীবনধারার প্রকাশ একপ্রকার অনিবার্যই ছিল।"[৪] নাট্যকার মুনীর চৌধুরী-র পরিচালনায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ও ২০ এপ্রিল ঢাকায় ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২ খ্রি.) নাটকটির পটভূমি হিসেবে গ্রহণ

করেছেন ১৭৬১ সালে সংগঠিত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন বালাজী রাও পেশোয়া অন্যদিকে মুসলিম শক্তির পক্ষে নেতৃত্ব দেন আহমদ শাহ আবদালী। এই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল এক বাহিনী অন্য বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা। যুদ্ধে মুসলিম শক্তির প্রতিনিধি আহমদ শাহ আবদালী জয়লাভ করলেও উভয় পক্ষের হতাহত সংখ্যা ছিল অগণিত। নাটকের তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে আহমদ শাহ আবদালীর কথায় ব্যক্ত হয়েছে—"যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের ওপর লাশ, তার ওপর লাশ! কেউ উপুর হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে, কেউ দলা পাকিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে, আঁকড়ে ধরেছে, জাপটে ধরেছে। নানাজনের কাটা কাটা শরীরের নানা অংশ তালগোল পাকিয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে। রক্তে রক্ত মিশেছে। কার সাধ্য এই রক্ত-মাংস-অস্থি হাতড়ে শত্রু-মিত্র বেছে বেছে আলাদা করে।"[৫]

'নাট্যকারের কথা' অংশে নাট্যকার জানিয়েছেন—"জয় — পরাজয়ের এ বাহ্য ফলাফলের অপর পিঠে রয়েছে উভয় পক্ষের অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতির রক্তাক্ত স্বাক্ষর। যতো হিন্দু আর যতো মুসলমান এ যুদ্ধে প্রাণ দেয় পাক-ভারতের ইতিহাসে তেমন আর কোনোদিন হয়নি। মারাঠারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো বটে কিন্তু মুসলিম শক্তিও কম ক্ষতিগ্রস্ত হলো না। অল্পকাল মধ্যেই বিপর্যস্ত ও হতবল মুসলিম শাসকবর্গকে পদানত করে বৃটিশ রাজশক্তি ভারতে তার শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে উদ্যোগী হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত ফলাফল যেমন মানবিক দৃষ্টিতে বিষাদপূর্ণ, তার পরবর্তীকালীন পরিণামও তেমনি জাতীয় জীবনের জন্য গ্লানিকর।"[৬] আপাতদৃষ্টিতে নাটকটি দেখলে ঐতিহাসিক নাটক বলে মনে হয়। "তবে যুদ্ধের ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণ মাত্র— অনুপ্রেরণা নয়।"[৭] নাট্যকার নাটকে ইতিহাসের পটভূমি ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ইব্রাহিম কার্দি, রোহিলার নবাব নজীবদ্দৌলা, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতি চরিত্র ইতিহাসের। আতা খাঁ-র চরিত্রটি ইতিহাসের হলেও হিরণ—আতা খাঁ-র কাহিনি ইতিহাসের নয়। এই কাহিনিটি ও জোহরা বেগম বা মন্নু বেগ এবং তার সঙ্গে ইব্রাহিম কার্দি-র প্রণয় কাহিনি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য থেকে নেওয়া। নাটকটিতে ঐতিহাসিক চরিত্র এবং অনৈতিহাসিক চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

নাটকের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলে বোঝা যায় এখানে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থাকলেও কাহিনির মধ্যে চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রধান হিসাবে উঠে এসেছে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ আহমদ শাহ আবদালী নায়ক হলেও নাটকে ইব্রাহিম কার্দি-র প্রধান ভূমিকা রয়েছে। নাটকে ইব্রাহিম কার্দি ও জোহরা বেগমের জাতিগত দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের রূপ নিয়েছে। নাটকে প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যের ইব্রাহিম কার্দি-র বক্তব্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে—"সাধারণ সৈনিকের কাজ করেছি ফরাসিদের সৈন্যবাহিনীতে। আধুনিক রণবিদ্যা তারাই আমাকে

শিখিয়েছে। যৌবনে চাকরির সন্ধানে সকল জাতের শিবিরেই হানা দিয়েছি। উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে কেউ নিযুক্ত করতে চায়নি। সেদিন সসম্মানে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে যোগদান করার জন্য যিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান, তিনি হলেন মারাঠাধিপতি পেশবা। তারপর এই পানিপথের প্রান্তরে শুরু হয়েছে হিন্দুস্থানের মুসলিম শক্তির সঙ্গে মারাঠার সংঘর্ষ। মুসলিম শক্তির জয় হোক আমিও মনেপ্রাণে কামনা করি। কিন্তু যারা আমার আশ্রয়দাতা, পালনকর্তা, আমার রক্তের শেষ বিন্দু ঢেলে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই করে যাবো। জোহরা বেগম তা মানতে চায়নি তা মানতে চায়নি।"[৮] অন্যদিকে জোহরা বেগমের কথায় সেই দ্বন্দ্বের ছবি স্পষ্ট—"আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। এই মারাঠা শিবিরে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারবো না। আমি মেহেদি বেগের কন্যা। মারাঠা দস্যুরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কী করে? তোমার হাতে হাত রাখবো কী করে? আমাকে ক্ষমা করো।"[৯] ইব্রাহিম কার্দি-র কাছে উপকারের উপকার এবং তার পত্নী জোহরা বেগম-এর কাছে পিতৃহত্যার প্রতিশোধই বড়ো হয়ে উঠেছে। উভয়েই ব্যক্তিগত মতাদর্শ, চিন্তা-চেতনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ব্যক্তি জীবনকে সংকটাপন্ন করেছে। নাটকে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কথা বলে পানিপথের প্রান্তরকে রক্তাক্ত প্রান্তরে রূপান্তরিত করেছে। ইতিহাসও রক্তাক্ততার কথা আছে। কিন্তু নাটকে পানিপথের প্রান্তরের রক্তাক্ততার পাশাপাশি ইব্রাহিম কার্দি, জোহরা বেগমের মনে বা অন্তরের রক্তাক্ততার বিবরণ পাই। মনে হয়, রক্তাক্ত প্রান্তর নয় উক্ত দুই চরিত্রের রক্তাক্ত অন্তর। তবে জোহরা বেগমের অন্তরেই বেশি রক্তাক্ত হয়েছে।

ইব্রাহিম কার্দি ও জোহরা বেগমের মতো নবাব নজীবদ্দৌলা এবং আতা খাঁ-র হৃদয় রক্তাক্ত হয়েছে। নবাব নজীবদ্দৌলা একজন বীর যোদ্ধা। মারাঠাদের সমূলে উৎখাত করে মুসলিম শাসন কায়েম করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। তার স্ত্রী জরিনা বেগমের পতি সান্নিধ্য লাভের কামনা তীব্র ছিল। জরিনার নারী সুলভ সন্দেহ প্রবণতার বিষময় তীব্রতা নবাব নজীবদ্দৌলা-র অন্তরকে রক্তাক্ত করে তোলে। স্ত্রী-র এরূপ ব্যবহার জোহরা বেগমের মতো সৌন্দর্যময়ী, প্রবল আবেগ সর্বস্ব এবং আদর্শবাদী নারীর প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে তোলে। আতা খাঁ ও হিরণবালা একে অপরকে খুবই ভালোবাসে কিন্তু পানিপথের রক্তাক্ত প্রান্তর হিরনবালাকে শেষ করে দেয় এবং আতা খাঁ-র অন্তর রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। নাটকের তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে আতা খাঁ-র কথায় তার উল্লেখ রয়েছে—"মরে গেছে। আমি যখন তাঁকে খুঁজে পেলাম তখন সে মরে পড়ে আছে। লাশটা কাঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে এসেছি।"[১০]

আহমদ শাহ আবদালী ঐতিহাসিক চরিত্র তিনি একজন রণনিপুণ, পরাক্রমী ব্যক্তি। নাটকে তার যুদ্ধবিদ্যার মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে। নাট্যকার এই চরিত্রটিকে উচ্চ মানবিক

গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিবেশন করেছেন। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী দার্শনিক চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। যুদ্ধ মানেই ধ্বংসস্তূপ। যে যুদ্ধ অগণিত মানুষের জীবন দীপ নিভিয়ে দেয় সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে দায়িত্ব পালনের জন্য। সে অন্তরে উপলব্ধি করে যুদ্ধ কোনো সমাধানের রাস্তা নয়, পৃথিবী শান্তি ও মুক্তি খোঁজে।

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২ খ্রি.) নাটকে দিলীপ, বশির খাঁ, রহিম শেখ এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে ড্রামাটিক রিলিফ এনেছেন। দিলীপ দুর্বৃত্ত প্রকৃতির। তবে তার মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি রয়েছে। সে আতা খাঁ ওরফে অমরেন্দ্রনাথের সঠিক পরিচয় জানে। তবে উক্ত চরিত্রগুলির মধ্যে রঙ্গ-তামাশা বিশেষভাবে উঠে এসেছে।

কোনো সৃষ্টিশীল, প্রগতিশীল, প্রাজ্ঞ, নৈতিক মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তি যুদ্ধ কামনা করেন না। বিশ শতকের সত্তরের দশকের কবি নির্মলেন্দু গুণ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' (১৯৭০ খ্রি.) কাব্যের 'যুদ্ধ' কবিতায় মানবতাবিরোধী শুভ চৈতন্য জাগরণের প্রতিরোধক যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা
যুদ্ধ মানেই
আমার প্রতি তোমার অবহেলা।"

নৈতিক মানসিকতার পরাকাষ্ঠা, আদর্শবাদী নাট্যকার মুনীর চৌধুরী জানেন যুদ্ধ মানে ধ্বংসস্তূপ। পুরো নাটক জুড়ে তিনি যুদ্ধবিরোধী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার নামে যুদ্ধ আসলে ব্যর্থ পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয় সকল ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই। এই নাটকের তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সুজার উক্তির মধ্যে নাট্যকার যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রকাশ করেছেন—"আল্লাহযা করেন সবই মঙ্গলের জন্যই করেন। বাদশার যিনি বাদশা খোদ তিনি মুক্তির ফরমান জারি করেছেন। দুনিয়ার এক সামান্য বাদশার ফরমানের চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। যিনি প্রকৃত বীর ও মহান তিনি দুয়ের মধ্যে মেকিটা ঠেলে ফেলে দিয়ে সাচ্চাটা কুড়িয়ে নিয়েছেন। ছোট মুক্তিটাকে অবহেলা করে বড় মুক্তিটাকে আলিঙ্গন করেছেন। খোদা তাঁকে শান্তিতে রাখুন।"[১১]

এই 'ছোট মুক্তি' ও 'বড়ো মুক্তি'র রহস্য উন্মোচন করলেই বোঝা যাবে নাট্যকার যুদ্ধবিরোধী মানসিকতায় বিশ্বাসী। এছাড়া নাটকের নানা চরিত্রের অন্তর রক্তাক্ত হওয়াতেও তার যুদ্ধবিরোধী চিন্তা-চেতনার ছাপ রয়েছে।

নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রূপ ও রস বিচার করলে এটি ট্র্যাজেডি নাটকের দৃষ্টান্তে পরিগণিত হয়। অ্যারিস্টটল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে রচিত তাঁর 'দি পোয়েটিকস' গ্রন্থের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে ট্র্যাজেডির সম্পর্কে অভিমত করেছেন এরূপ : " Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete

and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play : in the form of action, not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions."[১২]

ট্র্যাজেডি নাটকের ঘটনা হবে গুরুগাম্ভীর, আকর্ষণীয়। কাহিনি বর্ণনামূলক নয়। ভয় ও করুণার উদ্বেগ হয়। কর্মবৃত্তির বা 'Action' অনুসরণ করে। নাটকটি করুণ রসাত্মক, চরিত্রের অন্তর ক্ষতবিক্ষত হবে।

নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি তিন অংকে আটটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। প্রথম অংকের তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অংকে তিনটি দৃশ্য এবং তৃতীয় অংকে দুটি দৃশ্য রয়েছে। এই আটটি দৃশ্যের মধ্যে প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্য এবং তৃতীয় অংকের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য অর্থাৎ চারটি দৃশ্যে ট্রাজেডির তীব্রতা বেশি। নাটকে ইব্রাহিম কার্দি-র একদিকে উপকারীর প্রতি দায়িত্ববোধ অন্যদিকে স্ত্রী জোহরা বেগমের প্রতি তীব্র টান—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব চরিত্রটিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। জোহরা বেগমের মধ্যে রয়েছে পিতৃহন্তা মারাঠাদের বিনাশের ইচ্ছা অন্যদিকে স্বামী ইব্রাহিম কার্দিকে কাছে পাওয়ার লোভ তাকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করায়। যুদ্ধে রক্তাক্ত অবস্থায় ইব্রাহিম কার্দি বন্দি হয়। জোহরা বেগম ওরফে মন্নু বেগ, আহমদ শাহ আবদালীর কাছে তার মুক্তি কামনা করে। আহমদ শাহ আবদালী তাকে মুক্তি দেন। এরপর কারাগারে এসে দেখে ইব্রাহিম কার্দি-র মৃত্যু হয়েছে তখন জোহরা বেগমের কথায় ট্র্যাজেডির চরম রূপ পাওয়া যায়— "তুমি কেন সাড়া দিলে না? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি এত কষ্টের আগুনে পুড়ে, মনের বিষে জরজর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোতে সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্যে ছুটে এলাম। আর তুমি কি- না ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুমের কোন অতল তলে ডুবে রইলে যে আমি এত চিৎকার করে ডাকলাম তবু তুমি একবারও শুনতে পেলে না। আহা! ঘুমাও। আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি, অনেকদিন তুমি ঘুমাওনি। চোখের দু পাতা মুদে মনের আগুনের লকলকে শিখাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারোনি। কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমাও! আরো ঘুমাও! প্রাণভরে ঘুমাও!"[১৩] জোহরা বেগমের এই অন্তরের কথা কেবল তাকে নয় সকল পাঠক ও দর্শককে করুণ রসে নিমজ্জিত করে। একইসঙ্গে আতা খাঁ ও হিরনবালার কাহিনিতে হিরনমালার মৃত্যু এক ট্র্যাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। নবাব নজীদ্দৌলার মানসিক যন্ত্রণাও ট্রাজেডির অংশ। সর্বোপরি মুসলিম পক্ষ ও মারাটা পক্ষের লড়াইয়ে অগণিত মানুষের মৃত্যু হয়, পানিপথের প্রান্তর রক্তাক্ত হয়ে ওঠে অনেকেই অনেকের প্রিয়জনদের হারিয়ে ফেলে এই করুণ-ভয়াবহ পরিস্থিতিই হল ট্র্যাজেডির চাবিকাঠি।

কোনো সাহিত্যের পর্যালোচনা করতে গেলে কেবল তার বিষয়গত ও চরিত্রগত

দিকগুলি আলোচনা করলেই হয় না আঙ্গিকগত দিকটিও আলোচনার দাবি রাখে। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী-র 'রক্তাক্ত প্রান্তর'(১৯৬২ খ্রি.) নাটকটি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নাটকটি ট্রাজেডিধর্মী। নাটকটিতে স্থানগত ঐক্য, কালগত ঐক্য এবং ঘটনাগত ঐক্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। দিলীপ, বশির খাঁ, রহিম শেখ প্রভৃতি চরিত্রের অবতরণার মধ্য দিয়ে নাট্যকার কমিক রিলিফ পরিবেশন করেছেন। প্লটের সারল্য ও প্রতিসাম্য ঘটেছে। নিয়তিবাদের প্রভাব রয়েছে। নিয়তিবাদের মূল বিষয় হল জগতে যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় মানুষের তাতে কোনো হাত নেই। এই নাটকে সেই ভাবনাটিকেই নাট্যকার আভাসে ইঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। নাটকের শেষাংশে ইব্রাহিম কার্দি-র মৃত্যু অনেকখানি রহস্যাবৃত। রহিম শেখ হত্যা করেছে, না অত্যধিক রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু ঘটেছে এই বিষয়টি নাটকে স্পষ্ট হয়নি। এর সমাধাননির্বাহের কাজটি নাট্যকার পাঠক ও দর্শকদের দিয়েছেন।

বিষয় ও চরিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি এই নাটকে নাট্যকারের শিল্পীসত্তা প্রকাশ ঘটেছে। সংলাপের উপস্থাপন, ভাষার সুন্দর প্রয়োগ, স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাক্য, কাব্যিক ব্যঞ্জনা, সরস বাকবিন্যাস, তীর্যক অভিব্যক্তি, চরিত্র ও বিষয় অনুযায়ী ভাষা, শব্দের ব্যবহার এই নাটকটিকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। একইসঙ্গে 'থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে', 'আল্লাহ যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যই করেন' প্রভৃতি লোককথার প্রয়োগ করেছেন। 'কপালে যদি তাই লেখা থাকে খণ্ডাবে কে?' এই বাক্য বিন্যাসটি চিরায়ত প্রবাদ-প্রবচন 'কপালের লেখা কে খণ্ডাতে পারে?' —কে মনে করিয়ে দেয়। প্রত্যেক চরিত্রের ভাষা তাদের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছে। নাটকের ভাষা এতখানি প্রাঞ্জল যে পাঠক ও দর্শক সহজেই কাহিনির রস উপভোগ করতে পারবেন।

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে নাটকের পটভূমি এবং কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের কাহিনি গ্রহণ করে তাঁর প্রথম প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' রচনা করেন। নাটকটি ইতিহাসের প্রেক্ষাপট রচিত হলেও এটি ঐতিহাসিক নাটক নয়, নরনারীর রক্তাক্ত অন্তরের প্রতিচ্ছবি। কর্তব্য, দায়িত্ব মানবজীবনকে কতখানি প্রভাবিত করে এই নাটকটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। মানবমানবীর প্রণয়ের চেয়ে কর্তব্য ও দায়িত্ব আগে তা পূরণের জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করার প্রেরণা এই নাটকে রয়েছে। তবে নরনারীর প্রেমের উজ্জ্বল দিকটি নাটকে পরিবেশিত হয়েছে। নিয়তিবাদের সুর রয়েছে। নাটকটি ট্র্যাজিকধর্মী। বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ, স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাক্য বিন্যাস, কাব্যিক ব্যঞ্জনা নাটকটিকে মনোগ্রাহী করেছে। সর্বোপরি যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই এই ভাবনাটি নাট্যকার নাটকে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ৪৪৭।
২. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৪৯।
৩. প্রাগুক্ত সূত্র — ২, পৃ. ৭৮।
৪. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কথাপ্রকাশ, বাংলাবাজার ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ২৮৫ — ২৮৬।
৫. মুনীর চৌধুরী, রক্তাক্ত প্রান্তর, পরিবেশক বাংলাদেশ বইঘর, বাংলাবাজার ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ : জুলাই ২০০৮, পৃ. ৮৯।
৬. প্রাগুক্ত সূত্র — ৫, পৃ. ২২।
৭. প্রাগুক্ত সূত্র — ৫, পৃ. ২২।
৮. প্রাগুক্ত সূত্র — ৫, পৃ. ৪২।
৯. প্রাগুক্ত সূত্র — ৫, পৃ. ৪৯।
১০. প্রাগুক্ত সূত্র — ৫, ৯৬।
১১. প্রাগুক্ত সূত্র — ৫, পৃ. ১০৩।
১২. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১৭৭।
১৩. প্রাগুক্ত সূত্র — ৫, পৃ. ১০৩।

বিজয় হাঁসদা

বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীত : বিষ্ণুপুর থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যাত্রা

এক

মানুষের সমস্ত জীবন সুরে জড়ানো। হাসিতে সুর থাকে, আবার গভীর কান্নাতেও সুর থাকে। এই সুরের জন্ম কোথায় হয়েছিল তার কোন ইয়াত্তা নেই। হয়তোবা এই সুরের জন্ম হয়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে কোন এক পাহাড়ের গুহার অন্ধকারে পাথরে পাথর ঘসে ঘসে আগুন প্রজ্জ্বলিত হতে হতে, প্রবাহিত ঝর্ণার শব্দে, পাখির কুহুকুজনে, কুয়াশার জাল ছিন্ন করে সূর্য জেগে ওঠার আনন্দে ঝিঁঝি পোকার ডাকে। সুর বয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তর। সুর কণ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রকাশিত হল যুগল নামে, সুর ও সঙ্গীত। এই সুর ও সঙ্গীতের ছোট একটি ঢেউ এসে লাগল মল্লভূম বিষ্ণুপুরে। ঢেউ এসে থেমে গেল না, একেবারে স্বতন্ত্র একটি ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করল।

বিষ্ণুপুরের সুর ও সঙ্গীতের শেকড় প্রোথিত আছে কয়েক'শ বছর গভীরে। আদি মল্ল সিংহাসন আরোহণ (৬৯৪ খ্রীঃ/ ১ মল্লাব্দ) করার মধ্য দিয়ে মল্ল বংশের সূচনা করলেন। তখন বাঁকুড়ায় মল্ল রাজাদের রাজত্ব থাকার কারণে নাম হয়ে উঠল মল্লভূমি। আর মল্লদের রাজধানী হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুর। তারপর থেকে কয়েক পুরুষ মল্ল রাজারা শাসন করে গেছেন। মল্ল রাজাদের মধ্যে ৩৭ তম রাজা পৃথীমল্ল প্রবল সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতের চর্চাও শুরু হয় তার রাজত্বকালে কিন্তু তার মৃত্যুর পর সঙ্গীত চর্চায় ছেদ পড়ে যায়। পরে ৪২ তম রাজা শিবমল্ল সঙ্গীতকে আবারও পুনর্জীবিত করে তোলেন। সঙ্গীতের এই ধারাকে অব্যাহতি রেখেছেন ৪৯ তম অধিপতি বীরহাম্বির। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষিত হবার পর সঙ্গীতের প্রতি তীব্র আবেগ সৃষ্টি হয়। কথিত আছে বৃন্দাবন ধাম থেকে শ্রীজীব গোস্বামী গৌড় দেশে **'মনিমঞ্জুষা' নামক বাক্সে "হরিভক্তি বিলাস", "হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধু', "উজ্জ্বল নীলমণি", "ললিত মাধব", "বিদগ্ধ মাধব", "দানকেলী কৌমুদী"** এবং সদ্য সমাপ্ত **'চৈতন্যচরিতামৃত"** এর পাণ্ডুলিপি সহ ১২১ খানি অমূল্য গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন। গুরু দায়িত্বে ছিলেন শ্রীনীবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ। কয়েকশো ক্রোশপথ অতিক্রম করার পর তারা মল্লভূমে উপস্থিত হয় :

এথা তো আচার্য ঠাকুর বনেতে ভ্রমিয়া
একদিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিঞা।

তবে রাস্তার মধ্যে গোপালপুর নামক গ্রামে দস্যুরা বৈষ্ণব গ্রন্থাদি লুঠ করেন। এমতবস্থায় উন্মাদের মতন তিন আচার্য বীরহাম্বিরের সভায় উপস্থিত হন। মল্ল রাজের প্রচেষ্টায় সমগ্র বাক্সটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন

বীরহাম্বির। অপর দিকে ওই সময় ভারতবর্ষে মোঘল কাল। আকবর- জাহাঙ্গীর- শাহজাহান তিনজনই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আমরা জানি মান সিংহের আমলে ধ্রুপদী গানের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও মোগল আমলেই ধ্রুপদী সঙ্গীতের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধনা হয়। কেন-না ওই সময় ধ্রুপদী সঙ্গীত ইসলামী গায়িকী ঢঙ বা এক বিশেষ ধরনের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে রাগ রাগিনীর বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ ধ্রুপদী সঙ্গীত চারটি নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উন্মোচিত হল। ধ্রুপদের চারটি বাণী হল :—

(১) গৌড়হার বা গৌড়ী

(২) খান্ডার

(৩) ডাগুর বা ডাগর

(৪) নৌহার।

"তানসেন ছিলেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। সেজন্য তাঁর বাণীর নাম ছিল গৌড়ী অথবা, গৌড়হার বাণী। প্রসিদ্ধ বীণাবাদক সমোখন সিংহ তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করায় তাঁর নতুন নাম হয় নবাৎ খাঁ। নবাৎ খাঁ-র বাসস্থান ছিল খান্ডার। তাই তাঁর বাণীর নাম হয় খান্ডার বাণী। ব্রিজচন্দের বাসস্থানের নাম অনুযায়ী তার বাণীর নাম হয় ডাগুর বাণী। রাজপুত শ্রীচন্দ নৌহারের অধিবাসী ছিলেন, তাই তাঁর বাণীর নাম নোহার বাণী"।

"এই চার বাণীর মধ্যে গৌড়ী বাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রসাদগুণ। এই বাণী শান্তরসের উদ্দীপক। এর গতি ধীর। অন্যদিকে খান্ডার বাণী তীব্র রস উদ্দীপক। এর গতি খুব বিলম্বিত নয়। বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য প্রকাশই এর বিশেষত্ব। ডাগর বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সারল্য ও লালিত্য। এর গতি সহজ ও সরল। নোহার রীতি আশ্চর্য রসোদ্দীপক এবং এর গতি খানিকটা দ্রুত। এক সুদূর থেকে দু-তিনটি সুর অতিক্রম করে পরবর্তী সুরে যাওয়া এর বৈশিষ্ট্য"। সঙ্গীতের এই নতুন উদ্ভাবিত রীতি ভারতের সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে উন্মাদন সৃষ্টি করেছিল। তখন ওই সময় ঔরঙ্গজেব রাজত্ব করেছেন। তিনি সঙ্গীত চর্চা, শিক্ষা, উপাসনা উপর প্রতিবন্ধক আরোপ করেছিলেন। এটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তর বিতর্ক আলোচনা ও সমালোচনা চলে আসছে। প্রসিদ্ধ গায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর **'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস প্রথম খন্ড'** গ্রন্থে ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে বলেছেন-"ইনি একজন বিদ্বানও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার সময়ে সুজন খাঁ, জীবন দাস, প্রভৃতি গায়ক ছিলেন। অনেকের ধারণ ইহাঁর সময়ে বিদ্যার চর্চা ছিল না। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ ইনি বহু পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা "অলমগীর ফতও আ" নামক গ্রন্থ বাহির করেন যাহাকে "বিধান" বলে, "ফতও আ অর্থে বিধান"। আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে শিক্ষা, সঙ্গীত চর্চা, ধর্ম উপাসনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে না গেলেও যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়েছিল।

মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬) সময়ে দিল্লীর ধ্বংস মুখে পতিত

হয়। তখন দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়কগুণীরা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। তানসেন-বংশধরেরা এলেন পূর্বদিকে, তাঁদের নাম হল "পুরবীয়া"। তানসেনের শিষ্য-বংশীরেরা গেলেন রাজ-পুতনার দিকে, নাম হল "পছাওয়ালা"। তানসেন-বংশধরদের কাশীর রাজা, অযোধ্যার নবাব, বেতিয়ার রাজা, রেওয়ার রাজা ও অন্যান্য অনেকে দরবারে আশ্রর দিলেন। অন্য দিকে কলকাতা, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর, হুগলি, শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় ওস্তাদদের আসা শুরু হয়। এই সময়েই বিষ্ণুপুরে আসেন বাহাদুর খাঁ নামে সঙ্গীতজ্ঞ এবং পীরবক্স নামে একজন পাখোয়াজী। তখন বিষ্ণুপুরের ৫৪ তম অধিপতি দ্বিতীয় রঘুনাথ রায়। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের কারণে বাহাদুর খাঁ কে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে এবং পীরবক্স কে নিজের সভা গায়ক রূপে অভিষিক্ত করেন। এবং তিনি ঘোষণা করেন "সুমধুর কণ্ঠবিশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে বাহাদুর খাঁর কাছে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করতে পারবেন। এমনকি দরিদ্র ছাত্রদের তিনি ভরণপোষণের ব্যবস্থা পর্যন্ত করবেন। তাই বহু ছাত্র তখন বাহাদুর খাঁর কাছে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করতে এসেছিল। আর রাজার নির্দেশে বাহাদুর খাঁ বহু ছাত্রকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন"। এই সময়কাল বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে সঙ্গীতের স্বর্ণযুগ। বাহাদুর খাঁ অনুরোধে রঘুনাথ রায় একটি সঙ্গীতের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করা বাহাদুর খাঁ কে। খাঁ সেহেবের প্রধান শিষ্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, নিতাই নাজীর, বৃন্দাবন নাজীর। ওস্তাদের মৃত্যুর পর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তারপর থেকে বিষ্ণুপুর রাজদরবারেকে কেন্দ্র করে গুরু-শিষ্য পিতা-পুত্র বংশ পরম্পরায় সংগীত সাধনায় মগ্ন সঙ্গীতশিল্পীরা। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উৎকর্ষতা চরম সীমা স্পর্শ করে। সঙ্গীতের এই অভূতপূর্ণ উৎকর্ষতার জন্য বিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় দিল্লি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

সঙ্গীতের এই বৈচিত্রময়তার জন্য বিষ্ণুপুরে গাওয়া সঙ্গীতকে 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' সঙ্গীত নামে পরিচিত লাভ করল। "এখন ঘরানা শব্দের অভিধানগত অর্থ সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সঙ্গীতবৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের বিশিষ্ট ধারা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রবহমান এবং এই পদ্ধতি থেকে জন্ম নেয় নিজস্ব ঘরানা বা গানের প্রকাশবৈশিষ্ট্য বা স্টাইল। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সঙ্গীতের অনুশীলন ভারতীয় সঙ্গীত-ইতিহাসের মধ্য ও উত্তর যুগকে সমৃদ্ধিশালী করেছে"। সঙ্গীতধারার এক উজ্জ্বল ইতিহাস বাংলার বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে একসময় গড়ে উঠেছিল। ঘরানা সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়- "বিষ্ণুপুরের মতো স্বাধীন রাজ্যের রাজদরবারে নানা গায়কের উপস্থিতি ঘটতেই পারে এবং সেদিক থেকে এ কথা বলার অবকাশ আছে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে একাধিক ঘরানা এসে মিশেছিল। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতকে বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার গান, গাইবার ভঙ্গীকে বলি

বিষ্ণুপুরী চাল। উত্তর ভারতের কোনো বিশেষ ঘরানা যদি বিষ্ণুপুরের উৎস হতো তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরানা না বলে সেনী ঘরানা বা অন্য কোনো ঘরানার নামেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের নামকরণ হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ, বিষ্ণুপুর-সঙ্গীত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা মনে করি, একাধিক ঘরানার সমন্বয়ই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে একটি নতুন রূপ দিতে সাহায্য করেছিল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সুনির্দিষ্ট ধারা নিতে পেরেছিল রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের আমল থেকে।......রামশঙ্করের সঙ্গীত প্রতিভার যে পরিচয় পাই তাতে এ ধারণা দৃঢ় হয়ে ওঠে রামশঙ্করের কণ্ঠেই বিষ্ণুপুরী চালের উদ্ভব এবং বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে ঘরানাগত বিশেষত্ব সূচিত হয়েছিল”। বিষ্ণুপুর ঘরানার আদি সঙ্গীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। চৈতন্য সিংহের সভা গায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবিশ্যি হলেও সত্যি যে পরিবারের কেউ গায়ক ছিলেন না, তা সত্ত্বেও বিরল প্রতিভার দাপটে গান গেয়ে মুগ্ধ করেছিলেন মল্লভূমবাসীকে। তাঁর রচিত দুটি গান উল্লেখ করা যেতে পারে :

১

কৃষ্ণ করুণাময় রাম হৃষীকেশ/বৃন্দা বিপিন পূর্ণচন্দ্র মথুরেশ।
মাধব মুকুন্দ মধু মথন যজ্ঞেশ/রাধিকা-রমণ রসরাজ নটবেশ।
নন্দ-সুত নীল-নলিনাভ ভুবনেশ/কেশী-মুর কংসহা যাদব মহেশ।
তব চরণকমল মতিবিহীন মূঢ়েশ/রামশঙ্কর সুদীনে কুরু কৃপালেশ।।

(সরফর্দা-ঝাঁপতাল, ধ্রুপদ)

২

অশরণ-জনে-শরণদ ভব-সাগর-নাবিক গোবিন্দ।
করুণাময় কেশব কংসারি কালীয়-মর্দন
রাধা-বল্লভ রামকৃষ্ণ জগন্নাথ যোগেন্দ্র।
দীননাথ দুখ-বিমোচন দামোদর
দৈবকী-নন্দন মুরহর মধুসূদন মাধব মদনমোহন মুকুন্দ।
অঘ নিদাঘ যুতং পাপাত্মানং কুকর্মযুক্তং
রামশঙ্কর দীনং প্রতি দয়াং কুরু দেবেন্দ্র। (ভূপালি-ব্রহ্মতাল, ধ্রুপদ)

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়াজোল নরেন্দ্রলাল খাঁ রাজ পরিবার সঙ্গীতাচার্যের পদ অলংকৃত করেছেন। এবং তিনি এক সময় কলকাতা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক রূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি ‘সঙ্গীত মঞ্জুরী’ নামক মূল্যবানগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত দুটি গান উল্লেখ করা হল :

১

সব জগত লোগ জপত নিত শিব সুত গণপতকো
ঋদ্ধি সিদ্ধি দাতা বিজ্জন হরণ।
খরব পীবর তন নেক গজ বদন
অরুণ কিরণ জিন জাকো বরণ।
গণেশ গণনায়ক ঔর এক বদন
পূজত নিশ দিন ইন্দ্রচন্দ্রতপন।
দেব অরচিত চরণ কৈসে পাবে প্রসন্ন
কৃপা কর তারণ হো প্রসন্ন বদন। (কল্যাণ-ঝাঁপতাল)

২

কহুইয়া সঙ্গ আজ রাধিকা খেলত হোরি
দেখো সখি রি কৈসী শোভা হোত।
ঐসো মিলন রৈন দিন দেখত
মেরী আঁখ আশা নহি মিটত।। কেদারা-ধমার

বহু গ্রন্থের রচয়িতা, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়কদের মধ্যে একজন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুমিষ্ট ও মধুর ছিল। ঠাকুরের সঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৩১ সাল। একবার কলকাতার সাহিত্য সম্মেলনে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীত পরিবেশন করছেন। এমন এক সময় গান থেমে গেল। রবীন্দ্রনাথ উঠলেন সভাপতিত্বের ভাষণ দিতে। উঠেই তিনি বললেন —"গোঁফেশ্বরের পালা শেষ। এবার দাড়িশ্বরের পালা"। ঠাকুর অকপটে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলে ছিলেন- "যাঁরা সংগীত ব্যবসায়ী নন, বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে গোপেশ্বরবাবুর চেয়ে বড় ওস্তাদ কেউ আছেন কিনা সে কথা বলা কঠিন।' তাঁর রচিত দুটি গান উল্লেখ করা হল:

১

হিন্দী খেয়াল বরষণ লাগি ঘন ঘোর ঘটা,
পিয়া পাশ নাহি জিয়রা লরজত।
সনসন ননন জোর পবন বহত
চহুঁদিশ আঁধেরী সূঝন পড়ত
গোপেশ প্রভু কো সবহি পুকারত।। (দেশ — তিনতাল)

২

চতুর সুঘর মোহন বাঁশরী বজায়কে
মেরো মনহর লিয়ো

গোপেশ প্রভুকো নিরখত চন্দ দরপ হত হোত
বিধি ঐসো রূপ কিয়ো।। (সামন্তসারঙ্গ অথবা দুর্গা একতাল)

বিষ্ণুপুর ঘরানার এই গুরু শিষ্য পরম্পরা সঙ্গীতজ্ঞদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল : রামকেশব ভট্টাচার্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কেশবলাল চক্রবর্তী, দীনবন্ধু গোস্বামী, রমাপতি বন্দোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিন্দ্যবাসিনী দেবী, গৌরীদেবী, আশালতা দেবী, সুলেখা দেবী, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবর্তী, কৃষ্ণনাথ চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, নকুড়চন্দ্র গোস্বামী, হলধর গোলী বা হলুগোঁসাই, গঙ্গনারায়ন গোস্বামী প্রমুখ। মৃদঙ্গ বাদক : রামমোহন চক্রবর্তী, জগৎচাঁদ গোস্বামী, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি অধিকারী, অনন্ত মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, গিরিশ চট্টোপাধ্যায়, ভৈরব চক্রবর্তী প্রমুখ।

দুই

একসময় পুরো কলকাতা মল্লভূমির গায়কদের সুরের মুর্ছনায় মুর্ছিত হত। তখন কলকাতায় রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে ব্রহ্মসভার জন্য আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। শাস্ত্র পাঠ, ধর্ম, সাহিত্য শিল্প, আলোচনা হল মূল উদ্দেশ্য। ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ হিসেবে তিনিই প্রথম ধর্মসঙ্গীতকে সংযুক্ত করেন। ধ্রুব পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি গান রচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর ৪৪টি গান নিয়ে "ব্রহ্মসঙ্গীত" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই কলকাতার বিভিন্ন রাজসভাতে মল্লভূমির শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হত। রামকেশব ভট্টাচার্য কোচবিহার রাজা সতুবাবুর সভাগায়ক ছিলেন, গঙ্গনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কেশবলাল চক্রবর্তী কলকাতার রাজা তারকনাথ প্রামানিকের রাজসভা অলংকৃত করেছেন। সঙ্গীতজ্ঞ গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন যদু ভট্টের গান কর্ণগোচর হয়। আবিষ্কার করেছিলেন অপার ঐশ্বর্যের সঙ্গীতের জগৎ। বেশ কিছুদিন পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যদু ভট্টর গানে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত শিক্ষক রূপে যদু ভট্টকে ঠাকুর বাড়িতে অভিষিক্ত করেন। একে একে বিষ্ণু চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্রীকন্ঠবাবু ও ঠাকুর বাড়ির সঙ্গীত শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ খুব বেশিদিন না হলেও বাল্যকালে বিষ্ণুর চক্রবর্তীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নিয়ে ছিলেন। প্রত্যেক রবিবার বিষ্ণু চক্রবর্তী বাড়িতে আসতেন গান শেখাতে। রবীন্দ্রনাথ তার সম্পর্কে বলেছেন : "বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখি নি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গাঁনের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সংগীতকলায় তিনি

ওস্তাদ ছিলেন"। অপর একটি অংশে তিনি বলছেন-"বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়। দুই-একটা নমুনা দিই-

এক-যে ছিল বেদের মেয়ে-এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কি-পরা যেমন-তেমন,
লাগিয়ে দিল ভেস্কি-
ঠাকুরঝি!
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুরঝি!
আরও কিছু ছেঁড়া-ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন—
চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফার্সি পড়ে তাঁতি।
গণেশের মা, তার কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,
একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা"।

বিষ্ণু চক্রবর্তী সম্পর্কে সঙ্গীতজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন "অন্যান্য ওস্তাদের গানের চেয়ে বিষ্ণুর গানই সকলে বেশি পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদরা যেমন তান-অলঙ্কারে প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমনি কিছু করিতেন না। তিনি অল্পস্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন না। ইহা ছাড়া, কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ-খেয়ালই বেশি গাহিতেন।"

রবীন্দ্রনাথ বরং শ্রীকণ্ঠবাবুর গান শিখতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ শ্রীকণ্ঠবাবু গান শেখাতেন না, গানের সুর দিতেন। আর সেই সুর গুনগুন করতে কখন যে গানে রূপান্তরিত হত রবীন্দ্রনাথ টেরই পেতেন না। সঙ্গীত গুরু রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন হিন্দুস্তানি সংগীতের অনুকরণে ধ্রুপদী গান রচনার তালিম নিয়ে ছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথকে সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছিল যদু ভট্টের গান। কিন্তু তিনি যদু ভট্টের থেকে বেশি গান শিখতে পারেননি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "তার পরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত

ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই- সেই জন্যে গান শেখাই হল না"। যদু ভট্ট যে শুধু ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের গান শেখাতেন এমন নয়। গান শেখানোর সময় বাড়ির বাইরের কেউ এলে এবং তার আগ্রহ থাকলে তাকেও সমান ভাবে গান শেখাতেন। অর্থাৎ যাদুভট্ট গায়ক হিসেব যেমন অসামান্য ছিলেন তেমনি মানুষ হিসেবে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর গায়িকী ঢঙ বারবার আপ্লুত করেছে রবীন্দ্রনাথকে। যদু ভট্টের আপার সঙ্গীতের জ্ঞানের জন্য মুক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : "ছোটোবেলায় আমার গলা খুব ভালো ছিল। সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট- অত বড়ো গাইয়ে বংলায় আজ পর্যন্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ- আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন"। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত জীবনে যদু ভট্টের হিন্দি-খেয়াল-টপ্পা-ধ্রুপদী গানের অনুসরণে অনেকগুলি ভাঙা গান রচনা করেছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী "রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম" শীর্ষক গ্রন্থে যদুভট্টের গান এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে সাজিয়ে এক সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। গানের তালিকা প্রস্তুত করা হল :

রবীন্দ্র-গীত	পুরোবর্তী আদর্শ	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
অন্তরে জাগিছ	কোন যোগী ভয়ো	বেহাগ, ঝাঁপতাল	ইন্দিরা
অমৃতের সাগরে	মৈ তো না জাঁউ	কামোদ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
অশ্রুভরা বেদনা	তনমনধন ভুয় পরবারে	মিশ্র কাফি, ত্রিতাল	
অসীম আকাশে অগণ্য	সকল গুণ প্রকাশ	মারুকেদারা, চৌতাল	গীতসূত্রসার
অসীম কালসাগরে	সারদা বিদ্যাদেনী	ভৈরবী, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
অহো! আস্পর্ধা একি	দারা দ্রিম তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল	
আইল আজি প্রাণসখা	খোল অব ঘুঘট পট	কেদারা, আড়াঠেকা	
আইল শান্তসন্ধ্যা	ভাওয়েরে ভস্ম	শ্রীরাগ, চৌতাল	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
আঁখিজল মুছাইলে	জিন ছুঁয়ো মোরে	রামকেলি, ত্রিতাল	ইন্দিরা
আছ অন্তরে চিরদিন	কৈসে অব ধরো ধীর	কাফি, চৌতাল	
আজ বুঝি আইল প্রিয়তম	ফুল রহি কলিয়া মধুবন	সাহানা, ত্রিতাল	গীতসূত্রসার
আজি এ আনন্দসন্ধ্যা	বহুর বজাও বংশী	পূরবী, তেওরা	গীতপ্রবেশিকা
আজি কমলমুকুলদল	মনকী কমলদল	মিশ্রবাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
আজি নাহি নাহি নিদ্রা (?)		মিশ্র সিন্ধু। ত্রিতাল	
আজি বহিছে বসন্তপবন	আজু বহত সুগন্ধ পবন	বাহার, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মম জীবনে নামিছে	অব মোরি পায়েলা বাজমু	আড়ানা, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মম মন চাহে	ফুলি বন ঘন মোর	বাহার, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মোর দ্বারে	হো হো মোরে দ্বার	দেশ, পঞ্চমসওয়ারি	ইন্দিরা
আজি শুভদিনে	পূর্ণ চন্দ্রাননে (কানাড়ী)	খাম্বাজ। তাল-ফেরতা	
আজি রাজ-আসনে	প্যারি তেরে পায়ন পকরু	বেহাগ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি হেরি সংসার অমৃতময়	এরি পরমেশ্বর	বেলাবলী, চৌতাল	
আনন্দ তুমি স্বামী	ওঙ্কার মহাদেব	ভৈরবী, সুরফাঁকতাল	

রবীন্দ্র-গীত	পুরোবর্তী আদর্শ	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মালকোষ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে	(মহীশূরী)	ভজন, একতালা	
আনন্দ রয়েছে জাগি	আজু" রচো করতার	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
আমারে করো জীবন দান	ইয়া জগ ঝুট	শঙ্করা, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
আমি দীন অতি দীন		রামকেলি, ঝাঁপতাল	
আয় লো সজনি সবে	আজু মোরন বন	মল্লার, কাওয়ালি	শতগান
উঠি চল সুদিন আইল	উঠি চলে সুদিন নাচত	কেদারা, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
এই-যে হেরি গো দেবী	মনকী কমলদল খোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি	(গুজরাটী)	ভজন, একতালা	
একি এ সুন্দর শোভা	বাজু রে মন্দর বাজু	ইমনভূপালি, ত্রিতাল	কণ্ঠকৌমুদী
একি করুণা করুণাময়	নইরে মা বরণ	বাহার, আড়াঠেকা	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ	(মহীশূরী)		
একি হরষ হেরি কাননে	মন্ত্রী কমলদল খোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
এখনো তারে চোখে দেখি নি	পায়েলিয়া মোরে বাজে	ইমন, কাওয়ালি	ইন্দিরা
এত আনন্দধ্বনি উঠিল	আজু ব্রজমেঁ	বাহার, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
এ পরবাসে রবে কে হায়	ও মিঞা বেজনুওয়ালে	সিন্ধু, মধ্যমান	
এ ভারতে রাখো	এ বতিয়াঁ মেরো	সুরট, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
এ হরি সুন্দর	এ হরি সুন্দর (পাঞ্জাবী)	আরতি গান, কার্ফা	
এ মোহ-আবরণ খুলে দাও	ঘুঁঘট পট খোলি	ইমন, আড়াঠেকা	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
এই বেলা সবে মিলে	চতুরঙ্গ রস সন	ইমন কল্যাণ,ত্রিতাল(দ্রুত)	সঙ্গীতমঞ্জরী
এসো শরতের অমল মহিমা	বাজে ঝনন ঝনন বাজে	জৌনপুরী, ত্রিতাল	
এসেছে সকলে কত আশে	বুঁদ পবন পুরবাই	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
ওই পোহাইল তিমির-রাতি	তোমতানা নানা নানা	আলাইয়া, ত্রিতাল	কণ্ঠকৌমুদী
ও কী কথা বল সখি		দেশখাম্বাজ, ত্রিতাল	
ও কেন ভালোবাসা	কৌন পরদেশ	পিলু, খেমটা	
ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও	গ ্য়া ্নহো সাকি	মিশ্রসুরট, দাদ্রা	ইন্দিরা
ওঠো ওঠো রে-বিফলে		বিভাস, চৌতাল	
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে	এরিমা সব বন অমুয়া	পরজ-বাহার, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত
কাছে তার যাই যদি		জয়জয়ন্তী, কাহারবা	
কামনা করি একান্তে	প্রথম কর শিঙ্গার মোরে	দেশকার, চৌতাল	
কার বাঁশি নিশিভোরে	কান ভনকবা	গান্ধারী, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত
কার মিলন চাও বিরহী	তনু মিলন দে পরবর	শ্রীরাগ, তেওরা	আনন্দসঙ্গীত কণ্ঠকৌমুদী
কী করিলি মোহের ছলনে	অবদিন থোড়ি রহি	ভজন, ঠুংরি	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
কী ভয় অভয়ধামে	নিডর ডর নিমাই	বেহাগ, ঝাঁপতালত	গীতসূত্রসার
কে বসিলে আজি	বে পরিয়া তাঁডে	সিন্ধু, মধ্যমান	সঙ্গীতবিজ্ঞান
কেমনে ফিরিয়ে যাও	বাবরে কি সঙ্গসাথ	ভৈরবী, চৌতাল	ইন্দিরা
কে রে ওই ডাকিছে	তারি ডফ বাজত	আলাইয়া, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী

রবীন্দ্র-গীত	পুরোবর্তী আদর্শ	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
কোথা আছ প্রভু	(গুজরাটী)	ভজন, একতালাও	
কোথা ছিলি সজনি লো		ভৈরবী, ত্রিতাল	
কোথা যে উধাও হল	বোল রে পাপিয়ারা	মিঞামল্লার, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে
কোথা হতে বাজে		সুরট, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোলো	মহারাজা কেবড়িয়া		
গগনের থালে রবিচন্দ্র	গগনোমে থাল (পাঞ্জাবী)		
গহন ঘন ছাইল	ইন্দহুঁকী অসবরী	গৌড়মল্লার, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
গহন ঘন বনে	সঘন ঘন বঙ্ক	হাম্বীর, চৌতাল	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
ঘোরা রজনী এ	বাজে ঝনন মোরে পায়েলিয়া	কানাড়া, ত্রিতাল	ইন্দিরা
চরণধ্বনি শুনি	মুরলীধুনি শুনি	সিন্ধু, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
চরাচর সকলি মিছে মায়া	দারা দ্রিমতানা না	বেহাগ, ত্রিতাল	
চিরদিবস নব মাধুরী	নব ভবন নব রাঘব	নটমল্লার, চৌতাল	গীতসূত্রসার
জগতে তুমি রাজা	অচল বিরাজ	কানাড়া, চৌতাল	
জননী, তোমার করুণ চরণখানি		মিশ্র গুণকেলী নবপঞ্চতালং	
জর জর প্রাণে নাথ	অব তেরি বাঁকিবাঁকি চিত	সিন্ধুড়া, ত্রিতাল	ইন্দিরা
জয় তব বিচিত্র আনন্দ	জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনীসারঙ্গ, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
জয় রাজরাজেশ্বর		ভূপালী, তালফের্তা	
জাগ জাগ রে জাগ	প্রথম পরবর দিগারহি	তিলককামোদ, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে	আজু রঙ্গ খেলত হোরি	বেহাগ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে	উচি চিত বন	বিভাসং চৌতাল	গীতসূত্রসার
ডাকি তোমারে কাতরে	তুঁহি ভজ ভজ রে	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	
ডাকিছ কে তুমি	হাঁরে ডফ বাজন	খাম্বাজ, ধামার	
ডাকে বার বার ডাকে	মোহে কৈসে নিকি লাগি	কেদারা, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ডুবি অমৃতপাথারে		ললিত, চৌতাল	
তব অমল পরশরস	তুয়া চরণ কমল"পর	আশাবরী, ত্রিতাল	গীতপ্রবেশিকা
তব প্রেমসুধারসে মেতেছি	কারি কারি কমরিয়া গুরজী	পরজ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
তবে কি ফিরিব সখা		দেশীটোড়ী, টিমাতেতালাও	
তাঁহার প্রেমে কে ডুবে		ভৈঁরো, একতালা	
তাঁহারে আরতি করে	জগজন ধ্যান ধরত	বড়হংসসারঙ্গ, চৌতাল	
তিমিরবিভাবরী কাটে	ক্যায়সে কাটোঙ্গি	বেহাগ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
তিমিরময় নিবিড় নিশা	প্রবল দল মেঘ	মেঘ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
তুমি আপনি জাগাও মোরে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈঁরো, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে
তুমি কিছু দিয়ে যাও	কৈ কছু কহরে	খাম্বাজ, কাহারবা	
তুমি জাগিছ কে	তুম নয়ন মে	গোঁড়, চৌতাল	গীতসূত্রসার
তোমা লাগি নাথ	তুম বিন রহো	পূরবী, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
তোমা-হীন কাটে দিবস	তুম বিন কৈসে	বাগেশ্রী, আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী

রবীন্দ্র-গীত	**পুরোবর্তী আদর্শ**	**রাগ-তাল**	**প্রাপ্তিস্থান**
তোমার দেখা পাব বলে	কর কঙ্গনওয়া	মল্লার, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ	মেরে গিরিধর গোপাল	ভৈরবী, একতালা	
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে	আজ শ্যাম মোহলিয়ে	খাম্বাজ, একতালা	গীতপরিচয়
তোমারি মধুর রূপে	তেরো হি নয়নবাণ	ঝিঁঝিট, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
তোমায় যতনে রাখিব হে		দেশখাম্বাজ, ঝাঁপতাল	
দাও হে হৃদয় ভরে দাও	প্যালা মুঝে ভরি দেরে	রামকেলি, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
দাঁড়াও মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড	এরি অব আনন্দ	ভীমপলাশী, সুরফাঁক	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
দিন যায় রে দিন	বেণিজা রয়ননদ	পিলু, মধ্যমান	
দুঃখরাতে হে নাথ	রঙ্গরাতি মাতিয়া	সরফর্দা, আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
দুখ দূর করিলে	বাজত বীণ	রামকেলী, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
দুয়ারে বসে আছি প্রভু	মৈতো ন জাঁউ	কামোদ, ধামার	
দেখা যদি দিলে	পিয়া বিন কৈসে	বেলাবলী, ত্রিতাল	
দেবাধিদেব মহাদেব	দেবন দেব মহাদেব	দেওগিরি, সুরফাঁক	গীতসূত্রসার
নব আনন্দে জাগো আজি	অধর ধরে বনবাঁশরী	টোড়ি, ত্রিতাল	
নব নব পল্লবরাজি	মনমথ তন দহে	বাহার, চৌতাল	
নমি নমি ভারতী	(গুজরাটী)	প্রভাতী, ঝাঁপতালত	
নয়ান ভাসিল জলে	পাপিহা বোলে রে	শ্যাম, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
নাথ হে প্রেমপথে	বলমা রে চুনরিয়া	সুহাকানাড়া, ত্রিতাল	
নিকটে দেখিব তোমারে	আনু আইল ভোর কি	রামকেলি, ত্রিতাল	
নিত্য নব সত্য তব	জ্ঞানরঙ্গ ধ্যানরঙ্গ	শুক্লবিলাবল, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
নিত্য সত্যে চিন্তন	কালী নাম চিন্তন	আড়ানা, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
নিশিদিন চাহ রে	আজু মনভাবন যোগি আয়ে	যোগিয়া, আড়াঠেকা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
নিশিদিন মোর পরানে	উন সন জায় কাহোরি	গান্ধারী, ত্রিতাল	
নীলাঞ্জনছায়া	বৃন্দাবন লোলা (দক্ষিণী)		
নূতন প্রাণ দাও	সোতন মদ মাত	নাচারীটোড়ি, ধামার	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
পান্থ এখন কেন অলসিত	রঙ্গ যুগত সোঁ গাবে বজাবে	ললিত, সুরফাঁক্তা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
পিপাসা হায় নাহি মিটিল	সাঁইয়া জাঁউ জাঁউ নাহি বোলেঙ্গি	ভৈরবী, ত্রিতাল	
পূর্ণ আনন্দ	পূর্ণ ব্রহ্ম	কল্যাণ, চৌতাল	
পেয়েছি অভয়পদ	ঈশ্বরী নাম জপ	খট, ঝাঁপতাল	গীতসূত্রসার
পেয়েছি সন্ধান তব		গৌড়সারং, চৌতাল	
প্রচণ্ড গর্জনে	প্রচণ্ড গর্জন	ভূপালী, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদ শিব শক্তি	সোহিনী, সুরফাঁকতাল	গীতসূত্রসার
প্রভাতে বিমল আনন্দে	নাদনগর বসায়ে	গুর্জরীটোড়ি, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ফিরায়ো না মুখখানি	কহো ন ঐসী বাত	হাম্বীর, ত্রিতাল	
বড়ো আশা করে	সখি বা বা (কানাড়ী)	ঝিঁঝিট, কাওয়ালিঃ	
বন্ধু, রহো রহো সাথে	সঙ্গে চলা, দিয়া, হাওয়ে	ভৈরবী, কার্ফা	

রবীন্দ্র-গীত	পুরোবর্তী আদর্শ	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ	দুসহ দোখ-দুখ দলনী	নিশাসাগ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাজাও তুমি কবি	আয়ে ঋতুপতি	বাহার, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাজে করুণ সুরে	নিতু চরণ মূলে (দক্ষিণী)		
বাজে বাজে রম্যবীণা	বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ (পাঞ্জাবী)	ইমনকল্যাণ, তেওরা	
বাণী তব ধায় অনন্ত	বেণী নিরখত ভুজঙ্গ	আড়ানা, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী	মীনাক্ষী মে মুদম (দক্ষিণী)		
বিদায় করেছ যারে	বাজে ঝননন মোরে পায়লিয়া	কানাড়া, ঝাঁপতাল	ইন্দিরা
বিপুল তরঙ্গ রে	নাচত ত্রিভঙ্গ য়ে	ভীমপলশ্রী, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
বিমল আনন্দে জাগ রে	সো নহি মারেঙ্গে মোরি রে	গান্ধারী, ত্রিতাল	
বিশ্ববীণারবে	নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস	শঙ্করাভরণ, তাল-ফেরতা	ইন্দিরা
বীণা বাজাও হে	বীণ বাজায় রে	পূরবী, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
বেদনা কী ভাষায় রে	(দক্ষিণী)		
বেঁধেছ প্রেমের পাশে	চাঁচর চিকুর আধো (বাংলা)	কাফি-কানাড়া,ঢিমাতেতালা	গীতপ্রবেশিকা
ব্যাকুল প্রাণ কোথা	ব্যাহণ লিয়ে বন	ভূপালি, মধ্যমান	
ভক্তহৃদিবিকাশ	শম্ভু হর মহেশ	ছায়ানট, সুরফাকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
ভবকোলাহল ছাড়িয়ে	কাহু ন কর মোসে	দরবারী টৌড়ি, ঢিমাতেতালা	
ভাসিয়ে দে তরী		জয়জয়ন্তী, কাওয়ালিঃ	
মধুররূপে বিরাজো	কৌনরূপ বনে হো	তিলককামোদ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
মন জাগো মঙ্গললোকে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈরোঁ, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে
মন জানে মনোমোহন	মন মানো	নট, চৌতাল	গীতসূত্রসার
মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে	হস হস গরওয়া লগাবে	ভৈরবী, যৎ	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
মন্দিরে মম কে	সুন্দর লাগি রহে	আড়ানা, একতালা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
মম অঙ্গনে স্বামী	আজু ব্রজমে সৈঁইয়া	বাহার, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
মহাবিশ্বে মহাকাশে	মহাদেব মহেশ্বর	ইমনকল্যাণ, তেওরা	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
মহারাজ একি সাজে	মেরে দুন্দ দল সাজে	বেহাগ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
মোরে বারে বারে ফিরালে	মোরি নয়ি লগন লাগি রে	নটমল্লার, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
যাওয়া-আসারই এই কি খেলা	প্রেম ডগরিয়াঁমে ন করো	গান্ধারী, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
যাও রে অনন্তধামে	গুজরাটী)	প্রভাতী, ঝাঁপতাল	
রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে	মুরলিয়া ইহ ন বজাও শ্যাম	খাম্বাজ, ত্রিতাল	
রাখো রাখো রে জীবনে	জান না দোঙ্গি এরি মা	শ্যাম, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
রিমঝিমঘন ঘন রে	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	মল্লার, ত্রিতাল	
শক্তিরূপ হেরো তাঁর	সপ্তসুর তিনগ্রাম	ইমন, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
শান্তি কর বরিষণ	শম্ভু হর পদযুগ	তিলককামোদ, সুরফাঁক্তা	সঙ্গীতমঞ্জরী
শান্তিসমুদ্র তুমি	হো নর হর	টৌড়ি, ঢিমাতেতালা	
শীতল তব পদছায়া	বাঙ্গুরী মোরী	ইমনকল্যাণ, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
শুভ্র আসনে বিরাজ	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন	ভৈঁরো, আড়াচৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী

রবীন্দ্র-গীত	পুরোবর্তী আদর্শ	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
শূন্য প্রাণ কাঁদে		সিন্ধু, একতালা	
শূন্য হাতে ফিরি হে	রুমঝুম বরখে	কাফি, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
শোন তাঁর সুধাবাণী	শুধমুদ্রা শুধবাণী	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ		পূরবী, ত্রিতাল	
সকাতরে ওই কাঁদিছে	চারি বর্ষা পর্যন্ত (কানাড়ী)	ভজন, একতালা	
সখা, সাধিতে সাধাতে	সখি তরসে তরসে	মিশ্র, খেমটা	
সখি, আঁধারে একেলা ঘরে	সখি, আওত অঁধেরী ঘটা		
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবী	ইমনকল্যাণ, তেওরা	গীতসূত্রসার
সবে আনন্দ করো	সুখ আনন্দ করো	দেওগিরি-বেলাবলী,	
আড়াচৌতাল	গীতসূত্রসার		
সবে মিলি গাও রে	সব মিল গাও	হেমখেম, চৌতাল	গীতসূত্রসার
সংশয়তিমির-মাঝে	অজ্ঞানতমনি করে	দেশসিন্ধু, কাওয়ালি	কণ্ঠকৌমুদী
সংসারে কোনো ভয় নাহি	শ্যামকো দরশন নহি	ইমনকল্যাণ, আড়াচৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
সাজাব তোমারে হে	ভুলিসি গোবারণ	নট্‌কিন্দ্র, ধামার	গীতসূত্রসার
সুখহীন নিশিদিন পরাধীন	দারাদীম দারাদীম	নটমল্লার, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী

যদু ভট্ট বঙ্কিমচন্দ্রকেও একসময় গান শিখিয়ে ছিলেন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা “বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সুরও তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন। তবে তিনি কোন রাগে গানটি গেয়ে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন : ‘যদুভট্ট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত “বন্দেমাতরম গানটির সুর করেন কাফি রাগে ত্রিতালের উপর।” অর্থাৎ লক্ষ্য করা যায় বিষ্ণুপুরের গায়করা শুধু যে ঠাকুর পরিবারেই গান গেয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, গোটা কলকাতা জুড়েই তাঁদের জুড়ি মেলা ভার ছিল। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ভারতীয় উচ্ছাঙ্গ সংগীতের স্বরলিপি প্রথম তৈরি করলেন। ফলে বিষ্ণুপুরের গায়কদের সঙ্গীতের সুভাষ ছড়িয়ে পড়েছিল সীমানা থেকে সীমান্তের। সঙ্গত কারণেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : ‘অন্য বিষয়ে বিষ্ণুপুরের গৌরব অস্তমিত হইলেও, শিল্প ও সংগীতে তাহা কথঞ্চিৎ সংরক্ষিত আছে। বিশেষতঃ সঙ্গীত বিষয়ে বিষ্ণুপুর এখনো ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান স্থান।’

তথ্যসূত্র :

১। মল্লভূম বিষ্ণুপুর-মনোরঞ্জন চন্দ্র
২। বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা-রবীন্দ্রনাথ সামন্ত
৩। পশ্চিমবঙ্গ বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা ১৪০৯
৪। বাঁকুড়া পরিক্রমা- অনুকূল চন্দ্র সেন
৫। বাঁকুড়া জেলার বিবরণ-রামানুজ কর
৬। গল্প কথায় বিষ্ণুপুর-শ্রী অনিলবরণ কর

৭। বাঁকুড়া পরিচয়-অমিয় পাত্র
৮। বিচিত্রা পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম খন্ড শ্রাবণ ১৩৪১পৌষ ১৩৪১
৯। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি- বিনয় ঘোষ
১০। পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪১০
১১। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস প্রথম খণ্ড-স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১২। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে উৎপত্তি ও ক্রমিকাশের ধারা উৎপল গোস্বামী
১৩। বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী- শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার
১৪। সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১৪। সঙ্গীতের শিল্পদর্শন- ডঃ অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস প্রথম খণ্ড- শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬। রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন-ডঃ দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার
১৭। রবীন্দ্রসংগীত- শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
১৮। রবীন্দ্রসঙ্গীতেরসুষমা- কিরণশশী দে
১৯। সংগীতচন্দ্রিকা- শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯। গীতবিতান- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০। রবীন্দ্র সংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা প্রথম তৃতীয় খণ্ড- শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস
২১। সংগীত-চিন্তা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২২। সংগীত পরিক্রমা- নারায়ণ চৌধুরী
২৩। বিষ্ণুপুরের পাঁচ কিংবদন্তি সংগীত সাধক-লীলাময় মুখোপাধ্যায়

সোমা সামন্ত

রবীন্দ্রনাথের আলোকে মানবতা, সাহিত্য ও দর্শন : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন এক অনবদ্য প্রতিভা, যাঁর লেখা সাহিত্যের সকল শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সৃজনশীলতার রসে সাহিত্যকে নতুন দিগন্তের পথ দেখিয়েছে। ১৮৬১ সালের ৭ ই মে, বঙ্গাব্দ ২৫ শে বৈশাখ ১২৬৮ তে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে এই মহান কবি জন্ম গ্রহণ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, প্রবন্ধকার চিত্রশিল্পী,অন্যদিকে তিনি দার্শনিক এবং সৃজনশীল মানবতাবাদী। তাঁর সৃষ্টিকর্মে ও ভাবনা-চিন্তায় 'মানবতাবাদী' সত্তা এক কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং তিনি বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্নতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন ছোটো গল্প রচনার মাধ্যমে। তাঁর রচনাবলির মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হল মানবতাবাদ। 'মানবতাবাদ' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Humanism'। 'Humanism' শব্দটি আবার আগত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'humanus' থেকে,যার অর্থ হল 'মানবিক' (humane) বা 'মানুষ' (human)।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ অমূর্ত বা বিমূর্ত কোনো বিষয় নয়, বরং সমাজ চিন্তায়, সাহিত্যে ও জীবন দর্শনে বাস্তব রূপ নিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছ। শিক্ষাদর্শন তিনি যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ এবং এই মানব সত্তার মধ্যেই নিহিত এক বিশ্বজনীন চেতন সত্তা। তাঁর বিশ্বাস ছিল মনুষ্যত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক সৃজনশীল শক্তি ও আত্মিক সম্ভাবনা যা মানবতার প্রকৃত ভিত্তি স্বরূপ। তাঁর মতে শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ,সমাজ ও সংস্কৃতি সব কিছুতেই হওয়া উচিত এমন পরিসর যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে এবং গভীর বন্ধনের দ্বারা প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এই জগতের প্রতিটি মানুষ হচ্ছেন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। কেবল জৈবিক চাহিদাসম্পন্ন প্রানী হিসেবে মানুষ কে তিনি দেখেন না ,বরং জ্ঞান, বিবেক, প্রেম, বুদ্ধি, সহানুভূতি আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হিসেবেও মানুষকে দেখেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে মানুষ হলেন অনন্য গুনাবলীর অধিকারীসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি মনে করতেন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত মহিমাকে উপলব্ধি করা এবং পরিপূর্নভাবে বিকাশ ঘটানোই জীবনের মূল লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর, তিনি মনে করতেন—

সঠিক পরিবেশ, শিক্ষা এবং আত্মবিশ্বাসের দ্বারা মানুষ যে-কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে এবং অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হতে পারে। তাঁর রচনাবলীতে মানুষের আত্মজাগরন এবং নিজের ভাগ্য নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রনের বার্তা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ হলেন মনুষ্যত্বের পূজারী। তাঁর মতে, এই জগৎ সংসার এতো সুন্দর এবং সব কিছুর দ্বারা পূর্ণ, কারণ শুধুমাত্র মানুষ আছে বলে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য কব্যিক উপমা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন— "একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর যে মানুষ তার কেবল পাঁপড়ি না বোঁটা না, একটি সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।"[1] অর্থাৎ কথাটির মর্মার্থ হল - গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের অর্থ রয়েছে শুধু মাত্র এই পৃথিবীতে মানুষ আছে বলে, ঐ সৌন্দর্য এর প্রকৃত কোনো অর্থ নেই অন্য প্রাণীর কাছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের সমস্ত সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন, কোনো সম্ভাবনাকেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্ম, প্রায় প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে এবং আশা করছেন ভবিষ্যতেও রাখবে। মানুষের নৈতিক বোধ, মনন, কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীলতার জগত অসীম। এই জগত সংসারের প্রতিটি মানুষ একে অন্যের সঙ্গে অদৃশ্যমান এক সম্পর্কের জালের দ্বারা আবদ্ধ। তিনি ঈশ্বর তথা সত্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানব হৃদয়কে নির্দেশ করেছেন, বাহ্য জগতকে নির্দেশ করেননি। অর্থাৎ ধর্মচিন্তা যেন মানুষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ভাবনা প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার হিয়ার মাঝে' কবিতাটিতে।

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি ,আমার হৃদয়ে পানে চাই নি।।"[2]

এই কবিতাটিতে উৎসারিত হয়েছে অন্তরের ব্যাকুলতা। তিনি অন্তর থেকে অনুভব করেছেন—মানুষ যুগ যুগ ধরে যে সত্যকে অন্বেষণ করে চলেছে বাইরে, সেই সত্য আসলে মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অন্তর্নিহিত। এই কবিতাতে কবি মানুষের হৃদয়ের মনি কোঠায় লুক্কায়িত পরম সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা সাহিত্যকে এক অনবদ্য জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ভাবনায় মানবতাবাদের যে গভীর প্রতিফলন দেখা যায়, তা মানবজীবনের অন্তর্নিহিত মর্যাদাকে, মূল্যবোধকে এক অনন্য ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাঁর মানবতাবাদ শুধুমাত্র দর্শন নয় , এক জীবন বোধের পরিসর যা বাংলা সাহিত্যের ভাবনাকে আরও প্রগতিশীল করে তোলে। বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণকালে যেসব যুক্তিবিদ,

সাহিত্যবিদদের আবির্ভাব ঘটে ছিল বাংলা সাহিত্যকে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সব ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচনাবলীতে মানুষকে কুসংস্কার,ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং মানুষের মর্যাদাকে অতি উচ্চ স্থানে স্থাপন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের পশ্চাতে দার্শনিক চিন্তাভাবনার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। উপনিষদের 'সোহহম (আমিই সেই) এবং তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই) এই জাতীয় অদ্বৈতবাদী ধারনা মানবতাবাদের ভিত্তি স্বরূপ। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের মধ্যেই একই সত্তা বিরাজমান, এই জন্য আমরা কোনো মানুষকেই অন্য কোনো মানুষ থেকে আলাদা করতে পারি না। অদ্বৈতবাদী ভাবধারা থেকেই জন্ম নেয় বিশ্বজনীন ভালোবাসার ধারনা। এছাড়াও তাঁর মানবতাবাদী চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা ও করুণা এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রেম ও ভক্তি। প্রাচ্যের জ্ঞান ও ঐতিহ্যকে গভীরতার সঙ্গে আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভাবনায় এক মানবতাবাদী দর্শনের জন্ম দেন, যা আধ্যাত্মিক চিন্তা ও জাগতিকতার মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তা মানব জীবনের নৈতিকতা, সৌন্দর্য, আত্মিকতা এবং সমন্বয়ের উপর মূলত ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যদিও নিজেকে কখনোই দার্শনিক বলে দাবি করেননি তবুও তাঁর রচনায় দার্শনিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নীতি তত্ত্ব ও জ্ঞান তত্ত্বের সুক্ষ্ম বিশ্লেষনের দ্বারা। তাঁর দর্শনের মূল লক্ষ্য হল মানুষ তাঁর নিজেকে জানা, অন্য ব্যক্তিকে জানা এবং জগত প্রকৃতিকে জানার মধ্য দিয়ে সত্যের সংস্পর্শে পৌঁচ্ছানো। আর সেই সত্যে পৌচ্ছে তিনি দরিদ্র জনগনের অসহায় অবস্থা তুলে ধরেছেন লেখনীতে-

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে,
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি"।।[3]

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক আলোচনার জগতে 'জীবনদেবতা' একটি গুরত্বপূর্ণ ধারনা। তাঁর মতে, ঈশ্বর কোনো অলৌকিক বিষয় নন, বরং মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বসবাস। এই 'জীবনদেবতা'র তত্ত্ব কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন ভাবে মানবতার দিকে নিয়ে যান যেখানে ঈশ্বরসেবা মানেই মানবসেবা এবং আত্মাকে পরিপূর্ন করে তোলা হল ঈশ্বরের আরাধনা। এই প্রসঙ্গে বারবার ধ্বনিত হয়েছে—

"সত্য যেখানে, সুন্দর যেখানে, সেখানেই ঈশ্বর"।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষের দুঃখ কে বোঝা, সত্যকে উপলব্ধি করা এবং মানুষের মর্যাদাকে রক্ষা করাই হল দর্শনের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ভালোবাসা ও সৌন্দর্য চেতনা মানব প্রকৃতির দুটি অপরিহার্য রূপ।

ভালোবাসা বা প্রেম মানুষকে অন্যের সাথে একাত্ম হতে শেখায় এবং হৃদয়ের বন্ধনকে আরো মজবুত করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ব্যক্তিগত প্রেম থেকে শুরু হয় বিশ্বপ্রেম। আর তা থেকেই প্রত্যেকের মধ্যে সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সৌন্দর্য বোধ মানুষকে জগতের অপরূপ রূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং আনন্দ দান করে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন কর্ম হল জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। তিনি নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে মুক্তি লাভের কথা বলেছেন। ফলের আশা না করে কর্ম করাই হলো প্রকৃত কর্ম। আর এই কর্মের মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ম কে একটি আনন্দময় পদ্ধতি হিসাবে দেখেন,যা মানুষ কে জগতের সঙ্গে যুক্ত করে সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষার আলোচনা তে মানবতাবাদ একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। তাঁর মতে, শিক্ষা মানুষের আত্মজাগরনের, নৈতিক বিকাশের একটি দিক, যা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা বা পেশাগত দক্ষতার শিক্ষা নয়। তিনি যে শিক্ষাদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মূল কেন্দ্রে ছিল মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নিহিত এক বিশ্বজনীন চেতন সত্তা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাঁর মানবতাবাদ ছিল প্রেম, ভালোবাসা, ন্যায় ও স্বাধীনতার দ্বারা পূর্ণ এক মানবমুখী দর্শন, যা মানুষকে মানুষের পর্যায়ে থাকতে, ভাবতে শেখায় এবং বিশ্বকে এক মানুষের দ্বারা বেষ্টিত পরিবেশ ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। রবীন্দ্রনাথের মানবতা ও পশ্চিমা মানবতার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্য বেশি দেখা যায়। পশ্চিমা মানবতাবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও যুক্তির দ্বারা গড়ে উঠেছে, কিন্তু কিছু সমালোচক এই জন্য পশ্চিমা মানবতাকে একপেশে বলে সমালোচনা করেছেন এবং এটি একটি নির্দিষ্টি সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অপরদিকে, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ হল সার্বজনীন ও সবাইকে একই সূত্রে বেঁধে রাখার মন্ত্র। তিনি মনে করেন, মানবতাকে কখনো যুক্তি চিন্তার দ্বারা গড়ে তোলা যায় না,বরং মানবতাকে বুঝতে হলে আবেগ ও নৈতিকতা প্রয়োজন। তাঁর মানবতা এক সার্বজনীন রূপ নিয়ে দাঁড়ায়,যা পশ্চিমী মানবতাবাদের একমাত্র যুক্তিনিষ্ঠ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপরীত হয়ে দাঁড় করায়। তাঁর মানবতাবাদে এক সার্বজনীন রূপের প্রতিফলন ঘটে।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের মধ্যে বেদান্ত দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায়। বেদান্ত দর্শন মানব জীবনকে এক পরম সত্তার ধারণা দেয় - যেখানে জগতের প্রতিটি প্রাণী ঐ অদ্বিতীয় পরমসত্তার অংশ রূপে প্রকাশমান এবং আত্ম উপলব্ধির দ্বারা অদ্বৈতবাদী পরম সত্তার উপলব্ধি মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চিমা মতবাদের বিপরীত মত রূপে প্রতিপাদিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে মানুষের শিক্ষক হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতি থেকে মানুষ সব রকম শিক্ষা লাভ করে যেমন - নীতি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ধৈর্য শিক্ষা এবং জীবন পরিবর্তন শিক্ষাও মানুষ প্রকৃতি থেকে লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবাদে মানুষের আনন্দময় জীবনযাপনের ওপর গুরত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন - সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ তার ভিতরকার আবেগ ,ভাবনা প্রকাশ করতে পারে এবং আত্ম তৃপ্তি লাভ করে। তিনি বিশ্বজনীন প্রেমের মধ্য দিয়ে মানব সমাজে প্রকৃত শান্তি ও সহযোগিতা স্থাপন করা সম্ভব বলে মনে করতেন। তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যক্তি মানুষ ও অসীম বা সমগ্র মানুষ - এই দুই প্রকার ভাব মানুষের মধ্যে থাকে এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যক্তি মানুষ নিজস্ব বিষয়ে, চিন্তার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ব্যক্তি মানুষ সারা জীবন ধরে সম্পত্তি, ধর্ম, কর্ম - এই সব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু অসীম মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার বিষয়চিন্তা থাকে না, বরং সব রকমের বিষয়চিন্তা ত্যাগ করে মহাজীবনের লক্ষ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তার কাছে জয়-পরাজয়, লাভ - ক্ষতি এই সবই তুচ্ছ বিষয়। অসীম মানুষ জীবনে আত্ম উপলব্ধি ও আনন্দ উপভোগের দ্বারা বেঁচে থাকতে চায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, ব্যক্তি মানুষের চিন্তাভাবনা ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু অসীম মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, যা তাকে আত্মত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। দেশ, কাল, জাতি ভেদে ব্যক্তি মানুষ ভিন্ন হলেও তার অন্তরে অসীম মানুষের অসীমত্ব লুকিয়ে থাকে। অন্তরের অসীমত্ব দ্বারাই সে সংকীর্ণ গন্ডির বাইরে গিয়ে সমগ্রতাকে উপলব্ধি করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ তার সসীম সত্তা তথা ব্যক্তি সত্তাকে অতিক্রম করে অসীম মানুষে উপনীত হতে চায়। ঐ অসীম মানুষ আদর্শের অভিমুখের দ্বারা পরিচালিত। আদর্শ মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও জৈবিক প্রয়োজন থাকে না, এই আদর্শ কোনো বাহ্যিক বস্তু নয়, বরং হৃদয়জাত ও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সমাহীত। এই আদর্শকে পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্টের বিবেকের বাণীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই আদর্শ মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ জৈবিকতার আবরনের দ্বারা আবদ্ধ। ব্যক্তি মানুষের মধ্যে 'আমি', 'আমি'করে যাওয়ার ভীষণ প্রবনতা থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'আমি'র দুটি ভাগ উল্লেখ করা যেতে পারে - যথা - 'ছোটো আমি' ও 'বড়ো আমি'। স্বার্থ চিন্তায় ঘেরা ক্ষুদ্র মানুষই হল 'ছোট আমি'। আর বৃহত্তর কল্যানের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত আমি হল 'বড়ো আমি'। এই 'বড়ো আমি'কেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অসীম আমি' বা 'বিশ্ব আমি' দ্বারা অভিহিত

করেছেন। সমাজের কল্যানের দ্বারা বা হিতসাধনের দ্বারা 'ছোট আমি'বা 'সসীম আমি' কে ছাড়িয়ে মানুষ বিশ্ব আমিতে উপনীত হতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ"[4]

অর্থাৎ সমগ্র পর্যায়ের দ্বারা চালিত হয়ে জীবন অবসানই মুক্তি। ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তাকে পরিত্যাগ করে সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধনের দ্বারা মুক্তি লাভ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ একেই জীবনের প্রকৃত সত্য বলেছেন। প্রকৃত সত্যই হল মানুষের হৃদয়ের প্রকৃত ঐশ্বর্য। তাই ঐশ্বর্যকামী মানুষের সুখ অংশে নয়, সমগ্রে। মানুষের যে জৈবিক সত্তা সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে ছাপিয়ে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করাই বিশ্ব মানবের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ। সর্বজনীন মনুষ্যত্বের উপলব্ধি হল সাধুতা, আর সার্বজনীনতা উপলব্ধির অভাবই হল স্বার্থপরতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি সব কিছুতেই মানবতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং মানবতা কে সব কিছুর উপর রেখেছেন। তাই চন্ডী দাসের কথায়—

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"[6]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় - রবীন্দ্রনাথ মানবতার পূজারী। তাঁর মতে - মানুষ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তিনি অবদমিত, পীড়িত ,অবহেলিত মানুষের অন্তরে পৌঁছাতে চেয়েছেন। নিজেকে মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়-

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক"[7]

তথ্যসূত্র :

১. মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১০৩-১০৪, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৩৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার হিয়ার মাঝে, ২৫শে চৈত্র, ১৩২০ (১৯১৪), গীতবিতান।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবার ফিরাও মোরে, ১৪ই মাঘ ১৩০০, চিত্রাকাব্য গ্রন্থ (১২৯৯ চৈত্র -১৩০২ ফাল্গুন)

৪. নৈবদ্য, ৩০ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. ড. চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস, উচ্চমাধ্যমিক দর্শন, santra publication pvt.Ltd.,২০২৫

৬. চন্ডীদাস চরিত, যোগেশচন্দ্র তায় সম্পাদিত, প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৪।

৭. সেঁজুতি, পরিচয় কবিতা দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. ড: নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন', সদেশ প্রকাশন, ১০১সি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৭০০০০৬ (প্রথম সংস্করণ -১৫ আগষ্ট, ২০০৫)

সুরজিৎ প্রামাণিক

জয়দেব বসুর কবিতায় সমাজ ও রাজনীতি

জয়দেব বসু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিধিতে এবং রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিশ্বাসে তিনি যে একজন বামপন্থী মানুষ ছিলেন, এ বিষয়ে আমরা নির্দ্বিধ হতে পারি, তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে। কারণ কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তিনি প্রত্যক্ষভাবেই সেই অবস্থানের অভিমুখ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। যেমন 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র একেবারে প্রথম কবিতাটিতেই সমাজতন্ত্রের যে চারাগাছ তিনি অঙ্কুরিত করতে চেয়েছেন এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ক যে ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'রাধাকথন' নামক কবিতাটির প্রায় সর্বাংশ জুড়ে, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিলে কবির রাজনৈতিক অবস্থান আমাদের কাছে তথা বাংলা কবিতার সচেতন পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় সমাজতন্ত্র শব্দ শুনে হারুবাবু বিমূঢ় হয়ে যান। সবার প্রিয় অভিনেতা নিতাই মল্লিক সমাজতন্ত্র শব্দ শুনলে বিষন্ন হয়ে পড়েন বা বিষন্ন হওয়ার মতো কারণ খুঁজে পান যথেষ্ট, 'সামাজিকা প্রমোদতরুণী' সমাজতন্ত্র শব্দের ভেতর দিয়ে গোপাল ভাঁড় খুঁজে পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ তার হাস্যরসের উদ্রেক ঘটে এই শব্দে। আবার কেউ বা 'সমাজতন্ত্র মানে বেশ্যালয় ছাড়া আর কিছুই বুঝি না আজকাল'[১] একথাও বলতে পারেন বলা উঁচিয়ে। সমাজতন্ত্রের এরকম অসহায় চিত্র যখন উপস্থাপিত হয় কোনও চিত্রপটে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কৌতুহল জাগে, যে শিল্পী এই ছবি আঁকলেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অবস্থান কোন জায়গায়, এটা জানার। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের যে অদ্ভুত চেহারা অবতারিত হল জয়দেবের কবিতায়, সেই চেহারা সমাজের ভেতর থেকে উঠে আসা সমাজতন্ত্রের খোসা ছাড়ানো ছবি। কবি এ বিষয়ে কী মনে করেন! বা তাঁর প্রত্যাশা কেমন! পাঠকের এটা জানতে চাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'রাধাকথন' কবিতাতেই কবি লিখলেন,

"তো, বন্ধুগণ, বক্তৃতা সমাজতন্ত্র নিয়ে। আমার বারোমাস্যায় দেখি ও-শব্দের অনাটন, অর্থাৎ ও শব্দের নীতিগত পাকা অবস্থান। এবং স্বপ্নাদেশে গতরাতে এ কথা জেনেছি সমাজতন্ত্র ছাড়া এই পোড়া মুখে অন্ন, প্রাণ, চেতনা, অক্ষর... মোদ্দা কিছুই আর রুচিবেক নাই। অবশ্যই, বিদগ্ধেরা যদিও জানেন, ভারতীয় সংবিধানে যে 'কার্টুন' আঁকা আছে শব্দটির শারীরবৃত্তের, আমার নিষ্ক্রমণ সেই তীর্থে নয়। তাহলে বোঝাই গেল তার আগে চাই সমাজতন্ত্র ও যাঃ, টুকলাম বুঝি, এ কথাটা অন্য কবির।"[২]

অবক্ষয়ে জর্জরিত সমাজের চোখে প্রবল ব্যঙ্গের চাবুক মারতে চেয়েছেন জয়দেব বসু। যে সমাজতন্ত্র বা সমাজবাদের মতবাদ উঠে আসছে উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানার সমমন্টনের ভিত্তি করে এবং অর্থনীতির সমবায়িক ব্যবস্থাপনার হাত ধরে, সেই

সমাজতন্ত্র কীভাবে মানুষের টুকরো টুকরো স্বার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে বিধ্বস্ত হচ্ছে রোজ, এই জিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছে জয়দেব বসুর কবিতায়। ঠিক যেভাবে আলোচনার শেষে আলো গুলো নিভে যায়, আবর্জনা পড়ে থাকে শুধু, সেভাবেই মানুষ তার বোধের দরজায় তালা এঁটে বসে থাকে। জানালার সস্তা কাঠ বেঁকে গিয়ে বন্ধ না হলে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার বন্দোবস্ত হয়। এভাবেই সমাজ চলে। যারা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উৎপাদনের মালিকানা ও অর্থনীতির সমবন্টনের প্রশ্নে রাজনৈতিক লড়াইয়ের মঞ্চে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চান নিরন্তর, তাদের উদ্দেশ্যে সমাজেরই আরেক শ্রেণী বলে ওঠে, "বাতেলা করোনা বাপু, ওসব আমরা জানি। শ্রমিকের দ্বিধা চিত্ত আঞ্চলিক দল, কৃষকের সংস্কার, তোমাদের গদি লোলুপতা এসব জড়িয়ে মিশে এখনো অনেক দিন বাঁচা যাবে, উদ্ধার করা যাবে তোমাদের পিতৃপুরুষ। তাছাড়া, দেখোনা কেন, এসব কি একদিনে হয়! সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর পণ্ডশ্রম।" তারচে "নামো তো বাবা, ভর সন্ধ্যেবেলা কৌটো ঝাঁকানো সেরে ছুট মারছ খালাসিটোলায়? না হলে সহসা কেন যানজটে পথিকেরে ক্লান্ত করে দিয়ে এ যাবৎ বাণী মুখরতা! তোমাদের কাজকম্ম জানা হয়ে গেছে।"[৩]

বামপন্থীদের নিয়ে মানুষের দ্বিধা-বিভক্ত স্বরূপ ফুটে উঠেছে জয়দেব বসুর কবিতা। এর কারণও ছিল যথেষ্ট। "পার্টি যার ঈশ্বর, পার্টি যার ধ্যানজ্ঞান, সেই জয়দেব তখন পার্টি-সদস্য, যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী। ১৯৮৪-তে রাজীব ক্ষমতায়। এই প্রথম বোঝা যাচ্ছে, কংগ্রেস রাজ্য সরকার ফেলবে না। ভয় কাটছে। তার মানে নামছে রাজীব গান্ধীর জনপ্রিয়তার পারদ, ইষৎ সেই সময়ে দেশে বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলা। স্বৈরতন্ত্রী কংগ্রেসকে হঠানো। সেজন্য প্রয়োজন বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য। কিন্তু কেবল দলীয় দর্শন নয়, রাজনৈতিক দর্শন বড় হয়ে উঠেছে কবির কাছে। তাই জয়দেব লেখেন 'প্রতিটি কবিতার জন্ম, তুমি চাও বা না-চাও, হয় রাজনীতি থেকে।' জানাতে চান গভীর বিশ্বাস থেকে 'প্রতিটি শিশুর জন্ম, সঙ্গমের ফলে শুধু নয়, নিবিড়-নিবিড়তম রাজনীতি থেকে।' আর রাজনীতি কী? কী জয়দেবের ভাবনা?, রাজনীতি মানে আমি মানুষকে ঘৃণা করা, মানুষকে রুদ্ধশ্বাস ভালোবাসা বুঝি,/ এবং মানুষ চিনি, নাম দিয়ে নয়, ক্ষমা কোরো, কাজ দিয়ে, পার্টি দিয়ে চিনি।', এই 'কাজ' পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু যেই 'পার্টি'-তে চলে গেলেন, তখনই একটা সর্বনাশের ইঙ্গিত দিলেন। ...পার্টি দিয়ে মানুষ চেনার প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এক সময়ে যেতে হয়েছে বলে বুঝি এ এক বিপদজ্জনক কৃষ্ণগহ্বর। এতে প্রবেশ আছে, পরিত্রাণ নেই। পরিশ্রমও নেই। তাই একসময়ে সব 'আমাদের লোক' হয়ে যায়। আর এই 'আমাদের লোক'-রাই আবার ক্ষমতা রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের 'আমার লোক'-এ রূপান্তরিত হয়।"[৪] এ সবের মধ্যেই নিরন্তর সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বুক বেঁধে বিকল্প এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেছেন কবি জয়দেব বসু।

যে সমাজে দুঃখ যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত বৃক্ষের নিচে জমে থাকা জড়োসড়ো অসহায় স্মৃতি সরিয়ে এক দণ্ড স্বস্তির শ্বাস নিতে পারে মানুষ; যেখানে অশুভ রাত্রির স্তব্ধতা কাটিয়ে নিশ্চিত আশ্রয়ে নিরাপদ হতে পারে; ঘাসের ঠোঁটে ঝরে পড়ে শিশির সলিল, সবুজ পাতার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় অহরাত্র, পৃথিবী আলোকময় বৈভবে ভরে ওঠে; বর্ণপরিচয় পড়ে নিতে পারে অন্ধ বাউল; যেখানে কানের পর্দায় আত্মকেন্দ্রিক স্তব্ধতা ধাক্কা মারে না অহর্নিশি; স্বার্থমগ্ন নির্জনতায় দম বন্ধ হয়ে আসে না কখনও; বঞ্চনার চিন্তাগুলো কিলবিল করে ওঠে না মাথার ভিতরে পোকার মতো; এক দেওয়ালের পাশে আর এক দেওয়াল জুড়ে অন্ধকার লেখা থাকে না কোথাও। তাই জয়দেব বসু লিখতে পারেন, "কেবল সমাজতন্ত্র। আর সেই দিকে পৃথিবীর উন্মত্ত ঝোঁক যদি এখনো বিলম্বিত হয়, নিউটন মেনে তবে আমাকেই ধাক্কা দিতে হবে। কেননা, সমাজতন্ত্র, তুঁহু বিনা আমি যে বাঁচি না।"[৫] আবার 'উন্মোচিত চিঠি :'[৪] কবিতায় দক্ষিণ কলকাতার বেহালার প্রসঙ্গ এবং কংগ্রেসের গুন্ডামির প্রসঙ্গ সরাসরি অবতারণা করেছেন কবি। কবিতার গঠন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যে কথা বলার, তাই সরাসরি বলে যেতে চেয়েছেন অগ্রজ কবি শৈলেশ্বর ঘোষের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতে লিখতে। সরাসরি নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত করে দিয়েছেন অবলীলায়। "বেহালা এখন নাকি ছেয়ে গেছে কংগ্রেসী মাস্তানে... মারুন, কাটুন আর কুচিকুচি করুন আমাকে, আমি এভাবেই শুরু করব লেখা। কবিতার ভার নিয়ে আমার সত্যি কোনো মাথাব্যথা নেই শৈলেশ্বরদা... যতক্ষণ তবু এই সি.পি.এম পার্টি রয়ে যাবে, কলম ঘষটানো আর যে কোনো কবিতা থেকে আমাকে নিবৃত্ত করা নেহাতই অলীক। আমরা ক্যাডার, এটা জানেন নিশ্চয়ই।"[৬]

সামাজিক দায় অনুভব করতে করতে একজন কবি যখন প্রবলভাবে রাজনৈতিক কথা বলেন, তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তখন ব্যঞ্জনার বদলে সরাসরি তীরের ফলার মতো প্রচন্ড ধারালো কিছু একটা এসে সমাজের বারান্দায় বিঁধতে চায়। তাই জয়দেব বসু বারবার ফিরে যেতে চান সময়ের কাছে, সমাজের কাছে। তাঁর কবিতায় ফুটবল মাঠ থেকে ফিরে প্রবল যৌবনের উদ্যম নিয়ে তরতাজা যুবক, ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাটকে মন দেয়। একনায়কতান্ত্রিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, মানব-সভ্যতার বুকে পুঁজিবাদী ভাবধারা প্রসারণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, ক্রমশ কালো মেঘে ঢেকে যাওয়া ভালোবাসাহীন শহরে দাঁড়িয়ে, চাপ চাপ হিংসার রক্ত মুছতে মুছতে মুঠো ভরা ভালবাসার পতাকা হাতে নিয়ে মানুষকে ভীষণ কষ্ট কাটিয়ে ওঠার দিগন্ত চিনিয়ে দিতে চান যে কবি, তাঁর কাব্যবোধ ও প্রকাশভঙ্গি তো একটু আলাদা হবেই। নিঃশেষিত দরজার ভেতরে কেবলই গুমড়ে ওঠা ছাড়া এবং তীব্র যন্ত্রণা ও গোঙানিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া পথ খুঁজে পাওয়া না গেলে, মরিয়া হয়ে ওঠে মানুষ। মানুষই মানব-সমাজের বুকে জমাটবদ্ধ শূন্যতার ভেতর থেকে সুস্থ সময়কে ছিনিয়ে আনতে পারে। অশুদ্ধতার গহ্বর থেকে শুদ্ধতার দিকে সময়কে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে বা ছিঁড়ে তুলে

আনতে গিয়ে, মানবিকতার প্রশ্নে, অনুভূতির প্রশ্নে, ব্যাটারিহীন টর্চের বিপন্নতার প্রশ্নের কব্জির শিরাগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন কবি জয়দেব বসু। তাই তাঁর কবিতার তীক্ষ্ণ অক্ষরগুলো সভ্যতার আলোহীন ক্যানভাসে বৈদ্যুতিক ধাতুর মতো মারাত্মক হয়ে ওঠে প্রকাশ্যে ও প্রকট। তাই প্রশ্ন জাগে,

"কতটা ছিঁড়লে নিজেকে, কতটা ভেজালে আবহমান বোবা কান্নায় কবি হওয়া যায়? কবিতা ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনা বাড়তি বা অধিক, অতিরিক্ত কিছু। কবিতা বুঝবার এবং বাজবার। কবিতা অনুভূতিময় এবং অনুভূতিহীনতার অতিরিক্ত। কবিতার আবেদন বোধের কাছে। বোধিরও কাছে। হৃদয়ে এবং বুদ্ধি, আবেগ এবং প্রখর যুক্তির সোয়েটারি ভেলভেট বুনন কবিতা। শব্দ প্রতিমা, শব্দ ছবি কথা চিত্র কবিতা কী নয়? কবিতা তো একটা জীবনের আশচর্য্য অভিজ্ঞতা; যে অভিজ্ঞতা কখনো কখনো তীব্র অনাসক্ত এবং নির্লজ্জভাবে পরস্পরবিরোধী। কবি কার কাছে বিশ্বস্ত? কবিতা, পাঠক, নিজের কাছে নাকি সব মিলিয়ে সময়ের এক ধাবমান ছবি? 'কে কবি কবে কে মোরে?' জয়দেব বেঁচে থাকলে বলতেন।"[৭]

বোধের সহজ সরল প্রবণতা দিয়ে 'জনগণতান্ত্রিক' রচনা লিখে যান জয়দেব। দুর্দিনের অতীত থেকে জীবনের কলসিতে জমে ওঠা অমাবস্যার বর্তমানে পিত্তরক্ষার তাগিদে দু'মুঠো ভাত প্রার্থনীয় হয়। সভ্যতার কঠিন তমসা কাটিয়ে ওঠার বার্তা নিয়ে প্রত্যুষ এলেও, প্রত্যুষের সাথে সাথে চোখের আলো প্রতিদিন নিভে যায় কিছু মানুষের। অথবা যে আলো জ্বলে উঠতে পারেনি কখনও। বেলা বাড়ে, হতবাক মানুষ খাবারের সন্ধানে ছুটে যায়। প্রিয় ল্যাম্পপোস্টের ধারে ফুটপাতে। ভালোবাসার আলোর কাছে ছুটে যেতে চায় খঞ্জনতা। তবু দিগন্ত অবধি ঢেকে থাকা অন্ধকারে, পবিত্র শাঁখের আওয়াজও ঢাকা পড়ে যায় নিবিড় দারিদ্র্যরেখায়। জীবনের পাতা ঝরে যায়, বিষন্ন ফেরিঘাট থেকে প্রবল অশ্রু-প্লাবনে একে একে ডুবে যায় এক একটি প্রত্যাশার ডিঙ্গি নৌকো। তাই যে রোষ অস্থিহীন, 'নুলো ভিখিরির মতো অক্ষমতা' ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার ক্ষমতা নেই যার, তাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে আমাদের। ঘুরে দাঁড়াতে হবে নিজস্ব ক্রোধের আগুনে, উদাসীনতা কাটিয়ে, আতঙ্ক ভেঙে ফেলতে হবে প্রচন্ড একাত্মততায়, প্রবল ভালোবাসায় ও প্রগাঢ় বিশ্বাসে। সাংঘাতিক সেই জেদের কথাগুলো মর্মে মর্মে ভয়াবহ রক্তাক্ত হতে হতেই লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস রেখেছেন কবি জয়দেব বসু। সমস্ত রক্ত-চক্ষুর নিশানা ছাড়িয়ে মানুষের যেভাবে প্রতিরোধের কথা বলে ওঠা উচিত, কবি সেই স্বর চিনিয়ে গেছেন তাঁর কবিতায়,

"নিজের জমি চেয়েছিলাম, ধুলোর নিচে তাই
থুবড়ে আছি, রক্ত ঘন বিষে

চাষের জমি চেয়েছিলাম, ব্রহ্মর্ষি পুলিশ
কণ্ঠনল ভরে দিয়েছে শিসেয়

ছিন্নদেশ চাইনা আর স্বভাবতই লুটিয়ে আছি
পাহাড় বনে ঝরা পাতার ঘ্রাণে

বাঁচবো বলে জন্মেছি তাই আরোয়াল বা দার্জিলিঙে
মৃতদেহের এক রকমই মানে

বুলেট এত নিবিড় টানে বাঁধছে দেশে-দেশে
জোহানেসবার্গ - পানামা - গঙ্গা

মন কি আজো লেনিন চায়? মনকে বলো হ্যাঁ,
মনকে বলো হ্যাঁ, তবু হ্যাঁ"[৮]

মানুষের অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইয়ে, চাপ চাপ রক্তের দাগ লেগে থাকা সমাজের পটভূমিকায়, একটার পর একটা বিঘ্ন বিপত্তির খুঁটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন কবি জয়দেব বসু। একের পর এক সীমানার কাঁটাতার কাটতে কাটতে হাট করে দিতে চেয়েছেন সীমান্ত। দেখতে চেয়েছেন 'সিঁথির সিঁদুরের মতো' লাল টকটকে সূর্যোদয়, পবিত্র বাণীর মতো প্রসারিত আকাশ। নিয়ত সূর্যাস্ত দেখে ক্লান্ত হতে হতে, দাহহীন সিঞ্চনহীন পরিণতিতে শূন্য হতে হতে, মুকুটহীন দেশে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রেমের মধ্যে ছুরি আর ছুরির মধ্যে প্রেম নিঃশব্দে বাসা বাঁধে। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস টুকরো টুকরো হয়ে যায় অনায়াসে, এক নিমেষে। কাজেই মানুষের এবং সভ্যতার মুক্তির প্রতীক লাল টকটকে সূর্য কেড়ে আনতে হবে মানুষকেই। সেই মুক্তির পথ মসৃণ নয়, ছিলও না কখনও, বহুকালের গতানুগতিক ভঙ্গুর পথ ডিঙোতে, প্রয়োজনে সাংকেতিক অবয়ব অবলম্বন করতে হলে তাও শ্রেয়। তারপর একদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের গলায় কোপ বসাতে পারে যারা, নির্দ্বিধায় কবি তাদের সঙ্গে প্রণয়ে মগ্ন হতে পারেন। শোষকের চোখে চোখ রেখে মুক্তির সূর্য প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায় যারা, তাদের প্রতি কবি 'ব্লেড দিয়ে শিরাকাটা নির্বোধ প্রেমিক' হতে পারেন। এই ভালোবাসার পথে, অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে, 'একটু কম জঙ্গিপনা করো' বলে তাকে কেউ জ্ঞান দিতে এলেও তিনি থামেন না। তাই জয়দেব বসু মানে বাংলা কবিতার প্রশস্ত ক্যানভাসে বেপরোয়া এক আবেগের নাম, এ কথা আমরা বলতেই পারি। যৌবনের উদ্দাম প্রবাহে মানব-সমাজকে এভাবেই দেখতে চেয়েছেন কবি জয়দেব বসু। মার্কস, লেনিন, বামপন্থাকে সঙ্গী করে নিয়েছেন জীবনে ও কবিতায়। চেয়েছেন শ্রেণী বৈষম্যহীন এক মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা, আর সহিষ্ণুতায় পূর্ণ মানবিক হৃদয়। 'দীপাবলি' কবিতার তৃতীয় অংশে গিয়ে কবি লিখলেন,

"আশা ও নিরাশাহীন, দাহ বা সিঞ্চনহীন আমি দেখি
পাতার শিরায় ছুটে যাচ্ছে স্রোত, আকাশে মেঘের কোনো চিহ্ন নেই,
লুব্ধক- অরুন্ধতী- কালপুরুষের বেল্ট আমার চোখের মধ্যে
চোখের মণির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু
ভেসে উঠছি ক্রমশই, আমার সুখ হচ্ছে না দুঃখ হচ্ছে না,
শূন্যতার মধ্যে কোনো ঢেউ নেই, শিরশিরানি আছে,
তিরতিরে ঈথারে যেন ভেসে যাচ্ছে পারস্য-গালিচা, আর বহু নীচে
আরব্য রজনীর আলো, সায়লেন্ট নাইট, স্যাটারডে নাইট ফিভার...
কলেজে ঢোকার পর আমার ট্রাভেল্টা কাট আর গলা থেকে
রুদ্রাক্ষ ছিঁড়েছিল আমারই কমরেড
আমি সেই দিন রাগ করি, পরদিনই জড়িয়ে ধরেছি, তারপর লেনিন পড়লাম।"[৯]

কবি উপলব্ধি করেছেন শূন্যতার মধ্যে কোনও সৃষ্টি ও সম্ভাবনা নেই, বিনাশও নেই আবার প্রেমও নেই। তাই অসহায় ভাবে ভালোবেসে কোনও অসুখ-বিসুখ নেই কবির। এই অসুখ-বিসুখ আসলে ভাবনা ও বোধের চিহ্ন বহন করে। কাজেই তিনি অসুস্থ কেনই বা হতে যাবেন! এভাবে শূন্যতার উপর ভেসে থাকতে থাকতে কবি অনুভব করেছেন, সময়দণ্ড কীভাবে ছুঁয়ে যায় ঘটনা-শীর্ষকে। যে ঘটনায় চরাচর স্তম্ভিত, রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে যায়, সেই ঘটনায় কবি ও কখনও কখনও স্তব্ধ হয়ে যান, নিঃশব্দে পড়ে থাকেন আবার কখনও বা কথা বলতে চান মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে এবং সময়ের সঙ্গে। কিন্তু কবির সেই কথা কি আদৌ কেউ শুনতে পায়! প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নটিও থেকে যায় পাশাপাশি। বিপর্যস্ত ভাষায় মহাজগতের ঘূর্ণনে, ছায়াপথে, জীবনের আবেষ্টনি জুড়ে মৃত্যুকে এবং সত্যকে জাগিয়ে তুলতে চান জয়দেব বসু। এভাবেই তিনি বাংলা কবিতার শস্যক্ষেত্রে ধ্বনিত করতে চেয়েছেন পৃথিবীর গান, রুদ্ধশ্বাস মানুষের জীবন-সঙ্গীত। জেগে উঠতে চেয়েছেন স্রোতে ও স্রোতের বিপরীতে, আলোয় ও আলোহীনতায়। 'দীপাবলি' কবিতায় কবি যেমন লেনিন পড়তে শুরু করার স্বীকারোক্তি করেছেন। ঠিক তেমনই 'লেনিন' শীর্ষক কবিতায় তাঁর বক্তব্য, "প্রত্যূষের সাথে-সাথে তোমার চোখের থেকে আলো মুছে যায়। বেলা বাড়ে, আর, তুমি হয়ে ওঠো মিনারসদৃশ। হতপ্রাণ, চকচকে, উঁচু। দ্বিপ্রহরে যে কুকুর তোমার পায়ের কাছে হিসি করে, তাকে তুমি খাবারের সন্ধান দিয়েছিলে। প্রিয় ল্যাম্পপোস্ট, এখন সবাই শুধু ভুলে যাবে একদিন তোমার আলোয় সাড়া পথ হেঁটে গেছে খঞ্জজনতা। মাঝরাতে তোমাকে জাপটে ধরে আকুল কেঁদেছে যত কবি ও নাবিক।"[১০]

তথ্যসূত্র :

১। বসু, জয়দেব, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ.৭

২। তদেব, পৃ.৭

৩। তদেব, পৃ.৭

৪। হক, ইমানুল, "কবি জয়দেব বসু : কিছু কথা", গুরুচণ্ডালী, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২, https-www.guruchandali.com

৫। বসু, জয়দেব, শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ.৮

৬। তদেব, পৃ.১১

৭। হক, ইমানুল, "কবি জয়দেব বসু : কিছু কথা", প্রাগুক্ত

৮। বসু, জয়দেব, শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

৯। তদেব, পৃ.৩২

১০। তদেব, পৃ.২৩

দীপা মাজি

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নর-নারায়ণ' নাটকে কর্ণের কৃষ্ণভক্তি : বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব

মহাভারতের দুই অন্যতম চরিত্র কর্ণ এবং কৃষ্ণ। তাঁরা উভয়েই শক্তিশালী চরিত্র। মহাভারতের কর্ণ চরিত্রটিতে দোষ ও গুণ দুইই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দোষগুলিই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি ছিলেন দানী ও জ্ঞানী। বীরত্ব ও সহিষ্ণুতাও তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান। অন্যদিকে কৃষ্ণ চরিত্রের ঘিরে রয়েছে রহস্যময়তা এবং জটিলতা। মহাভারতে মূলত ধর্মে এবং রাজনীতিতে সমন্বয় সাধনের জন্যই মহাকাব্যে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষ্ণ পান্ডবদের সহায়, এবং কর্ণ কৌরবদের সপক্ষে ছিলেন। মহাভারতে একজনকে যোদ্ধা হিসেবে দেখা যায়, অপরজনকে সারথি হিসাবে। একজন ন্যায়ের পক্ষে অপরজন অন্যায়ের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুজনেই সেই যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। মহাভারতে কর্ণের কৃষ্ণ-প্রীতি বা কৃষ্ণ-বিরাগ সম্পর্কে তেমন কিছুই দেখানো হয়নি। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত "নর-নারায়ণ" নাটকে তাঁদের বিরোধ ও মিলনের স্থানকে দেখানো হয়েছে। এই নাটকে আমরা দেখতে পাই কর্ণ তাঁর মনের জটিল দ্বন্দ্বের আবহ থেকে বেরিয়ে এসেছেন কৃষ্ণভক্তি সাহায্যে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন নাটকেই কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে। তবে কৃষ্ণভক্তি অভিমুখের পরিবর্তন ঘটেছে 'নর-নারায়ণ' নাটকে। তিনি এই নাটকে পূর্ববর্তী নাট্যকারদের কৃষ্ণভক্তিরসকে অনুসরণ করেননি। 'নর-নারায়ণ' নাটকটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে 'কর্ণ' নামে এই নাটকটি লেখা শুরু হয়। কর্ণ এই নাটকের প্রধান চরিত্র। নাটককার ১৯২৫ সালে নাটকটির রচনা সম্পুর্ণ করেন। এই নাটকটি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে, নাট্য মন্দিরে। এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে একটি। এই নাটকটির রচনার পরেই তিনি 'কৃষ্ণ' নামে একটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু নাটক্তি তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। 'নর-নারায়ণ' নাটকটি প্রথম অভিনয় হওয়ার কয়েক মাস পরই তিনি পরলোক গমন করেন। এই নাটকটির রচনাকালেই তাঁর মধ্যে কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত হয়েছিল। তাই অন্তিমজীবনে কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এই বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নয়। ভক্তের সঙ্গের ভগবানের মিলনে যুক্তি অনুসৃত। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস'(২য় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন—

"এ"কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, 'নর-নারায়ণ' রচনা শেষ হইবার অব্যবহিত পরই

ক্ষীরোদপ্রসাদ ‘কৃষ্ণ’ নামক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আর সম্পূর্ণ করিতে চাইতে পারেন নাই। ইহার অর্থ এই যে, ‘নর-নারায়ণ’ রচনাকালেও কৃষ্ণ-ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ ছিল। কৃষ্ণ সম্পর্কে যে বক্তব্য তাহার এই নাটকে অবশিষ্ট ছিল, তাহাই তিনি তাহার নতুন নাটকে বলিতে চাহিয়া ছিলেন। সুতরাং নর-নারায়ণ নাটক কৃষ্ণ-ভক্তিমূলক। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকের কৃষ্ণভক্তি প্রকাশের ধারা ও বিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকের কৃষ্ণ প্রকাশের ধারা অভিন্ন ছিল না- সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকের কৃষ্ণভক্তির পার্থক্য দেখা যায়।”[১]

নাটকের শুরু আশ্রম সান্নিধ্যে। শুরুতে সেখানে তাপস ও তাঁর কন্যা অস্তিকে গো-বধকারীর সন্ধান করতে দেখা যায়। সেখানে তাপস কর্ণ কে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে বলে—

> “দেহধারী অংশুমালী সম
> সতেজে স্বরূপে সুপ্রকাশ।
> কে আপনি পুরুষপ্রধান।”[২]

তাঁর বিরাটাকার দেহ দেখে অংশুমালী হিসেবে ভ্রম হয়। তখন কর্ণ নিজের পরিচয় গোপন রেখে মিথ্যা পরিচয়ের সঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন- তিনি অংশুমালির সেবক এবং দ্বিজ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর পিতৃদত্ত নাম বসুসেন, হস্তিনাপুর নিবাসী এবং তিনি কর্ণ নামেই সুপরিচিত। তিনি ভগবান পরশুরামের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে এসেছেন। পরশুরাম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ছাড়া ধনুর্বিদ্যা শেখান না। তাই কর্ণ মিথ্যা বংশপরিচয়ের আশ্রয় নেন। কর্ণই তাঁর শেষ শিষ্য, তাই ধনুর্বেদের সমস্ত জ্ঞান কর্ণকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বুঝেছিলেন কবচ কুণ্ডলধারী কর্ণের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণের পর, কর্ণের সমতুল্য আর কেউ হতে পারেনা। কর্ণ পরশুরামের কাছে ব্রাহ্মণের পরিচয়ে ধনুর্বিদ্যা শিখেছেন। তবে আসল পরিচয় জানতে পারলে পরশুরাম তাঁকে তিরস্কৃত করেন। অভিশপ্ত জীবনের সূচনা এখান থেকেই। এক মিথ্যা যে কোনো মানুষের জীবনে ভয়ানক বিপর্যয় আনতে পারে, কর্ণ ও পরশুরামের কাহিনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অভিশপ্ত জীবনের বিপর্যয়ের সূত্রপাত যেখান থেকে নাট্যকার সেই অংশটিকে প্রথমেই তুলে ধরেছেন।

নাটকের শুরুতে দেখি পরশুরাম ক্লান্ত হয়ে কর্ণের জানুতে শয়ন করেন এবং নিদ্রা যান। সেই সময় কর্ণকে এক বজ্রকীট দংশন করে। গুরুর ঘুমে ব্যাঘাত যাতে না ঘটে, তাই নিঃশব্দে তিনি তীব্র দংশন জ্বালা সহ্য করেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে কর্ণের রক্তস্পর্শে গুরুর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। গুরু বুঝতে পারেন শিষ্য ব্রাহ্মণ বংশজাত নন। তাঁর দেহে ক্ষত্রিয়ের মতো সহিষ্ণুতা বর্তমান, তাই দুঃসহ জ্বালা সহনে সক্ষম। কর্ণ তার কাছে নিজ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু প্রতারণার জন্য পরশুরাম শেষ পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দেন—

"ভাল, সত্যই- সত্যই যদি
 সূতপুত্রের শোণিতে
 অসচি হইয়া থাকি আমি,
এ পাপ স্পর্শিবে না তোমারে।
নহে,দ্বিজ- পুত্র জ্ঞানে জগৎ কল্যাণে,
যে গুহ্যাস্ত্র শিক্ষাদানে,প্রয়োগ সংসারে,
তোমারে করেছি আমি অজেয়ও ধরায়,
রে মূঢ়, সঙ্কট কালে-বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি।"[৩]

কর্ণ নিজেকে সূতপুত্র হিসাবেই জানতেন। তাই গুরুর দেওয়া অভিশাপ ব্যর্থ হবে — এই বিশ্বাস তাঁর মনে ছিল।

নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য- হস্তিনাপুরের সভামন্ডপ। সেখানে সূতপুত্র হওয়ার কারণে তিনি সভায় সর্বসমক্ষে অপমানিত, অসম্মানিত হন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমত্যানুসারে, কৃষ্ণের সম্মুখে কর্ণকে অপমানজনক কথা বলেছেন—সেই বার্তা নিয়ে এসেছেন সঞ্জয়। অর্জুন সূতপুত্র কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নারাজ। অপরদিকে ভীষ্ম দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নারদের মুখে জেনেছে নর-নারায়ন রহস্য কথা। সে কথা বিশ্বাস করে জনসভায় প্রকাশ করেন—

"ধনঞ্জয়-বাসুদেব মায়াতিমানব।
পূর্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
একআত্মা- দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।
দুষ্কৃতির ধ্বংসের তরে, ধর্মের রক্ষণে-
যুগে যুগে হ'ন তারা অবতার।"[৪]

ভীষ্ম নর ও নারায়ণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। পূর্বজন্মের দুই ঋষি এই জন্মে নর ও নারায়ণ। নর রূপে জন্মেছেন ধনঞ্জয় (অর্থাৎ অর্জুন) এবং নারায়ণ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন স্বয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব। অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের রক্ষার্থে তাঁরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কর্ণ একথা বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক। এই প্রসঙ্গে অজিত কুমার ঘোষ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—

"কর্ণে'র চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি গভীরভাবে বিষ্ণুভক্ত- কিন্তু তাহার তীব্র বিদ্বেষ নরনারায়ণ- ধনঞ্জয় ও বাসুদেব কৃষ্ণের বিরুদ্ধে। কৃষ্ণ যে নারায়ণ এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন।"[৫]

কিন্তু শেষপর্যন্ত কৃষ্ণই তাঁর সম্মুখে নর ও নারায়ণ রূপে ধরা দিয়েছেন। তাঁর কৃষ্ণের

প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণই যে নারায়ণ — সেটা বিশ্বাস করতে দ্বিধা ছিল। কর্ণের অন্তরে কৃষ্ণের সম্পর্কে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বই হয়ে উঠেছে নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

কর্ণের বিবাদ মূলত অর্জুনেরই সঙ্গে। তাঁদের একে অপরের প্রতি হিংসা, তীব্র রেষারেষি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কর্ণের মধ্যে বিদ্যমান। সে কথা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য অস্বীকার করলেও তিনি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে জাহির করেন। তিনি সূত্র বংশজাত হিসেবেই জনসমাজে পরিচিত। যুদ্ধের শর্তানুযায়ী ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই আক্ষেপ তাঁর মধ্যে ছিল। বংশজাত পরিচয়কে আশ্রয় করে ভীষ্ম বারবার কর্ণের দুর্বল স্থানে আঘাত করেছেন। তিনি দুর্যোধনের অপকর্মের পেছনে দায়ী করেছেন কর্ণকে—

> "তুমি নিশ্চয় জানবে মহারাজ
> তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের যে দুর্মতি
> উপস্থিত হবে সেটা দুর্মতি সূতপুত্র
> কর্ণের কর্ম।"[৬]

তাঁদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা চলতে থাকে। ভীষ্মের অপমান কর্ণকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য উদগ্রীব করে তোলে। তাই কর্ণ সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করেন-

> "যতদিন জীবিত রহিবেন পিতামহ,
> ততদিন কেহ না দেখিবে মোরে কৌরব সভায়,
> কেহ না দেখিবে দাঁড়াইতে রণাঙ্গনে।
> যেদিন সমরে পড়বেন পিতামহ,
> সেইদিন অস্ত্র পুনঃ করিব গ্রহণ।
> সেইদিন হতে কর্ণের পৌরুষ রাজা,
> দেখিবে জগৎ-বাসী।"[৭]

নাটকে কৃষ্ণকে প্রথম দেখা যায় প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে। পাণ্ডবশিবিরে। পাণ্ডুপুত্রদের ও পুত্রবধূর সঙ্গে। কৃষ্ণের প্রতি পান্ডু পুত্রদের প্রবল বিশ্বাস ছিল। কৃষ্ণ তাঁদের সকল দুঃসময়ের পরিত্রাতা। তাঁর পরামর্শ একান্তই প্রয়োজন। দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে অপহৃত রাজ্য ফেরত দিতে রাজি হননি। তখন যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণের প্রতি আস্থা প্রকাশ পেয়েছে—

> "কি কর্তব্য কৃষ্ণ? এই মহাভয় হ'তে
> পরিত্রাণ করিতে আমারে, একমাত্র তুমি।"[৮]

কৃষ্ণ তখন স্থির মনে সকলের বক্তব্য শোনেন। কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে কনোরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ হয়নি। তিনি যুধিষ্ঠির জগতের কল্যাণের জন্য সন্ধিস্থাপন করতে চান। তাই যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করেন যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি হস্তিনাপুরে যাবেন।

"বাক্যে, কার্যে, সন্ধির স্থাপনে
করিব প্রয়াস যথাসাধ্য- যথাশক্তি।"[৯]

এই নাটকে দুর্যোধন, দুঃশাসন ছাড়া প্রায় সকল চরিত্রের মধ্যেই কৃষ্ণ-ভক্তি প্রকাশিত। কর্ণও তার ব্যতিক্রম নয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ডক্টর ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-

"পৌরাণিক পরিমণ্ডলে ভক্তিভাব সন্নিবেশ স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নরনারায়ণ নাটকে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক বিভূতি সম্পর্কে অবিশ্বাসী কর্ণের বিশ্বাস স্থাপনের ইতিবৃত্ত চরিত্র বিকাশ এবং ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে। মহাভারতের কর্ণ কৃষ্ণভক্ত বলে বর্ণিত হন নি কিংবা চরিত্রের সে দিকটিও চিত্রিত হয় নি, কোথাও ঘোরতর কৃষ্ণবিরোধী বলে তাকে ঘোষণা করারও প্রয়োজন দেখা যায়নি।"[১০]

কর্ণের মনে নারায়ণের শক্তি নিয়ে তীব্র সংশয় ছিল। তিনি পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারেননি, আবার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে চাননি। তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী যখন বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহায়। সেকথা শুনে আঘাত পেয়ে বলে ওঠেন-

"ভাল, নারায়ণ অন্তর্যামী।
বাসুদেব
যদি নারায়ণ- বাসুদেব অন্তর্যামী।
কর্ণের অন্তর সঙ্গে তার পরিচয়।
দ্বিগুণ উতসাহ তবে, দ্বিগুণ আনন্দে
পদ্মাবতী, বাসুদেব-সখা ধনঞ্জয়ে
জীবন-মরণ যুদ্ধে করিব আহ্বান!"[১১]

কর্ণ জনসমক্ষে অবিশ্বাস করলেও 'নর-নারায়ণ' অর্থাৎ অর্জুন ও কৃষ্ণের সম্পর্ককে সম্মান করতেন এবং ভালোবাসতেন। কিন্তু অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব থেকেই অন্তরে জেগেছিল প্রতিশোধস্পৃহা। নীচবংশজাত হওয়ার কারণেই সমাজে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরের সম্মান থেকে বঞ্চিত। তাই যুদ্ধে অর্জুন ও তাঁর সখা কৃষ্ণকে পরাস্ত করাই ছিল লক্ষ্য—

"সত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন,
অধিরথ যদি মোর পিতা, শুনে রাখো
নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব
রণে নরনারায়ণে।"[১২]

হস্তিনাপুরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ উপস্থিত হন। তাঁকে কারাগারে বন্দী করার জন্য কর্ণ দুর্যোধনকে উপদেশ দেন। একদিকে ধার্তরাষ্ট্রদের পরামর্শদাতা কর্ণ, অপরদিকে পাণ্ডবদের সহায় কৃষ্ণ। এখানে যুদ্ধে দুজনের গুরুত্বকে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। শকুনি কর্ণকে দুর্যোধনের যোগ্যসখা বলেছেন। কর্ণের আসল উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে বন্দী করা নয়, পঞ্চপান্ডবের ক্ষতি করা। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন—

"বন্ধন - বন্ধন এ শুভ সুযোগ সখা,
কিছুতে ক'র না ত্যাগ। যেমনি শুনিবে পঞ্চভ্রাতা
কেশব হয়েছে বদ্ধ হস্তিনার
কারাগারে, অমনি সকলে, ভগ্নদন্ত
ভুজঙ্গের মতো উৎসাহ-চেতনাহীন
কণ্ঠিত হইবে ভূমি তলে।"[১৩]

কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্কালে আসন্ন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কর্ণ কৃষ্ণকে কল্পনা করেছেন। তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে বিরাজমান। তাঁর অবচেতন মনে জাগ্রত হন কৃষ্ণ। তবে সেখানেও বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বও ছিল। কর্ণ ভক্তরূপে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করেছেন। হৃদয়স্থলে উন্মীলিত হয়েছে কৃষ্ণের কিশোর রূপ—

"বাসুদেব
যদি তুমি অন্তর্যামী, তোমারে শুকায়ে
এ কথা, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চলি আমি।"[১৪]

কর্ণেরও চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে কৃষ্ণ ভাবনায়। তবে কর্ণ তখনও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করতে পারেননি।

তিনি সূর্যের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইন্দ্রকে নিজের কবচ কুণ্ডল দান করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁকে পরাজয় করা অসম্ভব। অর্জুনের বিনাশের জন্যই তাঁর বেঁচে থাকা-

"জীবিত থাকিতে চাই, অর্জুন- বিজয়,
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।"[১৫]

কর্ণের এই দম্ভ পতনের আরেক কারণ হয়ে উঠেছিল।

নাটকের দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের সভামন্ডপে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসেন। সন্ধির উদ্দেশ্য- ন্যায্যপ্রাপ্য অর্ধরাজ্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যাবর্তন। তিনি সকলের সামনে সেই প্রস্তাব জানিয়েছেন। এতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অকার্যের প্রতিকার হবে। দুই পক্ষেরই মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যের কথা বলেন। তাতে দুর্যোধন অসম্মতি প্রকাশ করলে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সতর্ক করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন—

"সন্ধি-সন্ধি- একমাত্র
অভিরূচি সন্ধি
হিতকামী কেশবের আবেদন
নিস্ফল ক'রনা দুর্যোধন।"[১৬]

সভামঞ্চে উপস্থিত ধৃতরাষ্ট্র ছাড়াও পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য ও মা গান্ধারী তাকে নিষেধ আজ্ঞা দেন। দুর্যোধন সকলের বাধা অমান্য করে কৃষ্ণকে বাঁধতে উদ্যত হয়েছেন।

সকলের মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ হলে কৃষ্ণের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়নি। শান্তভাবে বলেছেন—

"আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে,
আমি বহু-মুক্তিরূপ-জগতের বন্ধন
ভিতরে। আমি অণু-
বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ- ব'সে আছি বন্ধন সীমায়।"[১৭]

তিনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্বমহিমা প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও দুর্যোধন তাঁকে বন্দী করতে গেলে তাঁর বিশ্বরূপের প্রকাশ ঘটে।

কর্ণ দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করে মাত্র পাঁচদিনে তিনি পাণ্ডব শিবির নিশ্চিহ্ন করবেন সে কথা শুনে ভীষ্ম তাঁকে অপমান করেন এবং পুনরায় নর-নারায়ণের উপস্থিতি সম্পর্কে বলেন—

"আত্মশ্লাঘাকারী হীন-সূতের নন্দন,
এখনও দেখ নাই এক রথে
কেশব-অর্জুনে।"[১৮]

যেখানে কৃষ্ণ এবং অর্জুন উপস্থিত থাকবেন, সেখানে পাণ্ডবদের পরাজয় করা ব্যর্থ হবে। ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রদের কৃষ্ণের এই প্রতি অন্ধবিশ্বাসের বিরূদ্ধতা করেন কর্ণ। তিনি অবিশ্বাসের সুরে কৃষ্ণের সম্পর্কে দুঃশাষনকে বলেন—

"সমস্ত বুঝেছি আমি। মোহিনী-মায়ায়
সবারে ক'রেছে অন্ধ। দেখায়েছে বাজি।"[১৯]

কর্ণ ও তার স্ত্রী পদ্মাবতীর কথোপকথনে উঠে এসেছে স্নেহ-বাৎসল্যের কথা। কর্ণের মা রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মা যশোদার মাতৃস্নেহের সাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। কর্ণের আসল মাতা কোনটি একথা কৃষ্ণই তাঁকে প্রথম জানিয়েছেন। তিনি কর্ণকে পাণ্ডব শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। কর্ণের কৃষ্ণের অনুরোধকে প্রলোভন বলে মনে হয়েছে। তিনি সিংহাসনের প্রলোভনকে ত্যাগ করে যুদ্ধকেই বেছে নিলেন। জয়দ্রথ বধের পরও কৃষ্ণের নারায়ণত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন।

নাটকের একেবারে শেষ অংশে দেখি তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জীবনের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছেন। কর্ণের রথচক্র মাটিতে মগ্ন এবং তিনি মৃত্যুর নিকটে উপস্থিত। তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনা দায়ক। সেখানে কৃষন শোকপ্রকাশ করলে ভীম অবাক হয়ে বলেন-

"একি কৃষ্ণ, জল ভারাক্রান্ত
কেন আখি! কি আশ্চর্য! কার শোকে? ওই

পাণ্ডবের চিরশত্রু রাধার নন্দন
কাতর কি করিল তোমারে।"[২০]

কর্ণ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কৃষ্ণের নারায়ণত্বে বিশ্বাস করেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন—

" বাসুদেব-বাসুদেব
একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর।
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ।"[২১]

কর্ণের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। তিনি কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করলেও নারায়ণত্বের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকে কর্ণ চরিত্রটি গঠিত মানব মনের জটিল দ্বন্দ্ব নিয়ে। চূড়ান্ত অপমান ও বঞ্চনার জন্য তাঁর ভিতরে সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র ক্ষোভ এবং জেদ। তাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতায় সসম্মানে প্রতিষ্ঠা লাভ। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি পরাজিত হয়েছেন। তবে তিনি কৃষ্ণের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে স্থান পেয়েছেন। যে দ্বন্দ্ব শুরু থেকে তাঁর মনে ছিল, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সমাপ্তি হয়। সবশেষে মৃত্যুর কাছে গিয়ে কৃষ্ণের কাছে সমর্পন করে। বিশ্বাস করেন কৃষ্ণই নারায়ণরূপী নর। এই প্রসঙ্গে বৈদ্যনাথ শীল বলেছেন— " 'নর-নারায়ণ' নাটকের কর্ণ চরিত্রের কৃষ্ণভক্তি কর্ণের জীবনকে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া নিশ্চিত পরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছে।"[২২]

নাট্যকার কর্ণ চরিত্রের মধ্যে দেখিয়েছেন মানুষের জীবনের তৃষ্ণা ও যন্ত্রণার ছবি। যা অবসান ঘটেছে ভক্তির দ্বারা। বিশ শতকে এই পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিয়ে এলেন সমকালীন জিজ্ঞাসা। কর্ণের ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি নয়। ভক্তি যুক্তি অনুসৃত। এই নাটকে যে ভক্তিরসের সন্ধান পাই, তা প্রচলিত ভক্তি রসের ধারাকে অনুসরণ করেনি। এখানে নাট্যকার কৃষ্ণভক্তিকে তীর্যকভাবে প্রদর্শন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস"(দ্বিতীয় খণ্ড), এ. মুখার্জী. অ্যাণ্ড কোর প্রাইভেট লিঃ,১৩৬৭, কলকাতা, পৃ-২৫৯
২. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক', পুস্তক বিপণি,১৯৯৫, কলকাতা,পৃ-৩৫৫
৩. তদেব,পৃ- ৩৬০
৪. তদেব,পৃ- ৩৬২
৫. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, ১৪২৫, কলকাতা,পৃ-২৩৫

৬. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ-৩৬৩
৭. তদেব, পৃ-৩৬৫
৮. তদেব, পৃ- ৩৬৬
৯. তদেব, পৃ- ৩৬৮
১০. ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ', নিউ বুক ট্রাষ্ট,১৯৫৯, কলকাতা, পৃ-৩০০
১১. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক', পুস্তক বিপণি, কলকাতা,পৃ- ৩৭৪
১২. তদেব, পৃ- ৩৭৪
১৩. তদেব, পৃ - ৩৭৬
১৪. তদেব, পৃ - ৩৭৭
১৫. তদেব, পৃ -৩৭৮
১৬. তদেব, পৃ - ৩৮১
১৭. তদেব, পৃ - ৩৮৫
১৮. তদেব, পৃ - ৩৮৯
১৯. তদেব, পৃ - ৩৯১
২০. তদেব, পৃ - ৪২৯
২১. তদেব, পৃ -৪৩১
২২. বৈদ্যনাথ শীল, 'বাংলা সাহিত্যের নাটকের ধারা', এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, পৃ-৪৮৬

দোলন চ্যাটার্জী

চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের অনবদ্য শিল্পরূপ : শাক্ত পদাবলী সাহিত্য

শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের আবেদন সর্বস্তরের পাঠক ও শ্রোতার কাছে আজও অমলিন যে দু'একটি কারণে, তার মধ্যে অন্যতম- চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের অনবদ্য শিল্পরূপ। শাক্ত পদাবলীর 'লীলা' অংশে তথা 'উমা সঙ্গীতে' প্রধান চরিত্র মা মেনকা। কন্যা উমাকে কেন্দ্র করে মা মেনকার বাৎসল্যের ভাব এই অংশে রসরূপ লাভ করেছে- মা মেনকার যে স্নেহ-ব্যাকুলতা, মমতা অংশটিতে প্রকাশিত তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ। বৈষ্ণব সাহিত্যেও আমরা বাৎসল্য রসের উৎকৃষ্ট পদ পেয়েছি, কিন্তু শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে না। বৈষ্ণব পদের বাৎসল্য অনেকটা ভাবজগতের বস্তু। গোচারণে যাওয়ার জন্য সেখানে মা যশোদার উৎকণ্ঠাকে অহেতুক বলে মনে হয়- আমাদের হৃদয়ে তা মর্মভেদী হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে মা মেনকার কন্যার জন্য যে উৎকণ্ঠা, বেদনা তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গভীর ও মর্মভেদী হয়ে ধরা দেয়।

শাক্ত পদাবলীতে যে পারিবারিক আলেখ্য আমরা পেয়েছি তাতে মেনকা ছাড়া গিরিরাজ, উমা, শিব ইত্যাদি চরিত্র উপস্থিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু বাৎসল্যময়ী মা মেনকার অন্তরের বিচিত্র ছবিই এর প্রধান বিষয়। 'মাতৃহৃদয়ের গান'ই এর প্রধান উপাদেয়। বাৎসল্যময়ী মায়ের অন্তরের প্রথম ছবি ধরা পড়ে 'বাল্যলীলা' পর্যায়ে। যদিও 'বাল্যলীলা' পর্যায়ের পদের সংখ্যা স্বল্প, তবুও কয়েকটি পদের মধ্য দিয়ে মেনকার বাৎসল্য ভাব চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, রামপ্রসাদের একটি পদে দেখি- চপল, অবোধ বালিকা উমা রজনী শেষে আবদার করেছে আকাশের চাঁদ ধরে দেওয়ার জন্য। এই আবদার না মেটায় সে স্তন্যপান করেনি, ক্ষীর ননী কিছুই খায়নি- কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে, মুখ হয়েছে মলিন। তাতে মা মেনকা অস্থির হয়ে উঠেছেন। কারণ—

> "কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
> মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?" (রামপ্রসাদ)

'বাল্যলীলা'য় মা মেনকার বাৎসল্য ভাবের যে প্রকাশ তা বহুগুণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গানে। আলোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর ভাষায়- "কন্যাসন্তানের জন্য জননীর হৃদয়োত্থিত অশ্রান্ত অশ্রুর ধারায় আগমনী ও বিজয়ার পদাবলী অভিষিক্ত; গানগুলি অতলান্ত মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া জননীর যে দুশ্চিন্তা, তাহাকে কাছে পাইবার জন্য যে দুর্বার আগ্রহ, কাছে পাইয়া মিলনের যে আনন্দ-তন্ময়তা, আবার বিদায় দিতে গিয়া যে মর্মস্পর্শী অশ্রু-কাতরতা, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় শাক্ত পদাবলীর লীলা-অংশ করুণ-মধুর।" (শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, পৃ. ৮৮)

'বাল্যলীলা' পর্যায়েই আমরা দেখেছি কন্যার স্তন্যপান না করা, ক্রন্দন, মলিন মুখ ইত্যাদিতে মা মেনকার উদ্বেগ-আকুলতা। সেই কন্যাকে সমাজের কৌলিন্যের বাধ্যতায় বিবাহ দিতে হয় মাত্র আট বছর বয়সে। যে শিবের পরিবারে কন্যা উমা ঠাঁই পায় সেই পরিবার নিত্য অভাব অনটনে জর্জরিত। তার উপর আবার শিব বয়স্ক, নেশাখোর, উদাসীন- "শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না" (রামপ্রসাদ)। এছাড়াও উমার রয়েছে সতীনের জ্বালা- 'সতিনী সরলা নহে'। সব মিলিয়ে মেয়েকে শিবের হাতে অর্পণ করে উৎকণ্ঠিতা মাতাকে তাই দিন-রাত চোখের জল ফেলতে হয়। কন্যার জন্য মাতার চিন্তার শেষ নেই। কন্যার কষ্টের কথা ভেবে কন্যাকে নিজের কাছে এনে রাখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, অনুমতি মিলবে না। এছাড়া, লোকে মন্দ কথা বলবে। মা মেনকাকে বলতে শুনি—

"গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়-
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানব না।" (রামপ্রসাদ)

কিন্তু, মা মেনকা নিজেও জানেন তার একথার কোন সারবত্তা নেই, দশমী প্রভাতে কন্যাকে কোনদিন আটকে রাখতে পারবেন না- অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানাতেই হবে।

কন্যা উমাকে কাছে পাওয়ার সৌভাগ্য মাত্র তিনটি দিন। তাই দীর্ঘ অপেক্ষার পর আগমনীর দিন যত এগিয়ে আসে মা মেনকার মধ্যে কন্যাকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা তত বৃদ্ধি পায়। এই ব্যাকুলতাই ঘুমন্ত মায়ের চোখে এনে দেয় স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন দর্শন কখনো কন্যাকে কাছে পাওয়ার আনন্দ, কখনো আবার কন্যার রূপ ও অবস্থানে দুশ্চিন্তার। যেমন, স্বপ্নে কন্যাকে কাছে পাওয়ার আনন্দে মেনকা গিরিরাজকে জানিয়েছেন—

"কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার।।
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে;
আধ আধ মা বলে বচনে সুধাধার;" (কমলাকান্ত)

আবার, অন্যদিকে স্বপ্নে কন্যার রূপ ও অবস্থানে মাতৃহৃদয় হয়ে উঠেছে শঙ্কিত—

"কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী;
অসিত-বরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।" (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মা মেনকার এরূপ স্বপ্নদর্শনের প্রসঙ্গে সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্য— "মায়ের এই স্বপ্ন, উত্তেজিত মস্তিস্কের বিকারমাত্র নয়, এ যেন কবি Byron-এর 'I had

a dream– which was not all a dream'- এর মত। এ স্বপ্ন পূর্বনিমিত্তসূচক। স্বামী-গৃহে কন্যার বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ, অতীন্দ্রিয় আত্মিক সম্পর্কের সূত্র ধরিয়া যেন মায়ের স্বপ্নে অনাগত সত্যের ছায়াপাত করিয়াছে।" (শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, পৃ. ৮৯) সমালোচকের মন্তব্যের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

স্বপ্নদর্শনের পর কন্যার সঙ্গে মিলনের জন্য মাতৃহৃদয় উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু, তিনি যেহেতু নারী তাই কন্যাকে আনতে যেতে পারেন না, নির্ভর করতে হয় গিরিরাজের উপর। মাতৃহৃদয়ের এই যন্ত্রণা যে কত গভীর তার পরিচয় মেলে শাক্তপদে-

"কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি'
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।।" (কমলাকান্ত)

বাধ্য হয়েই তিনি গিরিরাজকে অনুরোধ করেন—

"গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে। (রাম বসু)

মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণা থেকে কখনও আবার প্রকাশ পায় তীব্র অনুযোগ-

"গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
আর না মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার।।" (কমলাকান্ত)

শেষ পর্যন্ত গিরিরাজ হিমালয় প্রস্তুতি নেন কৈলাস যাত্রার। যাত্রাকালে মেনকা তাকে লৌকিকতার বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। এছাড়া, জামাই শিবকে সঙ্গে আনতে বলেন। কারণ, উমার বিগত বৎসরের অভিমান মায়ের চোখ এড়ায়নি। তিনি মা বলেই উমার মনের ব্যথা সহজেই ধরতে পারেন। জামাইকে ছেড়ে থাকতে যে মেয়ের কষ্ট হয়, তা তিনি বোঝেন।

বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ এক বছর পর উমা পা রাখে পিতৃগৃহে। পুরবাসী সেই সংবাদ জানিয়েছে মা মেনকাকে। পুরবাসীর সংবাদে তিনি পাগলিনীর মতো ছুটে গেছেন কন্যাকে দেখার জন্য। খসে পড়েছে তাঁর 'কুন্তল ভার' প্রেমাশ্রুতে প্লাবিত হয়েছে তাঁর সর্বাঙ্গ—

"রানী ভাসে প্রেম-জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল-ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে- গৌরী কত দূরে আর গো।।" (রামপ্রসাদ)

উমার সাক্ষাৎলাভের পর "মেনকার মাতৃহৃদয় যেন গলিয়া পড়িয়াছে। উমা এখন জগন্মাতৃকা নন, অসীম ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী নন- মেনকা এক শাশ্বত মাতা এবং উমা তাহার সেই কোলের সন্তানমাত্র।" (হীরেন চট্টোপাধ্যায়, শাক্ত পদাবলীর রূপরেখা; পৃ. ১৮) তাই কন্যা উমাকে কাছে পাওয়া মাত্র-

"গদগদ ভাব-ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি' গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধ'রে।।

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।" (রামপ্রসাদ)

প্রথম মিলনের আবেগ কেটে যাওয়ার পর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদের পালা। মেনকা নারদের মুখে শুনেছিলেন শিব গায়ে চিতাভস্ম মাখেন, ভয়ঙ্কর তাঁর সাজসজ্জা, গলায় ফণির হার, অমৃতের পরিবর্তে তিনি পান করেন গরল। সেই অবধি মেনকার মাতৃহৃদয় কন্যার জন্য আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। মা তাই মেয়ের কাছে প্রথমেই জানতে চান- "কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে?" (রাম বসু) উমা মায়ের দুশ্চিন্তা দূর করে জানায় পতিগৃহে তার সৌভাগ্যের কথা। উমার পতিগৃহের ঐশ্বর্যের কথা, তার প্রতি পতির প্রেমের কথা, পতির ষড়ৈশ্বর্যের কথা, সতীনের স্নেহ-ভালবাসার কথা শুনে মেনকার মাতৃহৃদয় শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হয়- কেটে যায় দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে শাক্ত কবিরা মা মেয়ের মিলন দৃশ্যের বর্ণনা অত্যন্ত নিপুণভাবে দিয়েছেন। এই মিলন দৃশ্যের চমৎকারিত্ব বর্ণনায় অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, "এই মিলন-চিত্র নির্মল, শুভ্র, পবিত্র; ইহা অশ্রু-পরিশুদ্ধ, অনন্ত মাধুর্যে মণ্ডিতঃ ইহা আবেগে উজ্জ্বল, বাৎসল্যে গদগদ; একদিকে কন্যা মিলন-প্রয়াসী জননীর ব্যাকুলতা, অন্যদিকে মাতৃস্নেহপিয়াসী কন্যার সুতীব্র আগ্রহ; উভয়ে মিলিয়া যেন এই ধরণীর ধূলিতে এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে।" (শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, পৃ. ৯১)

এই মিলনের আনন্দ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। মিলনানন্দ অতি শীঘ্রই বিরহ যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হয়। কারণ- সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী অতিক্রান্ত হলেই ভোলানাথ এসে উমাকে নিয়ে কৈলাসে চলে যাবেন। 'বৎসরান্তে আসিস আবার, ভুলিস না মায়, ও মা আমার' (জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ) বলা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। বলা বাহুল্য, আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় নবমী রজনী থেকেই মাতৃহৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বিষাদের পরিচয় আমরা 'আগমনী' পর্যায়েও পেয়েছিলাম। সেই বিষাদের মূল কারণ দীর্ঘকাল কন্যাকে দেখতে না পাওয়া। 'বিজয়া' পর্যায়ে কন্যাকে কাছে পেয়েও হারাতে হবে, তাই এই বিষাদ আরও তীব্র ও মর্মস্পর্শী। সমালোচক হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য- "আগমনী পর্যায়ের প্রধান সুর বিষাদ- কন্যাকে দীর্ঘকাল দেখিতে না পাওয়ার জন্য বিরহ বেদনা। সেই বেদনা উত্তরিত হইয়াছে কন্যার সহিত মিলনের আনন্দে। বিজয়া পর্যায়ের প্রধান সুরও বিষাদ, কিন্তু সেই বিষাদ আরো তীব্র ও মর্মন্তুদ- কারণ যদিও এই পর্যায়ের সমস্ত পদেই মাতা ও কন্যা উভয়েই পরস্পরের সান্নিধ্যে রহিয়াছে কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় সেই সান্নিধ্যে মলিন হইয়া গিয়াছে। আগমনীতে মেনকার দুঃখ কন্যাকে পিত্রালয়ে আনিতে পারিতেছে না, বিজয়াতে সে দুঃখ আরো গভীর- কারণ কন্যাকে কাছে পাইয়াও হারাইতে হইবে।" (শাক্ত পদাবলীর রূপরেখা; পৃ. ১৪১)

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রূপচাঁদ পক্ষী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ

অনেক শাক্তকবি মাতৃহৃদয়ের এই বেদনাকে অপরূপ রসমূর্তি দান করেছেন। বিশেষত, নবমী রজনীতে মাতৃহৃদয়ের বেদনার রূপায়ণে একাধিক কবি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা যায়, কন্যাকে আটকে রাখতে ব্যর্থ নিরুপায় মা মেনকা সমাধান হিসাবে বেছে নিয়েছেন নবমী রজনীকে। নবমী রজনীর কাছে মা মেনকার করুণ নিবেদন, সে যেন অবসিত না হয়। আসন্ন কন্যা-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মাতৃহৃদয়ে ক্ষণিক আশাও জন্মেছে, হয়তোবা নবমী রজনীকে পূজা করলে স্তুতি করলে সন্তুষ্ট হয়ে সে তার স্থিতিকাল বৃদ্ধি করতে পারে- দশমীর সূর্যোদয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তাই মেনকা নবমী রজনীকে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন—

"প্রফুল্ল কুমুদবরে সচন্দন লয়ে করে'
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান।" (কমলাকান্ত)

কিন্তু, মা মেনকা জানেন তাঁর আবেদন, নিবেদন, প্রার্থনার কোন মূল্যই নেই নবমী রজনীর কাছে- সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কপট। প্রকৃতির নিয়মেই সে অবসিত হবে এবং উমার উপস্থিতিতে যে ঘর স্বর্ণদীপের মতো আলোয় আলোকিত হয়েছিল সেই ঘর 'দ্বিগুণ আঁধার' হবে। কন্যার সাথে বিচ্ছেদের বেদনায় আর পাঁচটা বাঙালি মায়ের মতোই ভেঙে পড়েন মা মেনকা। যদিও মাতৃহৃদয়ের রূপ কোন ভূখণ্ডের সীমানায় আবদ্ধ নয়, তবুও বাংলার জলহাওয়ায় গড়ে ওঠা মায়ের মন যেন আরও কোমল- মাতৃহৃদয়ের বেদনার গানের সুর বড় করুণ। সেই বাঙালি মায়ের প্রতিনিধি মেনকা। কন্যাকে হারানোর আশঙ্কায় নবমী রজনীর নিকট মেনকার যে প্রার্থনা—

"যেয়ো না রজনী, আজি ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যা'বে!
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!" (মধুসূদন দত্ত)

-এই প্রার্থনা কেবল মেনকার একার নয়, সমস্ত বাঙালি মায়ের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের নব-মূল্যায়ণে 'মেঘদূত' কবিতা বা প্রবন্ধে এবং অন্যত্র যক্ষের অচরিতার্থ মিলনাকাঙ্খাজনিত মর্মবেদনার মধ্যে নিখিল মানবাত্মার চিরন্তন মর্মবেদনার কথা বলেছেন। শাক্ত পদাবলীতেও মেনকাকে অবলম্বন করে আমরা খুঁজে পাই মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন মর্মবেদনা।

নবমী রজনীতে যে বিরহ ছিল 'ভাবী', দশমী প্রভাতে তা 'ভবন' বিরহে পরিণত হয়— বিচ্ছেদের ক্ষণটি সামনে এসে দাঁড়ায়। দশমী প্রভাতে মহাদেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হন। বাঘের ছাল বিছিয়ে অপেক্ষায় বসেন। শুধু তাই নয় ঘন ঘন 'বেরোও গণেশ মাতা' বলে ডাক দেন। সেই আহ্বানে এবং মহাদেবের ডমরু ধ্বনি শুনে মা মেনকার

হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভয়ে তাঁর দেহ কম্পিত হয়, নিদারুণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় তাঁর হৃদয়—

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার।।" (রামপ্রসাদ)

মা মেনকা সব কিছুই দান করতে পারেন মহাদেবকে, যদি মহাদেব তাঁর প্রাণ চান তাও দিতে পারেন; কিন্তু কন্যাকে ফিরিয়ে দিতে তাঁর মন সরে না- 'পরাণ থাকিয়ে কায় গৌরী কি পাঠানো যায়' (কমলাকান্ত)। বিবাহের পর কন্যা যে পরের ধন এই যুক্তি মায়ের মন মানতে চায় না। তবু, কন্যাকে আটকে রাখার কোন মন্ত্রই তাঁর জানা নেই। উমাকে নিয়ে মহাদেব যাত্রা করেন কৈলাসে। যাত্রা মুহূর্তে কন্যার প্রতি মায়ের শেষ অনুরোধ—

"এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা!
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।।" (কমলাকান্ত)

শাক্তপদসাহিত্যে মাতৃহৃদয়ের এই কন্যা শোককে আরও তীব্রতা দিতে শাক্ত কবিরা আর একটি কাজ করেছেন। তাঁরা মা মেনকাকে পুত্রশোকাতুরা করেও অঙ্কন করেছেন। যেমন, একটি পদে—

"পুত্রশোকে জীর্ণ জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
হই যদি তারা-হারা, জীবনে কি ফল বল।।" (রূপচাঁদ পক্ষী)

এ বিষয়ে আলোচক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা- "প্রথমতঃ আর সন্তান থাকিলে মায়ের মন-প্রাণ সর্বদাই এমন করিয়া উমার প্রতি পড়িয়া থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পুত্র-সন্তান জীবিত থাকিলে আজ আর মেনকাকে কন্যার তত্ত্ব লইতে বৃদ্ধ পতির পায়ে সর্বদা এমন করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইত না।" (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্তসাহিত্য, পৃ. ২৪১)

সব মিলিয়ে 'লীলা' পর্বের বিশেষত 'আগমনী' ও 'বিজয়া' পর্যায়ের গানগুলি সন্তান শোকাতুরা বাঙালি মায়ের বিচিত্র অভিব্যক্তি ও চিরন্তন বেদনার পরিপূর্ণ। সেখানে তাঁকে কোনভাবেই 'দেবী' বলে আলাদা করতে পারি না। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লোকসাহিত্যে' বলেছেন— "আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান।"

তথ্যসূত্র ঃ

১. শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাঃ), শাক্ত পদাবলী; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, শাক্তপদাবলী ও শাক্তসাধনা; ডি.এম. লাইব্রেরী।
৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, শাক্ত পদাবলীর রূপরেখা; এস. ব্যানার্জী এন্ড কোং।
৪. ড. অমরেন্দ্র গণাই, শাক্তপদাবলীঃ ভাব ও শিল্পসৌন্দর্য; ভাষা ও সাহিত্য।
৫. ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শাক্ত পদাবলী; এস. ব্যানার্জী এন্ড কোং।
৬. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, শাক্ত পদাবলী; রত্নাবলী।
৭. শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্তসাহিত্য; সাহিত্য সংসদ।

সুজিত দেবনাথ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক

বাংলা নাট্যজগতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এক উজ্জ্বল নাম। বিকল্প ধারার নাটক রচনায় তিনি একটি আলাদা পরিচিতি লাভ করেছেন। বিশেষ করে দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনায়। বিদ্যালয়ে পড়াকালীন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে তিনি সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন। সেখান থেকেই স্বাদেশিকতা এবং বিপ্লবের মন্ত্র পেয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে 'অনুশীলন সমিতি'র মতো গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। এই সূত্রেই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকের মধ্যে স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবোধের সুর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। নাটকগুলির নামেও সেই প্রমাণ মেলে। 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'রক্তকমল', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'এই স্বাধীনতা' ইত্যাদি। এর মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বহু আলোচিত দুটি নাটক হল 'গৈরিক পতাকা' ও 'সিরাজদ্দৌলা'। প্রবন্ধের এই ক্ষুদ্র পরিসরে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা গেল।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটির প্রকাশকাল ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়টায় ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। বিশ্বজুড়ে তখন বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোর শুরু হয়েছিল। এর দুবছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'ড্রেস রিহার্সাল' নামে পরিচিত স্পেনের গৃহযুদ্ধ হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলস্বরূপ বিশ্বজুড়ে মহামন্দার অভিঘাত তো ছিলই, সেই সঙ্গেই ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া। তার ঠিক এক বছর আগে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচনা করলেন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ বা তার আগে থেকে ভারতে বিভিন্ন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনগুলি ক্রমশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু, সুখদেও, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ইংরেজ সরকারকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। অন্যদিকে এই সময়েই ভারতে চলছিল মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন, গোলটেবিল বৈঠক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতি, এবং অতি অবশ্যই ভারত শাসন আইন। এই আইন মোতাবেক প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। আবার ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ভারতে বিভিন্ন সময় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বিক্ষিপ্তভাবে হয়েই চলছিল। বঙ্গভঙ্গের(১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং টানাপোড়েন শুরু হয়। শিক্ষিত মুসলমান মানুষের মনে হতে থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মাঝে তারা কেবলই বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। ক্রমশ তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় মানুষদের প্রতি অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার মুসলিমদের এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েই বঙ্গভঙ্গের

প্রস্তাবনা আনে। 'পিছিয়ে পড়া' মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষের কাছে ব্রিটিশরা বেশ কিছু সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরে। শিক্ষা, চাকরি এবং রাজনীতিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য বাংলা এবং উত্তর ভারত একজোট হয়েই ছিল। সেই বিষয়টিকেই উস্কে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। তাই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় মহমেডান এডুকেশন কনফারেন্সের অধিবেশন। তখন থেকেই মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি সংগঠনের ভাবনা জোরদার হয় এবং ঐ অধিবেশনেই মুসলিমদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্যই ছিল মুসলমানদের স্বার্থ ও রাজনৈতিক অধিকারকে সুরক্ষিত রাখা। পাশাপাশি লিগ এই সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ, লিগ প্রথম অবস্থায় জায়গা মজবুত করতে চেয়েছিল। তাই ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়নি; জিইয়েই ছিল। বিচ্ছিন্ন কিছু দাঙ্গা এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, অবিশ্বাসের পর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের পৃথক জাতি হিসেবে আলাদা একটি স্বশাসিত রাষ্ট্রের দাবি উঠে আসে। এর আগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরি রহমত আলি ১৯৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। তবে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে মুসলিমদের জন্য যে পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাবটি ছিল তাতে 'পাকিস্তান' নামের উল্লেখ ছিল না। এই প্রস্তাবের খসড়া তৈরিতে সিকান্দার হায়াৎ আলি খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফজলুল হক সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এই ছিল ১৯০৬ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ভারতে মুসলিম লিগের প্রাথমিক কার্য্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন ভারতের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং মুসলিম লিগের প্রাথমিক কার্যাবলী জানাটা জরুরি। প্রশ্ন হচ্ছে সিরাজদ্দৌলার শাসনামল এবং পলাশির যুদ্ধের ১৮০ বছর পর নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কেন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনা করতে গেলেন? এর আগে বঙ্গভঙ্গের সম-সময়ে নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষও 'সিরাজদ্দৌলা'(১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) নাটক রচনা করেছিলেন। গিরীশচন্দ্রের উক্ত নাটক রচনার কারণ ছিল বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জোরালো বার্তা দেওয়া। এবং ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় তৎকালীন বঙ্গদেশে জনমানসে এই নাটকের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। নাটক অন্যতম একটি গণমুখী দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম হওয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাটক রচনার ৩২ বছর পর একই বিষয় নিয়ে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরও লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মাধ্যমে দেশীয় যুবশক্তির জাগরণ এবং ইংরেজ শক্তিকেও জোরালো বার্তা দেওয়া। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'গৈরিক পতাকা' নাটকের

মাধ্যমে হিন্দু রাজশক্তির উত্থান এবং হিন্দু ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তবে ১৯৩০-এ বা তার পরবর্তী পাঁচ বছরেও ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয়নি। তাই হিন্দুত্বের পথ ছেড়ে বা বলা ভালো 'সাম্প্রদায়িকতা'র পথ ছেড়ে 'অসাম্প্রদায়িকতা'র পথ ধরলেন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সিরাজের পতনের মাধ্যমে তিনি এটাও বোঝাতে চাইলেন হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে লড়াই না করলে সাফল্য লাভ করাও সুদূর পরাহত। সিরাজের বিরুদ্ধে তাঁর সভাসদরা যেভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল তার থেকে বেরিয়ে আসার মতো অভিজ্ঞতা বা বিচক্ষণতা কোনোটাই সিরাজের ছিল না। তাছাড়া সিরাজের চরিত্রের স্খলন-পতনের কারণেও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সিরাজ চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল স্পষ্ট। যদিও বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের দাবিকে নস্যাৎ করে সিরাজকে 'মহান' করে দেখাতে চেয়েছিলেন নাট্যকার। নাটকের শুরুতে সেই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

"সিরাজদ্দৌলার জীবনের ঘটনা ঐতিহাসিকরা লিখে গিয়েছেন। যাঁরা স্বার্থের খাতিরে সিরাজ-চরিত্রে নানা কলঙ্ক আরোপ করে গিয়েছেন। তাঁদের কুকীর্তি আজ ধরা পরেচে সত্যাশ্রয়ী ঐতিহাসিকদের সত্যানুসন্ধানের ফলে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে আমি শেষোক্ত ঐতিহাসিকদের নির্দেশে মত সিরাজকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।"[১]

সিরাজের 'সৎ'-চরিত্র নিয়ে নাট্যকার এত প্রত্যয়ী হলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মত এবং নাট্যকারের মত উদ্ধৃত করেই আমরা প্রমাণ করে দেখাবো যে সিরাজ চরিত্রের স্খলন-পতন সিরাজের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। তাছাড়া তাঁর অসাম্প্রদায়িক রূপ নাটকে ফুটিয়ে তোলা হলেও অনেক সময়েই তাঁর চরিত্রে সাম্প্রদায়িক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সেই বিষয়গুলিই প্রবন্ধে ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হবে।

সিরাজ চরিত্র নিয়ে বলতে গিয়ে নাট্যকার আর একটি গুরুতর মন্তব্য করেছেন। সেই বিষয়টিও আমরা যথাযথ যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরবো। নাটকের শুরুতে নিবেদন অংশে তিনি বলেছেন, "সিরাজ ছিলেন খাটি বাঙালী। তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার পরাজয় হোলো। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী হোলো পতিত।"[২]

এইবারে প্রথমে সিরাজের চরিত্র বিশ্লেষণ, এবং অতঃপর তাঁর রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। সিরাজ খুব অল্প বয়সে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন। এত অল্প বয়সে পৃথিবীর অন্য কোথাও কেউ সিংহাসনে বসেননি, এমন নয়। আবার সবাই যে সফল হয়েছেন তেমনটাও নয়। শুধু এই কারণে নাট্যকার সিরাজের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলে সে অন্য বিষয়। সিরাজ চরিত্রে তিনি ঔদার্য, তেজ, নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ দেখিয়েছেন, সেটাও ক্ষেত্রবিশেষে সত্য। তাছাড়া নাট্যকার আরেকটি কথাও বলেছেন তৎকালীন রাজা-মহারাজাদের চরিত্রে কম-বেশি স্খলন-পতন থাকত; সেটা

নিয়ে খুব বেশি আলোচনা না করাই ভালো। এই যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আপনি যখন সিরাজদ্দৌলাকে অসাম্প্রদায়িক এবং মহান নবাব হিসেবে পরিবেশন করছেন তবে দর্শক-শ্রোতারা তাঁর চরিত্রকে অবশ্য সেই আলোকেই বিবেচনা করে দেখবেন। আর সেখানে যদি তারা সন্তুষ্টির জায়গায় না আসেন তবে নাটক মঞ্চসফল হলেও তাঁর ঐতিহাসিকতা ক্ষুন্ন হয়। জানা যায় এই নাটক শচীন্দ্রনাথের সর্বাধিক মঞ্চসফল নাটক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। এমনকি, স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই নাটকের অভিনয় দেখে অশ্রু গোপন করতে পারেননি। 'ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি, নাটক তা নয়।' এই উক্তি মেনে নিয়েও বলতে হয় ইতিহাস লেখা যদি ঐতিহাসিকের কাজই হয় তাহলে নাট্যকার ইতিহাসের চরিত্র বাছলেন কেন? আর ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে দর্শক-শ্রোতারা অবশ্যই ইতিহাসের উপাদান খুঁজতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক নয় কি!

সিরাজের জীবনযাপন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হীরাঝিলে সিরাজের জন্য প্রমোদকানন তৈরি করে দেন আলীবর্দি খান। দলবল নিয়ে সিরাজদ্দৌলা বিলাস-তরঙ্গে দেহমন ভাসিয়ে দিতে থাকেন সেখানে। এই বিলাস-স্রোতই পরবর্তীকালে ধন, মান, জীবন এবং সিংহাসন পর্যন্ত ভাসিয়ে দেয় তাঁর। নতুন নতুন সঙ্গীলাভের ফলে ব্যভিচারও ক্রমশ বাড়তে থাকে। সিরাজের প্রাসাদ-উদ্যানে আলীবর্দিও আমন্ত্রিত হতেন পাত্রমিত্র-সহ। আলীবর্দির আস্কারাতেই সিরাজের ব্যভিচার মাত্রা ছাড়াতে শুরু করে। কৌশলে নবাবের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন সিরাজদ্দৌলা। নৃত্য-গীতের আসর বসত, সুরা এবং সুরাপ্রেমীদের আগমন ক্রমশ বাড়তে থাকে সেখানে। নিত্যনতুন নারীসঙ্গ চলতে থাকে। এমনকি গৃহস্থ ঘরের কন্যারাও সিরাজ এবং তাঁর অনুচরদের হাত থেকে রেহাই পেত না। ঐতিহাসিকের মতে—

"অর্থবলে, ছলকৌশলে, প্রলোভনে অনেক গৃহস্থকন্যার সর্বস্বধন লুণ্ঠিত হইল। বাঙ্গালী যাহার জন্য সিরাজদ্দৌলার নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠে, সে এই মহাপাপ; এই মহাপাপের কথা চিরদিনই চারদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িতে লাগিল।"[৩]

অন্যদিকে বর্গীর হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলেন বলে আলীবর্দি সিরাজের এসব অন্যায় কাজের প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেননি। বর্গীর হাঙ্গামায় যখন বাংলা বিপর্যস্ত সিরাজ তখন প্রমোদ-নিদ্রায় সুখ-স্বপ্ন দেখছিলেন। এদিকে রাজবল্লভ শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল উঠছেন। পরবর্তীতে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীদল এবং আফগান সেনাদের বিরুদ্ধে সিরাজের রণ নৈপুণ্য দেখে আলীবর্দি সিরাজকে পাটনার নবাব করে পাঠান। সিরাজ কমবয়সি বলে জানকীরামকে বিহারের রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সিরাজের পক্ষে জানকীরামের খবরদারি মেনে নেওয়া অসহ্যকর ছিল। সিরাজ কোনো কালেই কারও খবরদারি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানকীরামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং পাটনা দুর্গ

আক্রমণ করেন। এবং সবশেষে আলীবর্দিকে চিঠি লেখেন তিনি একক ক্ষমতা ভোগ করতে চান। এতে যদি নবাব আলীবর্দির সঙ্গে যুদ্ধও করতে হয় তাও স্বীকার। সিরাজের এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়েই আলীবর্দি সিরাজকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। তখন সিরাজের বয়স ১৫-১৬ বছর। সিরাজের প্রতি আলীবর্দির এই দুর্বলতা সত্ত্বেও সিরাজের কুখ্যাতির কথাও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন, "বাঙালির নিকট সিরাজদ্দৌলা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অর্থপিপাসু উচ্ছৃঙ্খল যুবক বলিয়াই পরিচিত; এই পরিচয় কিয়দংশে অতিরঞ্জিত হইলেও, একেবারে মিথ্যা নহে।"[৪] জনশ্রুতি অনুযায়ী সিরাজ বহু হিন্দু রমনীর সর্বনাশ করেছিলেন। এই কারণে জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ প্রমুখরা সিরাজের বিরুদ্ধে বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। সিরাজের নৃশংসতার আর একটি প্রমাণ পারিবারিক সম্মান রক্ষার অজুহাতে হোসেনকুলীকে হত্যা করা। হোসেনকুলীকে মাসি ঘসেটির সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের অভিযোগে হত্যা করা হলেও আদতে হোসেনকুলীর বিদ্যা-বুদ্ধি সামরিক দক্ষতায় বিচলিত হয়েই সিরাজ তাঁকে খুন করেছিলেন। পাছে হোসেনকুলী সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন! ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দি পরলোক গমন করেন। সিরাজ সিংহাসনে বসামাত্র ঘসেটি বেগমের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেন। তবে সিংহাসনে বসার পূর্বেই সিরাজদ্দৌলা পানদোষ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পরম শত্রু সমসাময়িক ইংরেজ লেখকগণ এও বলেছেন যে, পূর্বের কথা যাই হোক, আলীবর্দির নিকট ধর্ম শপথ করার পর সিরাজ আর সুরাপান করেননি। সুরাপান না করলেও সিরাজের কুকীর্তি বন্ধ হয়নি। তাঁর চিত্তদৌর্বল্যের আর একটি নিদর্শন হল রাজশাহীর জমিদার রানী ভবানীর বিধবা কন্যা তারার প্রতি তাঁর লোলুপ দৃষ্টি। অন্যদিকে জগৎশেঠের এক ভ্রাতৃবধূর প্রতি তাঁর লোলুপ দৃষ্টির কথাও অনেকের কাছে সুবিদিত। তদুপরি, "কোনো সুন্দরী হিন্দু-স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে নেমেছেন দেখলেই সিরাজদ্দৌলার চরেরা তখুনি গিয়ে তাঁকে সেই সংবাদ জানাত। তারপর সেই স্ত্রীলোক একেবারে নিখোঁজ। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা কেউ আর কস্মিনকালেও তাঁর সন্ধান পেতেন না।"[৫] এই কারণে হিন্দু জমিদারগণ সিরাজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলাকে 'দেশপ্রাণ' নবাব বলে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর মুখে একাধিকবার 'অসাম্প্রদায়িক' সংলাপ ব্যবহার করেছেন। তবে সিরাজের কুকীর্তির কথাও একাধিকবার নাটকে উঠে এসেছে। ফৈজু বেগমকে নৃশংসভাবে হত্যা করায় সিরাজের হিংস্রতা ফুটে ওঠে। উক্ত ঘটনাগুলির সাপেক্ষে নাট্যকারের অঙ্কিত সিরাজের ভালো মানুষী মূর্তি প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়ায়। রাজনীতি কখনোই ন্যায়-নীতি বোধের ধার ধারে না। সিরাজের ক্ষেত্রে এই কথা আরও বেশি খাটে। প্রথমত দুর্বল বুদ্ধির এবং সামরিক শক্তিতে নাবালক শৌকতজঙ্গকে হত্যা করা, রাজবল্লভকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া, পরবর্তীতে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে

গ্রেফতারের নির্দেশ — এ সমস্ত কিছুই নিজের সিংহাসনকে কন্টকমুক্ত রাখার কৌশল মাত্র। সিরাজ তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকেই মাথা তুলতে দেননি।

সিরাজ খাঁটি বাঙালি ছিলেন, তার সাপেক্ষে নাট্যকার কোনো প্রমাণ দেননি। ইতিহাসও সেই কথা বলে না। আলীবর্দি খান এবং হাজি আহমদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভুত মির্জা মহম্মদ মাদানি এবং মা ছিলেন ইরানের এক তুর্কি উপজাতির। আলীবর্দির কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় নিজের তিন কন্যাকে নিজেরই বড়ো ভাই হাজি আহমদের তিন পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। তৃতীয় কন্যা আমিনার গর্ভে এবং জয়েনউদ্দীন আহম্মদের ঔরসে জন্ম হয় সিরাজের। সুতরাং বংশ পরিচয়ের বিচারে সিরাজ কোনো মতেই বাঙালি ছিলেন না। তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতেন কি না তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গোলাম হোসেনকে বলতে শোনা যায়,—

"পুণ্যবতী রাণী ভবানীকে দূর থেকে প্রণাম করলাম, নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোতিঃ চোখ ভরে দেখে এলাম, পাটনার জানকীরামের প্রভুভক্তির পরিচয় পেয়ে প্রীত হলাম। কিন্তু দেশভক্ত একটিও দেখলাম না। দেখলাম বড় বড় সেনাপতি, রাজা, উজীর সবাই স্বার্থের সন্ধানে উন্মাদ। শুধু একটি লোক, স্বার্থেরই খাতিরে বাংলার স্বাধীনতা, বাংলার মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করছে।"[৬]

নাট্যকার এইভাবে একাধিকবার সিরাজকে মহান করে দেখাতে চেয়েছেন। ইংরেজ রাজত্বে সিরাজকে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র হিসেবে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপিত করা অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় বার্তা। কিন্তু ব্যক্তি সিরাজের কুকীর্তি বাংলা জুড়ে যেমন প্রবল ছিল, তেমনি মুর্শিদাবাদেও গোপন ছিল না। সিরাজের বিরুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভ, মীরজাফর, রায়বল্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখরা যখন চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছেন তখনও সিরাজের মুখে অসাম্প্রদায়িক সংলাপ ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়—

"রাজা রাজবল্লভ, ভাগ্যবান জগৎশেঠ, শক্তিমান রায়দুর্লভ, বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয় — মিলিত হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি গুল্বাগ এই বাংলা। অপরাধ আমি যা করিচি, তা মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছেই করিচি — আঘাত যা পেয়েচি, তাও মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছ থেকেই পেয়েচি। পক্ষপাতিত্বের অপরাধে কেউ আমরা অপরাধী নই। সুতরাং আমি মুসলমান বলে আমার প্রতি আপনারা বিরূপ হবেন না।"[৭]

বাস্তবের ঐতিহাসিক সিরাজ নিজ সভাসদদের প্রতি এই আবেদন করেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে তাঁর অদূরদর্শিতা এবং প্রত্যেক সভাসদদের প্রতি অবিশ্বাস, বৈরিতা শেষ পর্যন্ত তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেছে। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ ছাড়া গোটা বাংলা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। মুসলমান শাসকের চোখ রাঙানি অনেক স্থানীয় জমিদার এবং রাজাদের পছন্দ ছিল না। জাতি পরিচয়ে সিরাজ না ছিলেন বাঙালি, না ছিলেন ভারতীয়। তাই যেকোন প্রকারে তাঁকে

সিংহাসন-চ্যুত করাই ছিল হিন্দু অমাত্য, ধনী জমিদার এবং স্থানীয় রাজাদের মূল লক্ষ্য। তাঁদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা একাই যথেষ্ট ছিলেন না। তাই সিরাজেরই সভাসদ মীরজাফর, ঘসেটি বেগম প্রমুখকে সঙ্গী করেছিলেন। অনেকের মনে এমন ভাবও তখন তৈরি হয়েছিল সিরাজের তুলনায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা অন্য কেউ বাংলার সিংহাসনে বসলে তাদের অধিকার অনেকটাই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এমন ভাবনার শরিক ছিলেন। সিরাজের পূর্বোক্ত হিন্দু-বিদ্বেষ এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার সকলকে একজোট হতে সাহায্য করেছিল। সর্বোপরি সৈন্য চালনার ভার বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে অর্পণ করা, সিরাজের ভোগবিলাসে মত্ত থাকা ইত্যাদিও তাঁর প্রতিকূলে গিয়েছিল। তাই নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ ইতিহাসের সিরাজকে মহান করে দেখাতে গিয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ যেমন দেখাননি, ঠিক তেমনি 'অসাম্প্রদায়িক' সিরাজ চরিত্রের উপস্থাপন করে দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনও বন্ধ করতে পারেননি। এই উদ্যোগ প্রশংসিত হলেও সিরাজদ্দৌলা নাটক রচনার দুই বছর পরেই মুসলমানদের জন্য মুসলিম লিগ পৃথক দেশের দাবি জানায় এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান গঠনের মাধ্যমে সেই দাবি পূর্ণতা পায়।

তথ্যসূত্র :

১। সেনগুপ্ত, শচীন, 'সিরাজদ্দৌলা', দেবাশিস, রায়চৌধুরী (সম্পাদনা), জে এন ঘোষ এন্ড সন্স, কলকাতা, জুন ২০১০, পৃষ্ঠা — ৭১।

২। তদেব, পৃষ্ঠা — ৭১।

৩। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, 'সিরাজদ্দৌলা', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা — ২১।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা — ৫৮।

৫। চট্টোপাধ্যায়, তপনমোহন, 'পলাশির যুদ্ধ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃষ্ঠা — ৯৬।

৬। সেনগুপ্ত, শচীন, 'সিরাজদ্দৌলা', দেবাশিস, রায়চৌধুরী (সম্পাদনা), জে এন ঘোষ এন্ড সন্স, কলকাতা, জুন ২০১০, পৃষ্ঠা — ৭৯।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা — ১১১।

শুভ দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-সাহিত্য : সমাজতত্ত্বের আলোয়

বিশ্ব সাহিত্যে বাণীই প্রথম, রচনা দ্বিতীয়। রচনা ও বাণীর মধ্যে মিল অমিল দুইই আছে। বাণী লেখার ভাষা কিংবা মুখের কথা দুভাবেই দেখা দিতে পারে। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ - সব একদিন মুখে মুখে গড়ে উঠেছিল। কথারা যখন নিজের বৈশিষ্ট্যে, নিজের দীপ্তিতে, নিজের গভীরতায় বিশেষভাবে আমাদের আকৃষ্ট করে, পথ চলতে সাহায্য করে তখন সেই কথাগুলো আমাদের সংগ্রহে রাখতে ইচ্ছে হয়। এবং পরবর্তীতে সেই শাশ্বত, সত্য ও চিরন্তন কথাগুলি উত্তরকালে ছড়িয়ে দেওয়ায় এই সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য। সক্রেটিস, গ্যোটে, রামকৃষ্ণ, অনুকূলচন্দ্র - এঁদের কথোপকথন তাই যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রথিত হয়ে আজ বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার। সকল সময় এরকম মহামানবের সংলাপ সংগ্রহকারী অনুরাগী খুব একটা দেখা যায় না। এমন অনেক লেখক রয়েছেন যাঁদের লেখায় যতটা প্রকাশিত, প্রতিদিনের আলাপচারিতায় ততটা প্রকাশিত নয়। আবার এমন ব্যক্তিত্বও রয়েছেন যাঁদের লেখনী অবান্তর, কথন নৈপুণ্যই প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। মানব সমাজে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব দেখা যায় যাঁদের উপদেশ,বাণী সমগ্র মানবজাতির পথ নির্দেশ। ভাষান্তরে আমরা দেশ-বিদেশের এরকম কিছু মহামানবের কথা পড়ে থাকি। চেতন অবস্থায় বা অচেতন অবস্থাতেও সেইসব উপদেশ আমাদের চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। যদিও তাঁরা একটি নির্দিষ্ট দেশ-কালে জন্মগ্রহণ করেন, তবুও তাঁদের উপদেশ সব কালে,সব সময় মানুষের জীবনপ্রবাহকে গতিময় করে রেখেছে। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা গেছে গৌতম বুদ্ধকে, একালের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পরবর্তীতে অনুকূলচন্দ্র তার বড় প্রমাণ।

রামকৃষ্ণের যা নিজের সৃষ্টি, তাঁর কথার শিল্পগুন,আমরা তাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য বলতে চাই। রামকৃষ্ণের সঙ্গে আরেকজন মহাপুরুষের বাণী ও জীবনের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে, তিনি চৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যের কথোপকথনের ছন্দায়িত রূপ আমরা "চৈতন্যচরিতামৃত", "চৈতন্যভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। এই সাহিত্য সৃষ্টিই বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ দান। পাঁচশ বছর পরেও সেই দানের গভীরতা ও পরিমান নিয়ে আজও বিচার চলে। কিন্তু রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সেজাতীয় বিচারের সময় এখনো পর্যন্ত সেরকমভাবে দেখা দেয়নি। তবু রামকৃষ্ণ জীবিত থাকাকালীন তাঁর বাণী সংগ্রহে কেশবচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে ডক্টর প্রণব রঞ্জন ঘোষ সহ আরও লেখক ও মনীষী প্রমাণ করেছেন যে তাঁর বাণী শুধু ভাবের দিক থেকে নয়, প্রকাশকলার দিক থেকেও তাঁর উপদেশ,বাণী ও সংলাপের বিশেষ মূল্য রয়েছে। পরবর্তীতে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের বাণী সংগ্রহের সাহিত্যমূল্য বিচার করতে গিয়ে বলেছিলেন —

আমার মনে হয় সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁন্দে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।[১]

মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে ভাষা নিরপেক্ষ একটা আত্মিক সৌরভ থাকে। যীশু বা বুদ্ধর বাণীর অনুবাদের দিকে লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু এই উপমাগুলো যখন ‘কথামৃতে’ চলতি ভাষায় পাই তখন তাদের সাহিত্যগুণ যথার্থ প্রকাশ পায়। ‘কথামৃতে’ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী —

জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে।’ আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। “যদি ঈশ্বরের কৃপায় “আমি অকর্তা”এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।[২]

এই উপমা শাস্ত্রীয় ভাষার প্রায় কাছাকাছি। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি যে বিপুল জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী ছিলেন এই উপমা বিশেষভাবে তার প্রমাণ দেয়। বেদান্তের মায়াবাদ সম্পর্কে রামকৃষ্ণসৃষ্ট বাণীগুলো খুব সহজ ভঙ্গিমায় বাংলা ভাষাকে কঠোর সত্যের অধিকারী করে তুলেছে। ‘কথামৃতে’ তাঁর বাণী—

আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থায়ই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া,জীব,জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।[৩]

বেদান্তের মায়াবাদ সম্পর্কে তাঁর এরকম বাণীগুলো খুব সহজ ভঙ্গিমায় বাংলা ভাষাকে কঠোর সত্যের অধিকারী করে তুলেছে। আর সত্য যেখানে সুষমায় প্রকাশিত, সাহিত্য গুণের সম্ভাবনা সেখানেই। অনেক বিস্তৃতভাবে রামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন সংগৃহীত বলে গল্পগুলি কাহিনির রূপ পেয়েছে। রূপকধর্মী এই কাহিনিগুলিতে প্রতিপাদ্য হয়েছে আধ্যাত্মিক বক্তব্য। কিন্তু মানব সংসারের ও মানব সমাজের বহু দিক এই ছোট্ট ছোট্ট কাহিনিগুলিতে বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। যে দৃষ্টির গভীরতা ও চমক উচ্চাঙ্গ সাহিত্য প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। তাঁর রচনায় উপমা প্রয়োগের বহুল ব্যবহার যেমন লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনই তাঁর নানান বাণী,উপদেশে ভাষাগত প্রকাশ শক্তির বিস্তর পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিই কবিদৃষ্টি যা বিশ্বের বিভিন্ন উপাদানের ভেতরের যোগটুকু মুহূর্তে ঘটাতে পারে। তাই বলা চলে তিনি একদিকে যেমন কবি অন্যদিকে তেমনি একজন মনীষী। তাঁর বাণী, তাঁর উপদেশ যা কথায় প্রকাশিত সেখানে দেখা গেছে তিনি ভাষার সম্পদে রাজাধিরাজ। তাঁর ব্যক্তিসত্তার শুদ্ধতম বিকাশ অতি সরল, সেই সরলতা আর অনুভবের অতলতা এই বাংলা ভাষায় তিনি রেখে গেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক

অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রথাগত অর্থে কোনো দার্শনিক, সমাজসংস্কারক বা সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জীবনদর্শন ও উপদেশমূলক বাণী পরবর্তীকালে যে সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে, তা ভারতীয় সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ছিল বহুমাত্রিক সংকটে আবদ্ধ - ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, খ্রিস্টধর্মের প্রচার, নবজাগরণের যুক্তিবাদী চেতনা এবং একই সঙ্গে জাতিভেদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক বৈষম্যের কঠোর বাস্তবতা। এই দ্বন্দ্বময় সমাজব্যবস্থার মধ্যেই রামকৃষ্ণ এক মানবতাবাদী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁর উপদেশমূলক সাহিত্য, যা মূলত মৌখিক ভাষণে রচিত এবং পরে শিষ্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ, সমাজতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশ করে না, বরং সমসাময়িক সমাজের কাঠামো, মানসিকতা ও মূল্যবোধকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

রামকৃষ্ণের উপদেশমূলক সাহিত্য প্রধানত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত। এই সাহিত্য কোনো পরিকল্পিত সাহিত্যরচনা নয়, বরং দৈনন্দিন কথোপকথন, উপমা, গল্প ও রূপকের মাধ্যমে গঠিত। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি অভিজাত শিক্ষিত শ্রেণির সীমা অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ যে ভাষায় কথা বলেছেন, তা লোকজ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, যা সমাজে দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং সামাজিক যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই দিক থেকে তাঁর উপদেশকে 'জনগণের ধর্মীয় ভাষ্য' বলা যায়, যা সামাজিক স্তরভেদকে অতিক্রম করে এক প্রকার সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলে। রামকৃষ্ণের উপদেশমূলক সাহিত্যের একটি প্রধান সমাজতাত্ত্বিক দিক হলো জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে তাঁর অবস্থান। উনিশ শতকের হিন্দু সমাজে জাতিভেদ ছিল সামাজিক সংগঠনের একটি প্রধান ভিত্তি। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁর আচরণ ও উপদেশের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তাঁর মতে, মানুষের প্রকৃত পরিচয় জাতি বা বর্ণে নয়, বরং তার অন্তর্গত চেতনা ও মানবিকতায়। তিনি ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করেছেন এবং সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'তে জাতিভেদ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের বলা কথাগুলির মধ্যে একটি সংলাপ দিলাম।

এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায়-ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা-সব শুদ্ধ হয়। গৌর, নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল

নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়।”[৪]

সমাজতত্ত্বে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে একটি শক্ত কাঠামো হিসেবে দেখা হয়, যা ক্ষমতা ও মর্যাদার অসম বণ্টনের মাধ্যমে টিকে থাকে। ম্যাক্স ওয়েবারের তত্ত্ব অনুযায়ী, ধর্ম অনেক সময় এই স্তরবিন্যাসকে বৈধতা দেয়, আবার কখনো তার বিরুদ্ধেও অবস্থান নিতে পারে। রামকৃষ্ণের ধর্মভাবনা এই দ্বিতীয় প্রবণতার অন্তর্গত, যেখানে ধর্ম সামাজিক বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গত না করে মানবিক সাম্যের দিকে সমাজকে আহ্বান জানায়।

ধর্মীয় সহনশীলতা ও বহুত্ববাদ রামকৃষ্ণের উপদেশমূলক সাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মীয় পথ নিজে অনুশীলন করে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন ধর্ম একই সত্যের দিকে নিয়ে যায়। “যত মত তত পথ” - এই উক্তি শুধু আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ নয়, বরং একটি গভীর সমাজতাত্ত্বিক বক্তব্য। এমিল দুর্খেইম ধর্মকে সমাজের সংহতি রক্ষার একটি প্রধান উপাদান হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু ধর্ম যখন সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতার জন্ম দেয়, তখন তা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। রামকৃষ্ণের ধর্মভাবনা এই বিভাজনকে অতিক্রম করে সামাজিক ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তি নির্মাণ করে। বহুধর্মীয় ভারতীয় সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক সহাবস্থানের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সর্বধর্ম- সমন্বয় সম্পর্কে রামকৃষ্ণের বলা কথা —

আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রীষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না'; কি, 'আমাদের মা-কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না'; 'আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না।' এ-সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্মই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ-বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়।[৫]

নারী সম্পর্কে রামকৃষ্ণের ভাবনাও সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ শতকের সমাজে নারী ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। রামকৃষ্ণ নারীকে ভোগের বস্তু হিসেবে না দেখে মাতৃশক্তির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—

মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ।[৬]

তিনি নারীকে শ্রদ্ধা করার নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংযম ও মানবিকতার ওপর জোর দিয়েছেন। সমাজতত্ত্বে লিঙ্গ সম্পর্ককে ক্ষমতার কাঠামোর অংশ হিসেবে দেখা হয়। রামকৃষ্ণের নারীভাবনা এই ক্ষমতার একতরফা প্রয়োগকে নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং নারীর মর্যাদাকে একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করে।

যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক নারীবাদের মতো রাজনৈতিক নয়, তবু তা সমসাময়িক সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

গৃহস্থ জীবন সম্পর্কে রামকৃষ্ণের উপদেশও সমাজতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সংসার ত্যাগকে একমাত্র মুক্তির পথ হিসেবে দেখেননি। বরং সংসারের মধ্যেই সংযম, কর্তব্যবোধ ও ঈশ্বরচিন্তার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলেছেন। সংসারী বদ্ধজীবদের তিনি বলেছিলেন—

তারা যেন গুটিপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটি তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না; তাতেই মৃত্যু হয়। আবার যেন ঘুনির মধ্যে মাছ; যে-পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দ আর অন্য অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না। ছেলে-মেয়ের আধ-আধ কথাবার্তা যেন জলকল্লোলের মধুর শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পরিবারবর্গ। তবে দু-একটা দৌড়ে পালায়, তাদের বলে মুক্তজীব।[৭]

এই দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক সংকট নিরসনে সহায়ক হয়েছে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার চাপে মানুষ একদিকে ভোগবাদী জীবনের দিকে ঝুঁকছিল, অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনের সঙ্গে সেই জীবনের সমন্বয় করতে পারছিল না। রামকৃষ্ণের উপদেশ এই দ্বন্দ্বের একটি সমাধান নির্দেশ করে, যেখানে ব্যক্তি সমাজে অবস্থান করেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারে।

রামকৃষ্ণের উপদেশমূলক সাহিত্যে নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সত্যবাদিতা, দয়া, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজতত্ত্বে নৈতিকতা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। রামকৃষ্ণের নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সরিয়ে সমাজমুখী করে তোলে এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। এই দিক থেকে তাঁর উপদেশ সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সহায়ক হয়েছে।

সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যায়, রামকৃষ্ণের উপদেশমূলক সাহিত্য উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজের একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এতে ধর্ম, সমাজ ও নৈতিকতার এমন এক সমন্বয় ঘটেছে, যা মানুষে মানুষে বিভেদ নয়, বরং সেতুবন্ধন রচনা করে। সমাজতত্ত্বের আলোকে এই সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে রামকৃষ্ণের উপদেশ সমাজ পরিবর্তনের কোনো বিপ্লবী কর্মসূচি নয়, বরং একটি ধীর, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কারচিন্তা। এই কারণেই তাঁর উপদেশ আজও প্রাসঙ্গিক এবং তা আধুনিক সমাজচিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

তথ্যসূত্র :

আকর গ্রন্থ

১. শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, সপ্তম প্রকাশ মাঘ, ১৪০৩

২. শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় খন্ড, উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা, সপ্তম প্রকাশ মাঘ, ১৪০৩

সহায়ক গ্রন্থ

১. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ, মা....., মা জহি, দেওঘর, ১৯৮৮

২. ঘোষ, ডঃ প্রণবরঞ্জন,শ্রী রামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য,করুণা প্রকাশনী, কলকাতা,প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩২

৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৯

৪. নিজমুখে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপলব্ধি,রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ :মার্চ ২০০১

৫। হালদার, গোপাল বাংলার নবজাগরণ, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৫

৬. দেব,চিত্রা, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ,স্বপ্নদীপ প্রকাশনী, কলকাতা,প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৪৯

৭. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ramakrishna

৮. https://www.anandabazar.com/editorial

৯। কর,পরিমলভূষণ,সমাজতত্ত্ব,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯৫

১০। সেনগুপ্ত,অচিন্ত্যকুমার, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

১. BOTTOMORE– T. B– SOCIOLOGY– BLACKIE & SON ‘INDIA’ LIMITED– THIRD IMPRESSION 1975

২. AAnthony Giddens, Sociology, Cambridge: Polity Press, 2009.

৩. Durkheim, Emile,The Elementary Forms of Religious Life, London: Allen & Unwin, 1915.

বিশ্বজিৎ পাত্র

এক লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি : রাঢ় বাসরের ছড়া

রাঢ় বিবাহ রীতির একটি বিশেষ পর্ব হলো বিবাহের শেষে বাসর শয্যা। বিবাহের এই পর্বটি নবদম্পতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে যৌন ক্রীড়ার প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে। তাই বিয়ের রাতে যৌন মিলন থেকে নবদম্পতিকে বিরত রাখতে সারারাত ধরে চলে বাসর জাগানোর গান বা ছড়া, যা রাঢ় বাংলায় “বাসর জাগানো” নামে খ্যাত। ছড়া বা গানের মাধ্যমে এ লড়াই একপক্ষ অন্যপক্ষকে কটাক্ষ করে রাতভর চালিয়ে যায়। নববধূর বান্ধবী, বৌদি, দিদিমা, ঠাকুমারা লড়াইয়ে অংশ নিয়ে রঙ্গরসের ছড়ায় বাসরের আসর জমিয়ে দেন। অন্যপক্ষে বরকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে তার ঠাট্টার সম্পর্কের বন্ধু-বান্ধব, আর আত্মীয়ের দল। যৌন রসের ভিয়েন চড়িয়ে চলে উভয়পক্ষের ছড়া বা গানের লড়াই। ছড়ার ভাষা কিম্বা সুর আপাত দৃষ্টিতে অশ্লীল বলে মনে হলেও এই ছড়াগুলি নবদম্পতির লজ্জা ভাঙ্গিয়ে তাদের যৌন মিলনের মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। কাজেই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছড়াগুলোর গুরুত্ব আজও অপরিসীম।

অধুনা শিক্ষিত সমাজ অতীত দিনের বাসর জাগানোর এই রীতিকে Backdated calture বলে দাগিয়ে দিলেও সেকালের রক্ষণশীল গোঁড়া মা-বাবাও ছেলে-মেয়েদের বাসরের এই রঙ্গ রসের আসরে যোগ দেওয়া কে স্বীকৃতি দিত। কালের বিবর্তনে আজ এই ধারা অবলুপ্তির পথে। শুধুমাত্র টিকে আছে তথাকথিত কৌম, নিম্নবিত্ত ও কিছু নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে। আসলে সেকালে বর যেত পালকি কিংবা গরুর গাড়িতে চড়ে, বরযাত্রীরা যেতো পায়ে হেঁটে। বৈবাহিক সম্বন্ধও গড়ে উঠতো পাশাপাশি গ্রামে। ছিল ”ব্যরাত” বা বরাতের ব্যবস্থা, যা আসলে কনের বাড়িতে বাড়তি আরো এক দিনের আতিথ্য। আর আজ দ্রুতগামী যানবাহনের যুগে গরুর গাড়ির মতোই বাসরের অস্তিত্বও বিলুপ্তির পথে। ইতিকথা হতে বসেছে রাঢ় বাসরের গান বা ছড়া।

বিবাহের শেষে নবদম্পতিকে নিয়ে হই-হুল্লোড় করতে করতে বাসরে প্রবেশ ছিল অতীত দিনের অনিবার্য দৃশ্য। সেদিন বাসরের আসরে ঢুকতে ঢুকতে কনে পক্ষের মেয়েরা সুরেলা কণ্ঠে বলে উঠতো—

জুনপুকি তোর পন্দে আল
জামাই দাদা গান বল
তাও যদি না ব˚লতে পার
মা˚ক আন্যে হাজির কর
তাও যদি না আ˚নতে পার
কানমলাটি স্বীকার কর

তাও যদি না ক‌ইত্তে পার
আমার দিদির পায়ে ধর।

[জুনপুকি জোনাকি, পন্দে পিছনে, আন্যে এনে, আ‌ইনতে = আনতে, কইত্তে = করতে]

বিয়ের আনুষ্ঠানিক পর্ব সমাপ্ত হলে শ্যালিকারা নবদম্পতিকে নিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশ করে জামাইবাবুকে উদ্দেশ্য করে ছড়াটি বলে। নতুন পরিবেশে আড়ষ্ঠ জামাইবাবুর মুখ খোলাতে এটি আসলে শ্যালিকাদের খোঁচা। এতেও কাজ না হলে বাসরে সমবেত কণ্ঠে কনেপক্ষের মেয়েরা সুর চড়িয়ে বলে -

বাসর জাগার টাকা দাও রে রসিক চাঁদ
টাকা লিব ফুর্তি ক‌ইরব তবে ত হে গাইব গান।

[ক‌ইরব করবো, লিব = নেব]

এভাবে কনেপক্ষের মহিলাদের হৈ হুল্লোড়ের মাঝে নববধূর স্বহস্তে পানের খিলি দিয়ে বরকে অভ্যর্থনা জানানোর রীতি এখনো গ্রাম জীবনে প্রচলিত আছে। একটি ছড়াতে তাই দেখি বরকে পান দেওয়ার কথা স্থান পেয়েছে --

পান চিরি চিরি সুপারি চিরি কার বা মুখে দিব গো
কার গায়েতে হেলান দিয়ে সুখ কইরে শুব গো।

[গায়েতে = শরীর]

নববধূর বরের হাতে পান দেওয়ার সাথে সাথে ছড়াটি বাসরে উপস্থিত অন্যান্য মেয়েরা বলে থাকে। বরকে পান দেওয়ার এই নিয়মটি মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানসম্মত। কেননা, এটি হল লজ্জা নিবারনের প্রথম ধাপ। এ সময় বর পান নিতে কিন্তু বোধ করলে কল হাস্যের মধ্য দিয়ে আদিরসের মাত্রা চড়িয়ে চলে সেই একই প্রয়াস—

একটি পানের দশটি খিলি
ধর নাগর পানের খিলি
মুখে দিলাম পান তাও খাল্যে নাই
আর কি আমি ডাগর হব নাই
ডাগর হব তো কাছে শুব নাই
কাছে শুল্যে পয়সা লিব
পয়সা বড় ভারি
মনের মতন মন করিত
বাইড়টা লিতে পারি

[খাল্যে = খেলে, ডাগর = বড়, শুল্যে = শয়ন, লিব = নিব, বাইড়টা = অহমিকা, লিতে = নিতে]

বাসরের ছড়াগুলির যৌন আবেদন এভাবে নব দম্পতির প্রথম মিলনের পূর্বে আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। এর পরেই একটি ছড়াতে তাই দেখি শয্যা দেখিয়ে বধূকে বরের দিকে ঠেলাঠেলি করতে করতে বলা হয়েছে—

এলাচ লবং দারচিনি
বিছানা পাড়্যেছি ভাই একখানি
লোক লয় গো লক্ষ্মীসনা
সুখের সময় কষ্ট দিও না।
[পাড়্যেছি = পেড়েছি, লয় = নয়]

ঠেলাঠেলি তে বর নববধূর শরীর স্পর্শ করে ফেললেই বৌদি, দিদি, ঠাকুমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে—

টগর, টগর ফুলের বাসে
ঢল্যে পড়্যে হাসে
মরদ বড় রেঙ্গা
মাগকে দেয় কাঁড়বাশটা
নিজে লেয় ঠেঙ্গা।

[টগর = বান্ধবী, ঢল্যে পড়ে = ঝুঁকে পড়ে, রেঙ্গা = একরোখা, লেয় = নেওয়া, ঠেঙ্গা = লাঠি।]

এসব কথা শুনে বর স্বাভাবিক ভাবেই লজ্জাবনত হয়। শুনশান হয়ে ওঠে বাসরের পরিবেশ। কিন্তু বাসরের উদ্দেশ্য তো শরীরী স্পর্শের আঁচ দিয়েও নবদম্পতিকে শয্যা বিমুখ করে রাখা। কারণ বিয়ের রাতে যৌনমিলন সমাজ স্বীকৃত নয়। ঘুমজড়ানো চোখে তাই এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে এগিয়ে আসে কনের বৌদিরা। শুরু করে—

বর বর বর বরের অশত্থতলে ঘর
আঁইসকা পিঠা খাঁইয়ে বরের সারারাত জ্বর
ও বর ঘুমায় কি
আমরা প্রাণপতি ছাড়্যে আস্যেছি।

ছড়াটিতে সারা দিনের ধকল, উদ্বেগ আর টেনশন কাটিয়ে শেষ রাতে ক্লান্ত বরের ঘুম জড়ানো চোখের অতি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু বৌদিরা তো এসেছে, স্বামীসঙ্গ ছেড়ে বাসরের মাঝে আসর জমাতে। বরকে খুঁচিয়ে তুলতে তাই বৌদিদের বিদ্রুপ "ও বর ঘুমায় কি'। এতেও কাজ না হলে এগিয়ে আসে শ্যালিকার দল—

পোক্তা করে ধর গো দিদি পোক্তা করে ধর
পাঁচ লাখ্যে বহু কষ্টে আন্যেছি তোর বর
পোক্তা করে ধরগো দিদি পোক্তা করে ধর
হাত পিছলে পালাই যাবেক বাঁকুড়ার ঘর।

এ সময় প্রবল হইহুল্লোড় আর ঠেলাঠেলিতে যারা পিছনে পড়ে যায়, তারাও এগিয়ে এসে বলে—

সর সর সর তোদের দেখি বাসর ঘর
বর দেখিয়ে ঢলে পড়ে ধর ধর ধর
বর যেন তেঁতুলেরই গড়া
আমার দিদি যেন গো মদনমোহনের চূড়া
হায়লো দিদি কি করলি সোনার খাঁচায় কাক বসালি
গেঁথেছিল মালতীর মালা কোন বানরের গলে দিলি।

দুটি ছড়াই মূলত রঙ্গ-ব্যঙ্গের। কিন্তু তারই মাঝে এসে গেছে এখানকার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। প্রথম ছড়াটিতে পাঁচ লাখে বহু কষ্টে বর জোগাড় করার কথা আমাদের সমাজে পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যধিকে যেমন তুলে ধরেছে তেমনি দ্বিতীয় ছড়াটিতে দিদির রূপের সুখ্যাতি বোঝাতে বাঁকুড়া জেলার সুবিখ্যাত মদনমোহন মন্দিরের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে খোঁচার পর খোঁচার কোন জবাব না পেয়ে একসময় শুরু হয় যুবতী শ্যালিকাদের উপর বরের শারীরিক আক্রমণ। চলে হাত ধরে টানাটানি থেকে গায়ে ঢলাঢলি। কোনরকমে হাত ছাড়িয়ে শ্যালিকারা জবাব দেয়।—

ক) শিরিষ পাতা কাল কাল
দিদির বন্ধু দেˆখতে ভাল
আমার বন্ধু লক্ষ্মীছাড়া
দিনে যায় গো ঢ্যামনিপাড়া
পাকা খেজুর থাˆকতে বন্ধু কাঁচা খেজুর খাও
যার ঘরেতে যাও হে বন্ধু তারি মাথা খাও।

আবার কেউবা গায়-

খ) বাসকায় ভরা পিরিত করা দশ টাকা তার মাইনা
চুল ছেড়ে দাও চিকন কালা আর তোমারে চাইনা
যখন তোমায় চেয়েছিলাম তখন তোমায় পাই না।

[দেˆখতে = দেখতে, থাˆকতে = থাকতে]

ছড়াদুটিতে শ্যালিকাদের কথায় বাসরের রসিকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। আদি

রস পঞ্চমে উঠেছে ক) ছড়ায় 'পাকা খেজুর থাইকতে বন্ধু কাঁচা খেজুর খাও' কথাটিতে। শুধু তাই নয় ছড়াটির শেষ পংক্তিতে 'যার ঘরেতে যাও হে বন্ধু তারি মাথা খাও' কথাটির শ্লেষ বরের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। খ) ছড়ায় প্রেমের দেবতা কৃষকে চুল ছেড়ে দেওয়ার আর্তির মধ্যেও সেই আদিরসেই সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত রসিকতা পর্বে বরের বাসরসঙ্গীদের অঙ্গভঙ্গির জবাব দিতে এসময় এগিয়ে আসে কনের বয়স্ক বৌদি, ঠাকুমা বা দিদিমারা। তাদের কণ্ঠে ঝংকৃত হয়ে ওঠে—

আমগাছেতে প্রেমেরি বাগান তায় কি বকুল ধরে লো
চোখ ঠারাঠারি বদনভরি শ্যাম কি দয়া করে লো
যখন ছিলাম যুবতী তখন কতই আরতি
এখন হয়েছি ছেল্যার মা এক বিছানায় শু^ইতে গেলে গ্রাহ্য করে না
মরদ বলে পালাই যা তোর ধারে শু^ইব না।

আবার তথাকথিত কৌম বা অন্ত্যজ শ্রেণির বাসরে কিছুটা পৃথক সুরে গাওয়া হয়—

সুলি শালুকের ফুল ফুটে আধার রাতে
যার সঙ্গে যার ভালবাসা সে যদি না আসে
বন্ধু অত রাইত কিসে।

[শু^ইতে, শু^ইব = শয়ন করা, রা^ইত = রাত]

লক্ষণীয় এই ছড়াগুলো শ্লেষাত্মক ছড়া। প্রত্যেকটি কথাই নারী জীবনের অনিবার্য পরিণতির জ্বলন্ত ছবি। বিয়ের রাতের সানাইয়ের ঝংকার যে চিরদিনের নয়, গ্রাম্য অশিক্ষিত বধূদের জীবন বোধের এই উপলব্ধি সত্যিই আমাদের অবাক করে। আবার বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা বঞ্চিতরা বাসরে যে ছড়া সুর করে বলে তার ব্যাখ্যা করা সত্যিই জটিল। এর অন্তর্নিহিত ভাব নিজের মতো করে বুঝে নিতে হয়। এরকম একটি বাসর জাগানোর ছড়া হলো—

বাঁশি বড় তালকানা সময়-অসময় বুইঝে না
ধন্য রে তোর বাঁশি কে
পাগল কইরে নিয়ে গেল বনকে
ঘুটঘুইট্টা আঁধার রাতে পেরাই গেলি গলি পথে
বেজাই গেল শিঁয়াকু^ইলের ঝাড়ে।

উত্তরে স্বগতক্তির সুরে নিজেরাই ছড়া কেটে বলে ওঠে—

হাতেতে রেশমি চুড়ি নাখে চিড়িতন দিদি যা^ইস না লো বন
ফরেস্টারে দেখা পা^ইলে ক^ইরবেক জ্বালাতন।

[বুইঝে = বোঝে, ক^ইরে= করে, ঘুটঘুইট্টা = ঘন, পা^ইলে = পেলে, কইরবেক কোরবে]

স্বাভাবিকভাবেই এসব কথায় বরের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে দিদিমা কিংবা বৌদিরা এগিয়ে এসে শুরু করেন বরের মানভঞ্জনের কথা—

লকলক্যা পাতা লড়ে বাতাসে
ছকরা বন্ধুর মান ভাঙাব তিনটি সন্দেশে
ছকরা বন্ধু ব'নের বশ
খবর লেই নি বছর দশ।

[লকলক্যা = কচি কচি, ব'নের = বোনের]

তাছাড়া ফুল শয্যা নামক অবাধ যৌনাচারের ছাড়পত্রের প্রাক মুহূর্তে নববধূকে উপহার দেওয়ার রীতি বহু দিন ধরে চলে আসছে। এর আভাষ মেলে একটি ছড়ায়। অন্যভাবে উপদেশমূলক হিসাবেও ধরে নেওয়া যায় এই ছড়াটিকে—

প্রথম প্রথম শু'তে গেলাম প্রথমকার ফল
হাতে কি দিবি বল
হাতে দিব তোর হাত মাদুলি পায়ে দিব তোর মল
ছুড়ি ধমক ধমক চল
চ'লতে গেলে আর কি তোকে সাজে
এক থোড়া ঘুঙুর দিব মধ্যি চিতির মাঝে।

এরপর বর কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে সামান্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ততক্ষনে বিয়ের ধকল কাটিয়ে উঠে বরক্ষ্মকনের খাবার ইচ্ছা লাটে উঠেছে। বর তাই খাদ্য মুখে তুলতে না চাইলে সকলে সুর করে ছড়া কাটে—

সর গো তরা সর
তোদের ঢুকি বাসর ঘর
প্রেমে ঢলঢল নিশি করে এসে
দেখিবো তোদের বর
তোদের জামাই এসেছে গো কামাই করে
খাত্যে দিব কি
আনত কন্যা বটিনটা তোর
কঁট টা কাটে দি।

[খাত্যে,= খেতে, কঁট = পুরুষের যৌনাঙ্গ]

অথবা

আমাদের এই পাগলা এঁড়া খায়নি ছানি খায়নি ঘাঁটা
খায় গো লোকের ফসল তুল্যে
কা'লকে রাতে দেখে লিব তিন বিঘা হাল জুড়্যে।

[এঁড়া = পুরুষ গরু, ঘাঁটা = গরুর খাদ্য]

লক্ষ্যনীয় যে উভয় ছড়াতে কৌশলে নব দম্পতির যৌন মিলনের চিত্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে। কারণ দুটি সম্পূর্ণ অপরিচিত নারী পুরুষের মিলন ঘটে বিবাহের ফলে। উভয়ের মধ্যে কাজ করে সংকোচ বা লজ্জা। ছড়া দুটিতে তাই নবদম্পতির যৌন মিলনের কথা বলে পারস্পরিক লজ্জা নিবারণের পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ছড়াগুলিকে তাই অশ্লীল বলে মনে হলেও এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত বাসরের গান বা ছড়ার বৈচিত্র্য, ভাবানুভূতি, অনাড়ম্বর সহজ প্রকাশভঙ্গির কিছু নিদর্শন সমাজ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি নিয়ে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বস্তুত বিয়ের ছড়া মাত্রই এক অসাধারণ হর্ষ-বেদনার অভিব্যক্তি। তবে বাসরের ছড়াগুলিতে তারই মাঝে অন্ত:সলিলা ফল্গুর মতই সুপ্ত থেকেছে নবদম্পতিকে শয্যাবিমুখ করে, প্রথম মিলনের লজ্জা ভাঙ্গিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দেওয়ার প্রয়াস। এই ধরনের ছড়া বা গানগুলি কোন গীতিকারের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, সরল সাদাসিধে লোকজীবনের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনার কথা। যে কথায় একদিন ভরে যেত রসিক জনের চিত্ত। সেদিন বাস্তব আর স্বপ্নের তালে তাল মিলিয়ে নবদম্পতির নবজীবনের যাত্রাপথকে মসৃণ করতে বাসর সংস্কৃতির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ এই ছড়া বা গানগুলি নগর সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাবে বিলুপ্তির পথে। তাই লোকসাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদ গুলির সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সাহিত্য অন্বেষণ খুব প্রয়োজন।

ঋণস্বীকার : এই ছড়াগুলি ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত। যাঁদের কাছ থেকে ছড়াগুলো সংগৃহীত তারা হলেন - অমলা রুইদাস- মায়রাডিহি, কমলা রুইদাস - সাহেববাঁধ, বিশাখা লাই - চাঁদপুর, গীতা পাত্র - বেনাচাপড়া, প্রতিমা ঘোষ - ঝাড়গ্রাম, কাজল মাহাতো - বেলপাহাড়ি, গায়ত্রী মন্ডল - পানচুড়, ঝুমা কুন্ডু - মালাতোড়, নন্দরাম বাউরী- আশুরাবাদ, প্রতিমা গুলিমাঝি - কুসুম কানালি, ও মায়া প্রামানিক - কেচন্দা।

তথ্যসূত্র :

অতুল সুর, ১৯৯৭, প্রাগৈতিহাসিক ভারত। কলকাতা: সাহিত্য লোক।
অপূর্ব কৃষ্ণ রায়, ২০০৬, বাঁকুড়া জেলার কথা। বাঁকুড়া: লেখক।
আশুতোষ ভট্টাচার্য , ১৩৬৯, বাংলার লোক সাহিত্য- ২য় খন্ড: ছড়া। কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস।
কামিনী কুমার রায়, ১৯৭৭, লৌকিক শব্দকোষ, কলকাতা: লেখক। ২য় সংস্করণ।
পবিত্র সরকার, ১৯৯১, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।
বরুণ কুমার চক্রবর্তী (সম্পা:), ১৯৯৫, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

স্বরূপ দে

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য

আধুনিককালে বাংলায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশ চোখে পড়ার মতো। এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও পাচ্ছে। ফলত সময় যত অগ্রবর্তী হচ্ছে,যত আধুনিকীকরণ হচ্ছে শিশু-কিশোর মনের জটিলতাও ততোধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। পুরোনো শৈশব, কৈশোরের অবস্থা নব-আধুনিক সমীকরণে শুধু পাল্টেই যাচ্ছে তাই নয়, তাদের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটেছে অনেকখানি। আর এই সকল শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জন, বিনোদন, জ্ঞানার্জন, নৈতিক বিকাশের ধারা ধরেই শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশ। ৮-৯ বছর থেকে ১৬-১৭ বছর পর্যন্ত শিশু-কিশোররাই শিশু-কিশোর সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। ছড়া, গল্প, কবিতা, লোকগান, লোককথা, রূপকথা, বিজ্ঞান কাহিনি, গোয়েন্দা কাহিনি, ভৌতিক কাহিনির দ্বারা শিশু ও কৈশোর মনের গভীরে প্রবেশ করাই এই ধরনের সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন:

"আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাহাদিগকে ভীরু বানাইবার আয়োজনের অভাব এদেশে নাই। তাহার উপর আর একটা উপদ্রব বাড়ান কেবল অবাঞ্ছনীয় নহে, নিতান্ত গর্হিত। যদি ভূতের গল্প একান্তই কেউ নিতে চান, গল্প ও ছবি এমন দিবেন, যাহা দ্বারা ভূতগুলো হাসিয়া উড়াইয়া দেবার মত কিছু হয়।" (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)

অন্যদিকে অক্ষয়কুমার বসু 'শিশুবোধ রামায়ণে' বলেন:

"এই সব আদর্শ চিত্র করি দরশন
কর প্রিয় শিশু, তব চরিত্র গঠন।"

বাংলায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। এক্ষেত্রেও ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রভাবিত। যদিও বাংলার প্রাচীন রূপকথা, লোকজ উপাদান, সংস্কৃত ভাষার 'পঞ্চতন্ত্র' 'হিতোপদেশ'-এর প্রভাব শিশু-কিশোর সাহিত্যে পড়েছে তবুও ইংরেজি সাহিত্যই এই সাহিত্যের মূল প্রেরণাস্থলে বিদ্যমান। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের দুই অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও গোলোকনাথ শর্মার 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ'কে বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রারম্ভিক সূচনা বলে মনে করা হয়। অনেকে আবার উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা'কেও (১৮১২খ্রি.) এই পর্যায়ভুক্ত মনে করেন। এর পরবর্তীতে মিশনারীদের উদ্যোগে 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৭খ্রি.) ও 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭খ্রি.) তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তারিণীচরণ মিত্র ও তারাচাঁদ দত্ত যথাক্রমে 'নীতিকথা' (১৮১৮খ্রি.), 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮৪২খ্রি.) শিশু-কিশোর পাঠ্যপুস্তক রচনা

করেন। একাধিক পত্রিকাও এই সময় শিশু-কিশোর সাহিত্যকে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন- 'দিগদর্শন' (১৮১৯খ্রি.), 'পর্শাবলী' (১৮২২ খ্রি.) ইত্যাদি।

প্রকৃতরূপে শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশপর্ব শুরু হয় ঊনবিংশ শতকের চার ও পাঁচের দশকে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' (১৮৪৯ খ্রি., ১৮৫০ খ্রি.) গ্রন্থটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৮৫৫ খ্রি. দুই খণ্ডে বিদ্যাসাগর লেখেন 'বর্ণপরিচয়'। এছাড়াও 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী' বিদ্যাসাগরের শিশুমূলক সাহিত্য। এর পরবর্তীতে শিশু-কিশোর সাহিত্য লেখেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'মরমেত অর্থাৎ মৎস্যনারীর উপাখ্যান' (১৮৫৭খ্রি.), 'কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ' (১৮৫৮), 'হংসরূপী বাজপুত্রদিগের বিবরণ বিষয়ে' (১৮৫৯) উল্লেখযোগ্য শিশু গ্রন্থ। এই সময় 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। যা শিশু মনোরঞ্জন, শিশু-শিক্ষা, নীতিশিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক শিশু-কিশোর সাহিত্য রচিত হয়। যেমন- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৭), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১) ইত্যাদি। এইসময় অনেক সাহিত্যিক শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনায় মন দেন। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ ভট্টচার্য্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। একাধিক পত্র-পত্রিকাও এই সময়পর্বে শিশুসাহিত্য প্রকাশে উৎসাহিত ও উদ্যোগী হয়। যেমন- 'বালকবন্ধু', 'সখা', 'সাথী', 'সখা ও সাথী', 'বালক', 'মুকুল' ইত্যাদি।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধারাবাহিকতা মেনে বিংশ শতাব্দীতেও বাংলায় শিশু-কিশোর সাহিত্যে সচলমান প্রাণস্পন্দন লক্ষ্য করা যায়। যারা এইসময় পর্বে শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, অনিল সরকার, কমলকুমার মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুনির্মল বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

প্রথমেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কথায় আসা যাক। 'সখা' পত্রিকায় 'মাছি' প্রবন্ধটি দিয়ে সাহিত্যিক জীবনের পদচারণা শুরু। এরপর একের পর এক শিশু-কিশোর গ্রন্থ রচনা করেন। যথাক্রমে সেগুলি হল 'সেকালের কথা' (১৯০৩), 'ছেলেদের মহাভারত' (১৯০৮), 'মহাভারতের গল্প' (১৯০৯), 'টুনটুনির বই' (১৯১০), 'ছোট্ট রামায়ণ' (১৯১১) ইত্যাদি। শুধু তাই নয় উপেন্দ্রকিশোর শিশুদের জন্য একটি সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশ করেন- 'সন্দেশ'।

যা তাঁকে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি এনে দেয়। এবং এই পত্রিকার সঙ্গে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক যুক্ত হন। যেমন- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। নারী লেখিকারাও এই পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হন। যেমন- বিজনবালা দাসী, লাবণ্যলতা চৌধুরী।

উপেন্দ্রকিশোরের পরই শিশুসাহিত্যে যার অবদান তুলনারহিত তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর উল্লখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল- 'সহজপাঠ' (১৯৩০), 'পাঠসঞ্চয়ন' (১৯১২), 'ছুটির পড়া' (১৯২১), 'মুকুট' (১৮৮৫), 'নদী' (১৮৯৬), 'শিশু' (১৯০৩), 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২), 'খাপছাড়া' (১৯৩৬), 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭), 'সে' (১৯৪১), 'গল্পস্বল্প' (১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'সহজপাঠে'র অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হল-

"ছোট খোকা বলে অ আ
শেখেনি সে কথা কওয়া।"[১]

৪

শিশু সাহিত্যের এক অনন্য শিল্পী সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। তিনি উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র। পিতা-পুত্র উভয়েই শিশুসাহিত্যে প্রাণস্পর্শী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর হাতে বাংলা শিশু সাহিত্য পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে তাঁর লেখা শিশুরচনাগুলি হল- 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই', 'অবাক জলপান', 'হ য ব র ল' ইত্যাদি। তাঁর 'আবোল তাবোল'-এর কিয়দংশ নিম্নরূপে তুলে ধরা হল:

"আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত বাদল বাজিয়ে আয়।"[২]

সুকুমার রায়ের মতো লীলা মজুমদারও (১৯০৮-২০০৭) এক অনন্য শিশু সাহিত্যিক। 'সন্দেশ' পত্রিকার মাধ্যমেই সাহিত্য জগতে তাঁর হাতেখড়ি। তিনি ১৯৬১ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদিকাও ছিলেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর অজস্র সম্ভার রয়েছে। যেমন- 'বাঘের চোখ' (১৯৫৯), 'হাস্য ও রহস্যের গল্প' (১৯৭৬), 'হাতি! হাতি!' (১৯৭৭), 'কাগ নয়' (১৯৮১), 'পদিপিসীর বর্মী বাক্স' (১৯৫৩), 'হলদে পাখির পালক' (১৯৫৭), 'বকধার্মিক' (১৯৬০), 'মাকু' (১৯৬৯), 'নাকুগামা' (১৯৭৩), 'গুণুপণ্ডিতের গুণপনা' (১৯৭৫), 'টং লিং' (১৯৮১), 'বক বধ পালা' (১৯৫৯) ইত্যাদি।

শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৯৪-১৯৫০) ভূমিকাও অনবদ্য। একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে যতটা তাঁর কদর, তেমনিভাবে শিশু গ্রন্থেও তাঁর জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। 'মরণের ডঙ্কা বাজে' (১৯৪০), 'মিসমিদের কবচ' (১৯৪২), 'আম আঁটির

ভেঁপু' (১৯৪৪), 'হীরা মানিক জ্বলে' (১৯৪৬), 'ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৫৫), 'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৮) তাঁর বিখ্যাত শিশু-কিশোর সাহিত্য।

বিভূতিভূষণের পরবর্তী দুই শিশু সাহিত্যিক হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)। দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিকপাল। দুজনেই কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোর গ্রন্থ হল- 'পিঁপড়ে পুরাণ' (১৯৩১), 'হিমালয়ের চূড়ায়' (১৯৩২), 'পাতালে পাঁচ বছর' (১৯৩৪), ভানুমতীর বাঘ (১৯৩৯), 'আকাশের আতঙ্ক' (১৯৪২), 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস' (১৯৪২), ময়দানের দ্বীপ (১৯৪৯), 'কুমির কুমির' (১৯৪৯), 'ভূতশিকারী মেজোকর্তা' ইত্যাদি। অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাগুলি হল- 'মাসপয়লা' (১৯২৮), 'মরণের মুখোমুখি' (১৯৩৯), 'সপ্তকাণ্ড' (১৯৪৯), 'ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৫৫), 'চারমূর্তির অভিযান' (১৯৬০), 'কিশোর সঞ্চয়ন' (১৯৬১) ইত্যাদি।

৫

আধুনিকযুগে শিশুসাহিত্য রচনায় যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)। কল্পবিজ্ঞান ও অ্যাডভেঞ্চারের জগতে তিনি অনন্য। তাঁর কাকাবাবু সমগ্র শিশু-কিশোরদের অন্যতম মনোরঞ্জনকারী। তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়েও চমৎকার সৃষ্টি শৈলীতে কৈশোর জীবন আনন্দিত ও মুখরিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশু ও কিশোর রচনা হল- 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' (১৯৭২), 'সবুজ দ্বীপের রাজা' (১৯৭৮), 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক' (১৯৮১), 'মিশর রহস্য' (১৯৮৫), 'বিজয় নগরের হীরে' (১৯৮৯), 'কাকাবাবু ও ব্রজলামা' (১৯৯০) ইত্যাদি।

সুনীলের পূর্বের একজন শিশু ও কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা হলেন সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)। তাঁর প্রোফেসার শঙ্কু, তারিণীখুড়ো ও ফেলুদা চরিত্র কিশোর মনের নিজস্ব চরিত্র। বৈচিত্র্যে ও ঔজ্জ্বল্যতায় তা শিশু ও কিশোর মনকে স্পর্শ করে। তাঁর শিশু-কিশোর মনোরঞ্জক উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল- 'সোনারকেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য', 'একশৃঙ্গ অভিযান', 'শঙ্কুর শনির দশা', 'ক্লাসফ্রেন্ড' ইত্যাদি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) মুসলমান সমাজের মধ্যেকার একজন উল্লেখযোগ্য শিশু সাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল- 'আমাজনের অরণ্যে' (১৯৭৩), 'নিঝুম রাতের আতঙ্ক' (১৯৭৯), 'টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর' (১৯৮০), 'ম্যাজিসিয়ান মামা' (১৯৮৩), 'হায়েনার গুহা' (১৯৮৬), 'আডভেঞ্চার অমনিবাস' (১৯৯১) ইত্যাদি।

বিংশ ও একবিংশ শতকে একজন অন্যতম শিশু ও কিশোর সাহিত্য স্রষ্টা হলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৩৫ খ্রি.)। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল- 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' (১৯৭৮), 'গোঁসাই বাগানের ভূত' (১৯৭৯), 'হেতমগড়ের গুপ্তধন' (১৯৮১), 'হীরের

আংটি' (১৯৮৬), 'পাগলা সাহেবের কবর' (১৯৮৭), 'ছায়াময়' (১৯৯২), 'পাতালঘর' (১৯৯৬) ইত্যাদি।

বিশ শতকের আরেকজন খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশু সাহিত্য হল- 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), 'ঠাকুরদার ঝুলি' (১৯০৯), 'ঠানদিদির থলে' (১৯০৯), 'দাদামশায়ের থলে' (১৯৯৩), 'খোকাবাবুর খেলা' ইত্যাদি।

৬

উপরিউক্ত শিশু সাহিত্যিক ছাড়াও উনিবিংশ, বিংশ ও একবিংশ শতকে একাধিক শিশু ও কিশোর সাহিত্যিক ও তাদের রচনার সম্ভার মেলে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিশু ও কিশোর সাহিত্যের নিদর্শন তুলে ধরা হলো। কমলা চক্রবর্তীর 'হিমালয়ের চূড়ায়', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অজানার দেশের পথে', মামিনুর রহমানের 'চাঁদের দেশে অভিযান', আব্দুল জলিলের 'ভৌগোলিক কবিতা', আসারাফ সিদ্দীকির 'কাগজের নৌকা', কাজী আব্দুলের 'কাসেমের পুথির মালা', রজনীকান্ত সেনের 'অমৃত', রবিদাস সাহার 'খুশির দেশে', গোলাম মোস্তাফার 'ভোর বেলার গান', ধীরেন বলের 'আমাদের গাঁ', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া', মোহিত ঘোষের 'টাপুর টুপুর', সুনির্মল বসুর 'তালপাতার সিং', অন্নদাশংকর রায়ের 'সাতভাই চম্পা', সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুড়ে', ভবতোষ দত্তের 'বাংলার ছড়া', কানাইলাল চক্রবর্তীর 'চলো দেখে আসি', শিবরাম চক্রবর্তীর 'কেবল হাসির গল্প', মহাশ্বেতা দেবীর 'তুতুল', মোসলেম উদ্দীনের 'বোকা কুমীরের গল্প', সাহনাজ বেগমের 'আরবের রূপকথা', আখিল নিয়োগীর 'শিশু নাটিকা', উপেন্দ্র মল্লিকের 'কবির লড়াই', নজমুল আবদালের 'সূর্যমামার গল্প', সুবোধচন্দ্র মজুমদারের 'বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী', ইত্যাদি।

সময় যত বহমান শিশুমন তত বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও ভিন্ন চাহিদারত। নতুনের ব্রতে তারা সর্বদাই সমাহিত। গল্প, ছড়া, গান, রূপকথা, গোয়েন্দাধর্মীতা, কল্পবিজ্ঞানে তারা চির নবত্বে অগ্রসমান। ফলত নাবালক ও সাবালক দুইই আজ নতুনভাবে মনোরঞ্জিত, বিনোদিত ও বিকশিত হতে চায়। সুতরাং তাদের জন্য রচিত সাহিত্যও চির ধারাবাহিক হলে হয় না। তাই নতুন নতুন ভাবনা, চিন্তাও সাহিত্য স্রষ্টাদের মাথার মণিকোঠায় পৌঁছেতে বাধ্য করে। ফলস্তু কালের প্রয়োজনে সৃজিত হচ্ছে নব আঙ্গিকের শিশু-কিশোর সাহিত্য। কল্পবিজ্ঞান থেকে রূপকথা, মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব কোন কিছুই যেন বাদ পড়ছে না তাতে। কল্প-বাস্তবের যেন নতুন জগৎ তৈরি হচ্ছে বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যে। তাই অন্যান্য নানান সাহিত্যিক প্রকরণের মতো শিশু-কিশোর সাহিত্যও যেন আজ বাংলা ও বাঙালির হৃদয়-মজ্জায় সমানভাবে গ্রথিত ও ক্রিয়াশীল।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সহজপাঠ, প্রথমভাগ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৃ.২

২। রায়, সুকুমার: আবোল তাবোল, সুকুমার সমগ্র রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, জুন, ১৯৬০, পৃ. ২১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। রায়, সুকুমার: আবোল তাবোল, সুকুমার সমগ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, জুন ১৯৬০, কলকাতা।

২। বসু, বুদ্ধদেব: বাংলা শিশুসাহিত্য, সাহিত্যচর্চা, প্রবন্ধ সমগ্র-৪, দেজ পাবলিশিং, ২০২১, কলকাতা।

৩। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য, প্রাক শারদ ২০১৩।

৪। 'শিশু কিশোর সাহিত্য' সকালবেলার আলোর দেখা, সংকলক ও সম্পাদক সুশীল সাহা, দিয়া পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ২০২১।

৫। বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য, NSOU, ডিসেম্বর ২০২৩, কলকাতা।

গোপাল মণ্ডল

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন ও কীর্তন সম্প্রসারণে এক মহীয়সী ব্যক্তিত্ব জাহ্নবা দেবী

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণ মূলত রাধা। রাধা ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সাহিত্য দীর্ঘ পাঁচশো বছর সাহিত্যের আঙিনা শাসন করলেও এই ধর্ম আন্দোলনে নারীর সংখ্যা যেমন কম, তেমনই নারীর হাতে বৈষ্ণব ক্ষমতায়নের সময়কালও বড্ড কম। তবে একুশ শতকে দাঁড়িয়ে জাহ্নবা দেবীর ভূমিকার কথা আলোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনে জাহ্নবা দেবী শুধুমাত্র একটা নাম নয়, একটা নতুন যুগ এক নারীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নতুন যুগ। প্রাচীন ভারতবর্ষে কিছু মহীয়সী নারীর সন্ধান পাওয়া গেলেও মধ্যযুগের বাংলা তথা ভারতে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। বাংলায় তুর্কি আক্রমণে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে এবং সেই সঙ্গে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসনের শুরুতে হিন্দু নিধন ও ধর্মান্তরীকরণ বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় হিন্দুরা নিজেদের ঘর গোছানোর পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় মন দেয়। নারীদের যবন অর্থাৎ মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাতে তাদের গৃহবন্দী করে তোলে।[১] সেন যুগে পুরুষের স্বার্থে গড়ে উঠেছিল কৌলিন্য প্রথা। মধ্যযুগে তা আরও বিস্তার লাভ করল। এর সঙ্গে যুক্ত হল বাল্যবিবাহ, অসম-বিবাহ; যার ফল স্বরূপ সমাজে দেখা দিল অকাল বৈধব্য। নারীকে সমাজ ও পুরুষের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে যুগ যুগ ধরে সতীদাহ প্রথা চলছিলই, মধ্যযুগে তা যেন আরো বৃদ্ধি পেল।[২] নারীকে রক্ষার নাম করে করা হলো গৃহবন্দী এবং তাদের উপর চলতে থাকল প্রতিনিয়ত নির্যাতন। নারী শুধুমাত্র পুরুষের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হয়ে উঠলো।

আধুনিক যুগে বিশেষ করে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী ও শেষদিকে নারীবাদী আন্দোলন এক জোরালো দাবি নিয়ে সাহিত্য ও সমাজে ধাক্কা দেয়। এই আন্দোলনের কথা বলতে হলে বলতে হয় ফরাসি আন্দোলনের কথা। ফরাসি আন্দোলনের পরবর্তীকালে ঘোষিত হয় 'পুরুষদের অধিকারের ঘোষণাপত্র' (Declaration of the Rights of man)। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাদাম গুৎজ নামক এক ফরাসি মহিলা দাবি করেন নারীদের যদি ফাঁসিতে যাওয়ার অধিকার থাকে, তাহলে তাদের সংসদে যাওয়ার অধিকার থাকবে না কেন? এর পরিণতি স্বরূপ মাদাম গুৎজকে ফাঁসিতেই যেতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু শুরু করেছিল এক নারী আন্দোলন। ভারতবর্ষে নারীবাদী আন্দোলন অনেক পরে ঘটলেও মধ্যযুগের মধ্য-গগনে দাঁড়িয়ে জাহ্নবা দেবী যে অবস্থান নিয়েছিলেন তাতে তাকে মধ্যযুগের নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বলতে হয়। জাহ্নবা দেবীকে সাহিত্যিক হিসেবে গণ্য করা

উচিত হবে না, তাঁর তেমন কোন সাহিত্যিক নিদর্শনও আমরা পাইনি। তাঁকে আমরা বৈষ্ণব ধর্মগুরু হিসেবেই চিহ্নিত করব। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে বিশেষ করে চর্যাপদে নারীদের যে অবস্থান পাই তাতে একটি পদে দেখা যায় এক নারী স্বাধীন ভাবে সমাজের বাইরে বাস করছে। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে কোনো নারীর উল্লেখ আমরা পাইনা। যদিও কেউ কেউ মনে করেন 'কুক্কুরি পা' একজন নারী পদকার ছিলেন। তবে এ অনুমান মাত্র। বাংলায় যথার্থ মহিলা কবি হিসেবে আমরা পাই রামীর নাম। এ প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন— "বঙ্গের মহিলা কবিদের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে সকলের আগে রজকিনী রামীর নাম করিতে হয়। তাঁহার রচিত কয়েকটি পদ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহাঁকেই বঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে প্রথম স্থান দিতে হয়। তাঁহার পূর্বে যে দুই একজন স্ত্রী কবির ভনিতা পাওয়া যায় তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ মহিলা কবিরূপে গ্রহণ করা যায় না বলিয়াই আমরা প্রথমেই রামীর কথা বলিতেছি।"[৩]

রামী ছাড়াও আমরা বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কয়েকজন মহিলা কবিকে পেয়েছি। যেমন ফরিদপুরের কোটালি পাড়ার প্রিয়ংবদা দেবী, যিনি মাদলসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের শান্তি পর্বের বিষয়ে সুবিস্তৃত টীকা রচনা করেছিলেন। ষোড়শ শতকের বিদূষী কবি মাধবী দেবীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ছিলেন স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। এই মহিলা কবিদের ধারায় যিনি উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী। যিনি মনসার ভাসান গাওয়ার পাশাপাশি রামায়ণের অনুবাদও করেছিলেন। যা মূলত 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ' নামে পরিচিত। তা যথার্থ রূপে রামায়ণ না হয়ে, হয়ে উঠেছিল 'সীতায়ন'। এই কাব্য যেহেতু একজন নারীর রচনা, তাই দীর্ঘদিন ধরেই ছিল সাহিত্যের ইতিহাসে বঞ্চিত। এই প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেনের মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে— "একে কি আমরা কণ্ঠরোধের কৌশল রূপে চিহ্নিত করব? এই রামায়ণটির যে কণ্ঠরোধ করে রেখেছিলেন সাহিত্যের ঐতিহাসিকের দায়িত্বে থাকা শহুরে শিক্ষিত পুরুষ মধ্যস্থবৃন্দ, এতে অবাক হবার কিছু নেই। একা তাঁদের কিন্তু আমরা দোষারোপ করতে পারিনা। এই নারীচিত পরিচিত 'রামায়ণে' স্বয়ং রামকেই এক কোণে ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে যেখানে সীতার প্রসঙ্গে ভিন্ন এক কদাচিৎ দৃশ্যমান। আখ্যানের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সীতারই জীবনের কাহিনি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রামকথার আবরণের অন্তরালে এটি সম্পূর্ণই সীতা কথা। অতএব পণ্ডিতদের মনোমত না হওয়াই স্বাভাবিক।"[৪]

মধ্যযুগে বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু নারী সাহিত্যিককে আমরা পেয়েছি। তাঁরা যথার্থ রূপে কবি বা সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে তাঁদের সরাসরি

ভূমিকা পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের বৈষ্ণব ধর্ম-আন্দোলনে চৈতন্যদেব ও তাঁর পরবর্তী ষড়-গোস্বামীদের চলে যাওয়ায় বৈষ্ণব ধর্ম-আন্দোলন এক প্রকার ভেঙে পড়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু বিদূষী নারীকে আমরা পেয়েছি, যেমন- নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবী, অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের পুত্রবধূ সুভদ্রা, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা ও পুত্রবধূ যথাক্রমে হেমলতা ও সত্যভামা প্রমুখ। এঁদেরে মধ্যে জাহ্নবাদেবী বৈষ্ণব সমাজে শিরোমণি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

জাহ্নবা দেবীর জন্ম ১৪৩১ শকাব্দে (১৫০৯ খ্রি.) নবদ্বীপের কাছে শালিগ্রামে। তাঁর পিতার নাম সূর্যদাস পণ্ডিত, মাতা ভদ্রাবতী। সূর্যদাস তৎকালীন গৌড়রাজ আলাউদ্দিন হুসেন শাহের অধিনে কোষাগারের হিসেব রক্ষক ছিলেন। কর্মকুশলতার কারণে সুলতান তাঁকে 'সরখেল' উপাধি দেন। সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুমতী ও জাহ্নবা।[৫] মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন নিত্যানন্দকে আদেশ দিয়েছিলেন বঙ্গে-বৈষ্ণবধর্ম ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পর অবধূত নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের নেতৃত্ব ভার নিজের হাতে নেন। তখন নিত্যানন্দ নবদ্বীপ থেকে চব্বিশ পরগনার খড়দহে এসেছিলেন। পরে খড়দহই নিত্যানন্দের প্রধান কর্মস্থল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে মোট তিরাশি জন নিত্যানন্দ ভক্তের কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে অভিরাম দাস, গদাধর দাস, বাসুদেব ঘোষ, নবদ্বীপের 'খোলাবেচা' ব্রাহ্মণ শ্রীধর এবং স্বয়ং বৃন্দাবন দাস। নিত্যানন্দ সেই সময় অনেকেরই বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর ভক্তরা 'নিত্যানন্দ বিনা নাহি জানে আন'। প্রথম জীবনে সংসারধর্ম ত্যাগী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু চৈতন্যের আদেশে দার পরিগ্রহের ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর নিত্যানন্দ 'স্বরূপ' ও 'অবধূত' রূপেই সুপরিচিত ছিলেন।[৬] খড়দহে নিত্যানন্দ বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দেই থাকতেন। তাঁর গৃহের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা এইরূপ

'লক্ষ লক্ষ জ্বলে কত প্রদীপ রসাল।।...
বিচিত্র-নির্মাণ হর্ম্য গঠন সুন্দর।
ধ্বজ-পতাকাতে শোভে অতি মনোহর।।
পারাবত কেলি করে বসিয়া কুটীরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে কোকিল কুহরে।।
গঙ্গার সমীপে স্থল অতি সুশোভন।
দিব্যভূষাম্বরে শোভে দাস দাসীগণ।।'[৭]

জাহ্নবা ও বসুধা দুই বোনের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকমের। বসুধা ছিলেন অন্তর্মুখী শান্ত মৃদুভাষী চিরন্তন ভারতীয় নারী। অন্যদিকে জাহ্নবা ছিলেন বহির্মুখী। জাহ্নবাদেবী বেশ কিছুটা বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছিলেন। দুই বোনে মিলে একসঙ্গে নিত্যানন্দের সংসার যাপন করলেও, তাঁদের সংসার জীবন কেমন ছিল তা সঠিক জানা যায় না। তবে বসুধা দেবীর বীরভদ্র নামে এক সন্তান ছিল। জাহ্নবা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। জাহ্নবা দেবী বীরভদ্রকে নিজের সন্তান রূপে লালন-পালন করতেন। ১৫৪৪ খ্রি. অবধূত নিত্যানন্দ ধরাধাম ত্যাগ করেন। তখন জাহ্নবা দেবীর বয়স ছিল ছত্রিশ বছর।[৮] এই অকাল বৈধব্যের পর জাহ্নবা দেবী ঘরের ভিতরে আর পাঁচজন হিন্দু নারীর মতন বসে রইলেন না। আত্মপ্রকাশ করলেন নতুন রূপে। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর খড়দহে শ্রীপাট ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে। সেই পরিস্থিতিতে জাহ্নবা দেবী শ্রীপাটে সক্রিয় পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। একেই নিত্যানন্দের পত্নী, অন্যদিকে নিজস্বতা দিয়ে এক স্বতন্ত্র জাহ্নবা দেবী হয়ে উঠলেন। তাঁর কাজকর্ম শুধুমাত্র খড়দহে সীমাবদ্ধ থাকলো না। চৈতন্য-নিত্যানন্দ ও ষড়গোস্বামীদের পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও আন্দোলনকে তিনিই নেতৃত্ব দিলেন। তিনি হয়ে উঠলেন বৈষ্ণব সমাজের 'মা গোঁসাই'।

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন বাংলায় বৈষ্ণবধর্মে দুর্দিন চলেছিল। বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মধ্যে নানান দল ও উপদল দেখা যায়। যেমন—

অদ্বৈত আচার্যের অনুগামী বৈষ্ণবগোষ্ঠী, নিত্যানন্দের অনুগামী বৈষ্ণবগোষ্ঠী, শ্রীখণ্ডের গৌরনাগরবাদী বৈষ্ণবগোষ্ঠী, গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী "গদাই গৌরাঙ্গ" বৈষ্ণবগোষ্ঠী।[৯]

অবধূত নিত্যানন্দকে অদ্বৈত আচার্য পছন্দ করতেন না। একবার উভয়ে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তার প্রভাব উভয় গোষ্ঠীতেই ছিল। বীরভদ্র অদ্বৈত আচার্যের কাছে দীক্ষা নিতে শান্তিপুরের দিকে যাত্রা করলে জাহ্নবাদেবী তাঁকে মাঝ পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন। নিজেই বীরভদ্রকে গৌর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দেন। এর মাধ্যমে নিজ গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র বজায় রাখেন। চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের এই অভাবনীয় পরিণাম ও বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের দলাদলির কথা বৃন্দাবনের গোস্বামীরা জানতেন। এই পরিস্থিতিতে জাহ্নবাদেবী দু'বার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। "জাহ্নবাদেবীর শিষ্য নিত্যানন্দ দাস তাঁর 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে এ সকল ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রামাণ্যতা সর্বাংশে প্রশ্নাতীত না হলেও তাতে প্রকাশিত সমন্বয় সাধনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়।

জাহ্নবা দেবী তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ করলেন খেতুরীর মহোৎসবে। বৈষ্ণব সমাজের দলাদলির অবস্থা যখন তুঙ্গে, তখন বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন বাংলার তিন বৈষ্ণব

সাধক। এই তিন বৈষ্ণব সাধক হলেন-শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ প্রভু। শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম আনুমানিক ১৫১৯ খ্রি. কাছাকাছি সময়ে। তাঁর পিতার নাম গদাধর ভট্টাচার্য, মায়ের নাম লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী। বাড়ি বর্ধমান জেলার যাজীগ্রাম। তাঁরা ছিলেন-রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরী ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস আচার্য অত্যন্ত সুন্দর দেখতে ছিলেন। তাঁকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবরও বলা হয়।[১০] নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম আনুমানিক ১৫৪০ খ্রি.। তিনি ছিলেন রাজশাহী জেলার খেতুরী পরগনার কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম নারায়ণী। তাঁর বাবা ছিলেন জমিদার। তারা ছিলেন কায়স্থ শূদ্রকুলজাত।[১১] শ্যামানন্দ প্রভুর জন্ম আনুমানিক ১৫৩৪ খ্রি.। তাঁর বাড়ি মেদিনীপুর জেলার ধারোন্দা বাহাদুরপুর গ্রাম। তাঁর পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। এই দম্পতির অনেক পুত্র-কন্যা জন্মানোর পরই মৃত্যু হয়। তাই জীবিত সন্তান শ্যামানন্দ প্রভুর নাম রাখেন দুখী। শ্যামানন্দ প্রভু ছিলেন শ্রীমতি সখী ললিতার আশীর্বাদ ধন্য। তাঁর কপালে নূপুরাকৃতি তিলক ছিল। জীব গোস্বামী তাঁর নাম রাখেন শ্যামানন্দ। তাঁরা জাতিতে ছিলেন সদ্‌গোপ।[১২] এই তিন বৈষ্ণব বঙ্গসন্তানের সহযোগিতায় 'খেতুরীর মহোৎসব' হয়। খেতুরীর অনুষ্ঠিত সমাবেশের সময়কাল সম্পর্কে নানান মতামত গড়ে উঠেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪র্থ খণ্ড পৃ. ১৮৫৬) অনুযায়ী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ১৫০৪ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৫৮৩ খ্রি. মার্চ মাস) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুকুমার সেন এই মহোৎসব নিয়ে দুই রকম মত দেন। প্রথমত বলেন ১৫৮০ খ্রি.। আবার পরে 'A History of Brajabali Literature' গ্রন্থে ১৫৮৩ খ্রি. বলে মন্তব্য করেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ১৫০৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৮২ খ্রি. বলে মন্তব্য করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খেতুরীর মহোৎসবের সময় নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বীরহাম্বির কর্তৃক গ্রন্থচুরির প্রসঙ্গ টেনে ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই খেতুরীর মহোৎসব হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এই যুক্তি অযৌক্তিক, কেননা গ্রন্থ চুরির ঘটনা অনৈতিহাসিক।[১৩]

ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন "এতে শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ যোগদান করেন। ১৫৯০ খ্রি. রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫২ খ্রি. তাঁর তিরোধান হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা হয় ১৬১০ থেকে ১৬২০-র কোনো এক সময় খেতুরীর অনুষ্ঠান হয়"। এই যুক্তিও মেনেও নেওয়া যায় না। কেননা রমাকান্ত চক্রবর্তী 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই মন্তব্য করেন। কিন্তু 'প্রেমবিলাস'-এর বহু তথ্যই অনৈতিহাসিক। আর একটি মতামত প্রচলিত যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হয় অর্থাৎ ১৫৮৩ খ্রি.। বিভিন্ন মত দেখে মনে করা হয় 'খেতুরীর মহোৎসব' ১৫৮০ থেকে

১৫৮৪ খ্রি. এর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে হয়। হিতেশরঞ্জন সান্যাল খেতুরীর মহোৎসব উপলক্ষে মন্তব্য করেছেন

"১৫৭৬ সাল বা তাহার অব্যবহিত পরে খেতুরী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি রাধাকৃষ্ণ ও একটি গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম এই মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন"।[১৪]

এই উৎসবের সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন সন্তোষ দত্ত। বিখ্যাত গান রচয়িতা বলরামদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রমুখ বহু বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক উপস্থিত ছিলেন। ছটি বিগ্রহ-শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধামোহন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যার মধ্যে একটি মূর্তি প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গের মূর্তী। নরোত্তম বিলাসে আছে-

'লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্র' (নরোত্তম বিলাস-১১৯)

এই মহোৎসবের সঞ্চালনা করলেন জাহ্নবা দেবী। ভেঙে পড়া বৈষ্ণব গোষ্ঠীকে একছাতার তলায় নিয়ে এলেন। এক নতুন ধারার বৈষ্ণব আন্দোলন শুরু হল। এই অনুষ্ঠানে নরোত্তম ঠাকুর প্রথাগত ভাবে লীলাকীর্তন গানের প্রবর্তন করলেন। গৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি এই তত্ত্বকে গানে রূপ দেওয়া হল। এখানেই কীর্তন গানের সূচনায় 'গৌরচন্দ্র' বা গৌরচন্দ্রিকা গাইবার রীতি প্রবর্তিত হল। নরোত্তম দাস বৃন্দাবনে বসবাসকালীন শাস্ত্রীয় কীর্তন গানের শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং লীলাকীর্তনে সেই রীতিকে প্রণয়ন করলেন। এরপর বৈষ্ণব সাহিত্য আরও বিস্তার লাভ করলো কীর্তনের মাধ্যমে। কীর্তন মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে আদেশ নিত্যানন্দকে দিয়েছিলেন তা সফল করে তুললেন জাহ্নবাদেবী। তিনিই মহিলাদের নিয়ে এলেন বৈষ্ণব সাহিত্য ও সমাজের মূল আঙিনায়। তাঁর দেখানো পথেই কীর্তনে নারীদের আগমন। সমাজের মূল স্রোতের বাইরে চলে যাওয়া বহুনারী এক সময় কীর্তনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে ফিরেছিল। আজকের দিনেও কীর্তন নারীদের কাছে স্বনির্ভর ভাবে বেঁচে থাকার একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কীর্তনের জনপ্রিয়তা ও সম্প্রসারণে নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র :

১। সনৎকুমার নস্কর, পুরাতনী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রসঙ্গে (প্রথম খণ্ড), আশাপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২, পৃষ্ঠা- ১৫৯
২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৯
৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩১, পৃষ্ঠা- ২

৪। নবনীতা দেবসেন, চন্দ্রমল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, দে'জ, কলকাতা, পুনমুর্দণ ২০১৯, পৃষ্ঠা -৪৩-৪৪

৫। সনৎকুমার নস্কর, পুরাতনী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রসঙ্গে (প্রথম খণ্ড), আশাপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২, পৃষ্ঠা- ১৬২

৬। রমাকান্ত চক্রবর্তী, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম একটি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, আনন্দ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৭৮

৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৮

৮। সনৎকুমার নস্কর, পুরাতনী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রসঙ্গে (প্রথম খণ্ড), আশাপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২, পৃষ্ঠা- ১৬৫

৯। রমাকান্ত চক্রবর্তী, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম একটি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, আনন্দ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৭৮

১০। জীমূতবাহন রায়, শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশ সমিতি, শান্তিনিকেতন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৩৩

১১।নীরোদপ্রসাদ রায়, নরোত্তম দাস ও তাহার রচনাবলী, পৃষ্ঠা-১৭

১২।সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-৮৫

১৩।যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, চৈতন্য সংস্কৃতিতে কীর্তনের ভূমিকা, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৯

১৪।হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস, কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ পৃষ্ঠা-১৪২.

সত্যজিৎ দত্ত

বিশ্লেষণের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্যচর্চা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত যে ক্ষণজন্মা পুরুষ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করে সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষকে বন্দিত করেছিলেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি বাংলা ভাষায় ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবানী, পত্রাবলীর বাংলা চিঠিপত্র, সঙ্গীত কল্পতরু এবং একটি গানের খাতা লিখেছিলেন। সংখ্যায় স্বল্প হলেও স্বামীজি রচিত বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব কম নয়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে স্বামী বিবেকানন্দ সরাসরি সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ না করলেও সাহিত্যিক প্রতিভা তার মধ্যে ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন চলিত বাংলার একজন বলিষ্ঠ লেখক।

স্বামীজির বাংলা সাহিত্য রচনার বেশিরভাগই 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীজীর 'ভাববার কথা' গ্রন্থটিতে হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বাঙ্গালা ভাষা, বর্তমান সমস্যা, জ্ঞানার্জন, প্যারি প্রদর্শনী, ভাববার কথা, ম্যাক্সমুলারকৃত রামকৃষ্ণ ও তাহার উক্তি (গ্রন্থ সমালোচনা), শিবের ভূত,ঈশা-অনুসরণ প্রভৃতি নয়টি প্রবন্ধ রয়েছে সেগুলো সবকটিই 'উদ্বোধন' পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীজির 'ভাববার কথা' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধ প্রকৃতিতে ভিন্নধর্মী। যেমন- 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে স্বামীজি মূলত বাংলা ভাষা বিষয়ে নিজের মতামত দিয়েছেন। কোন ভাষা গ্রহণ করা উচিত এ বিষয়ে নিজের মতামত দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন — 'যদি বল ও-কথা বেশ, তবে বাঙ্গালা ভাষার স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা , কোনটি গ্রহণ করবো ? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে , সেইটি নিতে হবে অর্থাৎ কলকাতার ভাষা পূর্ব-পশ্চিম যে দিক থেকে আসুক না কেন একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখেছি সেই ভাষা লোকে কয় তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন ভাষা লিখতে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, ততই পূর্ব-পশ্চিমে ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ওই এক কলকাতার ভাষায় রাখবে। কোন জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট সে কথা হচ্ছে না কোন ভাষা জিতছে সেটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকাতার ভাষাই অল্প দিনে সমগ্র বাংলাদেশের ভাষা হয়ে যাবে তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয়, তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকাতার ভাষাকে ভিত্তি রূপে গ্রহণ করবেন।[১]

'ভাববার কথা' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'মাক্সমুলার কৃত রামকৃষ্ণ ও তাহার উক্তি' প্রবন্ধটি স্বামীজির সহজ সরল ভাষায় লেখা একটি গ্রন্থ সমালোচনা। যেখানে তিনি বলেছেন- 'দার্শনিক পূর্ণ ভারত ভূমিতে যে সকল ধর্ম তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ মাক্সমুলার প্রকাশ করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেকে উহার মর্ম বুঝিতে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং অযথা বর্ণনা করিয়াছেন।[২]

এই 'ভাববার কথা' প্রবন্ধ গ্রন্থেই 'ঈশা অনুসরণ' প্রবন্ধটি স্বামীজি আমেরিকা যাওয়ার আগে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক মাসিক পত্রের ' IMITATION OF CRIST ' নামক বিখ্যাত বইয়ের 'ঈশা অনুসরণ' নাম দিয়ে অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। এর সূচনা অংশটি স্বামীজির মৌলিক রচনা। 'ঈশা অনুসরণ' প্রবন্ধটিতে ছটি প্রবন্ধ রয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে - খ্রিস্টের অনুসরণ এবং সংসার ও যাবতীয় সাংসারিক অন্তঃসার শূন্য পদার্থে ঘৃণা, আপনার জ্ঞান সম্বন্ধে হীনভাব , সত্যের শিক্ষা, কার্য্যে বুদ্ধিমত্তা, শাস্ত্রপাঠ, অত্যন্ত আসক্তি। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সমস্ত রচনাগুলি স্বামীজীকৃত বাংলা অনুবাদ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'পরিব্রাজক' প্রবন্ধে বিশুদ্ধ মুখের ভাষা বা চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর চলিত রীতি অত্যন্ত জীবন্ত। এই 'পরিব্রাজক' প্রবন্ধ গ্রন্থে দর্শন, ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কিত বহু মননশীল প্রবন্ধ আছে। এই সকল প্রবন্ধের চলিত ভাষা চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয়। যেমন- 'পরিব্রাজক' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'ভারত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ' প্রবন্ধের স্বামীজীর ভাষা ব্যক্তিগত ঘরোয়া ভাষার মতো। উদাহরণ — 'জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে, এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুড়িয়ে পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েছেন। যে জমি আমাদের বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আর বড় এগুচ্ছেন না, ওই সোঁদরবন পর্যন্ত।[৩]

স্বামীজি তাঁর লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করেছেন এমনকি এই ভাষার সংলাপের ধরন, রীতিনীতি, মুদ্রাদোষ প্রভৃতিকেও ভাষার মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এই ভাষার বৈশিষ্ট্য হল তৎসম শব্দের অল্প ব্যবহার, ছোট বাক্য গঠন, ঢংটা অনেকটা সংলাপের মত। যেমন- 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'ইউরোপের নবজন্ম' প্রবন্ধের একটি অংশ এখানে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে — 'ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়া শব্দ দিয়ে আবার পাশ থেকে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষে জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা-বুদ্ধির শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো'।[৪]

স্বামীজি তাঁর 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে জটিল ও দুর্বোধ্য সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে এই সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য হল, এখানে তিনি চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহার করে সাধুরীতির মেজাজ এনেছেন। কারন সাধুরীতি ও চলিত রীতির মধ্যে ব্যকরণগত পার্থক্যের থেকে বড়ো পার্থক্য হলো তার প্রয়োগ ও বাক্য সংগঠনে। এই প্রবন্ধে স্বল্প শব্দ প্রয়োগের মধ্যে বিশাল ভাব প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণ- 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টি জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য-জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিশীল যোগে তার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য শুধু কর্তব্য নহে,ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু, পালনে অমরত্ব'।[৫]

'বীরবাণী'- স্বামীজি রচিত কবিতা, স্তোত্র ও গানের সমাহার। এই গ্রন্থে বিভিন্ন কবিতা

ও গানে বিশেষভাবে উপনিষদীয় ভাব ও ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ-

'প্রলয় বা গভীর সমাধি বাগেশ্রী-আড়া
নাহি সূর্য,নাহি জ্যোতিঃ , নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।।
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর।।'[৬]

বলাবাহুল্য, এই গানে স্বামী বিবেকানন্দের অনুভবের দুঃখ-বেদনা-মৃত্যুর মহৎ উপলব্ধির সাথে বেদান্ত ও উপনিষদের নির্মোহ জীবনাদর্শ যুক্ত হওয়ায় এই গান মানুষের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে গেছে।

স্বামীজি রচিত বাংলা চিঠিপত্র বা পত্রাবলীতে তাঁর ঘাত সংঘাতময় জীবন ও ব্যক্তিসত্তার প্রকাশক। তবে এই চিঠিপত্রের ভাষার দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এখানে খুবই সহজ সরল ভাষায় ব্যক্তিগত পত্র লিখেছেন স্বামীজি। উদাহরণ-

'(প্রমদা বাবুকে লেখা)গাজিপুর
২ রা এপ্রিল ১৮৯০
পুজ্যপাদেষু,

মহাশয় বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহা কোথায় পাইব? তাহারই চেষ্টায় ভবঘুরেগীরি করিতেছি। যদি কখনও যথার্থ বৈরাগ্য হয়, মহাশয় কে বলিব, আপনিও যদি কিছু পান আমি ভাগীদার আছি- মনে রাখিবেন।

কিমধিকমিতি
দাস নরেন্দ্র'[৭]

স্বামীজি তাঁর রচিত গানের গ্রন্থ 'সঙ্গীত কল্পতরু'- তে গান সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের সূচনায় আছে 'সঙ্গীত ও বাদ্য ' বিষয়ে স্বামীজির লেখা সঙ্গীত বিষয়ে একটি নিবন্ধ, ছশো সাতচল্লিশটি গানের সংগ্রহ এবং সতেরো জন গীতিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই গ্রন্থটির বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো এখানে তিনি গানবাজনার বিনোদনের দিকটির পাশাপাশি এর অ্যাকাডেমিক দিকটির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।তিনি এই গ্রন্থে তাই সঙ্গীত তত্ত্বের আলোচনা ও সঙ্গীত সংগ্রহ দুটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সঙ্গীত কল্পতরুর নিবন্ধে স্বামীজি স্বরলিপি পদ্ধতি, বাদ্য সঙ্গীত বা তাল বাদ্য নিয়েও আলোচনা করেছেন। ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দেহতত্ত্ব, খ্রিস্টান,ইসলাম প্রভৃতি নানা গানের সমন্বয় তাঁর এই গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া স্বামীজি তাঁর 'গানের খাতা'-য় বেশ কিছু গান লিখেছেন ও তাতে স্বরলিপি সংযোজনও করেছেন। উদাহরণ-

'মন ক'রো না কাজে হেলা।
চলা নয় ধিকি ধিকি, এখন ঝিকি-মিকির বেলা।।
তপন যায় বসতে পাটে, আর কি বিলম্ব খাটে,

সঙ্গী জোটে না জোটে একাই কর মেলা।।
বাঁধ অনুরাগে কোমর ক'সে, চল আলোর সঙ্গে আলোর দেশে,
আনন্দে থাক রে ব'সে শমন এসে চুষবে কলা '।। [৮]

স্বামিজি রচিত বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক বিশ্লেষণে সমালোচক ও বিশ্লেষক গোপাল হালদার মহাশয়ের বিশ্লেষণ বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি স্বামিজি রচিত বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বলেছেন—

"নবজাগরণের সেদিনে (১৮৭৫-১৯০০) সাহিত্যক্ষেত্রে বিবেকানন্দ পদার্পণ করেননি। কিন্তু তাঁর চিত্ত যে রস-সম্পদে ঐশ্বর্যবান ছিল তা তাঁর যে-কোনো লেখা বা যে-কোনো বক্তৃতা পড়লেই অনুভব করা যায়। আরও বেশি অনুভব করা যায় একথা যে তাঁর মনের ভিতরে ছিল সৃজনশীল সাহিত্যিক প্রতিভা, বাংলা ভাষার উপর ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। সঙ্গীতে, শিল্পে , সাহিত্যে বিবেকানন্দের অনুরাগের কথা অনেকেরই জানা আছে।কিন্তু বাংলা ভাষার যে তিনি অসামান্য লেখক, এ কথাটা অনেকেই বিস্মিত হন। বিশেষ করে চলতি বাংলায় প্রানবন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে কিনা জানি না।সে-যুগে 'যুরোপ যাত্রীর ডায়েরী ও জলধর সেনের 'হিমালয়' ছাড়া আর কোথাও এমন অকুণ্ঠিত কথিত ভাষার ব্যবহার মনে পড়ে না। এ তো ভাষা নয়, এ জীবন্ত মানুষ — ভাষার এই পৌরুষ সেই পুরুষ প্রবরের ব্যক্তিস্বরূপ থেকে উদ্ভূত। 'The style is the man' — তাই সাধু বা চলিত যে রীতিতেই যখন তিনি কলম চালিয়েছেন, তখনি তাতে ফুটে উঠেছে বজ্রনির্ঘোষ।"[৯]

স্বামীজির বাংলা ভাষার সাহিত্যচর্চার সামগ্রিক নির্য্যাস রূপে যে বিষয়টি উঠে আসে সেটি হল,স্বামীজি তৎসম,তদ্ভব, দেশজ শব্দ, ঘরের আটপৌরে ভাষা, বাইরের ভব্য ভাষা প্রভৃতির সংমিশ্রণে বাংলা গদ্য রীতির যথার্থ রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, তাই তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্য সাহিত্যের মানদণ্ডে নিজ স্থান সুনিশ্চিত করেছে ও কোন ভক্ত গোষ্ঠীর রসচর্বনায় পরিনত হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১) ড বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদনা), বাংলা রচনা সম্ভারঃ স্বামী বিবেকানন্দ,দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৩৭,দ্বিতীয় প্রকাশ মার্চ ২০১২, পৃষ্ঠা —৬,৭
২) ঐ, পৃষ্ঠা —২৭
৩) ঐ, পৃষ্ঠা —৭৩
৪) ঐ, পৃষ্ঠা —১৬৩
৫) ঐ, পৃষ্ঠা —১৭৬
৬) ঐ, পৃষ্ঠা —২১৮
৭) ঐ, পৃষ্ঠা —২৬৭
৮) ঐ, পৃষ্ঠা —৪৩৫
৯) ঐ, পৃষ্ঠা —viii

জয়শ্রী মুখার্জী

সাহেবধনী গানে বৈষ্ণব ভাবনার প্রতিফলন

১৮৭০এ প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে অক্ষয়কুমার দত্ত 'সাহেবধনী'দের সম্পর্কে আলোচনায় জানিয়েছেন —

এরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে এক জন উদাসীন বাস করিত। ঈশ্বরারাধনায় ও পরোপকারসাধনে তাহার বিশেষরূপ অনুরাগ ছিল। বাগাড়ে-নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়া-নিবাসী দুঃখীরাম পাল এবং হিন্দু-মতাবলম্বী অপর কয়েক ব্যক্তি ও এক জন মুসলমান তাহার শিষ্য হয়। ঐ উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নামও সাহেবধনী হইয়াছে।[১]

দোগাছিয়ার এই 'দুঃখীরাম পাল' গবেষক সুধীর চক্রবর্তীর মতে মূলীরাম বা মূলীচাঁদ পাল। ইনিই সাহেবধনীদের প্রধান গুরু। মূলীচাঁদের তিন সন্তান— ঠাকুরদাস, চরণচাঁদ ও গোবর্ধন। মধ্যমপুত্র চরণচাঁদই পরবর্তীকালে সাহেবধনী সম্প্রদায়টিকে দৃঢ় ও সংগঠিত করে তাঁদের সাধনক্ষেত্র দোগাছিয়া থেকে বৃত্তিহুদায় স্থানান্তরিত করেন। তখন থেকেই বৃত্তিহুদার পালবাড়ি সাহেবধনীদের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিচিত। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় আনুমানিক ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে চরণপালের জন্ম। তাঁর পিতা মূলীচাঁদের সময় থেকে এই উপসম্প্রদায়টির সূচনা। অর্থাৎ আঠারো শতকের প্রথম দিক সাহেবধনীদের আবির্ভাব কাল আমরা মনে করতে পারি। গবেষক চক্রবর্তী এক নতুন তথ্য দিয়েছেন সাহেবধনীদের সম্পর্কে। তাঁর মতে সম্প্রদায়টির প্রবর্তক 'সাহেবধনী' আসলে এক নারী। শ্রীরাধাই নদীয়ায় আবির্ভূত সাহেবধনীরূপে। নিম্নোক্ত গানটির উদাহরণ দিয়েছেন তিনি —

সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটি শুনি
সেই ধনী এই সাহেবধনী।[২]

তবে সবটাই অনুমান নির্ভর। শুধুমাত্র সাহেবধনী নয়, আঠারো-উনিশ শতকে গড়ে ওঠা যেকোন গৌণধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজ ধর্মমতের প্রবর্তকদের চৈতন্যদেব বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার জ্ঞান করেন। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যেখানে বৈধভক্তি কিংবা পরকীয়া সাধনাকে ধ্যান বা নিদিধ্যাসনে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন সেখানে উপসম্প্রদায়গুলি দেহকেন্দ্রিক সহজ সাধনাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই বৈষ্ণব ঐতিহ্য বহন করা স্বত্ত্বেও জন্মলগ্ন থেকেই নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন তাঁরা। আঠারো শতকে দক্ষিণী ভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তোতারাম বঙ্গের ১৩টি বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—

আউল বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখীভাবকী স্মার্ত জাত-গোঁসাই।।
অতি বড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি।।[৩]

সাহেবধনীদের উল্লেখ আমরা এখানে পাই না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে অক্ষয়কুমার দত্তকে আলোচনা করতে দেখি এই লোকধর্ম সম্পর্কে। তবে খুব বেশি প্রচারের আলোকে সাহেবধনীরা কোনদিনই আসেন নি। নিরাপত্তার কারণেই হয়ত এই গোপনতা। আসলে উচ্চবর্ণ বা হিন্দু রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাছে এই গৌণধর্মগুলির সাধন-ভজন অনাচার ও বিকৃত কামসর্বস্ব রূপে গণ্য হয়েছে বারবার। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা 'পাষণ্ড' নাম দিয়ে ধিক্কার জানিয়েছেন তাদের। রচনা করেছিলেন 'পাষণ্ডীদলন'এর মতো গ্রন্থও। প্রশ্ন রেখেছিলেন-

স্বর্গের সোপান কি এ মতে গাঁথা আছে।
দড়বড়ি চলি যাবে শ্রীহরির কাছে।।[৪]

সমালোচক তাই বলেন,

ইতিহাসের এই জাতীয় সন্ত্রস্ত নিষ্পেষিত সমাজচিত্র মনে রাখলে বোঝা যাবে কেন গৌণধর্মসম্প্রদায়গুলি অত্যন্ত সতর্কভাবে ঢুকে গেছেন প্রত্যন্ত গ্রামের গহ্বরে, কেন তাঁরা ক্রমে ত্যাগ করেছেন বহির্বাস আর নিজধর্মের অঙ্গচিহ্ন, কেন তাঁরা গুপ্তসাধনার আসনে নিজেদের অর্গলবদ্ধ করেছেন।[৫]

দেহকেন্দ্রিক সাধনার পাশাপাশি উপসম্প্রদায়গুলিতে ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে একটা সমন্বয় বা উদারতা লক্ষ করা যায়। সাহেবধনীরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। হিন্দুদের 'ক্লীং দীননাথ দীনবন্ধু' ও মুসলমানদের 'দীনদয়াল দীন-বন্ধু' এই মন্ত্র উপদেশ দেন তাঁরা। তাছাড়া সাহেবধনীদের উৎপত্তিতে একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংযোগ ছিল এমন মনে করা হয়। পাশাপাশি খ্রিস্টিয় মতাদর্শের প্রভাব যা ধর্মমতটির ঔদার্যের ইঙ্গিতবাহী। কোনরূপ ছুৎমার্গ নেই বললেই চলে। অবশ্য যে কোন গৌণধর্মের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। প্রশ্ন জাগে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কোন প্রেক্ষাপটে সাহেবধনীর মতো বাংলার লোকধর্মগুলি শুষ্কপ্রায়, তত্ত্বপ্রধান বৈষ্ণব ধর্মের ধারাটিকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের ছত্রছায়ায় থেকে সুফি-ইসলাম-সহজিয়ার সমন্বয়ে এমন এক ধর্মমত গড়ে তোলেন তাঁরা যার মূল কথাই হল ঐহিকতা। মানবিক প্রেমের স্বীকৃতি।

প্রকৃতপক্ষে 'এই সব গৌণধর্মের প্রাণবীজ চৈতন্য আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এ দেশের গোপন সহজ সাধনার মধ্যে অনুস্যূত ছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব শুধু তাঁদের সাহসী করে তুলল আত্মপ্রকাশের দ্বিধাহীন শক্তিতে।'৬ চৈতন্যদেবের অবৈদিক মতাদর্শের

ছত্রতলে নিজেদের মিলিয়ে দিলেন তাঁরা। নিজ নিজ সম্প্রদায় প্রবর্তকের সাথে যোগ করলেন চৈতন্য-অবতারবাদের তত্ত্ব। সহজিয়া সাধনার সাথে যুক্ত হল গৌরাঙ্গের পরকীয়া সাধনার মিথ। 'শ্রীচৈতন্য তাঁদের কাছে শ্রদ্ধেয় এইজন্য যে বেদপুরাণকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন, মানুষকে মূল্য দিয়েছিলেন, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রেরও উপরে। ভেতরে ভেতরে লোকধর্মের সাধকরা এমনও বিশ্বাস করেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁদের মতই গুহ্য পরকীয়া প্রকৃতি-সাধনা করতেন।'[৭] সাধনার দ্বারা রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলাকে ব্রজগোপীদের অনুসরণে উপলব্ধির সাথে সহজিয়ারা যুক্ত করলেন মর্ত্যচেতনা। আরোপ-তত্ত্ব অর্থাৎ সাধক ও সাধিকার মধ্যে কৃষ্ণ ও রাধা সত্তা আরোপ এবং সাধনার দ্বারা কাম থেকে প্রেমের পথে উত্তরণ। সুকঠিন এই সাধনা সাহেবধনীরা গ্রহণ করেন। কাম থেকে প্রেমের পথে ক্রমিক যে উত্তরণ তা সাহেবধনী ভাষ্যে হল মানুষের করন। এই করনসিদ্ধির পথ গুরু নির্দেশিত। গুরুবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে এখানে। সমস্ত লোকধর্মেই অনুরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেবের নববৈষ্ণবতার সাথে বাংলার গৌণধর্মগুলির সমন্বয়বাদ কোন সূত্রে মিশেছে তা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছেন এডওয়ার্ড সি ডিমক তাঁর ' The Place of the Hidden Moon' বইতে —

The crucial point in considering the social attitude of the Sahajiyas is the doctrine of 'equality' or 'sameness'. To the boy Chaitanya– sweets and dirt were the same. So to a Sahajiya– a Brahman and an untouchable are the sameThe state of unity is emulated in the union of male and female– of Brahmin and Dom– of high and low.[৮]

এই অভেদতত্ত্বেই শ্রীগৌরাঙ্গ মিশে যান সাহেবধনীদের ধর্মমতের সাথে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সাহেবধনীদের উৎপত্তিস্থল দোগাছিয়া-শালিগ্রাম যোড়শ শতক থেকেই বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রভাবিত। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁর অন্যতম পার্ষদ নিত্যানন্দ যে সমস্ত গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন তার মধ্যে দোগাছিয়া উল্লেখযোগ্য। এমনকি নিত্যানন্দ-পত্নী বসুধা দেবী ও জাহ্নবা দেবীর পৈতৃক বাড়িও এই গ্রামে। নিত্যানন্দ প্রভুর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার গ্রামটিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বৈষ্ণবীয় প্রেমরসে সিক্ত দোগাছিয়ার উদার ভক্তিধর্মের বাতাবরণ সাহেবধনীদের উদ্ভবকে করে তোলে ত্বরান্বিত। সুতরাং বোঝা যায়, সাহেবধনী কোনো বিচ্ছিন্ন মতাদর্শ নয়; এর মধ্যে রয়েছে বৈষ্ণবধর্ম তথা চৈতন্যবাদের এক রোমাঞ্চকর পরম্পরা ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের লোকায়নের দ্যোতনা।

সাহেবধনীদের গান লিখেছিলেন দুইজন। একজন চরণ পালের প্রত্যক্ষ শিষ্য বৃত্তিহুদার কুবের সরকার বা কুবির গোঁসাই। অন্যজন কুবির গোঁসাইয়ের শিষ্য যাদুবিন্দু। গবেষক সুধীর চক্রবর্তী কুবির গোসাঁইয়ের ১২০৯খানি গানের সন্ধান পেয়েছেন। তবে প্রচারের দিক থেকে কুবির অপেক্ষা যাদুবিন্দুর গান চলে বেশি। এর অন্যতম কারণ যাদুবিন্দুর গানে

উপমা, রূপক নির্মাণের স্বাভাবিকতা ও সাবলীল রচনাশক্তি যা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে কুবিরের গান খুব মৌলিক রচনারীতি ও গভীর সাধনতত্ত্বে নিবিড়, সে গান জনপ্রিয় হওয়া কঠিন। অথচ যাদুবিন্দুর গানের ভাব ও ভাষা চিরকালের বাংলা সহজিয়া গানের সঙ্গে চমৎকার ভাবে মিশে যায়। যাদুবিন্দুর বাড়ি বর্ধমান জেলার পাঁচলখি গ্রাম যার একদিকে নবদ্বীপ অন্যদিকে কালনা শহর। কাছেই শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া। সবকটি জনপদই বৈষ্ণব ভাবধারায় স্নাত।

সুধীর চক্রবর্তী 'সাহেবধনী তাদের গান' গ্রন্থে মোট ৯০টি সাহেবধনীদের গান সংকলন করেছেন। তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব অনুষঙ্গযুক্ত গান ১৩টি। অধিকাংশ গানেই প্রাণের ঠাকুর দয়াল 'গৌর'কে পাবার আকুতি ধ্বনিত। চৈতন্যদেব এঁদের কাছে 'কোনও ব্যক্তি নন, অবতার নন, চৈতন্য একটা স্তরান্বিত চেতনা। তাঁকে মূর্তিতে বা মন্ত্রে পাওয়া যাবে না। পেতে হবে সাধনার বিমিশ্রণে, শোধনে।'৯ সাধনার দ্বারা লাভ করতে হয় তাঁকে। সাধকের দুই গুরু- দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু। দীক্ষা গুরু হলেন কৃষ্ণস্বরূপ। শিক্ষাগুরু রাধাস্বরূপ। শিষ্যদেহে দুইয়ের সংযোগ ঘটে। তাই সহজিয়া সাধকের দেহ গৌরময়। কুবিরের অঙ্গভূষণ এমনকি অলংকার গৌর। তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের স্বরূপ —

চেয়ে দেখতে পাই গৌরময় সকলি। আমার চাঁদ গৌর বসন গৌর ভূষণ
গৌর নয়নপুতলি। চাঁদ গৌর আমার দেহের জীবন গৌর যৌবনের ডালি।।[১০]

গৌরকে 'দেহের জীবন যৌবনের ডালি' বলার মধ্য দিয়ে যে সাহসের পরিচয় কবি দিয়েছেন তার শক্তি লোকজীবন থেকে আহৃত। গৌরাঙ্গ কোন অপার্থিব আবরণে ঘেরা দেবতা নন, তিনি একান্তই নিজের, আপনার জন। গৌরের কাছে দেহ-মন সমর্পণের ইচ্ছাটুকু ভক্তির স্পর্শে পবিত্রতার দীপশিখারূপে জাজ্বল্যমান। আবার গৌরকে না পাবার বেদনা যাদুবিন্দু আন্তরিকভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর গানে। গৌরাঙ্গ চরণে আশ্রয় নেবার তাঁর বাসনা অপূর্ণ। লোককবির আত্মধিক্কার আমাদের স্মরণ করায় বৈষ্ণব কবিদের কথা—

মনের কথা বোলবো কি আর তোরে—
আমি পেলাম না প্রেমভক্তিলতায় তোর দুটি পায় বানাতে।[১১]

গৌরগতপ্রাণার গৌরাঙ্গকে নিজের করে রাখার ব্যাকুলতা কুবির গোঁসায়ের গানে বেশ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে —

নাগর কালাচাঁদ হে
তোমায় লুকিয়ে থোবো হৃদয় মন্দিরে।
জায়গা নাই রাখি কোথায়
তোমায় মাথায় থুলে উকুনে খায়
মাটিতে রাখলে পরে কাকে ধ'রে ঠুকরে মারে।।[১২]

নব অনুরাগিনী তাঁর নাগর কালাচাঁদকে হৃদয়ে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবেন। চারিদিকে শত্রুর অভাব নেই তাঁর। কৃষ্ণ-প্রণয়িনীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের 'উকুন', 'চিল', 'কাক', 'টিকটিকি', 'চামচিকি' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন লোককবি। ললিতা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা প্রমুখদের নাম এখানে ব্যবহার করেন নি। একদিকে প্রণয়ীকে হৃদয় মন্দিরে রাখার তীব্র ব্যাকুলতা, অন্যদিকে তাঁকে নাগর সম্বোধন ও লোকজীবন সম্পৃক্ত উপমা প্রয়োগে বিষয়টির শাস্ত্রোচিত গম্ভীরতা হ্রাস। রাধিকা একজন সাধারণ গ্রাম্য নারীর মতোই সহজ, সরল ভাষায় নিজের মনোবেদনা ব্যক্ত করেছেন। সকলের লাঞ্ছনা, গঞ্জনার আঁচটুকু দিতে রাজী নন তিনি কালাচাঁদকে। তাই সযত্নে রাখবেন অন্তর মাঝে। শিষ্ট সাহিত্যের পাশাপাশি গ্রামজীবনে কৃষ্ণকথার যে স্রোতধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের মনোরঞ্জন করে এসেছে কবি কুবির প্রভাবিত হয়েছেন তার দ্বারাই। রাধিকার সুতীব্র মানের পরিচয়ও আমরা তাঁর গানে পেয়ে থাকি। প্রেম যত গভীর মান তত দুর্জয় হয়ে ওঠে যেন —

আমি এই মান ত্যেজে কুঞ্জেতে থাকবো আর কি ধন লয়ে।
আমি মান-প্রতিমা পূজা করি মানকে মন প্রাণ দিয়ে।।
আপন মান রাখি আপনার ঠাঁয়ে।।[১৩]

কবি যাদুবিন্দু গোঁসাইয়ের দুটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ সংকলনে স্থান দিয়েছেন গবেষক সুধীর চক্রবর্তী। কৃষ্ণের প্রতি রাধার ভৎর্সনা এই গানদুটির মূল উপজীব্য। পদাবলি সাহিত্যে দেখি রাধাকে কুঞ্জে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নির্ধারিত সময়ে এলেন না কৃষ্ণ। রাত্রিযাপন করলেন অন্য গোপীর সাথে। অন্যদিকে কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় রাধার রাত্রি কাটে বিরহ যন্ত্রণায়। পরদিন সকালে অনুতপ্ত কৃষ্ণ এসে হাজির কুঞ্জের দ্বারে। সঙ্গে অন্য নারীর সাথে রাত্রিযাপনের চিহ্ন। ধৈর্য্যের বাঁধ আর থাকে না রাধার। তীব্রভাবে ভৎর্সনা করেন তিনি কৃষ্ণকে। রাধার মান ভঙ্গে ব্যর্থ হন শ্রীকৃষ্ণ। যাদুবিন্দু বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে মুল ভাবটি গ্রহণ করে আপন কল্পনার রঙে রঞ্জিত করেছেন মানিনী রাধার চিত্র। এই রাধা মহাভাবময়ী নন, যেন এক গ্রাম্য নারী। কৃষ্ণের প্রতি তার সম্ভাষণ —

আমি টোকো ঘোল নেব না সখী টাটকা মাখনের দরে।।
কালোভ্রমর গোবর খেলে থাকে গুবরেপোকার দলে
কোমদিনী কোনকালে রসিক বলে চায় না ফিরে।[১৪]

বৈষ্ণব পদাবলির রাধার সাথে এই রাধার দুস্তর ব্যবধান। তবে ছেড়ে কথা কৃষ্ণও কন না রাধাকে। কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি অনুতপ্ত। তাই দূতীকে প্রেরণ করেন কৃষ্ণের কাছে, অনুনয়-বিনয় করে ফিরিয়ে আনার জন্য। দূতীকে কৃষ্ণ বলেন—

উষ্মা কোরো না দূতি নারীজাতি ভারি কু।
বুঝালে বোঝে নাকো রাঙের টেকো কথায় কথায় রয় বেঁকে।[১৫]

ইনি তো বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ নন, গাঁয়ের চেনাশোনা পুরুষটি যিনি সারাদিনের অক্লান্ত

পরিশ্রমের পর স্ত্রীর সাথে খুঁটিনাটি সাংসারিক কলহে বিরক্ত হয়ে নারীজাতি সম্পর্কে এমন প্রাজ্ঞজনের মতো উক্তি করে বসেন। বহুদর্শী কবির রচনার সহজসরল অনাড়ম্বর সেই জীবনের ছবি ধরা পড়েছে। রাধাকৃষ্ণের এই চাপান-উতোরে রাধা বলে বসেন —

ওকে দেখলে আমার ঘেন্না করে
বুক চিরে ওঠে বমি।।
জগতের ভিতরে বাঁকা বংশীধর।[১৬]

বৈষ্ণব সাহিত্য ও তত্ত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণকথাকে যাদুবিন্দু এনে হাজির করেছেন আমাদের আঙিনায়। তার গানের সংলাপ, ভাষা যেন চিরকালীনতার সাথে মিশে যায়। বৈষ্ণবদের অপার্থিব কল্পনালোক থেকে নিয়ে যায় চেনা-পরিচিত জগতে। এদিক থেকে যাদুবিন্দুর গান বাউল গানের কাছাকাছি।

চৈতন্যভক্ত হওয়া স্বত্ত্বেও সাহেবধনীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বর্জনীয়। বড় দুঃখে গান বাঁধেন কুবির —

ভেক লয়ে বৈরাগী হলাম
মুড়িয়ে মাথা ছেঁড়া কাঁথা গলাতে নিলাম
জাত খোয়ালাম কিছুই হলো না।।[১৭]

গৌরের পিরীতে মজে কবি যাদুবিন্দুর 'জন্ম গেল কানতে'। হতাশার সুর তাই ধ্বনিত তাঁর গানে। তবে বৃথা এ খেদ। গৌর দয়াময়। আমাদের অন্তরে তাঁর অবস্থিতি। মোহে ভ্রষ্ট হয়ে শাস্ত্রজালে আবদ্ধ আমরা বিস্মৃত হই তাঁকে। তাই কবি মনে করেন তাঁর সাধনায় রয়ে গেছে ত্রুটি। আত্মসুখ, সর্বপ্রকার অভিমান বিসর্জন দিয়ে গৌরাঙ্গ পদে মগ্ন হতে পারেন নি তিনি। প্রকৃত সাধকের আত্মবিশ্লেষণ যাদুবিন্দুর গান।

বৈষ্ণব অনুষঙ্গের রূপকে সাহেবধনীরা তাঁদের গুহ্য সাধন প্রণালীর কথাও অনেক সময় ব্যক্ত করেছেন। গৌরাঙ্গের সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে তাঁরা কায়াসাধনার প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন গানে। নবদ্বীপ ও তার পার্শবর্তী বিভিন্ন বৈষ্ণব ঐতিহ্যবাহী স্থানের উল্লেখ আমরা যাদুবিন্দুর গানে পূর্বেই লক্ষ করেছি। এগুলির ব্যবহার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যেমন, নবদ্বীপ অর্থে নবদ্বার - দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখবিবর, পায়ু আর লিঙ্গ। সাধক সাধিকাকে প্রথমে বুঝে নিতে হয় দেহ-নদীয়ার নবদ্বীপ তত্ত্ব এবং সেই নবদ্বীপের বিভিন্ন গলি ও পাড়া, গঙ্গা অর্থাৎ নাড়ির ব্যঞ্জনা। তার প্রলোভন, তার পিছল ঘাট বুঝে নিতে হয়। এ ব্যাপারে সহায়ক হয় গুরুর নির্দেশ।১৮ গীতিকার কুবের গোঁসাই সাহেবধনীদের কূট চন্দ্রতত্ত্বের সাথে মিশিয়েছেন গৌরাঙ্গতত্ত্ব। যেমন —

দেখ নবরসে নবচন্দ্র হয়েছে
শ্যাম আর রাইয়ে চাঁদ হয়েছে নবচন্দ্রে ঘিরে আছে...

দেখ চব্বিশ চন্দ্র একত্র করে
সাধন করে প্রভু নদেপুরে।[১৯]

দেহবাদীদের কাছে 'চন্দ্র' শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের বিশ্বাস মানব শরীরে সাড়ে চব্বিশচন্দ্র আছে। সাহেবধনীরা চব্বিশচন্দ্রের কথা বলেছেন। এই চব্বিশচন্দ্র হল— পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাদের পাঁচ রকমের কাজ, চারটি অন্তরেন্দ্রিয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার), পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়(বাক, হাত, পা, পায়ু, ও লিঙ্গ) ও তার পাঁচ রকমের কাজ।[২০] এই চন্দ্রবহুল শরীর নিয়ে পুরুষ নারীর মিলন হলে বলা হয় 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে।' গৌড়ীয়তত্ত্ব অনুযায়ী চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের মিলিত সত্তা। সহজিয়া মতে দীক্ষাগুরু হলেন কৃষ্ণ ও শিক্ষাগুরু হলেন রাধা। দুইয়ের মিলনে চৈতন্যদেব। তাই যাদুবিন্দু বলেন —

চাঁদে চাঁদ মিশাবার তরে
উদয় হলেন প্রভু নদেপুরে।।
চাঁদের সঙ্গে চাঁদ মিশায়।।[২১]

শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে দেহসাধনার মূল সূত্রটি খুঁজে পেয়েছেন সাহেবধনীরা। গৌর তাঁদের কোন অনুমানের দেবতা নন। প্রাণের মানুষ তিনি। আপন দেহের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধির সাধনা সাহেবধনীদের।

সহজিয়াদের একটি গানে বলা হয়েছে—

বৃন্দাবনে রসরাজ ছিল
রসের তাক না বুঝে ধাক্কা খেয়ে
নদেতে এল।[২২]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যাবতারের তিনটি মুখ্য কারণের কথা বলেছেন যার মূল বিষয় হল শ্রীরাধার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি। অন্যদিকে সহজিয়া বৈষ্ণবরাও মনে করেন তিনটি মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ অবতার ধারণ করেন। যেমন —

এক, ওরে আমি কটিতে কৌপীন পরবো।
দুই, করেতে করঙ্গ নেব।
তিন, মনের মানুষ মনে রাখবো।[২৩]

এই তৃতীয় বাঞ্ছাই হল আসল কারণ। এর পূর্বে গোলক, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের মাধুর্য্যরূপের সাথে ছিল ঐশ্বর্য্যসত্তার সমন্বয়। সেখানে তিনি ঈশ্বর। কামনা-বাসনা শূন্য। উপলব্ধি হয় নি তাঁর রসের তাৎপর্য। তাই কামনার রজোবীজে মানবদেহে জন্ম নিলেন তিনি নদীয়ায়। সাধারণ মানুষের মতো কামকে জয় করে প্রেমের পথে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনায় ব্রতী হলেন। পরকীয়া সাধনায় লাভ করলেন সহজানন্দ। সাধনসঙ্গিনী তাঁর সার্বভৌম কন্যা শাটি। সহজিয়ারা তাই বলেন —

শাটিতে পেয়ে সুধা
সারে চারিযুগের ক্ষুধা।[২৪]

চার জন্ম অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির অপূর্ণ সাধ তিনি নবদ্বীপলীলায় মেটান পরকীয়া সাধনায়। এই যুগ তাই 'দিব্যযুগ'।

লোককবির সহজ একটি প্রশ্ন চিরাচরিত সংস্কারকে আঘাত করলেও ভাবিয়ে তোলে আমাদের —

ত্রিজগৎ যাহাতে কাঙাল
তারই তরে গোরা বেহাল।
তবে নারীত্যাগের ভেজাল
কেন গোরা দেয়?[২৫]

এর কোন সদুত্তর পাই না আমরা বৈষ্ণব শাস্ত্রে। প্রচলিত ধর্মের আচার সর্বস্বতার বিপরীতে সুস্থ এক জীবনবোধের কথা বলে গৌণ ধর্মগুলি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে জীবনের কামনা বাসনার দমন নয়, সেগুলির স্বীকৃতির দ্বারা স্বাভাবিক যৌনতার কথাও বলেছেন তাঁরা। বিধি নিষেধের বেড়াজালের বাইরে এক উদার, মুক্ত আকাশের সন্ধান দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তীব্র ঘৃণা ও প্রতিরোধ তাই আটকাতে পারে নি লোকধর্মের স্রোতকে।

বর্ধমান জেলার পাঁচলখি গ্রামে কবি যাদুবিন্দুর ভিটা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন হাঁতে লেখা পুথিতে গবেষক সুধীর চক্রবর্তী শ্রীরূপের ধারাশ্রয়ী পঁচিশটি মতবাদের মধ্যে সাহেবধনীদের নাম পেয়েছেন। অর্থাৎ সাহেবধনীরা সহজিয়া বৈষ্ণবদের একটি ধারা এমনটাই অনুমান করেছেন তিনি।[২৬] সুফি, ইসলাম, বাউল প্রভাবের কথাও অস্বীকার করতে পারি না আমরা। নির্দিষ্ট কোন ধর্মকে কেন্দ্র করে নয় সব ধর্মের মূল নির্য্যাসটুকু গ্রহণ করেই বাংলার গৌণধর্মগুলি পরিবর্তিত সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল। লাভ করেছিল জীবনচেতনার উদারতা। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁদের জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও অনুশীলিত অভিজ্ঞতা। গানগুলিতে রূপকের মোড়কে দেহতত্ত্বের কথা ব্যক্ত হলেও সেখানে অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। দুর্মর জীবনসত্যের সন্ধান দেন তাঁরা আমাদের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেগুলি গায়কের গানে গানে বয়ে চলে। কুবির গোঁসাই বা যাদুবিন্দু তাই সেকালের হয়েও রয়ে গেছেন একালের হয়ে।

তথ্যসূত্র :

১. অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়(প্রথম ভাগ), কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৪, পৃ. ২৩০

২. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৩, পৃ. ২৩
৩. সুধীর চক্রবর্তী, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও উপসম্প্রদায়', চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান, সম্পা. অবন্তীকুমার সান্যাল ও অন্যান্য, ১৯৯৯, কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, পৃ. ২২৯
৪. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২
৭. তদেব, পৃ. ১১১
৮. তদেব, পৃ. ১৮৭
৯. সুধীর চক্রবর্তী, 'গৌরাঙ্গের মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা', গভীর নির্জন পথে, কলকাতা : আনন্দ, ২০০২, ২য় সং, পৃ. ১৭৯
১০. সুধীর চক্রবর্তী, সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ ২১৬
১১. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
১২. সুধীর চক্রবর্তী, সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮
১৩. তদেব, পৃ. ২১৫
১৪. তদেব পৃ. ২২১
১৫. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮
১৬. তদেব
১৭. সুধীর চক্রবর্তী, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও উপসম্প্রদায়', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
১৮. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
১৯. তদেব, পৃ. ১৯১-১৯২
২০. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
২১. তদেব, পৃ. ১৯১
২২. সুধীর চক্রবর্তী, 'গৌরাঙ্গের মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
২৩. তদেব
২৪. সুধীর চক্রবর্তী, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও উপসম্প্রদায়', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
২৫. সুধীর চক্রবর্তী, 'গৌরাঙ্গের মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
২৬. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

শান্তনু সাহা

'আলাপচারী তুলি ও কলম: সমসাময়িক নির্বাচিত মহিলা কবিদের কবিতার প্রাসঙ্গিক পাঠ'

ছবি ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে লেখালেখির অন্ত নেই। সুপ্রাচীন অ্যারিস্টটলের সময় থেকে তার একটা ধারাবাহিক বিবরণ সুমিতা চক্রবর্তী তার বিখ্যাত বই *ছবি ও লেখা : মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব* —এ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান আলোচনা সেই লেখালেখিরই সূত্র ধরে। বাংলা সাহিত্যের কবিদের রচনায় বিভিন্ন বিষয় নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শই খেয়াল করা যায় যে তারা কবিতার ভিতরে চিত্রকলার উল্লেখ রেখে যাচ্ছেন। কখনো কখনো তার পরিমাণ যৎসামান্য, কখনো বা উপাদানের প্রাচুর্যে কবিতার অন্তর্লীন ব্যঞ্জনার বিস্তার ঘটতে থাকে : যেমন জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে ইত্যাদির কবিতায়। কবিতা ও ছবির প্রকাশ ভঙ্গি নিঃসন্দেহে ভিন্ন ভিন্ন; একটায় যখন ভাষা মাধ্যম, অন্যটির তখন রং আর তুলি। একটায় যখন শব্দ-বাক্যের বিমূর্ত গঠনতন্ত্রের মাধ্যম দিয়ে অর্থের মুক্তি ঘটে, অন্যটি ছবি হয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে ছবির উল্লেখ এক ভিন্ন রসচর্চার দাবী করে। এবং বিশেষ করে মহিলাদের কবিতায় চিত্র শিল্পের আলোচনা যথার্থভাবেই এক ভিন্ন অর্থের প্রকাশ করে।

ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের কবিতার একটা ট্র্যাডিসন লক্ষ্য করা যায়, যাদের "একফ্রাসিস" বা "একফ্রাস্টিক" কবিতাও (ekphrasis-ekphrastic) বলা যেতে পারে। সিলভিয়া প্ল্যাথ, অ্যান সেক্সটন বা ভারতীয় দের ইংরেজি তে কবিতা লেখার ঘরানায় ইউনুস ডি সুজা - এদের কবিতায় কোন কোন নির্দিষ্ট চিত্রশিল্পের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। এই সহজ চলাচল কবিতার বক্তব্যকে অন্য মার্গে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আসলে এ তখনই সম্ভব যখন কবির কবিতা লেখার পাশাপাশি ছবির জগতেও যাতায়াতের একটা ইতিহাস থাকে। আর ঠিক এই কারণেই বোধহয় সাহিত্য মহলের প্রচলিত আলোচনায় এই বিষয়ে কোন মহিলা কবির আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। তার একটা বড় কারণ বাঙালি বা ভারতীয় আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, যেখানে দাঁড়িয়ে যখন একজন মহিলার পক্ষে লেখালেখি করে যাওয়াটাই ভীষণ শক্ত, তখন আরও শক্ত হয়ে ওঠে কবিতা লেখা যা এক ধরনের 'শৌখিন মজদুরির' মত। সেই মহিলার পক্ষে ছবির মত এক বিশেষ প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্পচর্চা ঘন্টার পর ঘন্টা গৃহকর্মকে পাশে সরিয়ে রেখে সুগভীর মনোসংযোগের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্যকর ব্যাপারের মত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বা স্বাধীনতার পরেও আমাদের শিল্পচর্চায় তখনও গ্যালারিতে গিয়ে ছবি দেখে ওঠার প্রচলন হয়নি মহিলাদের পক্ষে। বা মিউজিয়ামের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠান সাধারণ ঘরের মহিলাদের পক্ষে প্রায় অগম্য ছিল। খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে যাওয়ার পাশাপাশি হাতের নাগালে

ছবির বই থাকবে, তা সম্ভবপর ছিল না। তবু দেশীয় শিল্পচর্চায় বিশেষ করে স্থাপত্য বা ভাস্কর্য শিল্পের একটা নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল কোন তীর্থস্থানে বেড়াতে গিয়ে, যেখানে মন্দিরের গায়ে বা রাজাদের তৈরি করা ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো থেকে একটা চাক্ষুষ অবলোকন সম্ভব ছিল। কিন্তু তার কতটা অংশ শিল্পচর্চার গণ্ডির ভিতরে প্রবেশ করতে পারতো তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তাই বাংলা নারীদের লিখিত কবিতায় চিত্রশিল্পের বা ভিজুয়াল আর্টের সবিস্তার আলোচনার বিশেষ জায়গা নেই। Linda Nochlin তার একটি বিখ্যাত বই *Why There have been No Great Artists* এ সামাজিক প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রস্তাবনা এনেছেন। তার আলোচনা মূলত পাশ্চাত্য দেশগুলিকে কেন্দ্র করে হলেও সমস্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভীষণভাবে প্রযোজ্য। রেনেসাঁ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শিল্পের জগতে যে সমস্ত শিল্পীরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের ভেতরে মহিলা শিল্প নগণ্য বললেই চলে। Linda যথার্থই বলেছেন , "well if women are really equal to men – why there never been any great woman artist" [১] (writing.upenn.edu). তিনি নিজেই সেই অস্বস্তিকর সত্যর সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছেন:

> The assumptions behind such a question are varied in range and sophistication, running anywhere from 'scientifically proven' demonstrations of the inability of human beings with wombs rather than penises to create anything significant,to relatively open-minded wonderment that women– despite so many years of near--equality-and after all, a lot of men have had their disadvantages too-have still not achieved anything of exceptional significance in the visual arts.[২] (writing.upenn.edu)

যদিও বিংশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহিলা শিল্পীর কথা উঠে আসে তবু কথাও যেন একটা আর্থ-সামাজিক লিঙ্গ রাজনীতিতে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ চোখে আঙুলের মত প্রকাশিত হয়। তাই চিত্রশিল্পের পাশাপাশি তার চর্চার অভাব মহিলা সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় ভীষণভাবে লক্ষণীয়। যেমন সুমিতা চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করেছেন, "শিল্প মাত্রেই যৌগশিল্প... শিল্পরসিক মাত্রেরই অভ্রান্ত উপলব্ধি এই যে, একটি শিল্পের রসগ্রহণে অন্য মাধ্যমের শিল্পের অন্তরানুভব আলো-হাওয়া-জলস্রোতের মতোই সম্মিলিত থাকে"[৩] (৬)। তেমন দুই মাধ্যমের ভেতরে স্বতঃস্ফূর্ত চলাচলের প্রমাণ নারীলিখিত কবিতাগুলির ভেতরে যথেষ্টই দুষ্প্রাপ্য। তাই 'কোন ঠাকুর? অবন ঠাকুর- ছবি লেখে' -র মত প্রবাদে পরিণত হয়ে যাওয়া আত্ম-পরিচিতি বা শিল্পী পরিচিতি সামাজিক মানুষের এক আরোপিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রমাণ হিসেবে উঠে আসে।

তবু সব অন্ধকার টানেলের পরেই যেমন দিনের আলো অবশ্যম্ভাবী, তেমনি বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই শব্দ আর ছবি, তুলি আর কলমের যৌথ জীবনের এক সান্নিধ্য

লক্ষ্য করা যায় মহিলা কবিদের কবিতায়। সংখ্যায় হয়তো অল্প কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টির বীজের মতো কাজ করে। সমসাময়িক মহিলা কবিদের লেখায় তার প্রমাণ মিলে।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর *ব্রেল* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "সুন্দর পটুয়া বাড়ি নেই" কবিতাটিকে সোজাসুজি কোনো নির্দিষ্ট শিল্পী বা শিল্পকর্ম বা শিল্পগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে মাপা সম্ভব নয়। কোনো নির্দিষ্ট কেউ নয়, কবি কবিতায় এক নাম না জানা 'সুন্দর পটুয়া'- র প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং আক্ষেপের ছলে জানাচ্ছেন যে তাঁর জীবনের সেজে ওঠার দিনগুলোতে ঐ পটুয়ার অভাব বোধ করছেন। পটুয়া বা এক পটশিল্পী যেমন একের পর এক পট চিত্রের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রকাশ করে যায় শিল্পের সমারোহ এবং যা দিয়ে জীবনের বেঁচে থাকার রসদ সঞ্চিত হয়, সেই সৌন্দর্য চেতনার অভাব তিনি পূর্ণ করে তুলতে চান প্রতিটি চলাফেরায়। তিনি জানেন যে , "কত কি পারিনি আমি তুমি ভরে দিয়ো / সুধা ও ঘ্রাণের ফাঁকা, আমার দু'হাতে / ফুল দিয়ো, বর্ণহীন, গন্ধভরা ফুল/ কত কি খুঁজতে গিয়ে ধূলোমাখা পায় / ফিরে আসি/ সুন্দর পটুয়া বাড়ি নেই" [৮] (৩৭)। জীবনের সবকিছু বুকে নিয়ে সমস্ত আশ্লেষ দিয়ে জড়িয়ে থাকতে চান। না, এই চাওয়া পুরোদস্তুর ভোগবাদী জীবনমুখি নয়; নয় কোনো অর্থনৈতিক চাহিদা কে পুর্ণ করার পূর্ব শর্ত। জীবনের মৌলিক প্রয়োজন গুলোকে সঙ্গে নিয়েই নান্দনিক ভাবে বেঁচে থাকার সাধ হয়- তাই তিনি কবিতার মাধ্যমে এক ছদ্ম-আত্মজৈবনিক ঢঙে প্রকাশ করেন না—পাওয়াগুলো। এই উন্মুক্ত বিশ্বের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই 'সুন্দর পটুয়া' র সন্ধান হয়তো কারোরই জানা থাকে না। এই ব্যস্ত জীবনের শহরের স্তব্ধতায় হারিয়ে যেতে থাকে স্নিগ্ধতার গান গুলো, তাই যখন কবি বিষণ্ণ হন, "একা লাগে, ফাঁকা পটে আষাঢ়ের রোদ / ফিরে আসে"[৫] (৩৭)। পাঠক বুঝে ওঠে , "সুন্দর পটুয়া বাড়ি নেই"। কবিতার সঙ্গে শিল্পের এই যোগসূত্র খুব অর্থপূর্ণ ভাবে সাজিয়ে তুলেছেন কবি এই কবিতায়। 'Beauty is truth– truth beauty' — আর তাই এই সুন্দরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেই হয়তো একদিন সত্যের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব- সেই সত্য যা আমাদের ভালোথাকার সন্ধান দেয়।

মউলি মিশ্র তার *শুশ্রূষাকাব্য* গ্রন্থের "বিজ্ঞাপন" নামক কবিতায় ছবির গঠনতন্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন সামাজিক এক অবস্থানকে তুলে ধরার জন্য। কবিতাটি এক বিজ্ঞাপনকে ছবির মাধ্যমে উপস্থিত করে যেখানে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি এক পরিবারের ছবি, যেখানে বাবা-মায়ের মাঝখানে বসে শিশু আর হয়তো হাতে সুস্বাস্থ্যের পানীয় সূচক কিছু। আসলে বিজ্ঞাপনের ছবি যেমন থাকে রেডিও টিভিতে খবরের কাগজে। কিন্তু একটি ছবির ক্যানভাস যেন, "ছবির মধ্যে সুখ /দিগন্তজোড়া নীল ফ্রেমে সুখ স্থির হয়ে আছে। দম্পতির মধ্যিখানে শিশু / সুস্বাস্থ্যের পাত্রে সুখ নিয়ে বসে" [৬] (১৬)। একটি ছবির পর্দায় বহু রংয়ের সমাহার, সবুজ নীল ইত্যাদি। আসলে এই পরিবার যে আপাতভাবে সুখী বা সুখের মুখোশ মুখে

বিজ্ঞাপনের জন্য সাজানো ছবির মত তা বলাই বাহুল্য। এক সামাজিক প্যারোডির জন্ম দিতে গিয়ে কবি এখানে ছবির প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন। এবং এই সাজানো বাতাবরণ যে কতটা সাময়িক, অস্থির বোঝা যায় যখন, "আমাদের দারুন বিপন্ন করে /দিগন্ত ছোঁয়া অতিকায় ছবি থেকে /লাফিয়ে নামছে ঝাঁ চকচকে/ ছিমছাম এক বিদেশী গাড়ি"[৭](১৬)। একটি ছবির বিপরীতে অন্য আরেক ছবির জন্ম হয়। এক লোভের ছবি, ক্যাপিটালিস্ট পুঁজিবাদী সভ্যতার জন্ম দেয়। সাধারণ দেশীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে গ্রাস করে বিদেশি অচেনা বস্তুবাদ। কবির এই বিশ্লেষণ ভীষণভাবে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে তার ইমেজ ব্যবহারের কুশলতায়। যেন কবিতা নয় আসলে শব্দ দিয়ে ছবি আঁকছেন তিনি।

অহনা বিশ্বাস এর "জলরং" তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অষ্টাবক্ররমণীকথা*-র অন্তর্গত। তাঁর কবিতায় মনস্তত্ত্বের একাধিক স্তর কাজ করে, বা বলা ভালো চেতন অবচেতনের আড়ালে গিয়ে যে ছবি তৈরি করে তা তার একান্তই নিজস্ব। কবি এলিয়েট-এর কবিতার মত তার পাঠককেও দীক্ষিত হতে হয়। তার কবিতায় বর্ণনা আছে, তবে তা ঘটমানের নয় মনের গহীন প্রদেশ থেকে উঠে আসা অনুভব সারি সারি প্রকাশিত হয় শব্দ বাক্যদের মুখোশ নিয়ে। এখানে 'জলরং' আলো ও অন্ধকার দুই সহোদার মত। বা মুদ্রার এ'পিঠ ও ও'পিঠ- এই দুই বিপরীত প্রান্তের জীবনের গল্পে কবি শব্দের স্থানিক চরিত্রকে ছাপিয়ে গিয়ে বর্ণ বা রংয়ের জগতের প্রতিনিধি সূচক 'রূপকে'র মাধ্যম খুঁজে নিচ্ছেন। যেখানে এক একটি রং এক একটি আবেগের একটি পরম্পরার আয়োজন নিয়ে আসে। আয়োজন প্রেমের ও অপ্রেমের, পাওয়া ও না-পাওয়ার, মিলন ও বিচ্ছেদের, সংরাগ ও বিরাগের, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের, আর সবশেষে বিশ্বাসের মৃত্যুর। এই ভিন্ন ভিন্ন আবেগের বা অভিমানের প্রতিনিধি হয়ে উঠে আসে ভিন্ন ভিন্ন রং। সাধারণতঃ যে আবেগ শব্দের, বাক্যের; তার প্রথাগত সংযোজনায় তাকে মেলোড্রামাটিক বাহুল্য মনে হয় , ক্লান্তিকর অতিশয়োক্তি মনে হয়, বা অশৈল্পিক ব্যবহারে ব্যবহৃত হতে হতে ক্লিশে হয়ে যাওয়া মনে হয়; তার বদলে শিল্পের এই অন্য মাধ্যমের প্রয়োগে উদ্দেশ্যের সাধন হয়, আর বৈচিত্রও আসে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন, "তুলি দিয়া যদি আঁকিতে পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রং দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সে উপায় ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ"[৮] (bichitra.jdvu.ac.in)। (তখনো আমরা জানি তিনি শিক্ষানবিশিমূলক চর্চা ছাড়া সিরিয়াস ছবি আঁকার জগতে প্রবেশ করেননি)। কিন্তু অহনা বিশ্বাসের লেখালেখির ঘরানার সূত্রে পাঠক অবগত থাকে যে কবির চিত্রশিল্পের জগতে নিয়মিত চলাচল আছে এবং তুলি আর কলমের সমন্বয়ের সাধন তাঁর হাত দিয়ে যথার্থভাবেই সম্পন্ন হয়। তাঁর অনেক বইয়ের প্রচ্ছদ নিজের ছবি দিয়ে তৈরি। সেখানেও পৌরাণিক গল্পদের বা রূপকথার চরিত্রদের পিতৃতান্ত্রিক জগতের বাইরে বেরিয়ে নতুনভাবে

ভাবে দেখা যায় তাঁর নিজস্ব মতামত রেখেছেন। এখানেও কবি নিজের মনের কথা লিখেছেন, "আলোরও বিচিত্র রংরস থাকে/ মনমতো রঙের জামা পরি, মনোমতো বর্ণ বিপণি ঘুরি/ আর পেনসিল দিয়ে যে রঙের কথা লিখি, আলো তুমি জানো/ মিথ্যাচারী হইনি কখনও"[৯] (৩৯)। কবি কবিতার পাশাপাশি শিল্পচর্চা বজায় রেখে সেই সত্যের সম্মুখীন হতে চান যাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় মিথ্যাচার পরশ্রীকাতরতা স্পর্শ করতে পারেনা। ভালোবাসার সেই জলরং যা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, অমলিন কবি তার কথাও লিখেছেন। যদিও কবিতা শেষ হচ্ছে কোন অবিশ্বাসী পুরুষের হাতে বয়ঃসন্ধির কোন এক ভুলের খেসারত দিতে দিতে। কবিতা শেষ হচ্ছে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে -শারীরিক বা আলংকারিক- যাই হোক না কেন, ওই মৃত্যুর কোন রং কবি খুঁজে পাননি। রং যা জীবনের স্পন্দন বহনকারী, স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুতে এসে তারও অস্তিত্ব বিপন্ন। অহনা বিশ্বাসের কবিতা নারীর সামাজিক অবস্থানকে প্রকৃতভাবে তুলে ধরার জন্য শিল্পের এক মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আইরিস কফি অচেনা রুমাল* কাব্যগ্রন্থের "পোর্ট্রেট" কবিতায় চিত্রশিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ খুব সহজেই করতে পেরেছেন কিছু চিত্রশিল্পীর নাম উল্লেখ করে। 'পোর্ট্রেট' যা এক ধরনের প্রতিকৃতি আঁকার পদ্ধতি, তাঁর কবিতায় শব্দের বাক্যের বিন্যাস দিয়ে সেরকমই কবিতার এক নির্দিষ্ট প্রতিকৃতি আকার তাগিদ এখানে স্পষ্টতঃই নজরে আসে। "অফসেটে ছাপা জলে, অক্ষরে/ অক্ষরে মিলে, তৈরি হয় জ্বালার পোর্ট্রেট"[১০] (৭০)। একজন নারীর জীবন, যা প্রচলিত সমাজ সিস্টেমের কাছে সমানুপাত হিসেব দাবি করে, আর তা না পেয়ে অবদমিত হয়ে থাকার যন্ত্রণা এই কবিতার বিষয়। জীবনের সারার্থকে তিনি ভাগ করে নিতে চান শিল্পের সারার্থে, "এখন বিধ্বস্ত ছবি, শীতের পশম, খোলা মাঠ/ রেম্ব্রান্ট , তুলুস লোত্রে, দেখে যাও। খিদের উৎসবে আজ,/ রাতারাতি আগুন লেগেছে"[১১] (৭০)। রেম্ব্রান্ট (১৬০৬-১৬৬৯) ও তুলুস লোত্রে (১৮৬৪-১৯০১), দু'জনেই ভিন্ন সময়সারণির শিল্পী। প্রথমজন ডাচ শিল্পকলার একজন যুগান্তকারী শিল্পী যার ছবিতে আলো আর ছায়ার নিরবিচ্ছিন্ন খেলা চলতে থাকে। তুলুস লোত্রেক প্রায় আড়াইশ' বছর পরের ফরাসি শিল্পী, ইম্প্রেশন যুগের শেষের দিকে বা প্রকারান্তরে পোস্ট-ইম্প্রেশন যুগের শিল্পী। প্রথম জনের ছবিতে শহরের রাজ পরিবারের প্রতিকৃতি, অন্যদিকে অন্যজনের ছবিতে মুলারুজের (Moulin Rouge) মত মদ্যপানের জায়গায় সমাজের উপেক্ষিতা নারীদের ক্যাবারে নৃত্যকলার ছবি। দুটি দুই মেরু, কবি এই কবিতায় অদ্ভুতভাবে এই দুই বৈপরীত্যকে সঙ্গে নিয়ে যেন দ্বন্দ্বময় জীবনের একটা আবক্ষ ছবি এঁকে রাখতে চেয়েছেন।

চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের "আলোকথা"-য় শিল্পকাজের প্রসঙ্গ এসেছে আরো এক নারীকেন্দ্রিক ভাবনার ভেতর দিয়ে। এখানে তিনি এক পুরুষকে মাধ্যম করে সমস্ত পুরুষ

জাতির কাছে তুলে ধরেছেন এক মোক্ষম বক্তব্য, "আমি কি আপনাকে খোলা চিঠি দেব।/ লিখব কি, বিধাতার অপরূপ শিল্পকাজ ছাড়া /মেয়েদের আর কিছু ভাবতে চাননি কোনদিন"[১২] (৩৪)। একটা সাধারন শব্দাবলীর মাধ্যমে কবি শিল্পকলার ইতিহাসের সেই চিরচারিত প্রথার কথা তুলে ধরেছেন যেখানে পুরুষের তুলি বা হাতুড়ি ছেনির মাধ্যমে এক 'আইডিয়ালাইজড' নারীর রূপ ফুটে উঠেছে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'মোনালিসা', বতিচেল্লীর 'ভেনাস' , এদুয়ার্দ মানের 'অলিমপিয়া', এডগার দেগার "ব্যালে-নর্তকী", হেমেন মজুমদারের 'স্নানরতা নারী' ইত্যাদি অজস্র বিশ্ববিশ্রুত শিল্পকর্মগুলির ভেতরে একটি সাধারণ সূত্র সবসময় কাজ করে যা হোল প্রধানত পুরুষের চোখে নারীর সংরচনা। যেন বিধাতা এখানে পুরুষের রূপ ধরে এক আদর্শায়িত নারীরূপ তৈরি করছেন যার বাইরে বেরিয়ে ভাবতে যাওয়া ভীষণ প্রথাবিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। সমগ্র কবিতাটিতে কবি যেভাবে নারীর বয়ানে তার অভিযোগের খতিয়ান তুলে ধরেছেন এই শিল্পকলার এক প্রথার, তার সামান্য উল্লেখে যেন সমাজের অচলায়তনের অন্য আরেক দিক তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

মীরা মুখোপাধ্যায়ের "ন্যুড স্টাডি"-তে কবি আরো একবার একটি আর্ট ফর্ম কে ব্যবহার করেছেন এক ভয়ংকর স্টিরিওটাইপ চিন্তাভাবনাকে সবার সামনে এনে উপস্থিত করার জন্য। শিল্পের জগতে ছবি বা ভাস্কর্যের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য গ্রীকদের সময় থেকেই নগ্ন নারী শরীর মডেল হিসেবে সামনে রেখে তার চর্চা করা হয়। যদিও শিল্পের ক্ষেত্রে কোন লিঙ্গ বৈষম্য থাকা উচিত নয় তবুও এই ন্যুড স্টাডির ক্ষেত্রে অদ্ভুত বৈষম্য দেখা যায়। কবি এখানে একটি নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখেছেন একজন নারী মডেলের অনুভবের কথা, যখন তাকে নগ্ন হয়ে একাধিক শিল্পীদের মাঝখানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, "আমি জানি এখন বর্ষাকাল নয়,/ তবু চাইছি আকাশ উজাড় করে/ মেঘ এসে ভেসে ভেসে /এই ঘরে ঢুকে পড়ুক, অন্ধ হয়ে যাক / আর্ট কলেজের সব শিক্ষার্থী যুবক /অন্ধ মানুষের কাছে লজ্জা নেই"[১৩] (১৪)। যদিও হালকা চালে লেখা ব্যক্তিগত অসহায়তাকে রোমান্টিসাইজ করে লেখা , তবু কবি এই সামান্য কয়েকটি লাইনের ভেতর দিয়ে Male Gaze বা পুরুষের চোখ দিয়ে দেখার যে সামাজিক গতানুগতিক চর্চা, তার কেন্দ্রে পৌঁছতে চেয়েছেন। সাধারণতঃ ইতিহাস শিল্পীদের ভাষায় কথা বলে, যেখানে 'মডেল' কেবলমাত্র 'মডেল মেয়ে' যাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব বিখ্যাত সব ছবি আঁকা যায় অথচ বিশেষ কয়েকজনকে বাদ দিয়ে যার কোনো বয়ান এই ইতিহাসের পাতা লিপিবদ্ধ করে রাখে না। এবং এই দেখা ব্যাপারটা এতটাই পুরুষশাসিত যে ইউরোপের মতো সভ্য দেশেও বহুদিন মহিলাদের দেখতে দেওয়ার রাজনীতি থেকে চালাকি করে দূরে রাখা হয়েছিল। Catherine McCormack যথার্থ বলেছেন তাঁর *Women in the Picture : Women, Art and the Power of Looking* (২০২০) বইয়ের ভূমিকায়ঃ

Historically speaking, women have not been allowed to look; held back from studying and entry into the professional sphere, they were not allowed to look at books nor at the world-more specifically-they weren't allowed to look at the world of men– in case they found something that they wanted to challenge.[১৪] (৮)

তাই লেখালেখির দায়িত্বটা যেন শুধু পুরুষের হাতে আর নারীদের শরীর শুধুমাত্র অবজেক্টিফিকেশনের অঙ্গ। নারীর শরীর যেন শুধু ভোগবাদী আন্দোলনের একটি বিষয়বস্তু। মীরা মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আন্দোলনের ভাষায় কথা বলে না। অতটা চাবুক শাসিত কণ্ঠে বিদ্রোহ করে না বরং অপেক্ষায় থাকে কবে এই নতুন "মডেল মেয়ে" অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এই গতানুগতিক কার্যপ্রণালীতে। "মডেল মেয়েরা চায়/ কিছুদিন অসাড়তা কেটে গেলে/ শিক্ষার্থী যুবকেরা সব্বাই দৃষ্টি ফিরে পাক"[১৫] (১৪)। তবু 'মেনে নেওয়া'-র এই কবিতা কোথাও এই সামান্য প্রকাশের ভেতর দিয়েই নীরবে যেন এই অভ্যাসের বিপরীতে তার মতামত জানিয়ে রাখে। কারণ তিনি জানেন দেখার রাজনীতি আসলে শাসকের রাজনীতি

The anxiety about women looking at naked men in the studio and manipulating their bodies at will with their pen or brush is at the crux of everything. It is an admittance that looking, and who gets to look, and make art, is more about power and control than we might first be inclined to think. It is about who gets to tell their version of the story and who makes an object out of whom. It is also an admission that men and womenós bodies have historically always been seen differently.[১৬] (১১)

সবর্ণা চট্টোপাধ্যায় তার তার "ছাইপাঁশ" কবিতায় অনেকটা রবীন্দ্রনাথের অমল ও চারুলতার সম্পর্কের মত করে এখানে একটি নারী চরিত্রের বয়ানে নারীর লেখালেখির ক্ষমতার প্রকাশ দেখিয়েছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের লেখার উপরে যে দীর্ঘকাল থেকে 'ব্যঙ্গতির' বর্ষিত হয় তিনি তার একটা সমোচিত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার ভঙ্গি উগ্র নয়, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ উপস্থিত সেখানে, " আমি রাঁধুনি ভালো নই/ও শিরোপা থাক তোমারই মাথায়"[১৭](২৫)। এই প্রসঙ্গে প্রায় চারশত বছর আগে রচিত অ্যান ব্র্যাডস্ট্রিটের "প্রলোগ"[১৮] কবিতায় একই ধরনের বক্তব্য উঠে আসতে থাকে। দুই কবির লেখার ভেতরে অনেক দিন পেরিয়ে গেছে অথচ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এখনো ততটা ফ্লেক্সিবল নয় নারীকে তার অধিকার - লেখার অধিকার, সমানভাবে তুলে দিতে। সমাজ কতটা অকৃপণ হবে কবি জানেন না, কিন্তু তিনি ভীষণ সচেতনভাবেই এই প্রচলিত লিঙ্গ রাজনীতির ভেতরের শিল্পচর্চার অভিমুখ তিনি বেশ মজার ছলে ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন, "তোমার মতো, ভিঞ্চির মোনালিসাও আমায় পাতায় টানে,/ নিজেকে বড় চিত্রকর করে গড়ি,/ একটু হাসি যদি আনো আটপৌরে মুখে,/ তবে আমিও নতুন এক মোনালিসা আঁকি"[১৯](২৫)।

পুরুষকে প্রথম সারিতে রেখে নারীকে দ্বিতীয় সারিতে রাখার যে হায়ারআর্কির কথা প্রচলিত, কবি সেই চিরচারিত তত্ত্বের বিনির্মাণ করতে চাইলেন। ইতিমধ্যেই আলোচিত লিন্ডা নকলিন-এর প্রশ্নকে যেন সামনে রেখেই নারীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়ে ওঠার আত্মবিশ্বাসের কথা এর তিনি তুলে ধরতে চাইছেন যা আসলে আত্ম-পরিচিতি, আত্ম-সম্মান আর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার এক পদ্ধতিও বটে। ছবি ও কবিতার এই সম্পর্ক প্রকৃত অর্থেই তাই মহিলা কবির কবিতায় নতুন সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটায়।

তথ্যসূত্র :

১। www.writing.upenn.edu/library/nochlinlindn-why-Have-been-No-Great-women artist pdf.

২। ঐ

৩। সুমিতা চক্রবর্তী, *ছবি ও লেখা : মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব*। কারিগর, কলকাতা , ২০১৬

৪। আনিতা অগ্নিহোত্রী, *ব্রেল*। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২

৫। ঐ

৬। মউলি মিশ্র, *শুশ্রূষাকাব্য*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫

৭। ঐ

৮। https://bichitra.jdvu.ac.in/manuscript/manuscript–viewer.php? manid = 176 & mname = RBVBMS-146%28iii.29.

৯। অহনা বিশ্বাস, *কবিতা সংগ্রহ*। রাবণ, কলকাতা, ২০২৩

১০। সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *আইরিস কফি অচেনা রুমাল*। অক্ষরবৃত্ত, কলকাতা ২০২২

১১। ঐ

১২। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, *কালো বসন্তের কিস্‌সা*। সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২

১৩। মীরা মুখোপাধ্যায়, *বিরহের অতুলপ্রসাদে*। গদ্যপদ্যপ্রবন্ধ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০২৩

১৪। Catherine Mc Cormack, *Women in the Picture, Women, Art and The power of Looking.* Icon Books Ltd. London. 2021

১৫। মীরা মুখোপাধ্যায়, বিরহের অতুলপ্রসাদে। গদ্যপদ্যপ্রবন্ধ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০২৩

১৬। Catherine McCormack, *Women in the Picture, Women, Art and The power of Looking.* Icon Books Ltd. London– 2021

১৭। সবর্না চট্টোপাধ্যায়, *চারদেওয়ালি চুপকথারা*। সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৮

১৮। https:www.poetryfoundation.org/poems/43705/prologue-56d22283c1 2e1

১৯। সবর্না চট্টোপাধ্যায়, *চারদেওয়ালি চুপকথারা*। সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৮

মনোজ কুমার দে

নাগরিক বিচ্ছিন্নতা ও বাংলা কবিতা : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

আধুনিক ও সমকালীন বাংলা কবিতায় নগরজীবনের অভিজ্ঞতা নানান আঙ্গিকে উপস্থিত হলেও, সেই অভিজ্ঞতাকে সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করে পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সীমিত। অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচনা কবিতার নান্দনিকতা, ভাষা ও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও, নগরায়ণ, পুঁজিবাদ, শ্রেণি-সংকট ইত্যাদি সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে কবিতার ভেতরে নাগরিক বিচ্ছিন্নতার রূপ নির্মাণ করে, তা পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি। ফলে বাংলা কবিতায় নাগরিক বিচ্ছিন্নতা প্রায়ই একটি ব্যক্তিগত মানসিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সামাজিক কাঠামো ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তার জটিল সম্পর্ক অনালোচিত থেকে গেছে। এই গবেষণাপত্র তাই বাংলা কবিতায় নাগরিক বিচ্ছিন্নতাকে কীভাবে একটি সামাজিকভাবে নির্মিত অভিজ্ঞতা হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায় এবং কবিতা কীভাবে আধুনিক নগরসমাজের সংকটকে প্রতিফলিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করে, তার উপর আলোকপাত করে। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে নাগরিক বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে ব্যাখ্যা করা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করাই এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য।

সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব দুটি পৃথক বিষয় হলেও সাহিত্যের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করা যায় না। সমস্ত শিল্প ও সাহিত্য একটি নির্দিষ্ট সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত ক্ষেত্র থেকে উঠে আসে। অ্যাডোর্ণ (১৯৮৪) বলেন, শিল্পের সামাজিক চরিত্রটি তার অবিচ্ছিন্ন নান্দনিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে তাই কবিতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আন্তঃবিদ্যা গবেষণার বহুমাত্রিকতাকে আরও প্রসারিত করে।

আধুনিক নগরসমাজ মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতা। শিল্পায়ন, পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদ এবং পরবর্তী বিশ্বায়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় নগর কেবল একটি ভৌগোলিক পরিসর নয়, বরং একটি জটিল সামাজিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। গ্রামকেন্দ্রিক সামাজিক সম্পর্কের তুলনায় নগরজীবন অধিক গতিশীল, প্রতিযোগিতামূলক ও যান্ত্রিক। এর ফলে ব্যক্তি একদিকে যেমন স্বাধীনতা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করে, অন্যদিকে তেমনি সে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পারিবারিক সম্পর্ক, প্রতিবেশী সম্পর্ক ও সমষ্টিগত সংহতি থেকে। এই দ্বৈত অভিজ্ঞতার ফলেই জন্ম নেয় 'নাগরিক বিচ্ছিন্নতা' যা আধুনিক মানুষের এক মৌলিক সামাজিক অনুভব।

বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা কবিতা, এই নাগরিক অভিজ্ঞতাকে গভীর সংবেদনশীলতার সাথে ধারণ করেছে। কবিতার ভাষা ও চিত্রকল্পে নগর কখনো ক্লান্ত,

কখনো হিংস্র, কখনো নিঃসঙ্গ, আবার কখনো প্রতিবাদী রূপে উপস্থিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হলো সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে বাংলা কবিতায় নাগরিক বিচ্ছিন্নতার রূপ, কারণ ও অর্থ বিশ্লেষণ করা এবং দেখানো যে কবিতা কীভাবে আধুনিক নগরসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল হিসেবে কাজ করে। সমাজতাত্ত্বিক ধারণায় বিচ্ছিন্নতা।

সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'বিচ্ছিন্নতা' ধারণাটি মূলত কার্ল মার্কের চিন্তায় সুস্পষ্ট রূপ পায়। মার্কের মতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক তার শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং ধীরে ধীরে তার শ্রম কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য, উৎপাদন প্রক্রিয়া, সহকর্মী ও নিজের মানবসত্তা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল অর্থনৈতিক নয়; এটি মানসিক ও সামাজিক স্তরেও কার্যকর। এছাড়া, সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যুক্তিবাদ ও আমলাতন্ত্রের প্রসারের কথা বলেন। তাঁর 'Iron Cage' ধারণা অনুযায়ী আধুনিক মানুষ নিয়ম, হিসাব ও দক্ষতার এক অদৃশ্য খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যেখানে আবেগ ও মানবিক মূল্যবোধ ক্রমশ গৌণ হয়ে যায়। জর্জ সিমেল নগরজীবনের মানসিক অভিঘাত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'সংবেদনহীন মনোভাব'-এর কথা বলেন। অতিরিক্ত উদ্দীপনা ও তথ্যের চাপে নগরবাসী সংবেদনশীলতা হারিয়ে এক ধরনের মানসিক নিস্পৃহতাযর শিকার হয়। এই সব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নাগরিক বিচ্ছিন্নতাকে একটি সামাজিকভাবে নির্মিত অভিজ্ঞতা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, যা নগরায়ণ, পুঁজিবাদ ও আধুনিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বাংলা কবিতায় নগর অভিজ্ঞতার সূচনা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে ঘটে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার মতো মহানগরের উত্থান বাংলা সমাজে এক নতুন সামাজিক বাস্তবতা সৃষ্টি করে। গ্রামভিত্তিক সমাজ থেকে নগরমুখী মানুষের যাত্রা কেবল ভৌগোলিক পরিবর্তন ছিল না; এটি ছিল পেশা, মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্পর্কের এক মৌলিক রূপান্তর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে নগর আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে উপস্থিত হলেও, তখনও নাগরিক বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট সামাজিক সংকট হিসেবে কবিতায় ধরা পড়েনি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, বিশেষত তিরিশের দশকের কবিদের হাতে নগর একটি গভীর অস্তিত্বগত অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, উপনিবেশিক শোষণ ও দ্রুত নগরায়ণএই সব প্রক্রিয়া নগরজীবনকে অনিশ্চিত ও ক্লান্ত করে তোলে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই ক্লান্ত নগর একদিকে বাস্তব, অন্যদিকে স্মৃতি ও স্বপ্নের বিপরীত

পরিসর। নাগরিক মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে হয়ে ওঠে একাকী ক্লান্ত এবং চুড়ান্ত বিচ্ছিন্ন একক। তৎকালীন এই বিচ্ছিন্নতার প্রতিফলন আমরা কবি জীবনানন্দের কবিতায় পেয়ে থাকি।

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?

(বোধ/জীবনানন্দ দাশ)

সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায়, বিচ্ছিন্নতা সমাজ জীবনের এক নির্মম ও রূঢ় বাস্তব। মানুষ নিজেরা যে অবস্থায় বাঁচছে এবং সেই অবস্থায় বাঁচার মধ্যে যে অতৃপ্তি বা শূন্যতাবোধ, তার মধ্যে মানুষ তার নিজেদের বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে। কারণ তার বেঁচে থাকার শর্ত বা অবস্থা তাকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। ব্যক্তি যেমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তেমনই সমাজও ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। উক্ত কবিতায় কবি এই বিচ্ছিন্নতার আর্তনাদই ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, কীভাবে সবার মাঝে থেকেও একাকীত্ব তাঁকে গ্রাস করেছে। সমস্তই যেন তাঁর শূন্য মনে হয়। কবি স্মৃতির আশ্রয়ে বাঁচতে চায়। এটাই নাগরিক বিচ্ছিন্নতার এক ঐতিহাসিক রূপ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শিল্পায়ন, উদ্বাস্তু সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নগরকে আরও জটিল করে তোলে। এই সময়ে নগর আর কেবল ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার স্থান নয়; তা হয়ে ওঠে শ্রেণি সংঘাত, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্র। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই বৈষম্যের কথা ফুটে ওঠে।

আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ
ভাল কথা
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন
খুব ভাল
মশা, মাছি, সাপ, বাঘ তাড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসেছে
আমরা সত্যিই খুশী হচ্ছি
কিন্তু মোটেও খুশি হচ্ছে না যখন দেখছি
সার হাত আছে তাঁর কাজ নেই,

মার কাজ আছে তার ভাঙ নেই,
আর, যার ভার্ত আছে তাঁর হাও নেই।

(মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

এই ব্যাপকহারে শিল্পায়ন ও আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা যে উন্নত থেকে উন্নততর জীবনের অভিমুখে যাত্রা করছি, এতে সমাজের সকল শ্রেণি কিন্তু উপকৃত হচ্ছে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য যে বৃহদাকার জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে এতে যেমন পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনই বহু মানুষ তাদের বাসযোগ্য জমি হারাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ঠিকমত করা হয় না। বড় বড় বৃহদায়তন শিল্প কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে একই সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। একটি শ্রেণির ক্রমশ প্রান্তীয়করণ ঘটে থাকে। তারা তাদের বাসযোগ্যভূমি, কৃষিভূমি হারার ফলে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও দুর্বল হয়ে যায়। তারা বাধ্য হয়ে এই সব শিল্পক্ষেত্রে বা অন্যত্র তাদের শ্রম বিক্রি করে জীবন ধারণ করে। সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষেরা এদের বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখে। এরাও সমাজের মূল স্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতায় নাগরিক বিচ্ছিন্নতা আরও জটিল ও বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করে। বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি, মিডিয়া সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির আগ্রাসনে ব্যক্তি আরও বেশি ভোক্তা ও তথ্যগ্রাহকে পরিণত হয়। এর ফলে সম্পর্ক হয়ে ওঠে ক্ষণস্থায়ী, অনুভূতি হয়ে পড়ে পণ্যমুখী। এই পর্যায়ে নাগরিক বিচ্ছিন্নতা কেবল দুঃখ বা নৈরাশ্য নয়; এটি পরিচয় সংকটেরও রূপ। ব্যক্তি একই সঙ্গে নানান ভূমিকায় আবদ্ধ, যথা- কর্মী, ভোক্তা, নাগরিক, কিন্তু কোথাও যেন সে সম্পূর্ণ নয়। কবিতা এই অসম্পূর্ণতার ভাষা নির্মাণ করে। এই নগর সমাজ এক চূড়ান্ত নৈব্যক্তিকতা লক্ষ করা যায়। এখানে প্রতিনিয়তই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে বেঁচে ওঠার লড়াই। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই উচ্চারণ প্রস্ফুটিত হয়

কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়ালকাঁটা
অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে।

(আমি ও কলকাতা/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

এই নাগরিক কৃত্রিমতা জার্মান সমাজতাত্ত্বিক সিমেলের (Simmel) এর তত্ত্বে উঠে আসে, যা নগর সংস্কৃতির রূপ। নগরজীবনে এক ধরণের মানসিকতা (attitude) দেখা যায় যা চূড়ান্ত সংবেদনহীন। শহরের মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ কম। গ্রামীণ সমাজের আকৃতি ছোট হওয়ায় পরস্পর পরস্পরকে চেনে কিন্তু শহরে একে অপরকে চেনে না।

শহরে গোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি থাকে। কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই শহরে ব্যক্তি স্বাধীনতা বেশি। ব্যক্তি একাধিক গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীতে ব্যক্তির ভূমিকাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। আবার এই ছোটো ছোটো গোষ্ঠীগুলোর কিছু মাননির্ধারক শর্ত বা দাবী থাকে যা না মানলে ব্যক্তি গোষ্ঠীচ্যুত হতে পারে। নগরে দূরত্ব অনুযায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে নিকটবর্তী লোকের সাথে সম্পর্ক শিথীল হয়ে পড়ে এবং দূরের লোকের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যায় নগর সমাজে ব্যক্তি নৈব্যক্তিক প্রক্রিয়া দ্বারা শাসিত হয়। নগর সমাজ একদিকে যেমন ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়, অন্যদিকে ব্যক্তির তেমন স্বাধীনতা কেড়েও নেয় (রিটজার, ১৯৯২)। এই মেকি স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই কবির তির্যক উচ্চারণ আমরা 'আমি ও কলকাতা' শীর্ষক কবিতায় লক্ষ করি।

এই নগর সমাজে সব কিছু অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত হয়। এখানে শিল্প, আকাঙ্খা, তৃপ্তি সবকিছুই অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত হয়। এমনকী নারীদেহও পণ্যে পরিণত হয়। কবি সমর সেনের কবিতাতে তা স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হয়

মহানগরীতে এল বিবর্ণদিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি আর কত
লাল শাড়ী আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ।
আর হাওয়ায় কর্ত গোল্ডফ্লেকের গন্ধ?
হে মহাগনরী!

(নাগরিক/সমর সেন)

সিমেল তাঁর, 'Philosophy of Money' গ্রন্থে টাকার সর্বব্যাপকতা দেখিয়েছেন। বড় শহরে বা নগরে সব কিছুই টাকা দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখানে সব গুণগত মান পরিমানগত মানে পরিণত হয়। এটাই শহুরে সংস্কৃতি। সিমেল দেখিয়েছেন এখানে সব কিছুই বাজারে পাওয়া যায়। সম্পর্ক থেকে শুরু করে আবেগ, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য সবকিছুকে টাকা দিয়ে কেনা যায়। মানুষের সৃজনশীলতা অসহায় হয়ে পড়ে টাকার কাছে। শহরে টাকা এক ধরণের আপেক্ষিক স্বাধীনতা প্রদান করে। টাকা একদিকে ব্যক্তিকে যেমন বাধ্যবাধ্যকতা থেকে মুক্ত করে, একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা কমে তেমনই নৈব্যক্তিক নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা, অবস্থান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তির ইচ্ছামতো বিষয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ার স্বাধীনতা। শহরে বেঁচে থাকার জন্য টাকা-পয়সার পরিবর্তে টাকা পয়সার জন্য বেঁচে থাকা হয়ে দাঁড়ায়। এই নগর সমাজে মানুষের সৃষ্টিশীলতা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করে টাকার কাছে (ফ্রিসবি, ২০০২)। টাকার এই সর্বব্যপকতা আরও নির্মমভাবে ফুটে ওঠে কবি তুষার রায়ের কবিতায়। তিনি লিখেছেন—

চাকরি যদি নাও দ্যান স্যার চারটে টাকা অন্তত
দিন, চিনচিনে এই বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা ভুলে
ফলিডলের গুনপনা, দরখাস্তের মাশুল, তুমি
চাকরি না হোক- চার বেহারার কাধে চেপে যাবে।

(মরুভূমির আকাশে তারা/তুষার রায়)

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে নাগরিক বিচ্ছিন্নতা আরও বহুমাত্রিক ও সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে। বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি ও প্রযুক্তির প্রসারে নগরজীবন ব্যাপকভাবে ভোক্তা সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ভার্চুয়াল ও ক্ষণস্থায়ী হয়ে ওঠে। ফ্ল্যাটবাড়ি, লিফট, মেট্রো, মোবাইল ফোন ও একাকী রাতের চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে কবিতায় এই বাস্তবতা ধরা পড়ে।

একেকদিন রাত দেড়টা-দুটোয় ফোন করতিস তুই
চাপা গলায় কথা বলতিস
খারাপলাগার কথা

আমারও কষ্ট হত খুব
ভাবতাম, ইস, যদি এখুনি মেয়েটাকে নিয়ে আসা যেত
তা হলে বুকে ওর মুখ লুকিয়ে রাখতাম...

আর আজ রাত দেড়টা-দুটোয়
যখন সত্যিই আমার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছিস তুই,
আমার আর ঘুম আসছে না
আমি বোকার মতো অপেক্ষা করছি

যেন ফোন করবি তুই (শ্রীজাত)

আধুনিক শহরে ব্যক্তি যেন ক্রমশ মোবাইল ফোন ও সামাজিক মাধ্যমের মধ্যে বন্দি এক নাগরিক সত্তা, যে কথা বলতে চায়, কিন্তু ভাষা হারিয়ে ফেলে, কবি শ্রীজাতর উচ্চারণ তাই কেবলই বিচ্ছিন্ন বা মানসিক নয়, তা ব্যাপকভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। উক্ত কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, কীভাবে মোবাইল, প্রযুক্তি ব্যক্তিকে অসহায় ও বিচ্ছিন্ন করে তোলে। সে ব্যক্তিগত পরশের পরিবর্তে মোবাইল নির্ভর হয়ে পড়ে। এই নির্ভরতা বা ব্যাধির কাছে সম্পর্ক হয়ে ওঠে চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিক। আধুনিক যুগের এই প্রযুক্তি নির্ভরতাকেই Weber লোহার খাঁচার সাথে তুলনা করেছেন। যেখান থেকে ব্যক্তির পরিত্রাণ নেই।

জয় গোস্বামীর কবিতায় এই নাগরিক বিচ্ছিন্নতা এক নীরব আত্মসংলাপের রূপ নেয়।

শহুরে একাকী রাত, স্মৃতি ও অব্যক্ত প্রেম উত্তর-আধুনিক নাগরিক জীবনের সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরে।

আমরা তো অল্পে খুশি, কি হবে দুঃখ করে?
আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাত কাপড়ে।

চলে যায় দিন আমাদের অসুখে ধার দেনাতে
রাত্তিরে দুই ভাই মিলে টান দিই গঞ্জিকাতে।

সব দিন হয় না বাজার; হলে, হয় মাত্রাছাড়া
বাড়িতে ফেরার পথে কিনে আনি গোলাপচারা।

কিন্তু, পুঁতবো কোথায়? ফুল কি হবেই তাতে?
সে অনেক পরের কথা, টান দিই গঞ্জিকাতে।

আমরা তো এতেই খুশি, বলো আর অধিক কে চায়?
হেসে খেলে কষ্ট করে, আমাদের দিন চলে যায়।।

মাঝে মাঝে চলেও না দিন, বাড়ি ফিরি দুপুর রাতে
খেতে বসে রাগ চড়ে যায়, নুন নেই ঠান্ডা ভাতে

রাগ চড়ে মাথায় আমার, আমি তার মাথায় চড়ি
বাপ ব্যাটা দুই ভাই মিলে সারা পাড়া মাথায় করি

করি তো কার তাতে কি, আমরা তো সামান্য লোক
আমাদের শুকনো ভাতে লবনের ব্যবস্থা হোক।

(নুন, জয় গোস্বামী)

নাগরিক বিচ্ছিন্নতা বাংলা কবিতায় কেবল নৈরাশ্যের ভাষা নয়। কবি জয় গোস্বামীর কবিতায় এটি প্রতিবাদের রূপ নেয়। কবি নগরজীবনের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মানবিক সম্পর্ক, স্মৃতি, প্রেম ও স্বপ্নকে পুনরুদ্ধার করতে চান। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কবিতা এখানে একটি 'প্রতিসাংস্কৃতিক পরিসর'যেখানে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতাকে ভাষা দিয়ে অর্থবহ করে তোলে এবং সমষ্টিগত চেতনায় যুক্ত হতে চায়।

নাগরিক বিচ্ছিন্নতা আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক সমাজের একটি মৌলিক অভিজ্ঞতা, যা বাংলা কবিতায় গভীর ও বহুমাত্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব আমাদের এই কবিতাগুলোর সামাজিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝতে সাহায্য

করে, আর কবিতা সমাজতত্ত্বকে দেয় মানবিক অনুভবের সূক্ষ্ম ভাষা। তাই নাগরিক বিচ্ছিন্নতা ও বাংলা কবিতার সম্পর্ক একদিকে যেমন সাহিত্যিক বিশ্লেষণের বিষয়, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক সমাজকে বোঝার এক গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক প্রবেশদ্বার।

তথ্যসূত্র :

Marx– Karl. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Progress Publishers– 1959.

Weber– Max.The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons– Routledge– 2001.

Simmel– Georg. "The Metropolis and Mental Life." The Sociology of Georg Simmel– edited by Kurt H. Wolff– Free Press– 1950– pp. 409-424.

Williams– Raymond. Marxism and Literature. Oxford UP– 1977.

Lefebvre– Henri.The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith– Blackwell– 1991.

দাশ, জীবনানন্দ. *শ্রেষ্ঠ কবিতা*. দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।

দে, বিষ্ণু. *কবিতা সংগ্রহ*. আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।

নিরঞ্জন ঘোষ

বাঁকুড়া জেলার পুরাতত্ত্ব ও জৈন প্রভাব : একটি অলিখিত ইতিহাস

রাঢ় বাংলা তথা বাঁকুড়া জেলায় জৈন ধর্মের প্রভাব খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত প্রবল ছিল। দামোদর নদীর অববাহিকায় অবস্থিত রাধামোহনপুর গ্রামটি প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় লোকশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় এক শতাব্দী আগে বন্যার ফলে বা নদীর পাড় ভাঙনের সময় একটি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি মহেন্দ্র মাজি নামে এক চাষী উদ্ধার করেন তার চাষের জমি থেকে। পরবর্তীতে তিনি সেই প্রস্তর মূর্তি গ্রামে নিয়ে এসে বৌদ্ধ মূর্তি হিসাবে পূজার্চনা শুরু করেন। যদিও এটি ঐতিহাসিকভাবে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তি, তবে স্থানীয় জনমানসে এটি এক জাগ্রত দেবতার স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the study):

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল :-

১. রাধামোহনপুর গ্রামে প্রাপ্ত মহাবীর মূর্তির ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা।

২. স্থানীয় জনমানসে এই মূর্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিশ্বাস ও প্রাত্যহিক পূজা পদ্ধতির বিবর্তন বিশ্লেষণ করা।

৩. বার্ষিক মেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করা।

৪. জৈন ঐতিহ্য ও হিন্দু লোক ধর্মের সংমিশ্রণ কিভাবে স্থানীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে তা খতিয়ে দেখা।

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology) :-

এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রাথমিক ও গৌণ উৎসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম :- গবেষণার স্বার্থে সরাসরি ক্ষেত্র সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্দিরের পুরোহিত:- মূর্তির প্রাত্যহিক পূজা, উপাচার এবং প্রচলিত অলৌকিক কাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে।

স্থানীয় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক:- গ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষিত প্রবীণ গুণীজন :- গ্রামের প্রবীণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে মূর্তির প্রাপ্তি কালীন ইতিহাস জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষ সাক্ষাৎকার :- রাধামোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফকির চন্দ্র মন্ডল মহাশয়ের কাছ থেকে মূর্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং গত কয়েক দশকের বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার দেওয়া তথ্যাবলী এই গবেষণার ঐতিহাসিক ভিত্তি মজবুত করতে সাহায্য করেছে।

মূর্তির বিবরণ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব (Iconographic Analysis) :-

উদ্ধারকৃত মূর্তিটি কালো কষ্টিপাথর বা ব্যাসল্ট পাথরে নির্মিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নরূপ :-

ভঙ্গি :- মূর্তিটি কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দন্ডায়মান।

লাঞ্ছন চিহ্ন :- পাদ পীঠের নিচে সিংহ লাঞ্ছন পরিলক্ষিত হয়, যা নিশ্চিত করে যে এটি ২৪ তম তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তি।

শৈলী :- মূর্তির গঠন শৈলীতে পাল সেন যুগের প্রভাব স্পষ্ট, যা দশম বা একাদশ শতাব্দীর শিল্পকলার ইঙ্গিত দেয়।

পার্শদেবতা :- মূর্তির দু"ধারে চামরধারী অনুচর এবং উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি তীর্থঙ্করদের উপস্থিতি দেখা যায়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Context) :-

বাঁকুড়া জেলায় জৈন ধর্মের উদ্ভব খ্রি:পূ: দ্বিতীয় শতকে ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। আচারাঙ্গ সূত্র থেকে জানা যায় রাঢ় অঞ্চলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল বাঁকুড়া জেলা। বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অবস্থান রাঢ়ের দক্ষিণাংশের অন্তর্গত ভৌগোলিক অঞ্চল হওয়ায় প্রাচ্য দেশে অর্থাৎ পূর্ব ভারতে আর্য্যায়ন প্রক্রিয়া মূলত জৈনদের প্রভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। যদিও এই ধারণা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন ঐক্যমত নেই। কিন্তু ওই অঞ্চলে জৈনদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল সর্বাধিক। সুতরাং সেই বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলের আর্যায়ন প্রক্রিয়ায় জৈনদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। জৈন ধর্মের চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাল থেকে কালান্তরে বাঁকুড়ায় জৈন ধর্ম ও প্রচারকদের আগমন ঘটেছিল এবং তদানিরন্তন সময়ে বাঁকুড়ায় জনবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত অল্প হলেও স্থানীয় অধিবাসীগণ জৈন ধর্মকে শুধুমাত্র স্বাগতই জানায়নি, সেই ধর্মের প্রবল পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন এমন বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী, দামোদর প্রভৃতি নদীর উভয় তীরস্থ অঞ্চলে জৈন মঠ ও মন্দিরের প্রত্নাবিশেষ আজও ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। বহু জায়গায় জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ, মহাবীরের শিলা মূর্তির ক্ষয়িত নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত রাধামোহনপুর গ্রামে পাওয়া জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তিটি রাঢ় বাংলার জটিল এবং বৈচিত্রময় ধর্মীয় ইতিহাসের এক অনন্য নিদর্শন। এই মূর্তিকে কেন্দ্র করে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী বাংলা ১৩২৮ সালে এই মূর্তিটি স্থানীয় দামোদর নদের চর থেকে সংগৃহীত হয়েছিল প্রাচীন আচারাঙ্গ সূত্র থেকে জানা যায়, স্বয়ং মহাবীর রাঢ় দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, যার ফলে এই অঞ্চলে অসংখ্য জৈন ভাস্কর্য ছড়িয়ে রয়েছে। এই মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান পূজা পদ্ধতি তিনটি ধর্মের মিশ্রণকে ফুটিয়ে তোলে। মূর্তিটি দিগম্বর জৈন রীতিতে নির্মিত। এটি কায়োৎসর্গ মুদ্রায় খোদিত যা কঠোর তপশ্চর্য্যার প্রতীক। মূর্তির চারপাশের খোদাই কাজগুলি স্পষ্টতই জৈন শিল্পের পরিচয় দেয়। ঐতিহাসিক ও স্থানীয়ভাবে এই মূর্তিকে অনেক সময় বুদ্ধ হিসেবে সম্বোধন করা হয়। গ্রামের এই মন্দিরটি অনেক জায়গায় বুদ্ধমন্দির হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিকভাবে, অনেক প্রাচীন ধ্যানমগ্ন মূর্তিকে পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষ বুদ্ধের প্রতিকৃতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল, যা রাধামোহনপুরের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। হিন্দু মন্দিরে অন্যান্য দেবদেবীর (পার্বতী) মূর্তির সঙ্গে এই বিগ্রহকে স্থান দেওয়া হয়েছে যা একটি সমন্বয়ী সংস্কৃতির প্রতিফলন।

স্থানীয় পূজা অনুষ্ঠান ও বার্ষিক মেলা (Local Worship Ceremony and Annual Fair) :-

এই গবেষণাপত্রের বাঁকুড়ার রাধামোহনপুর গ্রামের হিন্দু রীতি অনুযায়ী তীর্থঙ্কর মহাবীরের

পূজা উপলক্ষে আয়োজিত মেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো। পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতিতে এই মেলাটি লোকজ ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। রাধামোহনপুরের জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের পূজা বাঙালি হিন্দু আচার অনুষ্ঠান ও স্থানীয় বিশ্বাসের এক অনন্য সংমিশ্রণ। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে মাঘীপূর্নিমার দিন ঢাকের বাদ্যি; উলুধ্বনি এবং শঙ্খ ধ্বনির মাধ্যমে পূজার এক পবিত্র পরিবেশ তৈরী হয়। বাঁকুড়ার অনেক দেবদেবীই মূলত লৌকিক পর্যায়ে থেকে উদ্ভুত। এই মেলাটি সেই লৌকিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ, যা গ্রামীণ মানুষের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে টিকিয়ে রেখেছে। রাধামোহনপুরে মহাবীরের মেলাটি কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বরং এটি একটি সামাজিক মিলনমেলায় পরিণত হয়। এই মেলা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে একত্রিত করে। বাঁকুড়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (যেমন — মাহিষ্য, বাউরী, বাগদি, গোয়ালা এবং অন্যান্য) মানুষ এখানে অংশগ্রহণ করে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখে। মেলার মঞ্চে স্থানীয় লোকগান, যেমন - কীর্তন বা বাউল গান পরিবেশিত হয়। এর মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ শিল্পকলা নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিতি পায়। রাধামোহনপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই মেলার অবদান অনস্বীকার্য্য। বাঁকুড়া তার পোড়ামাটির কাজের জন্য বিখ্যাত। মেলায় স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা তাদের তৈরী ঘোড়া, মনসার ঝাড়ি ও পুতুল সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করার সুযোগ পান। মেলা চলাকালীন খাবার (যেমন - জিলিপি, পাপড়, স্থানীয় মিষ্টি), খেলনা এবং গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানে ব্যাপক কেনাবেচা হয়। এটি স্থানীয় ক্রেতাদের বার্ষিক আয়ের একটি বড় উৎস, মেলার প্যান্ডেল তৈরী, আলোকসজ্জা, নিরাপত্তা ও স্টল ব্যবস্থাপনার কাজে অনেক স্থানীয় যুবক ও দিনমজুরের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল ও সবজি মেলার দর্শকদের কাছে সরাসরি বিক্রি করে লাভবান হন।

উপসংহার (Conclusion) :-

রাধামোহনপুরের প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তিটির রাঢ় বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, (যদিও স্থানীয় গ্রামবাসীরা মহাবীরের মূর্তিকে বুদ্ধ হিসাবে পূজা করে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় এটি জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তি)। এটি একদিকে যেমন রাঢ় বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিকে বহন করেছে, অন্যদিকে গ্রামীণ কারিগর ও ব্যবসায়ীদের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও এই মেলা বাঙালির লোকসংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে মন্দিরের নবনির্মাণ কাজ চলছে। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রামবাসীদের যৌথ আর্থানুকূল্যে মন্দির নির্মাণ কার্য্য ২০২৭ সালে সম্পন্ন হবে বলে মন্দির কমিটি দাবী করেন।

তথ্যসূত্র :-

১. বাঁকুড়া :- মন্দির শিল্প, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।
২. West Bengal District Gazetteers -'Bankura' Amiya Kumar Banerjee.
৩. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি :- বিনয় ঘোষ।
৪. পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি :- মানিক লাল সিংহ।
৫. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি :- অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬. দক্ষিণ বাঁকুড়ার জৈনধর্ম, শীর্ষক প্রবন্ধ :- গৌরাঙ্গ সুন্দর সুবুদ্ধি।
৭. দ: পশ্চিমবঙ্গের শিল্প :- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিন ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের সেকাল একাল : ফিরে দেখা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'

(বিদ্যাসাগর অনূদিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটির মৌলিকত্ব ও মূলানুগত্য নিয়ে কিছুটা চর্চা করার চেষ্টা করলাম। হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী' গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ আমরা লক্ষ করব না, বরং বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব গদ্য শৈলীতে গ্রন্থটিকে একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে রচনা করেছেন। হিন্দি ও বাংলা দুই গ্রন্থের সহাবস্থানে একটি আন্তঃ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।)

অনুবাদক বিদ্যাসাগর হিসেবে পরিচয় মূলত ও মুখ্যত তাঁর হিন্দি গ্রন্থের অনুবাদ দিয়েই শুরু হয়। 'বেতাল পচ্চীসী' হিন্দি গ্রন্থের প্রারম্ভিক অনুবাদ করেন। বাংলা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র বিজ্ঞাপন অংশে তিনি বলেছেন — 'বৈতালপচ্চীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দি পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। .... বেতাল পঞ্চবিংশতি পূর্বৎ সর্বত্র পরিগৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।"[১]

বাংলা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থে একটি উপক্রমণিকা অংশ আছে। সেখানে সামগ্রিক কাহিনির গৌরচন্দ্রিকাটি আছে। উজ্জয়িনী নগরের গন্ধর্বসেন নামক রাজার উল্লেখ আছে। তাঁর চার মহিষী ও তাঁদের গর্ভের ছয় পুত্রের কথা উল্লেখ আছে। জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভু পরবর্তীকালে সিংহাসনে বসেন। কনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের বিদ্যানুরাগ, নীতিপরায়ণতা ও শাস্ত্রানুশীলন ছিল জগদ্বিখ্যাত। অবশেষে সহোদর ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে সন্ন্যাসীর বেশে বিক্রমাদিত্য দেশান্তরে ভ্রমণ করতে লাগল।

উজ্জয়িনীবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কঠোর তপস্যা ও তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ফললাভের ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু এই ফললাভ ব্রাহ্মণীর কাছে অত্যন্ত কষ্টের মান হলো। কারণ অমরত্ব মানুষকে যন্ত্রণাভোগ করায়। অমরত্বে সুখের থেকে দুঃখ বেশি। এই সহজবাক্যের মাধ্যমে যেন নীতিবাক্য বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণের বক্তব্য 'আমার চৈতন্য হইল।'[২] প্রাচুর্য মানুষের মনে অসন্তোষ আনে এবং অতিরিক্ত বিলাসিতা মানবজীবনকে কলুষতি করে।

হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র সূচনা অংশটি অন্যরকম। প্রারম্ভিক পর্বে মূল পার্থক্য নগরের নামকরণে। এখানে ধারা নামক নগরের কথা উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণের বিশেষণ প্রয়োগে পার্থক্য লক্ষণীয়। হিন্দিতে বলা হয়েছে বিদ্বান ব্রাহ্মণ, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্যবহার করেছেন। প্রথমত যে সেখানে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিজীবনের দারিদ্র্য ও প্রচারবিমুখ অমায়িক বিনয়ী নিরহংকার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। উপক্রমণিকায় আমরা লক্ষ করব বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র আক্ষরিক অনুবাদে ছেদ ঘটেছে তার প্রমাণ চাণক্য শ্লোক। তিনি সেখানে প্রায় হুবহু চাণক্য শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করেছেন।

'অলসস্য কুতো বিদ্যা, অবিদস্য কুতো ধনম
অধনস্য কুতো মিত্রম অমিত্রস্য কুতো সুখম'[৩]

অর্থাৎ বিদ্যাসাগর বলেছেন অলসদের বিদ্যা হয় না, অবিদ্যাদের ধর্ম হয় না, ধনীদের মিত্র হয় না এবং মিত্রহীনদের সুখ হয় না।

বাংলা উপক্রমণিকা বা হিন্দি ভূমিকার পরেই গ্রন্থটি পঁচিশটি পর্বে বিভক্ত। এক্ষেত্রে দুই গ্রন্থের মূল তথ্য হল হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী' গ্রন্থে শিরোনামযুক্ত পর্বে বিভক্ত, কিন্তু বাংলা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' শুধুমাত্র সাংখ্যমূলক অধ্যায়ে বিভক্ত। হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী' গ্রন্থের প্রথম শিরোনামযুক্ত অধ্যায়টি 'বাস্তব মে দোষী কৌন' শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ের ক্ষেত্রে পাঠক পুরো গল্পের বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করতে পারেন। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে অধ্যায়ের পূর্ণপাঠের পরই গল্পের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম উপাখ্যানে বারাণসী নগরের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা লক্ষ করব অনুবাদে তিনি কাব্যিক অলংকারও ব্যবহার করেছেন। সেক্ষেত্রে গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর যেন কবি বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছেন। এই উপাখ্যানেই রাজকুমার ব্রজমুকুটের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন 'ব্রজমুকুট নামে হৃদয়বান নন্দন ছিল।'[৪] অর্থাৎ নন্দনের অনুপ্রাস লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই উপাখ্যানে যে উপমা ব্যবহার করেছেন তা হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র থেকে বিস্তর ফারাক। রাজকুমার ব্রজমুকুটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন কখনো কখনো তা যেন কালিদাসের বিবৃত কল্পনাকেও হার মানায়। সেক্ষেত্রে হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র ব্রজমুকুটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কাল্পনিক হলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বর্ণনা যেন পাঠকবর্গের চোখে এক অসামান্য সত্য বাস্তবের ছবি এঁকেছেন। হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র এই বর্ণনা অনেকাংশেই স্বাভাবিক বর্ণনামূলক। হিন্দি 'তালাব' শব্দের অর্থ 'পুকুর'। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় সরোবর এর অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন।

'বাস্তব মে দোষী কৌন?' এই শিরোনামে হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র প্রথম উপাখ্যানে বর্ণনা বিবৃতিটি মূলত ও মুখ্যত কাহিনিমূলক। পাঠক উপাখ্যানের আগাগোড়া পাঠ করে একটি উপদেশমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংখ্যামূলক শিরোনামে অর্থাৎ প্রতিটি উপাখ্যান পাঠ করে পাঠকবর্গ উপদেশমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 'বেতাল পচ্চীসী'র ভাষায় দ্বৈত অর্থ নেই, বেশির ভাগ অংশে লেখকের বর্ণনা হিন্দি ভাষ্যগদ্যে বর্ণিত হয়েছে। "রাজকুমার নে পুছা তুমহারে লিএ মিঠাই নহী ভেজ সকতী?"[৫] এখানে আক্ষরিক অর্থ মিঠাই শব্দের অর্থ মিষ্টিকেই বোঝায়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় মিঠাই, শব্দটিকে বাংলা সন্দেশ অর্থে ব্যবহার করেছেন। এখানে পাঠক মিষ্টি বা খবর অর্থ বুঝবেন তা বলাই বাহুল্য। যা নির্ভর করবে পাঠকের বোধগম্যতায়। 'বাস্তব মে দোষী কৌন' প্রথম উপাখ্যানটি বিবৃতিমূলক গল্প আখ্যান। এখানে রাজা রানী

মন্ত্রিপুত্র চরিত্রগুলির সাবলীলভাবে সংলাপ লক্ষণীয়। যেখানে বেতালের জিজ্ঞাসা ও উত্তর কৌতূহলোদ্দীপক। বেতাল বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করে ‘বোলে বিক্রম ....বোলো ! বাস্তব মে দোষী কৌন হ্যা?’[৬] এখানে যেহেতু শিরোনামযুক্ত উপাখ্যান তাই শিরোনাম দিয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। উপাখ্যানের সারমর্ম পাঠ করে নীতিকথা পাঠকবর্গ শিরোনাম থেকেই আন্দাজ করতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ প্রথম উপাখ্যানের শেষের দিকে পাঠকবর্গ নীতি উপদেশ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারেন। এই উপাখ্যানের শেষবাক্যটি এইরূপ “রাজাও, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণপূর্বক, স্কন্ধে করিয়া, সন্ন্যাসীর আশ্রম অভিমুখে চলিলেন।”[৭] ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যগগনে তৎসম ভাষার সৌকর্য্য এবং ‘বেতাল পচ্চীসী’র ভাষা শৈলীরও বিস্তর ফারাক লক্ষ করা যায়।

‘বেতাল পচ্চীসী’র দ্বিতীয় উপাখ্যান ‘মধুমালতী কিসকী পত্নী?’ শীর্ষক শিরোনামের সূচনাটি লক্ষণীয়। “উসী শ্মশান ঘাট পর পঁহুচকর বিক্রম নে বেতাল কো অপনে সাধুকে পাস চল দিয়া।”[৮] এই উপাখ্যানের প্রারম্ভিক পর্বটি সরল হিন্দি গদ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মহারাজকে সম্বোধন করে বেতাল বলেনি যে দ্বিতীয় উপাখ্যান আরম্ভ করার কথা। এখানে ধর্মস্থল নামক নগরীর উল্লেখ আছে। এখানে গুণাধীরা নামক রাজার উল্লেখ পাই। ত্রিবিক্রম, বামন ও মধুসূদন এই তিনজনের পত্নীলাভের কাহিনি বিবিধভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই উপাখ্যানের অর্থাৎ হিন্দি কাহিনির শেষাংশে বেতাল ও রাজার মধ্যে কথোপকথনটি তর্কমূলক তা লক্ষণীয়। উল্লেখ্য ‘রাজা নে জো তর্ক দিয়া উসকে আধার পর য়হ ফ্যাসলা তো স্বীকার করনা হী থা।’[৯]

হিন্দি দ্বিতীয় উপাখ্যানের শিরোনামটির দেখে পাঠকবর্গ উপাখ্যানটি পড়ে অন্য কোনো শিরোনামের কথা ভাবতে পারে না, কারণ শিরোনামটি উল্লিখিত ‘মধুমালতী কিসকী পত্নী?’ অর্থাৎ মধুমালতীর পতি কে ? বা মধুমালতী কার পত্নী হওয়ার যোগ্য? তা যে কোনো পাঠকের মনেই এই সঙ্গত প্রশ্নটি উঠবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিরোনামহীন দ্বিতীয় উপাখ্যানটি বেতালের সংলাপ দিয়ে শুরু হয়েছে। এখানে জয়স্থল নগরের কথা আছে। ত্রিবিক্রম বামন ও মধুসূদন এই তিনজনের পত্নীলাভের কাহিনিটি বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কোনো উপমার প্রয়োগ ছাড়ায় তিনি পাঠকের সুবিধার জন্য স্বল্প পরিসরে কাহিনির বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি পড়ে পাঠক তার নিজ মন মতো কোনো শিরোনাম ধার্য করতে পারে তা বলাই বাহুল্য। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় নাম সংখ্যক বা সংখ্যামূলক শিরোনাম কাহিনির বর্ণনা করেছেন।

‘কৌন বড়া বলিদানী’ শীর্ষক তৃতীয় উপাখ্যানটি শুরু হওয়ার আগে একটি বাহ্যিক পরিবেশ তথা স্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে এইভাবে “শ্মশান মে পহুঁচকর

বিক্রম নে বেতাল কো পুনঃ অপনে বশ মে কর লিয়া অউর অপনী পীঠ পর লাটকর সাধুকে পাস চল দিয়া।"[১০] এখানে পূর্ববর্তী কাহিনির সূত্র ধরেই পরবর্তী উপাখ্যানের শুরু হয়েছে। এখানে 'বলিদানী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা করেছেন ঔদার্য। বিক্রম ও বেতালের কথোপকথনের মধ্যেই 'বেতাল পচ্চীসী'তে উপাখ্যানটি শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ মূল গল্পটির বর্ণনার আগে কিছু অতিকথন আছে। কিছু উপদেশমূলক ও কিছু সচেতনতামূলক কথাবার্তা লক্ষণীয় "এক বাত অউর ধ্যান রাখনা কি যদি সহী উত্তর জানতে হুএ ভী তুমনে জবাব নহী দিয়া তো তুমহারা সির টুকরে টুকরে হো জায়েগা।"[১১] বর্ধমান নগরের রূপসেন রাজার বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে রাজা ছিলেন দয়াবান ও প্রজাপালক। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজার বিশেষণগুলি তথা রাজার গুণবত্তার পরিচয় দিয়েছেন আরো বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করে। যেমন অতি বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, দয়াশীল, পরম ধার্মিক। অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গায় বা বলা ভালো উপাখ্যানে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজস্ব ভাবনা চিন্তায় তথা অনুবাদকে কিছুটা দূরে রেখেই কাহিনির বর্ণনা করেছেন। রাজা রূপসেন ও দ্বারী তথা প্রজা বীরবল এই দুই চরিত্রকে সংলাপের মাধ্যমে একটি রসজ্ঞ জ্ঞাননিষ্ঠ গল্প তৈরি করেছেন। হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র এই উপাখ্যানে মূল গল্পের বিষয়বস্তুর তুলনায় আকারগত পরিসর অনেক বেশি। হিন্দি শব্দ বলিদানী অর্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় করেছেন 'ঔদার্য।' উপাখ্যানের শেষে হিন্দি গ্রন্থে কে সবচেয়ে বেশি বলিদানী এবং বাংলায় বিক্রমাদিত্যের উত্তর রাজার ঔদার্য বেশি। বলা বাহুল্য বিক্রমাদিত্য নিজে রাজা তাই হয়তো এই মানসিক বোধ কাজ করেছে। এবং রাজার গুণ যেহেতু দয়াশীল তাই হয়তো বিদ্যাসাগর মহাশয় ঔদার্য শব্দ ব্যবহার করেছেন।

'বেতাল পচ্চীসী'র চতুর্থ উপাখ্যান 'কৌন সব সে বড়া পাপী?' শীর্ষক গল্পে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মূল গল্প শুরু হওয়ার আগে বিক্রম ও বেতালের কিন্তু কথোপকথন লক্ষণীয়। বেতাল বলেছে "এক বাত অউর ধ্যান রাখনা কি যদি সহী উত্তর জানতে হুএ ভী তুমনে জবাব ন দিয়া তো তুমহারা সির টুকড়ে টুকড়ে হো জাএগা।"[১২] হিন্দি উপাখ্যানে ভোগবক্তা নগরের কথা চূড়ামণি নামে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন এক 'সর্বগুণাকর শুকপক্ষী'; কিন্তু হিন্দি উপাখ্যানে আছে চূড়ামণি নামক এক তোতা।

অনঙ্গসেন নামর রাজার রাজ্য ভোগবতী এবং মগধদেশের রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামক কন্যা হিন্দি গল্পে দুই রাজার নাম উহ্য আছে। হিন্দি গ্রন্থে ব্যক্তিনামের বিশেষণগুলি বাংলা গ্রন্থের তুলনায় কম। যেমন বীরসেনের কন্যা চন্দ্রাবতীর বিশেষণ বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন 'সে পরমা সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী' চন্দ্রবতীর কাছে মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকত। উল্লেখ্য চন্দ্রাবতীর শারীরিক সৌন্দর্য ও কামদেব মদনের নামানুসারে শারিকার নামকরণ মদনমঞ্জরী এই দুইয়ের মিলও লক্ষণীয়।

নারীদের জন্য বিদ্যাসাগরের মহানুভবতা উপাখ্যানের বিভিন্ন জায়গায় বিবিধ বিবরণে আমরা দেখতে পাবো। শূক ও শারিকার একটি কথোপকথন লক্ষণীয়।

"শারিকা কহিল, পুরুষজাতি অতিশয় শঠ, অধর্মী, স্বার্থপর ও স্ত্রীহত্যাকারী; এজন্য পুরুষসহবাসে আমার রুচি হয় না!"[১৪]

"শুক কহিল, নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাসিনী ও পুরুষঘাতিনী।"[১৫]

হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র চতুর্থ উপাখ্যানের মহাধন নামক শ্রেষ্টীর কথা আছে, কিন্তু তার ঐশ্বর্যশালীর বিষয় বা তাঁর সন্তান প্রসবের বিষয়ে কিছু বলা নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাধনের ঐশ্বর্যশালীর কথা বলেছেন এবং তাঁর সহধর্মিনীর সন্তান প্রসবের মনোকষ্টের কথা উল্লেখ আছে। আমরা লক্ষ করব বিদ্যাসাগর মহাশয় অধিকাংশ গল্পে নারী বিষয়ক ভাবনা চিন্তা স্বকপোলকল্পিত। যেগুলি মূল হিন্দি গ্রন্থে নেই অর্থাৎ নারী হৃদয়ের যন্ত্রণা এবং নারীর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি সেখানে নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীদের সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও অনুভূতিগুলি একাত্ম হয়ে নিজে অনুভব করতেন যেগুলি তার উপাখ্যান বর্ণনায় আমরা লক্ষ করি।

'যম জামাই ভাগ্নে তিন না হয় আপনে' এই প্রবাদ আমরা জানি, এই প্রবাদের প্রতিফলন আমরা চতুর্থ উপাখ্যানে লক্ষ করব। শ্রেষ্টিনী যখন স্বামীর সঙ্গে কথা বলে তখন বলে "তুমি কি জান না, জন, জামাই ভাগিনেয় এ তিন কোনো কালে আপন হয় না ও তাহাদের ওপর বলপ্রকাশ চলে না। জামাতা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই সর্বাংশে কর্তব্য।" কিন্তু হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ নেই। এগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব সংযোজন।

উপাখ্যানের প্রায় শেষাংশে জয়শ্রীর বক্তব্য লক্ষণীয়। নারী ধৈর্যশীলা, সহলশীলা, পাতিব্রত্য প্রভৃতি গুণের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন। এটি সংযোজন, কিন্তু হিন্দি উপাখ্যানের হুবহু অনুবাদ যে অংশটি বিদ্যাসাগর মহাশয় করেছেন সেটি হল এইরূপ ".....মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেবতারাও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না।"[১৬] লক্ষণীয় হিন্দি উপাখ্যানে পুরুষের ভাগ্যের কথা বলা নেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীদের নঞর্থক দিকের হুবহু অনুবাদ করেছেন সেই সঙ্গে পুরুষের ভাগ্যের কথাও বলেছেন। বলা বাহুল্য এখানে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীলতার পরিচয় পাই।

'কৌন বনা পতি?' হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র পঞ্চম উপাখ্যানে প্রারম্ভিক কিছু অতি বর্ণন আছে যেগুলি বাংলা পঞ্চম উপাখ্যানে নেই। মূল কাহিনিতে প্রবেশের আগে একটি প্রাককথন আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেতালের বক্তব্য দিয়ে পঞ্চম উপাখ্যান শুরু করেছেন।

হিন্দি উপাখ্যানে উজ্জয়িনী নগরের কথা বলা আছে। হরিদাস নামক বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও মহাবলী রাজার উল্লেখ পাই। উপাখ্যানটিতে এই বর্ণনা একটি নাতিদীয় অনুচ্ছেদ নিয়ে করা

হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই বর্ণনা উপাখ্যানের প্রারম্ভিক একটি পংক্তিতে করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য "ধারা নগরে মহাবল নামে, পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার দূতের নাম হরিদাস।"[১৭] লক্ষণীয় এখানে ধারা নগরীর কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উজ্জয়িনী একট প্রাচীন শহর এবং ধারা নামক একটি অন্য শহর যেটি ধারানগর নামে প্রসিদ্ধ। দুই গ্রন্থের দুটি শহরই বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সভায় হরিদাস যখন কলিযুগের পরিস্থিতি তথা কলিযুগ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বর্ণনা করছেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত গ্রন্থ চাণক্য শ্লোকের উদ্ধৃতির প্রায় হুবহু অনুবাদ করেছেন। হরিদাস বলেছেন 'লোক মুখে মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ কপটতা।' চাণক্য শ্লোকে উল্লিখিত —

"দুর্জন প্রিয়বাদী নৈত্যৎ বিশ্বাসকারণম
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম"[১৮]

হরিদাস কন্যা মহাদেবীর জন্য তিনটি পাত্র পাত্রের সন্ধান করেন। তিনজনের গুণবত্তার পরিচয় হিন্দি ও বাংলা গ্রন্থে বেশ কিছুটা ফারাক লক্ষণীয়। পরিশেষে দেখব বিক্রমাদিত্যের পছন্দনানুযায়ী রাক্ষস সংহারকই মহাদেবীর যোগ্য পতি হবে কারণ সে সর্বগুণে অলংকৃত। এই পতি দ্বিতীয় জন কিন্তু হিন্দি গ্রন্থে প্রথম জন সেই পতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'রাজকুমারী কী দুবিধা' নামক 'বেতাল পচ্চীসী'র ষষ্ঠ উপাখ্যানে ধর্মপুর নগরের ধর্মশীল নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। এখানে মন্ত্রীর নাম বলা হয়নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্ত্রীর নাম বলেছেন অন্ধক। এখানে দুটি গল্প একত্র করা হয়েছে। কাত্যায়নী মন্দিরে ভক্তের আকুল আর্তির ফলে রাজা ধর্মশীল ও দীনদাস নামক তন্তুবায়ের নিজ নিজ মনোস্কামনার কথা বলা হয়েছে। রাজা ধর্মশীলের কাহিনি, এখানে বন্ধ্যা পত্নীর পুত্রলাভ ও তন্তুবায় দীনদাসের গল্প অর্থাৎ স্ত্রীলাভ করে প্রাণদান ও পুনরায় স্ত্রীলাভ যা সত্যিই চমকপ্রদ। কিন্তু হিন্দি গ্রন্থে ষষ্ঠ উপাখ্যানের শিরোনামটি লক্ষণীয়। 'রাজকুমারী কি দুবিধা' হিন্দি শিরোনামে যেন মনে হয় গল্পটির বা সামগ্রিক উপাখ্যানের খন্ড নাম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম গল্পটি যেটি রাজা ধর্মশীলের পুত্রলাভ প্রসঙ্গ সেটি অন্য একটি শিরোনাম বা সম্পূর্ণ অন্য একটি গল্প হতে পারতো। পরবর্তী তন্তুবায় দীনদাসের গল্পটি অন্য একটি উপাখ্যান হতে পারতো।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন সাংখ্যমূলক উপাখ্যান বেতাল পঞ্চবিংশতিকে বিভক্ত করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট শিরোনাম দিয়ে উপাখ্যানগুলি রচনা করেননি। আমরা লক্ষ করব বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত চাণক্য একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন রূপের পিছনে নয়, বরং গুণই আসল।

"রূপযৌবনাসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবা।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকা"[১৯]

অর্থাৎ বিদ্যাহীন ব্যক্তি পলাশফুলের ন্যায় বাহ্যিকভাবে সুন্দর কিন্তু গুণহীনা। আমরা

উপাখ্যানটির শেষাংশে লক্ষ করব বেতাল বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করলে বিক্রম উত্তর দেয় তন্তুবায় দীনদাসই কন্যার স্বামী হবার উপযুক্ত। এটি বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করেছেন। কিন্তু মূল হিন্দি গ্রন্থে দীনদাসের বন্ধুককেই কন্যাটির যোগ্য স্বামী বিবেচনা করা হয়েছে।

'কৌন সবসে অধিক গুণবান' হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র সপ্তম উপাখ্যানে চম্পা নগরের চম্পকেশ্বর রাজা ও ত্রিভুবন নামক কন্যার কথা উল্লেখ আছে। গল্পের প্রারম্ভিক বর্ণনায় নামের ক্ষেত্রে আমরা কিছু পার্থক্য দেখব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সপ্তম উপাখ্যানের সঙ্গে। রাজার নামকরণ ও রাজার কন্যার নামকরণের পার্থক্যটা লক্ষণীয়। চম্পকেশ্বর রাজা ও ত্রিভুবন নামক কন্যার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দুই চরিত্রের নামকরণে বদল ঘটিয়েছেন। চন্দ্রাপীড় রাজা ও ত্রিভুবনসুন্দরী কন্যা বিদ্যাসাগর মহাশয় চরিত্রদুটিকে অন্যনামে পরিবেশিত করেছেন। এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় চঞ্চল চিত্ত, জীবন যৌবনের প্রসঙ্গ এনেছেন। এখানে তিনি সংস্কৃত শ্লোকের প্রায় অনুসরণে বলেছেন

"..... রূপলাবণ্যের মাধুরী দর্শনে, মুনিজনেরও মন মোহিত হয়।"[২০]

শ্লোকটি এইরূপ —

"চলচিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য সঃ জীবতি"[২১]

হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী'র গ্রন্থে এই রূপলাবণ্যের কোনো প্রসঙ্গ নেই। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠকের প্রয়োজনে উপদেশমূলক শ্লোকের ব্যাখ্যার ত্রিভুবনের ইচ্ছানুযায়ী যথার্থ পতি শুধুমাত্র বুদ্ধি ও বিক্রমকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিক্রম এই তিন অসাধারণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ত্রিভুবনসুন্দরী পতি হিসেবে গ্রহণ করবেন। চারজন পাত্রের সন্ধান পাওয়ার পর বিদ্যাচর্চামুখী বিদ্বান পন্ডিত শাস্ত্রবাদী একজন সুপুরুষ পাওয়া গেল। এখানেও বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ ব্যক্তির শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা বিষয়ে এক সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন -

"শস্ত্র শাস্ত্রশ্চ দ্বে বিদ্যে প্রতিপত্তয়ে।
আদ্যা হাস্যতে দ্বিতীয়াদ্রয়ে সদা"[২২]

অর্থাৎ শস্ত্র অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র এবং শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রবিদ্যা জানা। এখানে প্রথমটি বয়সকালে হাসির পাত্র হয় কিন্তু শাস্ত্রবিদ্যা সবসময় আদরণীয়।

'রাজা অউর সেবক' নামক 'বেতাল পচ্চীসী'র অষ্টম উপাখ্যানে প্রথমে বেতালের বক্তব্য ও কাহিনির পূর্বভাগ দেওয়া হয়েছে। পাঠককে কিছু বর্ণনা দেওয়ার পর মূল কাহিনিতে প্রবেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য হিন্দি গ্রন্থে মিথিলা নগরের রাজা ও এক যুবকের নামের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থের চরিত্র নামের পরিবর্তন লক্ষণীয়। হিন্দি গ্রন্থে গুণধীশ নামক রাজার ও চিরমদের নামক এক যুবকের উল্লেখ পাই। গুণাধীশ শব্দটি গুণ অধীশ অর্থে

এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় গুণ অধিপ অর্থে গুণাধিপ নামক রাজার উল্লেখ করেছেন। এবং দক্ষিণদেশের রাজপুত্র চিরঞ্জীবের নামটি পাই।

কাহিনি বর্ণনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের দারিদ্র্য যেন কাহিনির মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে চলে এসেছে। যেমন "ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী.... আশার দাসত্বস্বীকার করিলেই নিঃসন্দেহে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।"[২৩] চিরঞ্জীবের এ বক্তব্য হিন্দি গ্রন্থে পাই না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই উপাখ্যান বেশিরভাগ অংশই নিজস্ব ভাবনা চিন্তা। মূল গ্রন্থ থেকে কম অংশই নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাক্য গঠনে ধ্বন্যুক্তি ব্যবহার করেছেন। রাজা গুণাধিপ ও চিরঞ্জীবের কথোপকথনে আমরা লক্ষ করব। 'সতত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।'[২৪] পরিশেষে বেতাল ও বিক্রমাদিত্যের সংলাপে বুঝতে পারি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানসিকতার তফাৎ তথা তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রভাব হয়তো বা। দয়ার সাগর যিনি তিনি দান ও দয়াকেই অগ্রাধিকার দেবেন তা বলাই বাহুল্য। রাজা এবং সেবক কার ঔদার্য বেশি সেখানে সেবক চিরঞ্জীবের ঔদার্য বেশি বলা হয়েছে, কারণ চিরঞ্জীব ফল, জল ও আশ্রয়দানের মাধ্যমে রাজার উপকার করেছিল। আমরা লক্ষ করব বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে মূল হিন্দি গ্রন্থ থেকে কিছুটা সরে গিয়েছেন এবং যুক্তি দিয়ে চিরঞ্জীবের সৌজন্য ও ঔদার্য্যকে বড় করেছেন।

'কৌন সবসে বড়া ত্যাগী?' নামক 'বেতাল পচ্চীসী'র নবম উপন্যাসটি বাংলা উপাখ্যানের সঙ্গে মূল তফাৎ আয়তন বা আকারে। বিষয়বস্তুতে বাহ্যিক দুইয়ের মিল লক্ষণীয়। হিন্দি উপাখ্যানে মদনপুর নগর ও দীব্যদত্ত নামক বণিকের কথা আছে। কাহিনির বর্ণনা হিন্দি গ্রন্থে অতিরঞ্জিত তা যে কোনো পাঠকই মনে করবেন। বাংলা উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয় মূল কাহিনিটি হিন্দি গল্প থেকে নিয়ে কিছু চরিত্রের নাম বদল করেছেন। এমনকি স্থানের নামও পরিবর্তন করেছেন। হিন্দির মদনপুর বাংলায় হয়েছে মগধপুর এবং দীব্যদত্ত বণিকের নাম হয়েছে হিরণ্যদত্ত। হিন্দি গ্রন্থের এই মূল কাহিনিটি চরিত্রগুলি গুণাবলী তথা পারিপার্শ্বিক কিছু দিক নিয়ে অতিরিক্ত বিরত করা হয়েছে।

উপাখ্যানে ত্যাগী বিষয়ক নীতিকথায় উপনীত হয়েছেন বিদ্যসাগর মহাশয়। হিন্দি উপাখ্যান রাজার নাম নেই, শুধু নগরের নাম মদনপুর আছে। বাংলায় মগধপুর নগরের বীরবর নামক রাজার উল্লেখ আছে। রাজা বীরবর, বণিক হিরণ্যদত্ত, বণিকের কন্যা মদনসেনা, ধর্মদত্তের পুত্র সোমদত্ত ও একজন চোর এই পাঁচজনের জীবনে ঘটে যাওয়া ক্ষু ঘটনা থেকে পাঠক বুঝতে পারবে কে সর্ববৃহৎ ত্যাগী ? উপাখ্যানের শেষে বেতাল ও বিক্রমের কথোপকথনে হিন্দি ও বাংলা গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। লালসা মানুষের মনকে কলুষিত করে এবং সংযম মানুষের মনকে উর্ধগতি দান করে তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই গল্প

ব্যাখ্যা ও তাঁর নিজস্ব অভিমত দেখলেই বোঝা যায়। এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাণক্য শ্লোকের হুবহু একটি অনুবাদ চোরের মুখে বসিয়েছেন অলংকারে ভূষিতা সোমদত্ত ও চোরের কথোপকথনে তা স্পষ্ট।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেসু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পন্ডিতঃ"[২৫]

অর্থাৎ এখানে চোর সোমদত্তকে পরস্ত্রীকে নিজ মাতৃসুলভ মনে করেছে। এই সংযোজনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদের নতুনত্ব।

"সবসে লাজুক কৌন" হিন্দি উপাখ্যানে এই গল্পের চরিত্রগুলি বাংলা উপাখ্যানের থেকে সংখ্যায় কম। এক্ষেত্রে বাংলা কাহিনির বর্ণনা বেশি। বাংলা গ্রন্থে গৌড়দেশে বর্ধমান নগরের কথা আছে এবং নগরের বিবরণ দেওয়া আছে। গুণশেখর রাজার কথা এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অভয়চন্দ্রের (প্রধান অমাত্য) কথা উল্লেখ আছে। রাজ্যের মধ্যে রাজার মনোপুত্র না হওয়া কিছু বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। রাজার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং শৈব-বৈষ্ণব ধর্ম বর্জন এই বিষয়টি লক্ষণীয়। হিন্দি গ্রন্থে শুধুমাত্র শিবপূজা বর্জনের কথা বলা হয়েছে। হিন্দি গ্রন্থে কিছু বদল লক্ষণীয়। রাজার নাম ধর্মরাজ, গৌড়দেশের বিস্তৃত উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র বর্ধমান নগরের কথা আছে। আমরা লক্ষ করব বাংলা উপাখ্যানের আকার বা বিস্তৃতি হিন্দি উপাখ্যানের তুলনায় বেশি।

হিন্দি উপাখ্যানে পন্ডিত জগতরাম নামক এক পূজারী ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নামটিকে পদবীসহ আলাদা করেছেন। জগৎ রাম নামক পূজারীর উল্লেখ পাই। লক্ষণীয় রাম পদবীটি তপশিলী জাতিভুক্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয় অস্পৃশ্যতা ও দারিদ্র্য দূরকরণেরও পথিকৃৎ ছিলেন তাই ব্রাহ্মণ অথচ নামটি রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর শব্দ ব্যবহারের অভিনবত্ব। উপাখ্যানের শেষে বেতাল ও বিক্রম কথোপকথনের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে সেখানেও বিদ্যাসাগর মহাশয় হুবহু অনুবাদ না করে নূতনত্ব দেখিয়েছেন। বেতালের প্রশ্নে বিক্রম বলেন কে বা কোন রমণী সর্বাধিক সুকুমার প্রবৃত্তিমনা ? এর উত্তর হিন্দি গ্রন্থের সঙ্গে বাংলা গ্রন্থের তফাৎ লক্ষণীয়। "রাজা কহিলেন, সুধাকরকরস্পর্শে যে রাজমহিষীর দেহ দগ্ধ হইল, আমার মতে সেই সর্বাপেক্ষা সুকুমারী।"[২৬] অর্থাৎ এই মানসিকতা বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন সমাজচিত্র থেকে তথা তৎকালীন নারী হৃদয়ের না বলা কথাকে অনুভব করেই রাজমুখে এই সিদ্ধান্ত বসিয়েছেন।

'কিস বাত কা দুখ অধিক?' হিন্দি উপাখ্যানে এই কাহিনিটি তিনটি বিচ্ছিন্ন গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলায় মূলত দুটি গল্পের মাধ্যমেই বিদ্যাসাগর মহাশয় একাদশতম উপাখ্যানটি রচনা করেছেন। শুরুতেই রাজ্য ও রাজার নাম দুই দুই ভাষার উপাখ্যানে পরিবর্তিত। হিন্দি উপাখ্যানে অবধ রাজ্য ও শ্রীবল্লভ নামক রাজার উল্লেখ পাই। বাংলায়

পুণ্যপুর রাজ্য ও বল্লভ নামক রাজার উল্লেখ পাই। রাজার বৈরাগ্যদশা বা বিলাসিতাহীন মনোভাব বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি বাক্যে প্রকাশ করেছেন। “যে ব্যক্তি রাজ্যেশ্বর হইয়া অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগ না করে তাহার রাজ্য ক্লেশপ্রপঞ্চ মাত্র।”[২৭]

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন সুখ দুঃখের চক্রাকার পরিবর্তনের কথা। যা আমাদের চাণক্য শ্লোককে মনে করিয়ে দেয় —

“দুঃখমাপতিতং সেব্যং সুখমাপতিত্যং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি”[২৮]

হিন্দি উপাখ্যান থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধুমাত্র মূল কাহিনিটি নিয়েছেন। বাকি বর্ণনা তৎকালীন সময়োপযোগী তথা পাঠকের কথা মাথায় রেখে তিনি কাহিনির বর্ণনা করেছেন। রাজা বল্লভ ও তাঁর অমাত্য সত্যপ্রকাশের কথোপকথনে রাজা বৈষয়িক সম্পত্তি, বাহ্যিক সুখ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছেন। কিন্তু হিন্দি উপাখ্যানে এই ত্যাগের কথা বলা হয়নি। রাজার স্বেচ্ছায় সত্যপ্রকাশকে রাজ্যভার অর্পণ করার কথা বলা হয়েছে। সত্যপ্রকাশের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা এবং সেই বর্ণনা শুনে রাজা বল্লভের মনে রত্নমঞ্জরী নামে গন্ধর্বরাজের কন্যাকে মহধর্মিনী হিসেবে লাভ করার ইচ্ছা জন্মায়। এই দুটি কাহিনি ভিন্ন অনুচ্ছেদে বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণনা করেছেন।

উপাখ্যানের উপসংহারে দুইভাষী গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। অনূদিত উপাখ্যানে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রজার একাকীর ও অনাথ হবার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হিন্দি উপাখ্যানে শুধু মনের বেদনা বা বাহ্যিক মনোকষ্টকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিনবত্ব এই মৌলিক ভাবনা চিন্তায় যা মূল অনুবাদ থেকে অনেকখানি আলাদা।

‘পাপী কৌন’ হিন্দি উপাখ্যানটি একটি গল্প অবলম্বনে রচিত। কিন্তু বাংলা দ্বাদশ উপাখ্যানটি দুটি ভিন্ন গল্প অবলম্বনে রচিত। যদিও হিন্দি উপাখ্যানটির ক্ষুদ্র অংশ বিদ্যাসাগর মহাশয় হয়তো তৎকালীন পাঠকের প্রয়োজনে বা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রয়োজনে বিবৃত করেছেন। স্থান নামটি, ব্রাহ্মণের নাম ও কিছু চরিত্র নাম বাংলা উপাখ্যআনে পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দি গল্পে দেবীস্বামী ব্রাহ্মণের কথা, দেবগড় নামক নগর, দেবীস্বামীর পুত্র হরিস্বামী এবং হরিস্বামীর স্ত্রী নাম না করা নবযুবতীর কথা বলা আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থান নাম ও সব চরিত্রের নামও পরিবর্তন করেছেন। চূড়াপুর নামক নগর, দেবস্বামী নামক ব্রাহ্মণ উল্লেখ্য এখানে তাঁর পুত্রের কথা বলা নেই। এখানে দেবস্বামীর বিয়ে এবং তার স্ত্রী লাবণ্যবতীর নাম অভিনব।

হিন্দি উপাখ্যানে গল্পের বিবরণ এবং বিস্তৃতি একটিমাত্র গল্পকে কেন্দ্র করেই রচিত। কিন্তু বাংলা উপাখ্যানটি মূলত দুটি কাহিনি অবলম্বনে রচিত। প্রথমটি দেবস্বামী ও লাবণ্যবতীর

প্রেম ও দ্বিতীয়টি অজ্ঞানতাবশত বিষপান করিয়ে ব্রহ্মহত্যা। ব্রাহ্মণ স্বামীর কয়েকটি বিশেষণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যবহার করেছেন। দেবস্বামী ব্রাহ্মণের 'রূপে রতিপতি, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন।'[২৯]

উপাখ্যানের শেষে বেতাল ও বিক্রমের কথোপকথনে দুই গ্রন্থের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। হিন্দি উপাখ্যানে 'পাপী কৌন?' এই প্রশ্নের উত্তরে বিক্রমাদিত্য ব্যাখ্যা না দিয়ে গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে পাপী বলেছেন। কিন্তু বাংলা উপাখ্যানে 'পাপী' শব্দের বদলে দোষী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বেতালের প্রশ্নে বিক্রম যে উত্তর দিয়েছে তা ব্যাখ্যাসহ। গৃহস্ত ব্রাহ্মণ যে আনুমানিক ভাবনায় ব্রাহ্মণীকে গৃহছাড়া করলেন তা বলে বিক্রম দোষী প্রমাণ করেছে। বাংলা উপাখ্যানে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন পাঠকের কথা ভেবে উপাখ্যানের শেষাংশে ব্যাখ্যা সহ বিক্রম বেতালের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

'পহলে হঁসা, ফির রোয়া কিউ?' 'বেতাল পচ্চীসী'র ত্রয়োদশ উপাখ্যানের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র অনুবাদগত কিছু ফারাক লক্ষণীয়। প্রারম্ভিক পর্বে নামগত ফারাক দেখব হিন্দি গল্প রাজার নাম নরবীর, কিন্তু বাংলায় বিদ্যাসাগর মহাশয় করেছেন রণধীর। যদি চন্দ্রহৃদয় নগরের নাম একই আছে। নগরে চৌর্য্যবৃত্তির রাড়বাড়ন্তের কথা বলা আছে। এর ফলে প্রজাদের দুঃখ কষ্ট এবং রাজার তদারকির দ্বারা সমাধান সূত্র এই দুধরনের গল্প দুটি ভাষায় আমরা পাই।

দুইভাষী দুটি গ্রন্থের মধ্যে মিল ও অমিল দুইই লক্ষণীয়। মূল হিন্দি গ্রন্থ 'বেতাল পচ্চীসী'র পঁচিশটি শিরোনামসহ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থে সংখ্যামূলক পঁচিশটি উপাখ্যানে বিদ্যাসাগর কোনোটি উপাখ্যানই হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। যে উপাখ্যানে যতটা পরিমাণ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর গ্রন্থে পরিবর্তন করেছেন বা অনুবাদ করেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম। সমস্ত সহৃদয় রসিক পাঠক মাত্রই বুঝবেন যে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটি অনূদিত গ্রন্থ হলেও তা মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে পড়া তা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র :

১. সম্পাদক- গোপাল হালদার ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৪
২. তদেব, পৃ. ৫
৩. অনুবাদ — প্রদ্যুত ওঝা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, চাণক্য শ্লোক সুত্র, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৮

৪. সম্পাদক- গোপাল হালদার ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ১২
৫. গিরীশ মোহন, বেতাল পচ্চীসী, মহামায়া পাবলিকেশন, জলন্ধর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ১৯
৬. তদেব, পৃ. ২৩
৭. প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ২০
৮. গিরীশ মোহন, বেতাল পচ্চীসী, মহামায়া পাবলিকেশন, জলন্ধর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ২৪
৯. তদেব, পৃ. ২৮
১০. তদেব, পৃ. ২৯
১১. তদেব, পৃ. ৩০
১২. তদেব, পৃ. ৩৪
১৩. সম্পাদক- গোপাল হালদার ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ২৪
১৪. তদেব, পৃ. ২৫
১৫. তদেব, পৃ. ২৫
১৬. তদেব, পৃ. ৩২
১৭. তদেব, পৃ. ৩৩
১৮. অনুবাদ — প্রদ্যুত ওঝা, চাণক্য শ্লোক সুত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৮৯,পৃ. ২৪
১৯. তদেব, পৃ. ২৬
২০. প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ২৮
২১. অনুবাদ — প্রদ্যুত ওঝা, চাণক্য শ্লোক সুত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৩৮
২২. তদেব, পৃ. ৪০
২৩. সম্পাদক- গোপাল হালদার ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৩৯
২৪. তদেব, পৃ. ৪০
২৫. অনুবাদ — প্রদ্যুত ওঝা, চাণক্য শ্লোক সুত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৪
২৬. প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ৩৮
২৭. তদেব, পৃ. ৪২
২৮. অনুবাদ — প্রদ্যুত ওঝা, চাণক্য শ্লোক সুত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৬০
২৯. সম্পাদক- গোপাল হালদার ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৪৭

প্রকৃতি রায়

জীবনানন্দ চর্চার সেকাল-একাল : নির্জনতা থেকে বিশ্বজনীনতায় উত্তরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী যুগে বাংলা কবিতা যখন এক বিশাল ছায়ার নিচে থমকে ছিল, তখন তিরিশের দশকের পাঁচ কবি আধুনিকতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ছিলেন সবচেয়ে স্বতন্ত্র এবং রহস্যময়। তাঁর চিত্রকল্প, শব্দচয়ন এবং চেতনার সমকালকে চমকে দিয়েছিল। জীবনানন্দ চর্চাকে বুঝতে হলে আমাদের দুটি সুনির্দিষ্ট কালখণ্ডকে বিশ্লেষণ করতে হয়: প্রথমটি কবির জীবদ্দশা (সেকাল) এবং দ্বিতীয়টি তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বর্তমান সময় (একাল)। এই দুই কালের মধ্যে জীবনানন্দ কেবল একজন কবি থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন।

অবহেলা, ব্যঙ্গ ও সীমাবদ্ধতা (১৯৩০-১৯৫৪) জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর সাহিত্যিক গ্রহণযোগ্যাতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। সমকালীন সাহিত্যিক সমাজ তাঁকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল।

সজনীকান্ত ও ‘শনিবারের চিঠি’র আক্রমণ জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যজীবনের এক বড় অধ্যায় জুড়ে আছে সজনিকান্ত দাস এবং তাঁর সম্পাদিত ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার তীব্র ও বিরামহীন আক্রমণ। এই আক্রমণ কেবল সাহিত্যিক সমালোচনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যক্তিগত কুৎসা ও বিদ্রূপের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

সজনিকান্ত দাস ছিলেন মূলত রবীন্দ্র-পরবর্তী কল্লোল যুগের আধুনিকতার বিরোধী। জীবনানন্দের কবিতার যে আধুনিক ভাষা, বিশেষ করে তাঁর চিত্রকল্প এবং শব্দচয়নতা সজনিকান্তের কাছে ছিল ‘অস্পষ্ট’, ‘অর্থহীন’ এবং ‘অশ্লীল’। জীবনানন্দের বিখ্যাত ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন সজনিকান্ত সেটিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেন। তাঁর মতে, কবিতায় “ঘাইহরিণী” বা শিকারের এই রূপক ছিল কুরুচিপূর্ণ। এই আক্রমণের কারণেই জীবনানন্দকে সিটি কলেজের অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

‘শনিবারের চিঠি’তে জীবনানন্দের কবিতাকে ব্যঙ্গ করে প্যারোডি বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখা হতো। বিশেষ করে জীবনানন্দের উপমাযেমন “শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা” বা “উটপাখির মতো ঘাড় বাঁকানো” সজনিকান্তের কাছে হাস্যকর মনে হতো। তিনি মনে করতেন, জীবনানন্দ সচেতনভাবে বাংলা ভাষাকে বিকৃত করছেন।

বুদ্ধদেব বসু ও ‘নির্জনতম কবি’ অভিধা বুদ্ধদেব বসুর মতে জীবনানন্দ দাশের কাব্যকৃতি প্রধানত ইন্দ্রিয়বোধের অতুলনীয় আনুগত্য ও রূপদক্ষতায় ভাস্বর, যেখানে দুটি পরস্পরপূরক ধারা বহমান। একদিকে রয়েছে নিছক ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বর্ণনাধর্মী অনুষঙ্গময় নস্টালজিক

কবিতা, আর অন্যদিকে রয়েছে মননশীল ও প্রজ্ঞাদীপ্ত সৃষ্টি যেখানে কবির আবেগ জাগতিক প্রতিরূপের মাধ্যমে জীবনের গভীরতর সত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের কবিতাকে আলোর বিন্যাস অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করেছেনকোথাও সন্ধ্যার মায়াবী কুয়াশা ও ছায়াঘন গাঢ়তা প্রধান, কোথাও আলোর উজ্জ্বল ও প্রবল প্রকাশ ভোরের সংকেত দেয়, আবার কোথাও আলো ও অন্ধকার এক বিচিত্র দ্বন্দ্বে লীন হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে "বোধ" কবিতাটি কবির স্বগতোক্তি যেখানে কবি নিজের সৃষ্টির নতুনত্ব ও একাকীত্বের মুদ্রাদোষ সম্পর্কে সচেতন, আর "ক্যাম্পে" বা "আট বছর আগের একদিন"-এর মতো কবিতাগুলোতে মানুষের ঘুম ও জাগরণের দ্বান্দ্বিকতা এবং মানবিক প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু আরও লক্ষ্য করেছেন যে জীবনানন্দের কবিতায় শেলি, কীটস বা ইয়েটসের প্রভাব থাকলেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্ভুল এবং "হায় চিল" বা "সমারূঢ়"র মতো কবিতায় তিনি বিশ্বসাহিত্যের সমান্তরাল ভাবকেও অতিক্রম করে গেছেন। পরিশেষে, জীবনানন্দের বিদ্রূপের শক্তি এবং অতিবাস্তব মায়ালোকের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে এই কবি মৃত্যুকে দলিত করে জীবনের এক গম্ভীর জয়গান প্রচার করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে তাঁকে এক অনন্য ও প্রাণতপ্ত উচ্চতা দান করেছে। অবশ্য সেকালেই বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের অসামান্য প্রতিভাকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি তাঁকে 'নির্জনতম কবি' বলে অভিহিত করেন। যদিও এই অভিধাটি জীবনানন্দের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু এর ফলে একটি ভুল ধারণারও জন্ম হয়েছিল যে জীবনানন্দ কেবল প্রকৃতি আর নির্জনতার কবি, তাঁর সঙ্গে সমকালীন রাজনীতি বা ইতিহাসের কোনো যোগ নেই। এই খণ্ডিত পাঠ সেকালের চর্চাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।

তথাকথিত দুর্বোধ্যতা রবীন্দ্র-উত্তর পাঠকদের কাছে জীবনানন্দের ভাষা ছিল গোলমেলে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'বনলতা সেন'-এর জাদুকরী অন্ধকারকে সাধারণ পাঠক সেভাবে ধারণ করতে পারেনি। জীবনানন্দ নিজে তাঁর 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে এই দুর্বোধ্যতার জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও সমকালের সংশয় পুরোপুরি কাটেনি।

১৯৫৪ সালে ট্রাম দুর্ঘটনায় কবির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর উদ্ধার হয় পাণ্ডুলিপির জাদুকরী বাক্স: কবির ঘরে রাখা ট্রাঙ্ক থেকে একের পর এক বের হতে থাকে গল্প ও উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। দেখা যায়, যে মানুষটি সারা জীবন কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনি আড়ালে লিখে গেছেন বিপুল পরিমাণ গদ্য। এই গল্প ও উপন্যাসগুলো প্রকাশের পর পাঠকরা স্তম্ভিত হয়ে যান। কবিতার মায়াবী জগতের বাইরে তাঁর গদ্য ছিল নিরেট বাস্তববাদী, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অতি-বাস্তববাদী ও নিষ্ঠুর। ট্রাঙ্কভর্তি কয়েক হাজার পৃষ্ঠার বিশৃঙ্খল পাণ্ডুলিপি উদ্ধার ও প্রকাশের ইতিহাস মূলত ভূমেন্দ্র গুহ, দেবেশ রায় এবং গৌতম মিত্রের এক দীর্ঘ ও নিষ্ঠাপূর্ণ লড়াইয়ের গল্প। এই পুরো প্রক্রিয়ার প্রধান কাণ্ডারি ছিলেন

চিকিৎসক ভূমেন্দ্র গুহ, যিনি আক্ষরিক অর্থেই কবির অবিন্যস্ত খাতা ও জীর্ণ কাগজের স্তূপ থেকে জীবনানন্দকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন। কবির বোন সুচরিতা দাশের মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই ট্রাঙ্কের কয়েক হাজার পৃষ্ঠার দুরূহ হাতের লেখা পাঠোদ্ধার করা ছিল এক অসম্ভব কাজ। ভূমেন্দ্র গুহ পরম মমতায় সেই কীটদষ্ট কাগজের পাঠোদ্ধার করেছেন এবং দিনের পর দিন তাঁর নিজ হাতে সেগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করেছেন। জীবনানন্দের যে বিপুল গদ্য সাহিত্য বা উপন্যাস ও গল্পের কথা তাঁর জীবদ্দশায় কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, তা মূলত ভূমেন্দ্র গুহর একক পরিশ্রমে আলোর মুখ দেখেছে। এটিই ছিল জীবনানন্দ চর্চার মোড় পরিবর্তনের সূচনা। পাণ্ডুলিপির পাঠান্তর বিশ্লেষণ, কবির খসড়া ও মূল পাঠের তুলনামূলক বিচার এবং জীবনানন্দের ডায়েরি বা 'লিটেরারি নোটস' সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর বৌদ্ধিক অবদান অপরিসীম। তিনি পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের এই কর্মকাণ্ডকে কেবল বই ছাপানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনানন্দ-চর্চার এক নতুন ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই পুরো কর্মযজ্ঞকে সাধারণ পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য, তিনি হলেন প্রিয়ব্রত দেব। পাণ্ডুলিপির মতো অত্যন্ত ব্যয়বহুল, ঝুঁকিপূর্ণ এবং শ্রমসাধ্য প্রকাশনা প্রকল্পের দায়িত্ব তিনি সাহসের সঙ্গে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি দেবেশ রায় ও গৌতম মিত্রের সুযোগ্য তদারকিতেই জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির হুবহু প্রতিলিপি ও অবিকৃত পাঠ মুদ্রণ সম্ভব হয়। পাঠোদ্ধার, পাঠান্তর, টীকাকরন, সম্পাদনা এবং প্রকাশনাএই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জীবনানন্দ দাশ 'রূপসী বাংলার কবি'র সীমাবদ্ধ পরিচয় ছাপিয়ে এক মহৎ গদ্যকার ও দার্শনিক হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

বর্তমান সময়ে জীবনানন্দ চর্চা কেবল কবিতা পাঠে সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা সমাজবিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাসের এক জটিল সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে।

গদ্যশিল্পী জীবনানন্দের পুনর্মূল্যায়ন একালের চর্চায় জীবনানন্দ একজন সার্থক ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। তাঁর 'মাল্যবান' উপন্যাসটি আজ বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান হিসেবে বিবেচিত। দাম্পত্য জীবনের তিক্ততা, যৌনতার অবদমন এবং মধ্যবিত্তের পরাজয়ের যে আখ্যান তিনি লিখেছেন, তা তাঁকে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

ইতিহাস-চেতনা ও বিশ্বরাজনীতি বর্তমান গবেষকরা (যেমন ক্লিনটন বি সিলি বা ফয়জুল লতিফ চন্দ) দেখিয়েছেন যে জীবনানন্দ মোটেও নির্জন বা অন্তর্মুখী ছিলেন না। তাঁর 'নাবিক', '১৯৪৬-৪৭' বা 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থগুলোতে বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, দাঙ্গা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ইতিহাসকে দেখেছেন এক বৃহত্তর চক্রাকার গতিতে।

পরিবেশবাদ ও বাস্তুসংস্থান (Ecocriticism) একালের সাহিত্য সমালোচনার একটি জনপ্রিয় ধারা হলো 'ইকো-ক্রিটিসিজম'। জীবনানন্দের কবিতায় ঘাস, শিশির, পেঁচা, শালিখপ্রকৃতির এই ক্ষুদ্র অনুষঙ্গগুলো যেভাবে এসেছে, তা আজ তাঁকে 'প্রথম বাঙালি পরিবেশবাদী কবি' হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তিনি প্রকৃতির সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা জলবায়ু পরিবর্তনের এই যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

অস্তিত্ববাদ ও বিপন্নতা জঁ-পল সার্ত বা আলবেয়ার কামুর অস্তিত্ববাদী দর্শনের ছায়া গবেষকরা জীবনানন্দের কবিতায় খুঁজে পাচ্ছেন। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার সেই ব্যক্তি যে সমস্ত সুখের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করে, তাকে আধুনিক মানুষের চিরন্তন বিপন্নতা ও 'বিঁশে'র (Nausea) প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বর্তমান অর্থাৎ ২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দ চর্চা এক নতুন ডিজিটাল মাত্রা পেয়েছে।

তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি ও কাটাকুটি এখন ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষিত হচ্ছে। এতে গবেষকদের পক্ষে তাঁর কাব্য-নির্মাণের প্রক্রিয়া (Craftsmanship) বোঝা সহজ হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের চর্চা মূলত বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীভূত থাকলেও বিদেশে, বিশেষ করে ইংরেজি-ভাষী দেশগুলিতে, তার কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে ক্রমশ আগ্রহ বাড়ছে। এই চর্চা প্রধানত অনুবাদ, গবেষণা, তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন এবং একাডেমিক থিসিসের মাধ্যমে ঘটছে। জীবনানন্দের কবিতাকে অনেকে "অনুবাদযোগ্য নয়" বলে মনে করলেও বিভিন্ন অনুবাদক তার রচনাকে বিশ্বসাহিত্যের কাছে তুলে ধরেছেন। ইংরেজিতে তার কবিতার অনুবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Fakrul Alam-এর "Jibanananda Das-Selected Poems", যা তার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পাঠকদের কাছে তার কবিতার পরিচয় করিয়েছে। Clinton B. Seely. "The Scent of Sunlight-Poems by Jibanananda Das" এবং তার লেখা জীবনী "A Poet Apart" বিদেশী একাডেমিয়ায় বহুল প্রশংসিত, যেখানে ছত্রব্রনা একজন আমেরিকান অধ্যাপক হিসেবে জীবনানন্দকে "বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি" বলে উল্লেখ করেছেন। Rebecca Diane Whittington-এর অনুবাদে "Malloban" (উপন্যাস) Penguin Modern Classics-এ ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছে, যা তার গদ্যকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি সংস্করণ। এছাড়া The Antonym ম্যাগাজিনে Moulinath Goswami-এর অনুবাদ এবং বিভিন্ন অ্যান্থলজিতে ছড়ানো কবিতা তার কাজকে বিদেশী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনানন্দ নিয়ে গবেষণা উল্লেখযোগ্য, যেমন University of California–Berkeley-তে Rebecca Diane Whittington-এর থিসিস "Grasshopper Kababs-The Problem of Language in the Fiction of Jibanananda

Das" (২০১৩), যা তার গদ্যে ভাষার সমস্যা এবং ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি নিয়ে আলোচনা করে। অন্যান্য গবেষণায় তার কবিতাকে T. S. Eliot-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আধুনিকতা, ফর্মালিজম এবং প্রকৃতি-মানুষের সম্পর্ক নিয়ে। Goethe-এর "Weltliteratur" ধারণার প্রভাব ১৯৩০-৪০-এর বাঙালি কবিদের উপর, যার মধ্যে জীবনানন্দ অন্যতম, তা নিয়ে বিদেশী গবেষণা হয়েছে। অন্য ভাষায় অনুবাদ কম হলেও জীবনানন্দ দাশ অ্যাওয়ার্ড ফর ট্রান্সলেশন দশটি ভাষায় দেওয়া হয়েছে, যা তার কবিতার আন্তর্জাতিক অনুবাদকে উৎসাহিত করছে। বিদেশে তার গ্রহণযোগ্যতা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে, কারণ অনুবাদের অভাব এবং বাংলা সাহিত্যের সীমিত আন্তর্জাতিক প্রচারের কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যাপকভাবে পরিচিত নন। তবে postcolonial studies, eco-criticism এবং South Asian Literature-এর অধ্যয়নে USA– UK-এর বিভাগগুলিতে তার কাজ নিয়ে আলোচনা বাড়ছে। তার কবিতার রহস্যময় লিরিসিজম, প্রকৃতির সঙ্গে অস্তিত্বের যোগসূত্র এবং আধুনিকতার অনন্য ভাষা বিদেশী পণ্ডিতদের আকর্ষণ করছে, যদিও সম্পূর্ণ বিশ্বসাহিত্যে তার অবস্থান এখনও বিকাশশীল। বর্তমানে ইংরেজি ছাড়াও স্প্যানিশ, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় তাঁর অনুবাদ হচ্ছে।

এক তুলনামূলক রেখাচিত্র সেকাল একাল মূল্যায়ন 'গ্রাম্য', 'দুর্বোধ্য' ও 'অশ্লীল' হিসেবে সমালোচিত। আধুনিক মনস্কতা ও বিশ্ববোধের প্রতীক।

ক্ষেত্র মূলত কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ও দিনলিপির বিশাল বিস্তার।

রাজনৈতিক চেতনা অরাজনৈতিক কবি হিসেবে পরিচিত। ইতিহাস-সচেতন ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হিসেবে চিহ্নিত।

প্রকৃতি কেবল অলঙ্কার বা রূপক। বাস্তুসংস্থান ও অস্তিত্ব রক্ষার অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দই একমাত্র কবি যাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে। অমলেন্দু বসু, দীপ্তি ত্রিপাঠী, জহর সেন মজুমদার, সুমিতা চক্রবর্তী, তরুণ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সমসাময়িক গবেষকরা তাঁর সাহিত্যকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন। তাঁর ভাষার যে জ্যামিতিক বুনন রয়েছে, তা বিস্ময়কর। কবির দিনলিপি বা 'লিটেরারি নোটস' থেকে জানা যায়, তিনি কতটা সচেতনভাবে প্রতিটি শব্দ ব্যবহার করতেন। গাণিতিক নির্ভুলতায় তিনি তাঁর কবিতায় Time বা সময়কে উপস্থাপন করেছেন, যা কখনও লিনিয়ার নয়, বরং বৃত্তাকার। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে শোধগঙ্গা ওয়েবসাইটে জীবনানন্দ দাশ সংক্রান্ত গবেষণার সংখ্যা ষাটেরও বেশি। নীচে কয়েকটি তালিকাভুক্ত করা হল—

1. Oupanyasik Jibanananda Bhattacharya, Sucharita Jadavpur University
2. Kabi Jibanananda Daser jiban o kabi sabhab Dasgupta, Manjusri University of Calcutta
3. Jibanananda Das timirhananer kabi Aichbhaumik, Mili University of Calcutta
4. Kabi Jibanananda Das er kabye banglar loksanskriti Saha, Basudeb University of Calcutta
5. Jibanananda Daser kabya bhabna o paschattya aitihya Mandal, Sandipkumar University of Calcutta
6. The darkness and light in the poems of Jibanananda Das Islam, Monirul Visva Bharti University
7. An Ecocritical Study of the Poetry of Seamus Heaney and Jibanananda Das Bera, Krishnendu Visva Bharati bioregional matrix in jibanananda das Datta, Durbadal Seacom Skills University
8. The internal world of the protagonist In the fiction of Jibanananda Das Saha, Madhurima Visva Bharti University
9. Rewriting the Original a study of Clinton B Seelys Translations of Jibanananda Dass Pomes Das, Sanchita Raiganj University
10. Jibanananda Daser Uponyas: Ekti Samajtatwik Adhyayan Chakraborty, Soma University of Burdwan
11. Jibanananda Das-er Kabitay Prakriti o Manobik Jibon Ghosh, Anuradha University of Calcutta
12. Jibanananda Daser Kabya: Ekti Rupatattwik Bishleshan Roy, Dipak Kumar Jadavpur University
13. Jibanananda Das-er Uponyas Samagra: Ekti Bishleshanatmak Adhyayan Sen, Aparna Rabindra Bharati University
14. Jibanananda Daser Kabitay Nagar o Gramin Jibon Mukherjee, Srilekha University of Kalyani
15. Jibanananda Das-er Kobita : Prakriti, Prem o Mrityu Banerjee, Rita Visva-Bharati University
16. Comparative Study of Jibanananda Das and Bishnu Dey Paul, Amitava University of North Bengal
17. Jibanananda Daser Uponyas-e Nari Charitra Das, Nilanjana Vidyasagar University
18. Jibanananda Das-er Kobitay Adhunikata o Post-Adhunik Chinta Sinha, Debashis University of Gour Banga
19. Jibanananda Daser Kabya Bhabna : Ekti Tulanamulak Adhyayan Kar, Paramita Netaji Subhas Open University

বি.দ্র. https-shodhganga.inflibnet.ac.inùsimple-search-query = jibanananda থেকে প্রাপ্ত শিরোনাম যথাযথ রাখা হয়েছে।

আগামী দিনে জীবনানন্দ চর্চা আরও বেশি ডিকনস্ট্রাকশন বা উত্তর-আধুনিক তত্ত্বে দিকে মোড় নেবে। তাঁর কবিতায় যে 'না' বা নেতিবাচকতার সুর আছে, তা উত্তর-আধুনিক অনিশ্চয়তার এক সার্থক রূপায়ন। এ ছাড়া তাঁর নারী চরিত্রগুলোর (যেমনবনলতা সেন, সুচেতনা বা শ্যামলী) নারীবাদী বিশ্লেষণও একালের চর্চার নতুন দিগন্ত হতে পারে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এক শিল্পী ছিলেন। সেকালের পাঠকেরা তাঁকে বুঝতে পারেননি কারণ তাঁদের দেখার চোখ ছিল সীমিত। কিন্তু একালের বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে তাঁর নির্জনতা এখন আমাদের সকলের সংহতি হয়ে উঠেছে। তিনি কেবল একজন কবি নন, তিনি আধুনিক মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের এক অমোঘ ভাষ্যকার। জীবনানন্দ চর্চার এই 'সেকাল থেকে একাল' আসলে আমাদেরই অন্ধকারের উৎস থেকে আলোর অভিমুখে যাত্রার ইতিহাস।

জীবনানন্দ দাশের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী (১৮৯৯-২০২৪) উপলক্ষে দুই বাংলাতেই গবেষণামূলক ও সংকলনধর্মী গ্রন্থ প্রকাশের ধুম পড়েছে। বিশেষ করে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার এবং নতুন দৃষ্টিকোণে তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনা সভা, ওয়ার্কশপ [যেমন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত "জীবনানন্দ-নজরুল: ১২৫" অথবা, কবির জীবন, সৃষ্টি এবং সমকাল নিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা আয়োজিত বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স 'জীবনানন্দ অধ্যয়ন' ইত্যাদি] জীবনানন্দচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, বুদ্ধদেব। কালের পুতুল।
২. সিলি, ক্লিনটন বি.। A Poet Apart- A Literary Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das।
৩. চন্দ, ফয়জুল লতিফ। জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ।
৪. দাশ, জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ (সম্পাদনা: দেবেশ রায়)।
৫. সরকার, অলোকরঞ্জন। জীবনানন্দ ও আধুনিকতার প্রেক্ষাপট।
৬. শাহরিয়ার, আবু হাসান। জীবনানন্দ দাশ: পাণ্ডুলিপির অন্দরমহল।
৭. হ্যাকার, সমরেন্দ্র। জীবনানন্দ চর্চা: সেকাল ও একাল।

অরুণাভ মুখার্জী

ভাষা থেকে তত্ত্বের সন্ধানে নজরুল সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর এক অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা না মেনে, তত্ত্বকে অস্বীকার করবার এক দুর্বার প্রয়াস এবং ভাষার আগুনে মানুষের মনকে উদ্দীপ্ত করবার প্রদীপ্ত বাসনা নিয়েই কবি নজরুল আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে। তাই প্রচলিত ধারনায় নজরুল বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি, সাম্যবাদের কবি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু বিশেষণ তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত রয়েছে পাঠক মহলে। কিন্তু আমি এখানে তাত্ত্বিক নজরুলকে খোঁজার, বিশেষত তাঁর অন্তর দৃষ্টিকে তত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছি।

প্রথমেই আসি ভাষার প্রসঙ্গে। এককথায় ভাষা হল মানব মনের ভাব প্রকাশক এক বিশেষ অভিব্যক্তি। দুই, তত্ত্ব; যার আভিধানিক অর্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ 'মতবাদ'[১]; সাধারণভাবে অনুসন্ধান করা বা প্রদর্শন করা বা পর্যবেক্ষণ করা। বিমূর্ত ভাবনা থেকে যার জন্ম। তিন, সাহিত্য; ভাষার মধ্যদিয়ে ভাব যখন তাত্ত্বিক সংবেদনশীলতায় জীবনের অনুভূতিকে ব্যাপ্ত করে, তখনই তা হয়ে ওঠে সাহিত্য। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে, একজন সাহিত্যিক কি কোন না কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই তাত্ত্বিক! - তাও আমরা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবো এই আলোচনায়।

এবার আসি নজরুল সম্পর্কে। বাংলার সাহিত্য-গগন যখন রবিদীপ্তিতে পূর্ণতেজে দীপ্যমান, অন্যদিকে ব্রিটিশসূর্যের লেলিহান শিখায় ভারতের জনগণ যখন দিশাহারা- তন্দ্রাহারা- পথভ্রষ্ট, শান্তিকামী মানুষের বুকে যখন বিচ্ছিন্নতাবাদের ধাক্কা, ঠিক সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতোই নতুনের কেতন উড়িয়ে 'একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য' নিয়ে বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে নজরুলের পদার্পণ। বিংশ শতাব্দীর এক অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে, বাংলা কাব্য জগতে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে, পৌরুষের আস্ফালনে দিগন্ত কাঁপিয়ে, সমাজ জীবনের জড়ত্ব-পঙ্গুত্ব-স্থবিরতা ও অবসাদকে ঘুচিতে দিতে রেনেশাঁসের কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নজরুল একজন যথার্থ সংগ্রামী কবি, যৌবনের কবি, নজরুল বাংলা সাহিত্যে বসন্ত এনেছে'। তাই বাসন্তিক নজরুলের লেখনীতে তত্ত্ব কিভাবে ভাষা তথা শব্দকে আশ্রয় করে সাহিত্যে নান্দনিকতা তৈরি করেছে, আমি একে একে তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি থেকে দৃষ্টান্ত তুলে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

নজরুলের জন্মক্ষণ থেকে তাঁর কাব্যিক জীবনের ব্যপ্তি এই প্রায় চল্লিশ বছরের সময় সরণী যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে প্রথমেই দেখতে পাই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লর্ড কার্জন প্রণীত বঙ্গভঙ্গ নীতির রেশ, ১৯০৮ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক অনুশীলন সমিতিকে বে-আইনি ঘোষণা, ঋষি অরবিন্দের কারাদন্ডাদেশ, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসী, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে হোমরুল আন্দোলন, ১৯১৭-র নভেম্বর বিপ্লব, ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমস ফোর্ড আইন সংস্কার ও কুখ্যাত রাওলাট আইন প্রবর্তন, ১৯১৯ এ জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস গণহত্যা এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাপ্রাণ গান্ধীজির প্রবেশ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে স্বক্রীয় অংশগ্রহন — প্রভৃতি ঘটনা নজরুল জীবনকে যে বহুল পরিমানে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। আবার এই সময়কালেই, মূলত ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে ইংল্যন্ড ও আমেরিকায় টি. এইচ. হিউম এর নেতৃত্বে এক কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, যাঁরা প্রচলিত কাব্য আঙ্গিক ও প্রকরণের বিরুদ্ধে, বিষয়বস্তুর আলংকারিক উপস্থাপনা ও ছন্দ এবং সংবেদনশীলতার বিরুদ্ধে প্রায় সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। যেকোনো ধরণের ‘সেন্টিমেন্টালিস্টিক ম্যানারিজম’ এর বিরোধী ছিলেন এঁরা। এজরা পাউন্ড, উইলিয়াম ক্যারলস, রিচার্ড অ্যালাডিংটন, ডব্লিউ.বি. ইয়েটস, টি.এস.এলিয়ট থেকে শুরু করে জনশন, রসেটি, সুইনবার্ণ, লরেন্স প্রমুখ আধুনিক কবি গোষ্ঠীরা চেয়েছিলেন আলংকারিক ভাষার পরিবর্তে মানুষের মত বিনিময়ের ভাষা ব্যবহার করতে। তাঁরা চেয়েছিলেন বাস্তবতা পুরোপুরি প্রতিচ্ছবি না হয়ে ‘মেটাফোরিক ইম্প্রেশনে’র দ্বারা সাহিত্যে রূপ নেবে। তাই তাঁরা তাদের রচনায় মানবতার অবনমন, বক্র ও জটিল মনোবিকলন, সার্বিক অবক্ষয়, নৈরাশ্যক্ষুব্ধ যন্ত্রনা প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হলেন। ‘ইমেজিস্ট আন্দোলনে’র প্রবক্তা টি.এইচ. হিউম বললেন যে, ‘মানুষের আদিম পাপই শিল্পের উৎস, মানব চেতনা সংকীর্ণ, কারণ তা পরিবর্তনশীল।’[২] আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়িত পটভূমিকে টি. এস. এলিয়ট রূপ দিলেন তাঁর ‘দ্য ওয়েস্টল্যান্ড’ কাব্যগ্রন্থে। তাই এই সময়কালে পাশ্চাত্য সাহিত্যে কবিতার রূপ, অঙ্গিক, বিষয়বস্তু, ছন্দ, ভাষা সবকিছু বদলে গেল; সমাজ জীবনে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে অতীতের পোয়েটিক ডিকশন ও রেটোরিক প্রয়োগ বর্জন করে এই সময়ের কবিরা নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

ফলত একদিকে উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের তথা ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে পাশ্চাত্যের এই চিন্তা ভাবনা তথা মার্কসীয় চিন্তার পারম্পর্য, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার তাত্ত্বিক প্যারাডাইম, অতীন্দ্রিয়বাদ, স্বজাত্য প্রীতি, যুক্তিবাদী ও প্রয়োগবাদী দর্শন, অভিব্যক্তিবাদ, অস্তিবাদ, এবং সর্বোপরি কলাকৈবল্যবাদ এই সবকটি ইজম বা তত্ত্বকেই নজরুল আত্তীকরণ করে তাঁর সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তবে তিনি ইব্রাহিম খানকে লিখিত এক পত্রে জানিয়েছিলেন, “আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।”[৩]

অর্থাৎ তত্ত্বকে অস্বীকার করবার এক দুর্বার প্রয়াস এবং ভাষার আগুনে মানুষের মনকে উদ্দীপ্ত করবার প্রদীপ্ত বাসনা নিয়েই নজরুলের সাহিত্য সাধনা।

জীবনের ঊষালগ্নে লেটোদলে থাকাকালীন লেটো সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও অনুভূতির বার্তা গীতিকাব্যিক সুরমূর্চ্ছনায় নজরুল সাহিত্যে ধরা পড়েছে। আমার মনে হয়, এই পর্যায় থেকেই হিন্দু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের সঙ্গে মুসলিম ঐতিহ্য, শবিয়তী তত্ত্ব, তথা নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত, মারেফাত তত্ত্ব, কথকতা, হেঁয়ালী, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ইত্যাদি ভাবনাগুলি নজরুল মননে জারিত হয়ে পরবর্তীতে সাহিত্যিক ভাষায় প্রকাশ রূপ লাভ করে। এরই এক অনবদ্য প্রকাশ —

"রব না কৈলাশপুরে আই য়্যাম ক্যালকাটা গোয়িং।
যত সব ইংলিশ ফ্যাশান আহা মরি কি লাইটনিং।...."[৪]

কবি নজরুলের কাব্য সাধনার দুটি সুস্পষ্ট ধারা আমরা লক্ষ্য করি। এক — সৌন্দর্য ও প্রেম সাধনার ক্ষেত্রে তিনি আদর্শবাদী এবং দুই — সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি বাস্তববাদী। রবীন্দ্র-সমসাময়িক যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করলেও যুগ প্রতিভাধর মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের বাঁধা পথে না হেঁটে, অহিংস বৈষ্ণবীসুর বা সোহাগদোদুল ছন্দের পরিবর্তে রুদ্র কালবৈশাখীর সুর ও প্রবল ডমরু ছন্দের নিনাদে 'এই দুনিয়ার অসহায় যত ধুলিমাখা সন্তানে'র স্বপক্ষে ফরিয়াদ ঘোষণা করেছেন কবি নজরুল।

তাই বাংলা কাব্যের জগতে কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব যেমন অতর্কিত ধূমকেতুর ঝঞ্ঝার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর্যায়ভুক্ত, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান তদ্রুপ কাব্যের পদ্মশোভিত নীলাকাশ প্রতিবিম্বিত স্থির সরোবরের বুকে যেন একটা দুর্বার আবিল নদীস্রোতের মতোই শক্তির উচ্ছ্বাস ও ফেনিল উন্মত্ততার কলরোলে কল্লোলিত। কবি নজরুল বাংলা কবিতায় আত্মমুক্তি ও আত্মস্ফূর্তির পুরোধা। নজরুল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে হিন্দু ঐতিহ্য ও ইসলাম ভাবধারার যেমন সমন্বয় সাধন করেছেন, তেমনি সমন্বয় সাধন করেছেন বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী সাহিত্যিক মতবাদগুলির মধ্যে। তাই দেখি তাঁর রচনায় একই সাথে উঠে এসেছে Expressionism বা অভিব্যক্তিবাদ। যেমন যখন তিনি বলেন — "দেখিনু সেদিন রেলে, / কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে" - এখানে বস্তুগত পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতার প্রতিফলন এমন ভাবে চিত্রিত হয়েছে যে তা চিত্রকল্পবাদকেউ স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানুষের সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর বাণী নজরুলের লেখনী থেকে এমন ভাবে ঝংকৃত হয়েছে যে, তা কবিকে একই সাথে করে তুলেছে ক্লাসিক, রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্ট। আবার সঙ্গীতের জগতে কবিকে আমারা খুঁজে পাই এক মরমীয়াবাদী সাধক হিসাবে।

এখানে ভগবৎ বিশ্বাসী কবি অকাতরে গেয়ে ওঠেন — "আমি শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে / জপি আমার শ্যামের নাম। / মা হল মোর মন্ত্রগুরু / ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম।" একটু এগিয়ে বলতে পারি, এখানে কবির মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বও লুক্কায়িত রয়েছে কি না, তাও রীতিমতো গবেষনার বিষয় হতে পারে।

কাজী নজরুল যেমন পারদর্শী ছিলেন দ্রোহে-প্রেমে তেমনি সার্থক ছিলেন তিনি তার কবিতার মাধ্যমে সুফি ভাবদারাকে জীবন্তরূপে উপস্থাপনে। হিন্দু তান্ত্রিকতা, শক্তির অমোঘ পূজা, মুসলিম নব্য জাগরণ, ভেদ বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বমানববাদ, বাউলিয়ানা, কোরআন-পুরাণ এক হয়ে নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত, ইসলামী গজল কিংবা কবিতায় এক মোহনায় মিশে গেছে নজরুল সাহিত্যে। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে মরমীবাদ এসেছে নানা মতের সেতুবন্ধন হয়ে। তাই নজরুল সাহিত্যে আলাহ, হরি, মনের মানুষ আর পরম ঈশ্বর একই সুরের নানা যন্ত্রে ভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শ্যামা সঙ্গীতে যেমন তার ব্যাকুল মনের আত্মসমর্পণের আর্তি অঝরে ঝরে পড়েছে —

"খড়ের প্রতিমা পূজিস রে তোরা, মাকে ত' তোরা পূজিস নে !
প্রতি মা'র মাঝে প্রতিমা বিরাজে (ঘরে ঘরে ওরে) হায় রে অন্ধ, বুঝিস নে।।"

তেমনি ভক্ত হৃদয়ের আকুলতাও আমরা পাই তার ইসলামি গজলের প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত অব্যক্ত ধ্বনিতে —

"আহমদের ঐ মিমের পর্দা / উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন / হেরে গুণীজন।।"

ইসলামে 'আহমদ' হচ্ছে সৃষ্টি আর 'আহাদ' হল স্রষ্টা। শুধু 'মিমের পর্দা' এই দুইকে ভিন্ন করে রেখেছে। "আহমদ নাম লিখতে আরবিতে চার হরফ আলিফ, হে, মিম, দাল আর আহাদ নাম লিখতে আলিফ, হে, দাল এই তিন অক্ষর লাগে। নজরুলের মতে আমরা যদি আহমদ থেকে মিম হরফকে সরিয়ে দিই, তাহলে এই সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার স্বরূপ খুঁজে পাব।"[৫] আবার সেই নজরুলেরই কবিতায় বাউলের অচিন অধরাকে খুঁজে বেড়ানোর খ্যাপামিও লক্ষণীয়। সৃষ্টি ও সষ্টা এক ও অভিন্ন সত্তায় একে অপরের সম্পূরকভাবে লীলারত। এখানে সৃষ্টিকে চিনলেই স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব। তাই নজরুল স্রষ্টাকে চিনতে গিয়ে তিনি আগে সৃষ্টিকে চেনার কথা বলেছেন। কেননা সৃষ্টিই স্রষ্টাকে ধারণ করে আছে নিজের অলক্ষ্যে, নিজের অজান্তে। আর তাঁকেই খুঁজে মরছে বাউল নজরুল বন-বনান্তরে ক্ষ্যাপার বেশে। নজরুলের ভাষায় —

'কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে?
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,

বুকের মানিকে বুকে ধ'রে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে
স্রষ্টারে খোঁজ-আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোল, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া
দেখিবে, তোমারি অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।'
('ঈশ্বর' : 'সাম্যবাদী')

নিজেকে নব নব রূপে আবিষ্কারের মাধ্যমে অপার রহস্যের ভেদ জানাই হল মরমীবাদের মূল সুর। নজরুলের কাব্যের ভাষাও সে অমিয় সুরে সুললিত, গুঞ্জরিত, মরমীবাদের যাদুমন্ত্রে স্বদীক্ষিত। বাউলের নিজেকে চেনার যে ব্যাকুল আকুতি, তা নজরুলের কবিতায় সুর হয়ে প্রাণ দিয়েছে, পেয়েছে জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ। মরমীবাদের মূল কথা হল, 'এই মানুষে আছে রে মন/ যাকে বলে মানুষ রতন।' অর্থাৎ মরমীবাদে মানুষের অবস্থান এবং মানুষের মর্যাদা সবার উপরে। এখানে ধর্ম, শাস্ত্র, গোত্র কোন কিছুই মানুষের ঊর্ধ্বে নয়। মানুষই সব। আর এই মানুষের পূজাই হল ঈশ্বরের পূজা। ধর্মের দোহাই দিয়ে, শাস্ত্রের অজুহাতে, বিধানের ধুয়ায় কোনক্রমেই অখণ্ড মানুষের বিভাজন মান্য নয়। মানুষকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে তাই নজরুল সমাজের সৃষ্টি ধর্ম, বর্ণ, শাস্ত্র ও বিধি-বিধানকে অবলীলায় করেছে অস্বীকার। 'সবার উপরে তাই মানুষ সত্য' — এই মন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নজরুলের দৃঢ় অবস্থান —

মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরআন, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি'
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।
পুজিছ গ্রন্থ ভণ্ডের দল! মূর্খরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ;- গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।'
('মানুষ' — 'সাম্যবাদী')

এ যেন মরমী সাধক লালন সাঁইজির মানবতাবাদী মতবাদের প্রতিধ্বনি 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি,/ নইলে পরে ক্ষেপারে তুই মূল হারাবি।'

আসলে নজরুল মানুষকে শুনিয়েছেন জাগরণের অভয়বাণী। বিভেদ বিবাদের প্রাচীর ছিন্ন ভিন্ন করে, মানুষের হৃদয়ে প্রেরণাদান করে জীবন রসের সঞ্জীবণী সুধা সৃষ্টিকারী মানুষের মহান কবি হিসাবে অমর হয়ে আছেন কবি নজরুল। তাই সঙ্গত ভাবেই ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করতে

গিয়ে লেখেন — "দেশকালের জরা-শোক-অবক্ষয়-অন্ধকারকে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে প্রজ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার, আনন্দের, সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে যাঁরা বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম, তাঁরাই মহৎ। তেমনি এক মহৎ প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম।"

নজরুল রচনার শৈলী বিচারে তাই দেখি ফরম এবং কনটেন্ট উভয় ক্ষেত্রেই কবি যুগপৎ বিদ্রোহী এবং আবেগী। ফলত প্রকাশ ব্যকুলতার কারণেই বোধহয় প্রণম্য ড. পবিত্র সরকারের ভাষায় বলতে পারি, "বাংলার প্রায় সমস্ত কবির তুলনায় নজরুলের অভিধান বিস্তৃততর।" একথা সত্য, নজরুলের ভাষা ব্যবহারের মধ্যদিয়েই লঙ্ঘিত হয়েছে 'রাবীন্দ্রিক কাব্যভাষা সংস্কারের সীমারেখা'। প্রসঙ্গত 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' বিষয়টি সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেকেই আমরা অবহিত। শিল্প সৃষ্টিতে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, প্রথমত — তিনি কাব্য-শৃঙ্খলার প্রথাসিদ্ধ ধারণাকে পাল্টে দিলেন ভাষার ক্ষেত্রে; এবং দ্বিতীয়ত, তিনি এক নতুন ধরনের ভাষা-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেন কবিতায়। আমরা জানি, সাহিত্যে শব্দ-ভাষার যথার্থ প্রাণশক্তি অনুভব করা যায় তার প্রয়োগবিধির মধ্যদিয়ে। আর এখানেই নজরুলের স্বাতন্ত্র্য। তিনি বুকের ভাষাকে সরাসরি মুখে প্রকাশ করলেন অনুভূতির ব্যপ্তি ও তীব্রতা দিয়ে। তাই তাঁর রচনা যেন 'প্রলয়-বন্যার গৈরিক স্রোত'।

কেবল দেশবাসীর কাছেই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র নজরুলের বাণী আন্দোলিত হয়েছে। তার প্রমাণ আমরা নজরুল জীবনের শুরুতেই পেয়েছি। ১৯২২ সালে অক্টোবর মাসে নজরুলের 'অগ্নিবীণা' ও 'যুগবাণী' কবিতা ও প্রবন্ধের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যা একই সময় বাংলা সাহিত্যের নিস্তরঙ্গ প্রবাহকে খানিকটা অন্দোলিত করেছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল। দুটি গ্রন্থই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্তের তালিকায় নিয়ে আসে। কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক মাত্র ২০ বছর বয়সের একজন তরুণ কবি কি লিখেছিলেন এই গ্রন্থে- যা সরকারের এমন নিবর্তন আইনের শিকার হয়েছিল?

নজরুল এই গ্রন্থে লিখেছিলেন, "স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশ বিদেশীদের অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সম্পূর্ণ থাকবে ভারতের হাতে। তাতে কোনো বিদেশি মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে এ দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোচকা পুটলি বেঁধে সাগর পাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবে না। তাদের সবটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে।" নজরুলের আগে পৃথিবীর আর কোনো কবি প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ রাজকে এভাবে ধমক দিতে পারেননি।

এমনকি এ দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যেও কেউ তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবি করেননি। তার মাত্র কয়েক মাস আগে আরেকজন উর্দু কবি হসরৎ মোহানি আহমেদাবাদের কংগ্রেস সভায় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবি করে সরকার ও দলীয় নেতৃবৃন্দের রোষানলের পতিত হন। নজরুলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কোনো প্রক্ষিপ্ত বিষয় ছিল না; কারণ বয়সে তরুণ হলেও একটি রাজনৈতিক সংশ্লেষের মধ্য দিয়েই তার বিকাশ হয়েছিল। ১৯২০ সাল থেকে রাজনৈতিক সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' এ লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলোই 'যুগবাণী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া নজরুলও অন্যান্য উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যবেত্তাদের মতো রাজনৈতিকভাবে মার্কসীয় সাম্যবাদে অনুরক্ত ছিলেন। সেই আকাঙ্খা থেকে ১৯২৫ সালে যে 'কৃষক-শ্রমিক স্বরাজ পার্টি' গঠিত হয়, নজরুল ছিলেন তার অন্যতম সভ্য; এমনকি তার মুখপত্র 'লাঙল' ও 'গণবাণী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই মনে হয় পৃথিবীর প্রথম কবি যার কাব্যগ্রন্থের নাম 'সাম্যবাদী' যেটি প্রকাশিত হয় অন্যতম উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তক ফ্রাঞ্জ ফানোর জন্মের এক বছর আগে ১৯২৫ সালে। এই পার্টির জন্য তিনি যে সঙ্গীত রচনা করেন তার নাম দেন 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত'। সেখানে তিনি বলেন, 'জাগো অনশন-বন্দী ওঠ রে যত/ জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।' পোস্ট কলোনিয়াল তত্ত্বের যেহেতু একটি আন্তর্জাতিকতাবাদ রয়েছে সেহেতু নজরুলের কণ্ঠস্বর কেবল তার সময় ও কালের মধ্যে সীমায়িত থাকেনি। যেখানেই ক্ষুধা ও বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচার সেখানেই নজরুল-সাহিত্য সক্রিয় থেকেছে।[৬] আর ব্রিটিশ ভারতে জন্মগ্রহণের ফলে নজরুল-সাহিত্য কেবল ভারতীয় ভৌগোলিক সীমানায় তখনো সীমাবদ্ধ ছিল না; তাই নজরুলকে এই তত্ত্বের গুরু হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা লক্ষ করি, নজরুল রচনার মূলসুর অনুভূমিক অর্থাৎ ছদ্রুদ্রদ্রঙ্খন। বৃহৎ-বিশাল শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সংসার নিয়েই নজরুল সাহিত্যের জগৎ। তাই মৃত্তিকা-সংলগ্ন এই কবি কবিগুরু কথিত 'মাটির কাছাকাছি' স্তর থেকে সমুদ্ভূত হয়ে তৎ সামাজিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংস্কারে আঘাত হেনেছেন; হয়ে উঠেছেন গণ মানুষের কবি, বাংলা সাহিত্যে সাম্যতন্ত্রের উদ্গাতা, বিদ্রোহের বাণীবাহক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক, এমনকি চারণ কবিও।

অস্বীকার করার উপায় নেই, নজরুলের সাহিত্য সে যুগের জনমানসকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর কবিগুরুর ভাষায়, "জনপ্রিয়তা কাব্য বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।"[৭] আর তাই বোধ হয়, নজরুলের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্র-অভিমত "অরুগ্ন-বলিষ্ঠ-হিংস্র-নগ্ন-বর্বরতা তার

অনবদ্য ভাব-মুর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করেনি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধাগুণের ঊর্ধ্বে তার আসন-গ্রহণ করেছে।"[৮]

আসলে নজরুলের সাহিত্যকে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের গণ্ডীতে সীমায়িত করা সম্ভব নয়। তাঁর লেখনী শ্রেণী সংগ্রামের বাণীকে বিদ্রোহের সুরে যেমন করেছে দৃপ্ত প্রতিবাদের অগ্নি ঝলক, ভাষায় ঠিক তেমনি প্রকাশিত রুদ্র তেজের দীপ্তি। অন্যায়-অসহিষ্ণুতা থেকে এই তেজোবহ্নি বিচ্ছুরিত হয়ে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছে; আবেগের প্রাবল্যে জ্যামুক্ত ধনুকের টঙ্কারের মতোই প্রতিধ্বনি তুলেছে তাঁর কবিতার শব্দগুলি। 'আগাগোড়া অস্থিরতা, অশান্ততা, প্রাণশক্তির উদ্দামতা, শাসন-নাশন-বারণ-বন্ধন না-মানা প্রবৃত্তির অবারিত উচ্ছ্বাস আগ্নেয়গিরির অগ্নিমুখ থেকে যেন শব্দের লাভাস্রোতের মতো প্রবাহের অবিশ্রান্ততা সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে ধ্বনির অন্তহীন, ক্ষান্তিহীন শিলাবৃষ্টি। আমাদের রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে বান ডাকা জোয়ারের কল্লোলের মতোই কবির 'বিদ্রোহী', 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'সাম্যবাদী', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'ফরিয়াদ', 'সব্যসাচী', 'সর্বহারা', 'কান্ডারী হুঁসিয়ার', 'পুজারিণী', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', এমন কি তাঁর আপাত মধুর প্রেমের গানগুলিও নিয়ে আসে আবেগের চাঞ্চল্য, চিত্তের সহজাত স্ফুর্তিপ্রাচুর্য'।

তাই নজরুল সাহিত্যের গঠনগত পারিপাট্যে এবং কবিতার ধ্বনি বিন্যাসে আবেগের এই ঐশ্বর্য-ই প্রধানতম উপাদান বলে মনে হয়। যা তাঁকে করে তুলেছে একই সাথে বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি, তারুণ্যের কবি, সাম্যবাদের কবি। তিনি দরাজ গ্লে বলতে পেরেছেন — "গাহি সাম্যের গান - / যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।" নিজ সৃষ্টির তত্ত্বকে ফ্রেমায়িত করেছেন 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থে। আর কাব্যভাষা ব্যবহারে নজরুলের এই 'ট্রাডিশন'ই তাঁকে করে তুলেছে শিল্পী তথা নান্দনিক।

তথ্যসূত্র :

১) শৈলেন বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত 'সংসদ বাংলা অভিধান', সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৩৬৫

২) শ্রী সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, ইংরাজী সাহিত্যের রূপরেখা বাংলা সাহত্যে প্রভাব, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৩২৫

৩) আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য সমীক্ষা, নজরুল কাব্যের ব্যকরণ, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০, চতুর্থ প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮, পৃ. ২৮৩

৪) আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত) নজরুল-গীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ০৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, পৃ. ৫০৬

৫) আবু ইসহাক হোসেন, নজরুল সাহিত্যে মরমীবাদ, পদ্মাপাড়ের মানুষ, Word Press.com
৬) মজিদ মাহমুদ, নজরুল ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য-তত্ত্ব, মুক্তকথা, https-www.daily-bangladesh.com
৭) সূফী জুলফিকার হায়দার, নজরুল প্রতিভা পরিচয়, কাজীর কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি স্বীকৃতি : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুল জন্মজয়ন্তী : রবীন্দ্রসদন, কলকাতা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১, সূফী জুলফিকার হায়দার ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা ০৯, পৃ. ৩৭
৮) ঐ, বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজাহারউদ্দীন খান

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১) ‘কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র’ (সবক’টি খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা — ২০ কর্তৃক প্রকাশিত।
২) অরুণ কুমার বসু, ‘নজরুল জীবনী’, জানুয়ারী ২০০০, প.ব. বাংলা আকাদেমি, কলকাতা — ২০
৩) ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, ‘নজরুল চরিত-মানস’, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দে’জ সংস্করণ, জানুয়ারী-১৯৯৭, কলকাতা — ৭৩
৪) আতাউর রহমান, ‘নজরুল কাব্য সমীক্ষা’, চতুর্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, মুক্তধারা প্রকাশনী, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা — ১১০০
৫) ড. অরুণাভ মুখার্জী, ‘নজরুল চেতনায় রবীন্দ্রনাথ’, অংশুমান প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ১৪২০, কলকাতা - ০৯
৬) শৈলেন বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত ‘সংসদ বাংলা অভিধান’, সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৫
৭) শ্রী সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, ইংরাজী সাহিত্যের রূপরেখা বাংলা সাহত্যে প্রভাব, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা ৭৩
৮) আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত) নজরুল-গীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ০৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬
৯) সূফী জুলফিকার হায়দার, নজরুল প্রতিভা পরিচয়, সূফী জুলফিকার হায়দার ফাউন্ডেশন, ঢাকা ০৯, প্রথম প্রকাশ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪
১০) Word Press.com — https-www.daily-bangladesh.com

মৃন্ময় সরকার

মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষাদান — রবীন্দ্রনাথ, চমস্কি এবং অন্যান্য

বহুদিন আগে মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি বলেছিলেন — "দেসিল ব অনা সবজন মিঠঠা" অর্থাৎ নিজ নিজ দেশের ভাষা সবার কাছেই মিষ্ট লাগে। তিনি যে এখানে মাতৃভাষা ও তার আদর্শের কথা বলেছিলেন এ নিয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। একক বিচ্ছিন্ন মানুষের কোন ভাষা নেই। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানও বলছে যে ভাষাশিক্ষার কেন্দ্রে থাকে ভাষাবিজ্ঞান আর পরিমণ্ডলীয় অংশে থাকে অন্যান্য বিজ্ঞান। আর তাই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা বা বড়দের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় যে আবশ্যিক একটি বাহন হওয়া উচিত এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে চমস্কি সবার মনেই সাড়া জেগেছিল। পৃথিবীতে পলিটিকাল দাদাগিরি চলেছে চিরকাল, কোন ভাষা হয়েছে 'ডমিন্যান্ট' তো কেউ হয়েছে 'ডমিনেটেড'। কিন্তু তবু বারবার এদেশের ও বিদেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাবিত করেছে মানবশিশুর শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম কোনটি। - তার মাতৃভাষা নাকি অন্য কোন ডিমান্ডযুক্ত ভাষা। বিস্তর তর্ক- বিতর্ক ও গবেষণা হওয়ার পর সিংহভাগ এই মত দিয়েছেন যে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মাতৃভাষায় অপরিহার্য হলেও যেখানে সমস্যা রয়েছে সেখানে মাতৃভাষার পাশাপাশি অপর একটি ভাষায় শিক্ষাদান সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখতে চেষ্টা করব যে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের সমস্যা এবং সম্ভাবনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ থেকে চমস্কি ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীদের কতটা ভাবিয়েছিল বা ভাবাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন, মাতৃভাষায় মাতৃদুগ্ধসম তখন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় যে অপরিহার্য এ বিষয়ে আমাদের দ্বিমত নেই। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ? সে উপায়ও তিনি বলেছিলেন। ইংরেজিকে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে এমনকি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাদ দিতে তো তিনি বলেন নি বরং শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজিকে যদি গঙ্গা-যমুনার মত মিলিয়ে দেওয়া যায় তো আমাদের শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে এবং তার ফল হবে ধ্বন্যাত্মক। আসলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তার দেশপ্রেম থেকে বিছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি তাই ' শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন-"অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাহাদের একটা কাতরতা জন্মে হে সুশিক্ষিত আর্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা জানো।" আবার একসময় দেখতে পায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ চান।কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আনন্দের ধারনা ফ্রয়েবেল প্রবর্তিত কিন্ডারগার্ডেন বা মন্টেসরি প্রবর্তিত প্রি স্কুলের ধারনা থেকে আরও ব্যাপক।আর শিশুর মানসিক শক্তি হ্রাসকারি যে শিক্ষা তার কারণ যে অযোগ্য শিক্ষকদের বিজাতীয় ভাষা অর্থাৎ

ইংরেজির ভুল শিক্ষণ পদ্ধতির ফলে হয় তা তিনি বুঝেছিলেন। মুখস্থবিদ্যাই আমাদের শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মূলস্তম্ভ আর যে সমস্ত মাস্টারমশাই নিচের ক্লাস এ পড়ায় তারা কেউ এন্ট্রান্স পাস অথবা এন্ট্রান্স ফেল।আর রবীন্দ্রনাথ ভাষাটাকে বলেছেন অতিমাত্রায় বিজাতীয়। এই ভাষার ভাষাবিন্যাস ও বিষয়প্রসঙ্গ বিদেসি।তিনি বলেছেন — "এ যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দেশী খাঁড়া ভরবার কসরত।" বাঙালির ছেলেকে ইংরেজি শেখাতে গিয়ে শিশুর শিক্ষাগ্রহন ও মানসিক বিকাশে অসঙ্গতি ঘটছে। প্রথমত বাঙালি শিশুকে তার শিক্ষার অধিকাংশ সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষার পিছনে। দ্বিতীয়ত ভাষাশিক্ষার উপর নজর দিতে গিয়ে তার ভাবশিক্ষা ও বিষয়শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছে। তিনি তাই দুঃখ করে বলেছেন — " ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধু উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষত-বিক্ষত করে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদঘর্ম চেষ্টা করছি; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারিদিকে, না পৌঁছাচ্ছে গভীরে।"

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন- "এন্ট্রান্স এবং ফাস্ট আর্টস পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায়; তারপরেই সহসা বি এ ক্লাসের বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়, তখন সেগুলো ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই, শক্তিও নাই ইঁট সুরকি কড়ি বরগা বালি চুন যেভাবে ইচ্ছে জমা করে স্তূপ তৈরি করার পর তার উপর চড়ে পিটিয়ে একটা ছাদের চেহারা তৈরি করা।" কিন্তু অট্টালিকা নির্মাণ আর হয়ে ওঠে না; কিম্ভুত আবর্জনার স্তূপই নির্মাণ করি আমরা। রবীন্দ্রনাথের মনে বাস্তবিকতাবর্জিত ইংরেজি শিক্ষাদান ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল — "আমরা যতই বি এ এম এ পাশ করিতেছি , রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না।" পরের ইস্কুলে শেখা সমস্ত বিদ্যাই যে আসলে সঞ্চয় হয়ে রইল; প্রেরনা, প্রাণশক্তি, সৃষ্টি আর হল কই!... কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, ভয়ে ভয়ে ইংরেজ ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা কোন নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না।" আর আক্ষেপ এখানেই ; শিক্ষা এমনই অন্তঃসারশূন্য হয়েছে যে —"অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া, উল্কি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই।"

সমস্ত শিক্ষাসিস্টেম চলছে মুখস্থবিদ্যাসর্বস্ব শিক্ষার উপর — " কিছু ছেলে মুখস্থলব্ধ ইংরেজির ছাড়পত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার অধিকার পায়। যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিকতা নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে ?" 'শিক্ষায় সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে কিছু মানুষের ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে, ইংরেজিকে

শিক্ষার বাহন করে দেশের অধিকাংশ মানুষকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে — "আসল কথা, যারা ইংরেজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন, তারা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে, উদ্ধত হইয়া ওঠেন। মূলে তাহার অহংকার।" বঙ্কিমচন্দ্রও মেকলের 'ডাউন ফিলট্রেসন' থিওরির বিরোধিতা করেছিলেন। 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে বঙ্কিম তাই বলছেন — " শিক্ষিতে অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না বিলাতে কানা ফসেট সাহেব এদেসে সার অসলি ইডেন — ইহারা তাহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন , নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক — তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ইংরেজ ভালো বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি যাট লক্ষের ক্রন্দন ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে — বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না, বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিতে বুঝে না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষায় বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার সম্ভাবনা যাচাইয়ের যখন প্রশ্ন উঠল, রবীন্দ্রনাথ তখন মনে করিয়ে দিলেন শিক্ষিত লোকের মনে বাংলা ভাষার শক্তি এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। শিক্ষার বাহন প্রবন্ধটিতে তিনি শিক্ষিত মানুষজনদের মাতৃভাষায়শিক্ষার অজুহাতগুলি সম্পর্কে বিদ্রুপ করেছেন। পরিভাষার অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার ব্যঙ্গময় উক্তি —"দেশে টাকা চলিবে না, অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন লজ্জায়।" শেষে তার প্রস্তাব যে শুধু প্রাথমিক বা স্কুলস্তরে নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপাঠক্রমেও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের রাজপথটি প্রশস্ত হোক- " বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে ইংরেজি — বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলে দিতে হবে। " অর্থাৎ ইংরেজি বর্জন তো নয়ই বরং ইংরেজির মধ্য দিয়ে আমরা পড়ব- জানব- শিখব আর উদ্বুদ্ধ হব; কিন্তু প্রকাশ করব নিজের ভাষায়-" দূরদেশী ভাষায় যে যে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।"

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য নোয়াম চমস্কী (১৯২৮) জানালেন যে মানুষের মাথার মধ্যে ধারনা হিসাবে থাকা নিয়মকানুনই আসলে কোন ভাষার ব্যাকরণ। আর সেই ব্যাকরণ হল সঞ্জননী ব্যাকরণ বা জেনেরেটিভ গ্রামার। ধারনার মধ্যে যে নিয়মকানুন আছে কথা বলার সময় সেই নিয়মকানুন অনুসরণ করেই আমরা কথা বলি ,কিন্তু হুবহু বলি না। বলার সময় একটু অদল বদল ঘটে। একে বলা হয় ট্রান্সফরমেসন বা সংবর্তন। ১৯৫১ তে চমস্কি আধুনিক হিব্রু রূপস্বনিম নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তার গবেষণা নিবন্ধে। তার পিএইচডির গবেষণা নিবন্ধ 'ট্রান্সফর্মেশনাল অ্যানালিসিস'। ১৯৫৭ এ 'সিনটেক্টিক্স স্ট্রাকচারস' এ তিনি কিছু মডেলের কথা বললেন। ১৯৮৬ তে 'বরিয়াস' আর ১৯৯৫ এ 'the minimalist program'।

চমস্কির নানা প্রবন্ধে একের পর এক তত্ত্ব তৈরি করেন। সেই যুগ্মতত্ত্বগুলির চারটি সঞ্জননী ব্যাকরণে গুরুত্বপূর্ণ — ১। ইউনিভার্সাল গ্রামার বনাম পার্টিকুলার গ্রামার ২। কম্পিটেন্স ও পারফরম্যান্স ৩। ডিপ স্ট্রাকচার এবং সারফেস স্ট্রাকচারস ৪। গ্রামাটিকেল

সেনটেন্স বনাম অ্যাকসেপতেব টেবিল সেনটেন্স। এখন প্রশ্ন হল এর সাথে শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষার কি সম্পর্ক ? চমস্কি ইউ জি বনাম পিজিতে বলছেন সমস্ত শিশুর মধ্যেই বৈশ্বিক ব্যাকরণের নিয়ম কাজ করছে। শিশুদের মস্তিষ্কে রয়েছে ল্যাড বা ল্যাঙ্গুয়জ অ্যাকুইজিসান ডিভাইস যার দ্বারা সে বিশ্বের যে কোন ভাষা শিখতে পারে এমনকি একসাথে একাধিক ভাষাও শিখতে পারে। কিন্তু আমরা তাকে পিজি অর্থাৎ মাতৃভাষায় পার্টিকুলার গ্রামার এর জ্ঞান দিয়ে থাকি। আর তাই শিশুর সর্বোত্তম বিকাশ মাতৃভাষাতেই আবার পারঙ্গমতা বোধ বা কম্পিটেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ। পারঙ্গমতাবোধের সংজ্ঞায় তিনি বলছেন — " শ্রোতার মাতৃভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ভাষা ব্যবহার হল মূর্ত অবস্থায় প্রকৃত ভাষা ব্যবহার। একে সাসুর কথিত পারোল সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলেও আসলে হুমবোল্টের ইউনিভার্সাল কমপিটেন্স এর কথায় বলতে চেয়েছেন চমস্কি।

ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার তার 'ভাষা-দেশ-কাল' বইয়ে বলেছেন — " অনন্তকাল ধরে ভারতবর্ষের ইংরেজি উচ্চশিক্ষার ভাষা থাকবে কিনা সন্দেহ। মালয়েশিয়া, বার্মা, ইথিওপিয়া ইত্যাদি দেশে আমাদের ভারতবর্ষের মতোই একটি স্থানীয় ভাষা ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে উচ্চশিক্ষায় ইংরেজির সর্বাঙ্গীন অধিকার ক্রমশ সংকুচিত করে আনছে।" উচ্চশিক্ষার ভাষা বাংলা না ইংরেজি হবে সেই সম্পর্কে তার মত- "পৃথিবীর যাবতীয় উন্নত দেশে ব্যবহারিক প্রয়োজনে সেকেন্ডারি স্তর পর্যন্ত ইংরেজি শেখানো হলেও উচ্চশিক্ষা সেই সেই দেশের ভাষাতেই দেওয়া হয় - উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত। ভারতবর্ষে প্রধান ভাষা গুলি কোন দিন উচ্চশিক্ষার বাহন হতে পারবে না- এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দীর্ঘকাল পরাধীনতা পরাধীনের মানসিক দাসত্বের চিহ্ন বড় বেশি প্রকট"

১৯৫৭ সালে জি আর শর্মা 'দ্য টিচার অফ হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ' এ বলেছিলেন "No foreign language can take place of the mother tongue and no system of education can afford to disregard it without serious detriment to the mental development of the child. The child things and dreams in the language"

১৯৫৩ সালে ইউনেস্কোর কমিটি রিপোর্টে বলা হলো " The best medium for the teaching is the mother tongue of the pupil " ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন বলছে যে সে সময়কার সব থেকে ভালো স্কুল হিন্দু স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য যারা পরীক্ষায় বসত তাদের মধ্যে সফল হতো তারাই যারা — " Came from the Vernacular and not from the English Medium School."

যাই হোক মাতৃভাষা ভাল করে না জানলে অন্য ভাষা ভালো করে শেখা সম্ভব হয় না বলেই আমার ধারণা। ভালো বাংলা না জানলে কি ভালো ইংরেজি শেখা যায় ! যে ভাষায় হাজার বছরের পুরনো সাহিত্যসম্ভার রয়েছে, যে ভাষার শব্দভাণ্ডারে রয়েছে

লক্ষাধিক শব্দ, যে ভাষার এত উন্নত লিপিছাঁদ আর পরিভাষাকোষ রয়েছে, পৃথিবীর প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষের মুখের ভাষা এই বাংলা। আচ্ছা বলুন তো সেই ভাষায় কেন উচ্চশিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়? ইংরেজিকে বাদ দিতে তো আর কেউ বলেনি। কিন্তু যে ইংরেজি জানে না তার শিক্ষার অধিকার কি আমরা খর্ব করছি না আমাদের গণ্ডমূর্খতায়! চীন পারে জাপান পারে রাশিয়া পারে, আমরা পারিনা। আসলে বর্তমান যুগে ডিমান্ডের পিছনে ছুটে ছুটে আমরা আমাদের আইডেন্টিটিটা হারিয়ে ফেলছি না তো? তবে যে যাই বলুক আমরা পৃথিবীর সব লোকেরা নিজে নিজে রাতের বেলার স্বপ্নটা নিজের মাতৃভাষাতেই দেখব।

তথ্যসূত্র :

১। নাথ ,মৃণাল ১৯৯৯ ভাষা ও সমা্ নয়া উদ্যোগ ,কলকাতা।
২। চক্রবর্তী ,উদয় কুমার ১৯৯৮ বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ, অরবিন্দ পাবলিকেশ, কলকাতা।
৩। সরকার, পবিত্র ১৪০৫ ভাষা-দেশ-কাল, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

মহ: খুর্শিদ আলম

গনকণ্ঠের কবি নজরুল : হিন্দু মুসলমানের মূল সুর

'মিথ্যে শুনিনি ভাই—
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

বর্তমান ভারত তথা বিশ্বের অবস্থা অবস্থান যে তিমিরে বিদ্বেষে সেখানে হৃদয়ের পরশ মানবতার গান উক্ত দুটি লাইন গালাগালিকে গলাগলি করতে হিংসাকে করমর্দনে ভালোবাসার উত্তাপে হৃদয়েরে জয়। স্বভাবতই মানবতার জয়গান। কবি বা অকবি যাই বলি না কেন তিনি কবি নজরুল, নজরুল ইসলাম আজকের দিনে বড় বেশি প্রাসঙ্গিক।

জন্ম, বর্তমান বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে (২৪ শে মে ১৮৯৯) জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যু বর্তমান বাংলাদেশে (২৯শে আগস্ট ১৯৭৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মাটি নেন। যে বাংলাকে বাঙালিকে সারা জীবন ধরে বাঁচাতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতার (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের) পর বোধশূন্য দশাতেও বেশ ক বছর বেঁচে ছিলেন। আহারে কবি জন্ম এবং মৃত্যু দিয়ে দুটি দেশ তথা দুটি বাংলাকে বক্ষ পটে নিয়ে শুয়ে পড়েন। যে বক্ষপটের অমর সাধনা -

"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন-মণি হিন্দু তাহার প্রাণ"

কি সুন্দর বোধ প্রীতি সম্প্রীতি ঐক্যের বার্তা দেশে-দশে, মানুষে-মানুষে বার্তা। হৃদয়ে-হৃদয়ে, বোধে বার্তা। ঠিক ঠিক ভালো থাকার বার্তা। ভালোতে থাকার বার্তা।

এই কবি প্রথম দিকে শাক্ত গান লিখেন, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতায় পূজা অঙ্গনকে মাতিয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল তবুও কিছু হিন্দু অচ্ছুত মনে করত, যবন। কিন্তু কথা গান সুর কে আটকায় কে সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ ও হৃদয়ের আঙ্গিনায় সুর জেঁকে বসে। আবার অপরদিকে তৎকালীন সময়ের কিছু মোল্লা এই নজরুলকে গালাগালি দিত কাফের বলতো পরবর্তীকালে বেশ কিছু জ্ঞানীগুনির অনুরোধে ইসলামী গান গজল লিখে রাতারাতি সাড়া ফেলে দেন, যেমন—'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ'।

ভক্তি ও শক্তির প্রকাশে কত কত শ্যামগান হিন্দু উঠোন মন্দির ও হৃদয়ে ধ্বনিত হয়। ভক্তিমূলক নজরুলগীতিগুলো শ্যামা, কৃষ্ণভক্তি, আধ্যাত্মিক বহু গান জনপ্রিয়তা ও মুখে মুখে ফিরত। যেমন—ওরে নীল যমুনার জল, আই মা উমা রাখবো এবার, ব্রজগোপী খেলে হোরি, খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আন-মনে খেলিছো ইত্যাদি আজও প্রাণিত করে, করবেও চিরকাল।

কবি নজরুল সর্বত্র মানবতার জয় গানের কথাই বলতে চেয়েছেন গীতার কথা কে স্পর্শ করে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি অভেদ ঠিক তেমনি কোরানও বলছে সৃষ্টির সেরা হচ্ছে মানুষ। আশরাফুল মাখলুকাত, যা কবির কথায় -

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।"

এছাড়াও—

"এই রণভূমে বাঁশির কিশোর গাইলেন মহা-গীতা
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা"

সুভাষচন্দ্র বসুকে কবির কবিতা-গান প্রভাবিত করত। তিনি বলতেন কবি নজরুল সব যুগেই জ্যান্ত এবং পুনর্জীবিত—

"কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষান বেদী"

কিম্বা দেশ নায়কদের উদ্দেশ্যে সজাগ বার্তা-ব্রিটিশরা যখন হিন্দু মুসলমান নিয়ে ভারতবর্ষকে শাসনের নামে দ্বিধাবিভক্ত করে রাজত্ব চালাতে চাচ্ছে তখন "কান্ডারী হুশিয়ার" কবির কলমে দেশ নেতাদের সজাগের উদ্দেশ্যে—

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পন!
হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার!'
কান্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ
"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কব রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষণ বেদী।"
হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার!"

ভারতমাতার সন্তানেরা ডুবছে ভাসছে মরছে বড্ড অসহায়, সেই অসহায়তার বিরুদ্ধে দেশ নেতাদের সজাগ করার হৃদয় বার্তা, বোধ-চেতনাকে উজ্জীবিত করার বার্তা কবির কলমে-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। যা আজও একই ভাবে প্রাসঙ্গিক, সম্ভবত তাই নেতাজির বক্তব্যে উঠে আসে নজরুল সব যুগেই জ্যান্ত এবং পুনর্জীবিত। আজকের সময়ও দেশ নেতা তথা কান্ডারীদের হুশিয়ার হওয়ার বার্তা স্বদেশপ্রেম ও দেশের সম্প্রীতি-অখন্ডতা বড় মূলধন। তাইতো কবি অন্যত্র ব্যক্ত করেন—

"মানুষেরে ঘৃণা করি-
ও কারা কোরান, বেদ,বাইবেল চুম্বীছে মরি মরি ....
মূর্খরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ- গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।"

নজরুল শুধু একটি নাম না আজ। এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কারাগারের লৌহ কপাট ভাঙার কবি। হিন্দু মুসলমানের করমর্দনের কবি। সম্প্রীতি- সৌহার্দ্য -ঐক্য মাখা মানবতার কবি। তিনি গণতান্ত্রিক ভারত তথা বিশ্বের বিশ্বনাগরিক। এক হৃদয় পুরুষ। এক মানব- সংস্কৃতি। ভালোবাসার গোলাপবাগ। কবি নজরুল।

তথ্যসূত্র :

১। সঞ্চিতা—নজরুল ইসলাম, অর্ধসপ্ততিতম স্মরণ September 2025 ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণী, কোলকাতা-৩২
২। নজরুল প্রথম—ছাত্র সংহতি প্রকাশনী ৪৮ লেলিন সরণী, কোলকাতা-১৩
৩। নজরুল স্মারক বক্তৃতা মালা—সম্পাদনা বাঁধন সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৩১ বি রাজ দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কোলকাতা-৯

সাথী নন্দী

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা : দেহ, ভাষা ও নাগরিক অস্তিত্বের অন্বেষণ

কবিতার ইতিহাস মূলত মানুষের চেতনার ইতিহাস। ভাষা আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষ অনুভব করেছে যে সব কথা গদ্যে বলা যায় না। আদিম সমাজে কবিতা ছিল স্মৃতির বাহন, প্রার্থনার ভাষা এবং গোষ্ঠীর ইতিহাস টিকিয়ে রাখার উপায়। গ্রিক মহাকাব্য থেকে শুরু করে ভারতীয় ঋগ্বেদের স্তোত্রকবিতা তখন ছিল সমষ্টিগত, ছন্দনির্ভর ও ধর্ম—কেন্দ্রিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, আর কবিতাও ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত অনুভবের দিকে সরে এসেছে। বাংলা সাহিত্যে এই পরিবর্তনের ধারা স্পষ্ট। মধ্যযুগে কবিতা ছিল ধর্মীয় আখ্যান ও কাব্যকথার আধার। যেমন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি। আধুনিকতার প্রথম বড় টার্নিং পয়েন্ট আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে, যেখানে কবিতা আত্মসমীক্ষার ভাষা পায়, প্রেম, প্রকৃতি ও মানবিক বেদনা এক নতুন গভীরতা অর্জন করে। এরপর জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতাকে এনে দেন এক অনির্দিষ্ট বিষণতা, নগর ও প্রকৃতির দ্বৈত সত্তা, অস্তিত্বগত একাকিত্বের ভাষা।

স্বাধীনতা—পরবর্তী সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসুদের হাতে বাংলা কবিতা আরেকটি বড় বাঁক নেয়কবিতা হয়ে ওঠে শরীরী, রাজনৈতিক, প্রশ্নমুখর। একই সময়ে বাংলাদেশের কবিতাও গড়ে তোলে নিজস্ব আধুনিকতা। শামসুর রাহমান নাগরিক চেতনা ও রাষ্ট্রবোধকে কবিতার কেন্দ্রে আনেন; আল মাহমুদ ইতিহাস ও ভূমির স্মৃতি মেশান ব্যক্তিগত কণ্ঠে; শহীদ কাদরী বাংলা কবিতাকে দেন নিঃসঙ্গ আধুনিক মানুষের তীক্ষ্ণ, সংক্ষিপ্ত স্বর। এই দুই বাংলার কবিতা তখন সমান্তরালভাবে আধুনিকতার চাপ ও সম্ভাবনা বহন করে এগোতে থাকে।

এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতার মধ্যেই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয় যেখানে বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি, শরীরের রাজনীতি, রাষ্ট্রের সহিংসতা, প্রেমের ভাঙন ও ব্যক্তিগত অস্তিত্ব একসঙ্গে কবিতার ভিতরে ঢুকে পড়ছে। ছন্দ ভেঙে যাচ্ছে, কবিতা হাঁটছে গদ্য—কবিতার সীমান্তে, ভাষা নিচ্ছে দীর্ঘ শ্বাসের মতো বিস্তৃত লাইন। এই পর্যায়ে এসে কবিতার আরেকটি টার্নিং পয়েন্ট স্পষ্টকবিতা আর কেবল সৌন্দর্যের নয়, তা হয়ে উঠছে চেতনার নথি। এই পরিসরে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতার আবির্ভাব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এমন এক ধারার কবি, যিনি পূর্ববর্তী আধুনিকদের প্রভাব অস্বীকার করেন না, আবার কারও অনুকরণেও থেমে থাকেন না। তাঁর কবিতায় শক্তি—সুনীলের উত্তরাধিকার যেমন আছে, তেমনি বাংলাদেশের আধুনিক কবিতারবিশেষত শহীদ কাদরীর সংযত গভীরতা ও

শামসুর রাহমানের নাগরিক বোধেরএকটি রূপান্তরিত প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু এই প্রভাবগুলো তাঁর কবিতায় এসে ভেঙে যায়, নতুন বিন্যাস পায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলসুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতায় "অস্বস্তি" কোনও আলঙ্কারিক কৌশল নয়, এটি সময়ের স্বাভাবিক ফল। তাঁর কবিতায় মৃত্যু সুন্দর হয়ে ওঠে না, প্রেম মহিমান্বিত হয় না, শরীর পবিত্র থাকে না। এই অস্বস্তি আসলে পাঠককে স্বস্তি না দেওয়ার নৈতিক সিদ্ধান্ত। কারণ সমকালীন বাস্তবতা নিজেই স্বস্তিহীন। এইখানেই তিনি অনুসরণকারী নন। শক্তি বা সুনীলের শরীরী কবিতার উত্তরাধিকার থাকলেও, তিনি সেই বিদ্রোহী রোমান্টিসিজমে থেমে থাকেন না। শহীদ কাদরীর সংযত স্বরের কাছাকাছি গেলেও, তাঁর কবিতা আরও বিস্তৃত, আরও দীর্ঘ, আরও ক্লান্ত। তিনি একটি নিজস্ব পথ বেছে নেনযেখানে কবিতা অনুভূতির প্রকাশ নয়, অস্তিত্বের চাপ সহ্য করার এক প্রক্রিয়া। এই পথ বেছে নেওয়া কবিতার ইতিহাসে জরুরি, কারণ প্রতিটি যুগের কবিতা তার সময়ের ভাষা খোঁজে। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সেই খোঁজের কবি। তাঁর কবিতায় পাঠক সহজে আশ্রয় পায় না, কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের অস্বস্তিকেই চিনতে শেখে।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষা। এই ভাষা গদ্য ও কবিতার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে, দীর্ঘ শ্বাসে এগোয়। "তুমি—আমি" সম্বোধনের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিগত প্রেম ও বিরহ ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ে ইতিহাস, রাষ্ট্র, শরীর ও অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাঁর চিত্রকল্পে শরীর কখনও ব্যক্তিগত নয়তা রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত, স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত, মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত। প্রেম এখানে রোমান্টিক আশ্রয় নয়, বরং প্রশ্ন ও ভাঙনের জায়গা। এই কারণেই তিনি কেবল অনুসরণকারী নন। তিনি একটি নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছেনযেখানে কবিতা আর সাজানো অনুভূতির প্রকাশ নয়, বরং জীবনের গভীরে নামার একটি পদ্ধতি। এই পথ বেছে নেওয়াই সমকালীন কবিতার ইতিহাসে জরুরি, কারণ আজকের সময় সরল ভাষা বা পরিচ্ছন্ন অনুভূতিতে ধরা দেয় না। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সেই জটিল সময়ের ভাষা নির্মাণের চেষ্টা করেন। কোভিড—পরবর্তী সময়ে তাঁর কবিতায় আরও স্পষ্টভাবে উঠে আসে শরীরের ভঙ্গুরতা, নিঃশ্বাসের রাজনৈতিক অর্থ, মৃত্যুর নৈকট্য ও মানুষের একাকিত্ব। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে "আমাকে ধারণ করো, অগ্নিপুচ্ছ মেঘ" এই চেতনাগত ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এখানে কবি নিজেকে যেমন ভেঙে দেখেন, তেমনি পাঠককেও বাধ্য করেন নিজের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করতে।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের জন্ম বাংলাদেশের দক্ষিণ ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার বান্দুরা গ্রামে। শৈশবেই পারিবারিক কারণে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং পুরান ঢাকার নারিন্দা—লক্ষ্মীবাজার—সুত্রাপুর অঞ্চল তাঁর মানসগঠনে গভীর ছাপ ফেলে। এই

নগরজীবনের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় নাগরিক ক্লান্তি, দেহগত অস্বস্তি ও অস্তিত্বগত সংশয়ের রূপ নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে তিনি স্নাতকোত্তর। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখালেখির শুরু এবং শুরু থেকেই তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যপরিসরের বদলে বিকল্প ও প্রান্তিক প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন। পেশাগত জীবনে কর্পোরেট ও আইটি-সম্পর্কিত কাজে যুক্ত থাকলেও তাঁর সাহিত্যচর্চা কখনোই থেমে থাকেনি।

কবিতাই গোমেজের প্রধান ক্ষেত্র। 'তনুমধ্যা', 'পুলিপোলাও', 'ঝালিয়া', 'মর্নিং গ্লোরি', 'ভেরোনিকার রুমাল', 'হাওয়া-হরিণের চাঁদমারি', 'আমাকে ধারণ করো, অগ্নিপুচ্ছ মেঘ', 'ইশকনামা' ও 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-সহ একাধিক কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র ভাষা ও ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তিনি উপন্যাস ও গল্পও লিখেছেন এবং অনুবাদেও তিনি দক্ষ। অস্ট্রেলীয় ও বিশ্বকবিতার নির্বাচিত অনুবাদে তিনি ভাষান্তরকে কেবল অনুবাদ হিসেবে নয়, বরং এক ধরনের সাংস্কৃতিক সংলাপ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর গদ্য লেখায়ও একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়ভাষার ভাঙন, স্মৃতি, ইতিহাস ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব সেখানে কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। গোমেজের কবিতার মূল বৈশিষ্ট্যই হল যে তিনি কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ বা সরাসরি রাজনৈতিক উচ্চারণের কবি নন। তাঁর কাছে রাষ্ট্র, ইতিহাস বা ক্ষমতা দেহ ও ভাষার ভেতর দিয়েই উপস্থিত হয়। অসম্পূর্ণ বাক্য, নীরবতা, দীর্ঘ বিরতি ও আত্মসংশয়ী উচ্চারণ তাঁর কবিতাকে একধরনের অস্তিত্বগত অস্বস্তির পরিসরে নিয়ে যায়। লক্ষণীয় যে, দীর্ঘ সাহিত্যজীবন সত্ত্বেও তিনি কখনোই বড় কাগজ বা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যবাজারের নিয়মিত কবি ননএটি কেবল ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, বরং ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে রাখার এক সচেতন অবস্থান মনে হয়। কবিতার ইতিহাসে এমন কণ্ঠই টিকে থাকে, যাঁরা সময়ের সঙ্গে আপস না করে নিজের ভাষা নির্মাণ করেন। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সুব্রত অগাস্টিন গোমেজকে একটি বই বা একটি পর্যায়ে আটকে দেখা নয়। বরং তাঁর সমগ্র কাব্যযাত্রাকে একটি ধারাবাহিক বৌদ্ধিক ও ভাষাগত অভিযাত্রা হিসেবে পাঠ করা। প্রাথমিক গ্রন্থগুলিতে যে ব্যক্তিগত ও আবেগগত স্বর ধরা পড়ে, তা কীভাবে ধীরে ধীরে দেহ—রাষ্ট্র—নাগরিক চেতনায় রূপান্তরিত হয় এবং সাম্প্রতিক গ্রন্থগুলিতে এসে কীভাবে সেই স্বর অস্তিত্বগত, প্রায় দার্শনিক অস্বস্তিতে পৌঁছয়এই রূপান্তরের মানচিত্র আঁকাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "তনুমধ্যা"-তে দেখা যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রেম এবং দৈনন্দিন জীবনের সংযত ভঙ্গিতে লেখা লাইনগুলো, যেখানে 'অস্বস্তি' বীজ

আকারে থাকে। দীর্ঘ শ্বাসের মতো পঙ্‌ক্তি, প্রশ্নবোধক বাক্য এবং স্বরলীন ভাঙন পাঠকের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী অস্থিরতা তৈরি করে। কবি ব্যক্তিগত প্রেম, বিরহ ও আবেগের মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন, এবং সেই কবিতাগুলোতে ভাষা তুলনামূলকভাবে সহজ ও ক্লান্ত। পরবর্তী গ্রন্থ 'ঝালিয়া', ও 'মর্নিং গ্লোরি'-তে গোমেজ ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আরও প্রসারিত করেন। এখানে শব্দ আর অর্থের মধ্যকার দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, এবং রূপক ও ইঙ্গিত পাঠকের সক্রিয় অংশগ্রহণে বাধ্য করে। 'ভেরোনিকার রুমাল', কিংবা 'হাওয়া-হরিণের চাঁদমারি'-তে চিত্রকল্পের ঘনত্ব এবং ভাষার স্পর্শযোগ্যতা আরও বেড়ে যায়। সাধারণ শব্দকেও কবি এমনভাবে ব্যবহার করেন যেন তা পাঠকের দেহ ও মনে সংবেদন তৈরি করে। সেই সময়ের কবিতায় গোমেজ ইচ্ছাকৃতভাবে পাঠযোগ্যতার স্বাচ্ছন্দ্য ভেঙে দেন; তিনি চান পাঠক শব্দের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করুক, অনুভূতি অনুভব করুক।

"হাওয়া-হরিণের চাঁদমারি"-তে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা নাগরিক অস্তিত্ব ও দেহ-সংবেদনার সংকটকে ভাষার ভেতর স্পর্শযোগ্য করে তোলে। যেমন "চাঁদ, এমনই তোমার ভেলকি, কালকে ঢাকা গিয়ে আমি/ পরশু ফিরে এলাম (জন্মসূত্রে) অতীতের নাগরিকতাও" (১) এই পংক্তিগুলোয় রাষ্ট্র, ভিসা, জন্মসূত্রের মতো প্রশাসনিক ভাষা ব্যক্তিগত স্মৃতি ও আত্মপরিচয়ের ভাঙনের সঙ্গে মিশে যায়। নাগরিকতা এখানে কাগজের নয়, এক অনিশ্চিত অতীতের ক্ষত। আবার "আমি অন্ধ, সেও, দুই ভিন্ন আলোকের জীবন-মৃত্যুর মাঝে অদৃশ্য মসলিন"(২) পংক্তিতে আলো—অন্ধকারের দ্বন্দ্ব শরীরী অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়, যেখানে অস্তিত্ব এক প্রকার স্পর্শহীন অথচ অনুভূত পর্দার মতো ঝুলে থাকে। একইভাবে "ওরা কি এখনও ভালোবাসে/ আমাকে? .... আমাকে কি ভালোবাসে কেউ?" (৩) এই সরল প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি নাগরিক সমাজের ভেতর একাকিত্ব ও অস্বীকৃতির বোধকে নগ্ন করে দেয়। এমনকি "আমি কি নিশ্বাস নেব? ইজাজত হবে?" (৪) প্রশ্নটি দেহের সবচেয়ে মৌলিক অধিকারকেও অনুমতির অধীন করে তোলে। আর "মাঠে এক গাছ,/ একা।/ তার নিচে ছাতামাথা একাকী মানুষ।/ খালি বৃষ্টি আর ঘাম সমবেত" (৫) এখানে চিত্রকল্পের যে নিঃসঙ্গতা তা কেবল মানসিক নয়, দৃশ্যমান ভূগোল হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থে গোমেজ ইচ্ছাকৃতভাবে পাঠযোগ্যতার স্বাচ্ছন্দ্য ভেঙে দেন; শব্দকে ভাবের বাহন না রেখে শরীর ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করেন, ফলে কবিতাগুলো পাঠকের দেহ ও মনে একসঙ্গে সংবেদন সৃষ্টি করে।

এরপর মধ্যপর্বের গ্রন্থ 'পুলিপোলাও'-তে এই ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরও গভীরভাবে দেখা যায়। এখানে দেহ, রাষ্ট্র এবং নাগরিক চেতনার সংযোগ ঘটে, যেখানে বাক্য ভাঙা, থেমে যাওয়া এবং দোলাচল পাঠককে স্বতঃসিদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় আকৃষ্ট করে।

প্রেম, দেশ, প্রবাস এবং মৃত্যুচেতনাকে গোমেজ এমনভাবে লিখেছেন যে তা আর সরল আবেগ নয়; বরং পাঠকের মধ্যে প্রশ্ন, দ্বিধা এবং অস্থিরতা জাগায়। যেমন পুলিপোলাও-তে দেখা যায়, "কবে তোর ফিরুজা চুলের / বিপরীত ঢেউ এসে আমারে ভাসাল নিরুদ্দেশে / তার দিন-ক্ষণ আর মনে নাই তবু সেই পেলব ভুলের / আরক্ত মাসুল গনি আজও দিনশেষে।" (৬) প্রেম এখানে আর রোমান্টিক মুক্তির প্রতীক নয়; এটি এক দীর্ঘস্থায়ী অনুশোচনার জন্ম দেয়।

'আমাকে ধারণ করো, অগ্নিপুচ্ছ মেঘ',-এ ভাষা আরও তীব্র এবং নির্দয় হয়ে ওঠে। এখানে ঈশ্বর, অপরাধবোধ ও যৌনতার সম্পর্ক চূড়ান্ত সংকটে পৌঁছে যায়। "পাপের চেয়েও কালো অপরাধ-বোধে বীর্যপাতে / মোতায়েন হ'য়ে, কারা ঈশ্বরের অংশ হয়ে যাবে?" (৭)এই পঙ্ক্তি দেখায় কীভাবে ঈশ্বর আর পবিত্রতার প্রতীক নয়, বরং ক্ষমতা ও বিচার ব্যবস্থার প্রতিমূর্তি। এছাড়াও শরীর ও যৌনতা সম্পর্কিত স্বর এখানে ক্লান্ত, অপরাধী এবং ক্ষয়প্রাপ্ত। তাইতো তিনি বলেন ----"এমনকি স্বপ্নও বিরক্তিকর, এমনকি যৌনতা পানসে।" (৮) আবার মৃত্যু ও দেহচেতনাও গভীরভাবে অন্বেষিত: "পায়ের পাতা থেকে আলতো উঠে আসে মৃত্যু / নিজের চোখে দেখি আমসি হয়ে যেতে নিজেকে।" (৯)

এই পর্যায়ের কবিতায় দেখা যায় যে গোমেজের ভাষা পরীক্ষামূলক, দীর্ঘ শ্বাসের লাইন, ভাঙা বাক্য এবং গদ্য-কবিতার সীমান্তে অবস্থান পাঠকের জন্য এক চ্যালেঞ্জ। তবে, প্রতিটি গ্রন্থের স্বর একই রকম ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, যা কবির স্বাক্ষর হিসেবে কাজ করে। পাঠক লক্ষ করতে পারে, "তনুমধ্যা" থেকে "আমাকে ধারণ করো, অগ্নিপুচ্ছ মেঘ" পর্যন্ত ভাষার বিবর্তন, প্রশ্নবোধকতা এবং অনুভূতির গভীরতা ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থগুলিতে এসে কবিতার স্বর আর কেবল ব্যক্তিগত বা নাগরিক স্তরে আবদ্ধ থাকে না। এখানে কবিতা পৌঁছে যায় এক গভীর অস্তিত্বগত অস্বস্তিতেযেখানে প্রশ্ন আর রাষ্ট্রকে ঘিরে নয়, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলিতেবিশেষত "আমাকে ধারণ করো, অগ্নিপুচ্ছ মেঘ"- এ আমরা দেখি, কবির ভাষা আগের মতো সরাসরি প্রতিবাদী নয়, আবার নিছক আবেগপ্রবণও নয়। এই ভাষা সংশয়ী, ভগ্ন, প্রায় আত্মজিজ্ঞাসামূলক। কবিতা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেএই পৃথিবীতে থাকা মানে কী, দায় মানে কী, এবং নীরবতাও কি এক ধরনের অপরাধ নয়? এখানে "আমি" আর আগের মতো নির্দিষ্ট পরিচয়ের বাহক নয়সে কখনও নাগরিক, কখনও প্রেমিক, কখনও সাক্ষী, আবার কখনও অভিযুক্ত। দেহ আর রাষ্ট্রের সংঘর্ষের পর, এই পর্বে কবিতা ঢুকে পড়ে দেহ ও বিবেকের সংঘাতে। ঈশ্বর, বিশ্বাস, অপরাধবোধসবই উপস্থিত, কিন্তু কোনওটিই নিশ্চিত

আশ্রয় হয়ে ওঠে না। ঈশ্বর এখানে মুক্তিদাতা নন, ঈশ্বর প্রশ্নের আরেক নাম। ভাষাগত দিক থেকেও এই পর্বে এক স্পষ্ট পরিবর্তন চোখে পড়ে। বাক্য আরও সংক্ষিপ্ত, থেমে থেমে এগোনো। অনেক সময় অর্থ সম্পূর্ণ হয় নাপাঠককে সেই অসম্পূর্ণতার ভেতরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই ভাঙা ভাষা আসলে কবির দার্শনিক অবস্থানেরই প্রতিফলনযেখানে নিশ্চিত উত্তর নেই, আছে কেবল অস্বস্তিকর উপস্থিতি। এইভাবে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় এক গভীর মানবিক সংকটেযেখানে ব্যক্তিগত অনুভব, রাজনৈতিক বাস্তবতা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন একাকার হয়ে যায়। এখানেই তাঁর কাব্যযাত্রা পূর্ণতা পায়কারণ এই কবিতা আর শুধু কিছু ঘটনার প্রতিক্রিয়া নয়, বরং বেঁচে থাকার অর্থ নিয়ে এক নিরন্তর জিজ্ঞাসা।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল ভাষার ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'তনুমধ্যা'-তে ভাষা তুলনামূলকভাবে সংযত, যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রেম এবং দৈনন্দিন জীবনের নৈসর্গিকতা প্রকাশের জন্য সরল ও প্রায় ক্লান্ত স্বরের লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দীর্ঘ শ্বাসের মতো পঙ্ক্তি, প্রশ্নবোধক বাক্য এবং স্বরলীন ভাঙন একটি সূক্ষ্ম 'অস্বস্তি বীজ' তৈরি করে, যা পরবর্তী কবিতার ভিত্তি গড়ে। পরবর্তী গ্রন্থ 'ঝালিয়া', ও 'মর্নিং গ্লোরি'-তে সেই ভাষাগত পরীক্ষা - নিরীক্ষা আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়; শব্দ আর অর্থের মধ্যকার দূরত্ব বাড়ে, রূপক ও ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে পাঠককে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়। 'ভেরোনিকার রুমাল' এবং 'হাওয়া-হরিণের চাঁদমারি'-তে চিত্রকল্পের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, ভাষা ভিজ্যুয়াল ও স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে; সাধারণ শব্দকেও কবি এমনভাবে সাজান যে তা পাঠকের শরীরের অনুভূতির সাথে সখ্য স্থাপন করে। 'পুলিপোলাও'-তে কবি ভাষার এই পরীক্ষা আরও গভীর করে নেনদেহ, রাষ্ট্র ও নাগরিক চেতনাকে একত্রিত করে, যেখানে বাক্য ভাঙা, থেমে যাওয়া, দোলাচল ইত্যাদি পাঠকের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। অবশেষে 'আমাকে ধারণ করো, অগ্নিপুচ্ছ মেঘ'-এ ভাষা এসে দাঁড়ায় এক চূড়ান্ত পরীক্ষার মঞ্চে, যেখানে প্রশ্নবোধক, অসম্পূর্ণ, থেমে যাওয়া ও আক্রমণাত্মক বাক্যগুলো কবিতার মানসিক অস্থিরতা ও অস্তিত্বগত অস্বস্তিকে আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করে। অন্যান্য গ্রন্থ যেমন 'ইশকনামা' ও 'ছুরিতে ঠিকরানো আঁধিয়ার'-এও এই ভাষাগত অভিযাত্রা অব্যাহত থাকে, যেখানে শব্দকে অস্ত্র বা অস্তিত্ব পরীক্ষা করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখায় যে, গোমেজ কোনো স্থিতিশীল বা একঘেয়ে ভাষার দিকে ঝুঁকেননি; বরং প্রতিটি বই নতুন সংকট, নতুন স্বর, নতুন ভঙ্গি আর নতুন মানসিকতা নিয়ে এসেছে। পাঠক 'তনুমধ্যা', থেকে 'অগ্নিপুচ্ছ মেঘ' পর্যন্ত এই ভাষাগত বিবর্তনের মধ্য

দিয়ে কবির মানসিক ও বৌদ্ধিক অভিযাত্রায় এক ধারাবাহিক অংশগ্রহণের সুযোগ পায়যা সুব্রত অগাস্টিন গোমেজকে বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র স্থানে স্থাপন করে।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কিছুটা আগে ও পরে যাঁরা কবিতার জগতে পদার্পণ করেন সেই সমস্ত কবিদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ---মাসুদ খান, জুয়েল মাজহার, মজনু শাহ, ব্রাত্য রাইসু, শামীম রেজা কিংবা কুমার চক্রবর্তী। এই নামগুলো কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতর প্রবাহকে চিহ্নিত করে। এঁদের কবিতায় নাগরিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক ক্ষোভ, ভাষার ভাঙচুর ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রুপ অত্যন্ত সচেতনভাবে উপস্থিত। বিশেষত ব্রাত্য রাইসুর কবিতায় ভাষা একধরনের তাত্ত্বিক প্রতিবাদী অস্ত্র হয়ে ওঠেযেখানে ইতিহাস, রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয় উচ্চস্বরে, প্রায় ম্যানিফেস্টোর ভঙ্গিতে। মাসুদ খান বা জুয়েল মাজহারের কবিতায়ও দেখা যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সামাজিক বাস্তবতার দিকে সরাসরি যাত্রা; সেখানে ভাষা অনেক সময় বক্তব্যকে বহন করার জন্য নিজেকে শক্ত, তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট করে তোলে। মজনু শাহের কবিতায় আবার একধরনের লোকায়ত স্মৃতি, ধর্মীয় বোধ ও প্রান্তিক মানুষের জীবনানুভব ভাষার মধ্যে প্রবেশ করেযা পাঠককে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আবার দেখা যায় যে শামীম রেজার কবিতায় গ্রামীণ বাস্তবতা, নদী-মাটি-মানুষের জীবনানুভব ও ঐতিহ্যগত স্মৃতি একটি সংগঠিত কাব্যভাষার মধ্য দিয়ে উপস্থিত হয়। তাঁর কবিতা পাঠককে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার ভেতরে স্থাপন করে। ভাষা সেখানে অনুভবের বাহন, অস্থিরতার ক্ষেত্র নয়। কুমার চক্রবর্তীর কবিতায় আবার ব্যক্তিগত স্মৃতি, সম্পর্ক, নিঃসঙ্গতা ও নাগরিক জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি গুরুত্ব পায়। তাঁর ভাষা আত্মকথনের দিকে ঝোঁকে এবং অভিজ্ঞতার সরাসরি প্রকাশে আস্থাশীল।

এই প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করলে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের অবস্থান একেবারেই ভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে। গোমেজ রাষ্ট্র বা রাজনীতির প্রশ্ন এড়িয়ে যান না, কিন্তু তিনি সেই প্রশ্নকে কখনোই সরাসরি স্লোগান, তত্ত্ব বা বুদ্ধিবৃত্তিক ঘোষণায় রূপ দেন না। তাঁর কবিতায় রাষ্ট্র ঢুকে পড়ে দেহের ভিতর দিয়ে, নাগরিক চেতনা আসে ক্লান্তি, দ্বিধা ও অস্তিত্বগত অস্বস্তির মধ্য দিয়ে। যেখানে রাইসু বা মাসুদ খানের কবিতা পাঠককে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আঘাত করে, গোমেজ সেখানে পাঠককে ধীরে ধীরে অস্বস্তির মধ্যে আটকে দেনভাষার ভাঙা গঠন, অসম্পূর্ণ বাক্য, দীর্ঘ নীরবতা আর প্রশ্নবোধক শূন্যতার মাধ্যমে। তাঁর কবিতায় ভাষা শুধু প্রতিবাদের বাহন হয়ে ওঠে না, ভাষা নিজেই সমস্যায় পড়ে, নিজেকেই সন্দেহ করে। এই আত্মসংশয়ী ভাষাই গোমেজকে আলাদা করে। গোমেজ গ্রামীণ স্মৃতি, সামাজিক বর্ণনা বা মানবিক আবেগকে কবিতার চূড়ান্ত আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেন না। তাঁর কবিতায় ভাষা

নিজেই একটি সংকটপূর্ণ সত্তাযা বারবার ভেঙে পড়ে, দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং নিজের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। যেখানে শামীম রেজার লেখায় বাস্তবতা একটি দৃশ্যমান কাঠামো হিসেবে হাজির হয়, গোমেজের কবিতায় সেই বাস্তবতা দেহ, চেতনা ও ভাষার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতার 'আমি' কখনো সুসংহত পরিচয় দাবি করে না, তা ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত, অপরাধবোধে আক্রান্ত এবং অস্তিত্বগতভাবে অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। শামীম রেজা বা কুমার চক্রবর্তীর কবিতা যেখানে পাঠককে পরিচিত বাস্তবতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে নেয়, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সেখানে পাঠককে সেই পরিচিতির ভিত ভেঙে দেখাতে বাধ্য করেন। তাঁর কবিতা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বক্তব্যে পৌঁছাতে চায় না; বরং ভাষা, দেহ ও নাগরিক অস্তিত্বের মধ্যেকার ফাটলগুলোকে উন্মুক্ত করে দেয়। এই কারণেই তিনি তাঁর সমসাময়িকদের অনুসরণকারী নন; বরং বাংলা সমকালীন কবিতায় এক ধরনের ভাষাগত-অস্তিত্বগত অন্বেষার স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছেন, যা তাঁকে আলাদা করে চিহ্নিত করে এবং গবেষণার উপযোগী করে তোলে। আরও একটি মৌলিক পার্থক্য হল যে বাংলাদেশের এই কবিদের অনেকের লেখায় ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ একটি দৃশ্যমান কাঠামো হিসেবে হাজির হয়, কিন্তু গোমেজের কবিতায় সেই কাঠামো ভেঙে পড়ে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ভেতরে। তাঁর কবিতায় 'আমি' কখনো শক্ত উচ্চারণে না দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত, অনিশ্চিত ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে গোমেজের কবিতা পড়া মানে শুধু সমকাল বোঝা নয়, তাঁর কবিতা পড়া মানে ভাষার ভিতরে বাস করা একধরনের দার্শনিক অস্থিরতাকে অনুভব করা। এইখানেই তিনি তাঁর সমসাময়িকদের থেকে আলাদাতিনি বক্তব্যের কবি নন, তিনি সংকটের কবি; তিনি সিদ্ধান্তের ভাষা লেখেন না, তিনি সিদ্ধান্তহীনতার ভাষাকেই কবিতার কেন্দ্রে বসান। এই কারণে বলা যায়, মাসুদ খান, জুয়েল মাজহার, মজনু শাহ বা ব্রাত্য রাইসু যেখানে সমকালকে বিশ্লেষণ করেন উচ্চারণ ও বোধের স্তরে, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ সেখানে সমকালকে ভেঙে দেন ভাষার ভিতর থেকে। তাঁর কবিতা কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রতিনিধি নয়; তাঁর কবিতা বাংলা কবিতায় এক ধরনের অস্তিত্বগত—ভাষাগত অস্বস্তির ধারাকে প্রতিষ্ঠা করে, যা তাঁকে শুধু সমসাময়িকদের থেকে নয়, গোটা বাংলা কবিতার প্রথাগত পাঠ থেকেও আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

সর্শেযে বলা যায়, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কাব্যচর্চা কোনো বিচ্ছিন্ন কবিতার সমষ্টি নয়। তাঁর কবিতা এক ধারাবাহিক বৌদ্ধিক, ভাষাগত ও সংবেদনশীল অভিযাত্রা, যেখানে প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ আগের প্রশ্ন বহন করে এবং নতুন সংকট ও সম্ভাবনা উদ্ভাবন করে। 'তনুমধ্যা' থেকে শুরু করে 'ঝালিয়া', 'মর্নিং গ্লোরি', 'ভেরোনিকার রুমাল', 'হাওয়া-হরিণের চাঁদমারি', 'পুলিপোলাও' এবং 'আমাকে ধারণ করো', 'অগ্নিপুচ্ছ মেঘ'

প্রতিটি গ্রন্থে আমরা দেখেছি ভাষা, দেহ, প্রেম, স্মৃতি, প্রবাসী চেতনা ও অস্তিত্বগত অস্বস্তি কীভাবে ক্রমবর্ধমানভাবে পরিপূর্ণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক হয়ে ওঠে। কবির ভাঙা, দীর্ঘশ্বাসময় এবং বহুস্তরবিশিষ্ট ভাষা পাঠককে অনুভবের পাশাপাশি মানসিক ও দেহগতভাবে নাড়া দেয়। আমরা আবিষ্কার করেছি সুব্রত কেবল ব্যক্তি বা আবেগের কবি নন, তিনি সমকালীন নাগরিক ও সামাজিক চেতনারও কবি, যিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দেহ ও রাষ্ট্রকে একত্রিত করে এক নতুন কাব্যভাষার জন্ম দিয়েছেন। এই ভাষা বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ঘরানা সৃষ্টি করেছেযে ঘরানায় পাঠক আরাম বা সহজে বোঝার জন্য নয়, বরং বোধ, অস্বস্তি এবং সচেতন প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করতে বাধ্য হয়। এই দিকগুলোই সুব্রত অগাস্টিন গোমেজকে সমসাময়িক বাংলা কবিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে এবং তাঁর কাব্যকে শুধুমাত্র পাঠযোগ্য নয়, গবেষণার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

তথ্যসূত্র :

১. ‘হাওয়া-হরিণের চাঁদমারি’ : সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, ভাষা চিত্র, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৫।
২. তদেব : পৃষ্ঠা ৩০।
৩. তদেব : পৃষ্ঠা ৪৫।
৪. তদেব : পৃষ্ঠা ৪৫।
৫. তদেব : পৃষ্ঠা ৫৪।
৬. ‘পুলিপোলাও’ : সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, একবিংশ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৭।
৭. ‘আমাকে ধারণ করো’, ‘অগ্নিপুচ্ছ মেঘ’ : সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, আদর্শ, ২০১২, পৃষ্ঠা ৩৮।
৮. তদেব : পৃষ্ঠা ৩৬।
৯. তদেব : পৃষ্ঠা ২৭।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. কাদেরী, বায়তুল্লাহ্‌বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২১।
২. রহমান, ড. মিজানবাংলা কবিতা : সমালোচনা পাঠ, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

সহায়ক অনলাইন উৎস:

১. www.banglakobita.net
২. www.bangla-kobita-.com
৩. www.kaurab.com
৪. www.journal.library.du.ac.bd (Shahitto Potrika)
৫. www.prothomalo.com
৬. www.thedailystar.net-literature

ডাক্তার মাহাত

উনিশ শতকের আলোকে সধবা-বিধবা নারী মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ 'মধুমতী'

উনিশ শতক বাংলা সাহিত্যের একটা অন্যতম অধ্যায়। নিঃসন্দেহে এই শতকের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছাড়াও সেইসময় একাধিক মানুষ উপন্যাস লেখার জন্য কলম ধরেছিলেন, তাঁরা হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি, কিন্তু সেই ঔপন্যাসিকের কলমেও সমাজের নানান দিক উন্মোচিত হয়েছে। যেমন সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের আটপৌরে, ঘরোয়া নারীর কাহিনির কথা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে স্ত্রী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ সংক্রান্ত মতামত, বিবাহ জীবনে দুঃসহ অত্যাচার ভোগ, কৌলিন্য প্রথার অত্যাচার, পরিবারের অর্থলোভে মেয়েদের পুনর্বিবাহ, সাংসারিক অভাবে শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ, বারাঙ্গনাদের অবস্থা পরিবর্তনে সংশোধন পরিকল্পনা, জন কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা, তেমনই পাশাপাশি নারী প্রগতিকে মেনে নিতে না পারা প্রভৃতি প্রসঙ্গ। এইসব ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, মীরমশারফ হোসেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ পাল, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, পাঁচকড়ি দে, হারানশশী দে, দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক। উল্লিখিত সব ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে যে পাওয়া গেছে এমনটাও নয়, তবে নারী প্রগতির দিকটি কমবেশি প্রত্যেকের কলমে ধরা পড়েছে। আমাদের আলোচ্য আলোচনায় তৎকালীন সমাজে একদল মানুষ অতীত সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই, আর একদল মানুষ আধুনিকতাকে গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে চাই। অর্থাৎ উনিশ শতকের আলোকে সধবা-বিধবা নারী মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব এই বিষয়টি উপন্যাসের পাতায় কতটা স্থান পেয়েছে তা আলোচিত হবে।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত আলোচ্য 'মধুমতী' উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৮৭৩ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। উপন্যাসটি বৃহতাকার না হলেও উপন্যাসের সবকটি লক্ষণই বর্তমান। মূলত এটি হচ্ছে স্মৃতিভ্রষ্ট এক নারীর পুনরুত্থানের আখ্যান। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সেরকম কোনো লক্ষণ এখানে পাওয়া যায়নি। তবে এটি অবশ্যই একটি সামাজিক উপন্যাস। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বসবাসকারী মানুষেরা প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাইরে গিয়ে কোন কাজ করতে নারাজ। অর্থাৎ আইনি স্বীকৃত নিয়মনীতিকে অস্বীকার করতে চায়। মূলত এই দুই ধরনের মন মানসিকতার মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় এই 'মধুমতী' উপন্যাসে মধুমতী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। আমরা মধুমতী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে

মধুমতীর মধ্যে ঘটে যাওয়া অতীত ও বর্তমানের সংঘাতের ফলে অর্থাৎ নতুন এবং পুরাতনের দ্বন্দ্বে সে কিভাবে নতুনকে ছেড়ে পুরাতন সংস্কারকে বেছে নিল, মূলত সেই দিকটিকে জোর দেওয়া হবে।

উনিশ শতকের ধারায় দুটো সমাজ ব্যবস্থা সাহিত্যে স্থান পাচ্ছে। এক অভিজাত বংশের জীবন সংস্কৃতি, অন্য এক ধারা গ্রামীণ সমাজের সংস্কৃতি। উনিশ শতকের শুরুতে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হওয়ার ভয় ছিল। মানব চরিত্রের জটিল কোনো সমস্যা নয়, কোনও মানসিক দ্বিধার ইতিহাস নয়। তাঁর চাইতে এই সমসাময়িক ঔপন্যাসিকরা বেছে নিয়েছিলেন সামাজিক সমস্যা সমাধানের দিকটিকে বালবিধবার দুঃখ, কুলীন কন্যার বিবাহ সমস্যা, পুরুষের বহুবিবাহ, স্বামীর ব্যাভিচারের ফলে স্ত্রীদের দুর্দশা। মেয়েদের ব্যভিচার হওয়ার শাস্তি, বৈধব্যজনিত সমস্যা, বিধবা বিবাহ, শাশুড়ি ননদিনীর দুর্ব্যবহার ইত্যাদি কারণে নারী জীবনে দুঃখ দুর্দশা বিলাপ ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে উনিশ শতকের উপন্যাসে।

উপন্যাসের শুরুতে এক ঝড়ের প্রসঙ্গ রয়েছে, এই ঝড় যেন অতীতের সব কিছুকে ভুলিয়ে দিতে চাই। আলোচ্য এই উপন্যাসে 'মধুমতী' নদীর তীরে এক যুবতীকে উদ্ধার করে করালী নামের এক ব্যক্তি, পেশাতে সে চিকিৎসক এবং তাকে সুস্থ করে তোলে। নামহীন, আশ্রয়হীন এই বালিকাকে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়। তার পূর্বপরিচয় জানা যায় না। এই দুর্ঘটনাতে তার স্মৃতিভ্রষ্ট হয়। তাই তাকে দেখাশোনা করার জন্য এক দাসী রাখে। করালী এই নামহীন নারীর নাম রাখে 'মধুমতী'। এইরকম নামকরণের কারণ হিসেবে জানায় তাকে মধুমতী নদীর তীরে পেয়েছিল বলে। এখন করালী যেখানে যেখানে যায়, যা যা কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে সেও করে কিন্তু মধুমতীর একটাই আক্ষেপ জলে ডোবার আগের কোনও স্মৃতিই তার মনে পড়ে না। এখন তার সবকিছু জুড়েই করালীপ্রসন্ন রয়েছে। করালীপ্রসন্ন ২৫ বছরের যুবা পুরুষ, পেশায় চিকিৎসক। এই দুজনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেম জন্মে, একমুহূর্ত দেখতে না পেলে মধুমতী যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকে। করালী মধুমতীর পুর্বস্মৃতি অনেকবার মনে করানোর চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে না। এই নিয়ে মধুমতীর মধ্যেও দোলাচলতার সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারে না সে সধবা নাকি বিধবা নারী। তার মনে হয় বিধবা হলেও ক্ষতি নেই কেননা এখন সমাজে বিধবাবিবাহ প্রথার প্রচলন আছে। তাই করালীপ্রসন্নর মনে হয় "মধুমতী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা সে বিষয় সর্বদাই আন্দোলন করিতেন। মধুমতী বিধবা হইলে তাঁহার বিবাহের কোন আপত্তি ছিল না, কেননা তিনি ব্রাহ্ম; কিন্তু মধুমতী যে সধবা নন, সে বিষয়ে তাঁহার একপ্রকার সংশয় দূর হইয়াছিল; কেননা যখন মধুমতীকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পান, তখন হস্তে একখানিও গহনা ছিল না।

হইতে পারে দস্যুকর্তৃক তাহা অপহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মধুমতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় তাহার মন এতই চঞ্চল হইয়াছিল, যে সে সংশয় মনে আসিল না। করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে বিবাহ করাই স্থির করিলেন।"[১]

এরপর একদিন পাঠদানের সময় করালী মধুমতীকে হঠাৎ করে যখন জানতে চাই যে সে বিধবা না সধবা, তাঁর উত্তরে সে জানায় "বিয়ের কথা কিছু মনে পড়ে না। বোধ হয় বিধবা।"[২] করালীপ্রসন্নরও এটাই মনে হয়েছিল, কারণ যখন তাকে পায়, তার গাঁয়ে কোনও অলঙ্কার ছিল না, অর্থাৎ সধবা নারীর কোন লক্ষণ সে দেখতে পায়নি। সেই থেকে মধুমতীও নিজেকে বিধবা বলেই পরিচয় দেয়। কারণ এখনকার সময়ে বিধবা বিবাহ হয়, এই কোথাও সে করালীর কাছেই জেনেছে। বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত কিছু কথা এখানে তুলে ধরলাম (করালী-মধুমতীর)

"ক। বিধবার বিবাহ হয় জান?

ম। তোমারই মুখে শুনিয়াছি।

ক। তুমি আবার বিবাহ করিবে?

ম। করিব না কেন!

ক। কাকে বিয়ে করবে?

ম। তুমি যাকে বল।

ক। আমাকে?

মধুমতী তখন লজ্জায় মুখ নত করিয়া, মৃদু২ স্বরে কহিল, "করিব।"[৩]

অতএব দুজনের স্ব ইচ্ছায় বিয়ে হলও এবং মধুমতীকে নিয়ে করালী স্বদেশে গেলো। পুত্রবধু মধুমতীকে করালীর বাবা-মা দেখে সবাই খুশি। এরপর তাদের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই কাটছিল। কেউ কাউকে এক তিল দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে উঠত। একবার ঘটনাক্রমে কাজের সূত্রে করালীকে কলকাতা যেতে হয়। অন্যদিকে এই সময়ে মধুমতীর পাশে ছিল ননদ শ্যামাসুন্দরী, সেই তার দেখাশোনা করত। দুজনের বেশ ভাব জমে, কিন্তু এতদিনের পরেও কিছুতেই মধুমতীর পুরনো কোন কথা মনে পড়ে না। হঠাৎ একদিন এই দুজনের কথপোকথনের মাঝে একধরনের গানের সুর ভেসে আসে, সুরটি মধুমতীর ভীষণ পরিচিত, সেটি শুনে তার 'আদরিণী' নামটা স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। এরপর থেকেই মধুমতীর শারীরিক মানসিক সব দিক থেকেই ভেঙ্গে পড়ে, একদিন একপুরুষের প্রতিকৃতি দেখতে পায়, উভয়ই উভয়কে চেনে। সেই পুরুষ প্রশ্ন করে "তুমি এখানে কেন, আদরিণি?"৪ এই আদরিণিই বর্তমানের মধুমতী। এরপর থেকে ধীরে ধীরে আদরিণি অর্থাৎ মধুমতীর পূর্ব স্মৃতি সব মনে পড়ে। নিজের অজান্তেই একটা বড় ভুল সে করে ফেলেছে সে এটা বুঝতে

পারে। এই পুরুষই হচ্ছে মধুমতীর আগের স্বামী। পূর্ব স্বামী তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে সে জানিয়ে দেয় সে এখন অন্য একজনের। এবং পূর্ব স্বামীর কথাতে আদরিণি জানায় "ছিলে। কিন্তু তোমার স্ত্রী মধুমতীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।"[৫]

আদরিণির পূর্ব স্বামীর নাম লালগোপাল দত্ত। মধুমতী তাকে জানায় এ ঘরের পুরুষ মানুষ থাকাকালীন যেন সে আসে, অর্থাৎ এখানে বর্তমান স্বামীর কথা বলা হয়েছে। একথা শুনে গোপাল সেখান থেকে চলে যায়। অবশেষে কাজ সেরে স্বামী করালী কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু যে স্ত্রীকে সে দেখে গিয়েছিল এখন তার চোখে এ এক ভিন্ন নারী যেন। একদিন গোপাল কেউ করালী দেখে ফেলে, তাই সাহসের সুরেই মধুমতী বলে ওঠে "আমি তাহাকে চিনিঘরে চল, বলিতেছি।"[৬]

এরপর থেকে মধুমতীর মধ্যে সধবা এবং বিধবা দুই নারী মানসিকতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ দ্বন্দ্ব যেন তৎকালীন নতুন এবং পুরাতনপন্থী মানুষের লড়াই। তাই করালীর প্রশ্নের উত্তরে মধুমতী জানায় "তুমি আমার জীবন দান করিরাছআমি তোমার নিকট যে ঋণে ঋণী মনুষ্যে তাহা শোধ করিতে পারে না। তাহার শোধ দূরে থাক, আমি তাহার পরিবর্তে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিতাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষাযে জীবন তুমি রক্ষা করিয়াছিলেতাহা আবার নষ্ট করচিকিৎসা শাস্ত্রে কি তাহার উপায় নাই?"[৭] আসলে এই অপরাধ যেন ঔপন্যাসিকের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিধবার পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে, বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টা আইনিভাবে স্বীকৃতি লাভ করলেও, সামাজিক স্বীকৃতি তখনও পায়নি। তাই মধুমতীর একমন চাইছে নতুন স্বামীর সাথেই থেকে যেতে, আর অন্যমন চাইছে পুরনো স্বামীর কাছেই ফিরে যেতে, আসলে তৎকালীন সমাজে সধবার বিবাহ ধর্মবিরুদ্ধ কিন্তু বিধবা বিবাহ আইনসম্মত। তবে শেষপর্যন্ত পুরনো স্বামীকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জন করে। আসলে মধুমতীর এই পরিশুদ্ধি যেন ঔপন্যাসিকের পরিশুদ্ধি। এই প্রসঙ্গে আমাদের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। মধুমতী স্বীকার করলো যে, না জেনেই সে করালীকে মিথ্যা বলেছিল। আসলে সে বিধবা নয়, সে সধবা। তার স্বামীর নাম লালগোপাল দত্ত। সুস্থ অবস্থায় যে কাজ করতে পারেনি লেখক, স্মৃতি ভ্রষ্টের মধ্যে দিয়ে সে কাজ করালেও তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি। আসলে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহ আইনগত স্বীকৃতি পেলেও সামাজিক ভাবে পায়নি।

অন্যদিকে করালী আর কোনও কথা বলল না, কারণ সেও বুঝেছে যে নিজেদের অজান্তেই একটা ভুল হয়ে গেছে। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হলেও পরস্ত্রী কখনো ধর্মপত্নী হতে পারে না। তাই মধুমতী গঙ্গার মধ্যে একবুক জলে দাঁড়িয়ে সবকিছু গোপালকে জানিয়ে প্রাণবিসর্জন দিতে চলে, সাথে গোপালও মারা যায়। আসলে ঔপন্যাসিক মধুমতীর মতো

বিধবাদের পুনর্বিবাহটাকে মানতে পারেনি বলেই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিধবাদেরকে প্রতিষ্ঠা করাটা সমাজেরই বিরুদ্ধতা করা। অতএব আলোচ্য উপন্যাসে আমরা দেখলাম এক বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহের পর সুখী হলেও সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী। এইরকম বিধবার সমস্যা নিয়ে রচিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি। সেখানেও বিধবার প্রেম দেখিয়েছেন, বিধবার আকাঙ্খার কথা, যৌনতাবোধের অকপট প্রকাশ করেছেন এবং বিবাহও দিয়েছেন। কিন্তু কুন্দকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা দিয়ে ঘরে তুলেও, আত্মহত্যা করতে বাধ্য করিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এখানেও মধুমতীর বিয়ে এবং বিয়ের পরে আত্মহত্যা। অতএব মনুর অনুশাসনে কথিত আছে ইহলোকে কেবল নয়, পরলোকেও স্বামীই মেয়েদের একমাত্র অবলম্বন। সমাজ জীবনের এই ধারনায় বিধবা বিবাহ আইনত মান্যতা পেলেও সামাজিক মান্যতা পায়নি। সামাজিক বিধানে বিধবার জন্য ছিল সেই কঠোর কৃচ্ছসাধনা। আবার বিধবার বিবাহ বাসনা নরক গমন তুল্যই অপরাধ। অতএব কুন্দনন্দিনী হোক বা মধুমতীর মতো সুন্দর ভালমানুষ স্বভাবের মেয়েকেউ মরতে হয়েছিল কেননা তার মতো বিধবাদের পুনর্বিবাহ হওয়ার পরেও কোন অধিকার ছিল না। কেবল ভ্রষ্টাচারিণী হিসেবে অভিহিত হওয়া ছাড়া।

যদিও কুন্দনন্দিনীর অপরাধ আরও গভীর ছিল, কেননা সে বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করেছিল। আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসেও দেখি এই বিধবা নারীর প্রেম ভেঙ্গে দেয় গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের দাম্পত্য জীবন। উপন্যাসে রোহিণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গোবিন্দলাল বাড়ি ছেড়ে প্রাসাদপুর গ্রামে এক নির্জন অট্টালিকায় বাস করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি হয়, গোবিন্দলালের গুলিতে মৃত্যু। কেননা কেবল সমাজ নয়, ঐ সমাজে প্রতিপালিত হওয়া গোবিন্দলালও রোহিণীর প্রেমকে বিশ্বাস করতে পারেনি। বিধবার প্রেম যখন অবৈধ বলে স্বীকৃত তখন ভালবাসা চাওয়া একজন বিধবা নষ্টনারী ছাড়া আর কিছুই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাই পুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিধবার প্রেমের উপর ভিত্তি করে কাহিনি গড়ে তুলতে গিয়ে মধুমতী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সধবা-বিধবা নারী মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্বে, একজন সধবা নারীর জয় দেখিয়েছেন।

তাই আলোচনার শেষলগ্নে এসে একথায় বলতে হয় যে, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এমন একটি নারীকে সৃষ্টি করছেন যার অবস্থান দুইপুরুষের মাঝখানে, যাকে তিনি বিধবাবিবাহ ঘটিয়ে সুখী করেও, সে সুখ ভেঙ্গে দিয়েছেন। কেননা সে নারী সধবা তাকে শুধুমাত্র পরলোকে গিয়ে দুই স্বামীর মুখোমুখি হতে হয়নি, তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে ইহলোকে। তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সধবা আর বিধবা নারী মনস্তত্ত্বের অন্তর দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমান স্বামী। কাকে বেছে নেবে সে? এরকম এক মানসিক লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে

হয়েছে তাকে। আসলে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' উপন্যাসটির সমস্যাটি যতখানি না সামাজিক তার চাইতেও বেশি আত্মিকসমস্যা। বিধবা বিবাহকে মেনে নিতে পারেননি বলেই তৎকালীন সমাজে সমসাময়িক ঔপন্যাসিকেরাও বিধবাবিবাহের ঘটনাকে নৈতিকতা বর্জিত করে দেখাতে পারেননি। উপন্যাসের বিধবারা হয় নিষ্পাপ, সরল, নিষ্ঠাবতী না হয় নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জিত। তাঁর আলোচ্য 'মধুমতী' উপন্যাসে মধুমতী চরিত্রটিকে বোধহয় এই দুই ধাঁচের কোনোটাই ফেলা যাবে না। আর এখানেই চরিত্রটি সার্থক।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র, মধুমতী, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী ২০১ নং কর্ণওয়াসিস স্ট্রীট, ১৩০৮ কার্তিক, পৃষ্ঠা ১৩
২. তদেব পৃ. ১৩
৩. তদেব পৃ. ১৪
৪. তদেব পৃ. ২৩
৫. তদেব পৃ. ২৪
৬. তদেব পৃ. ২৮
৭. তদেব পৃ. ২৯

অসীম মাজি

রামেন্দ্রসুন্দরের মননে অমঙ্গল : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

প্রাচীন কাল থেকে দর্শনের ইতিহাসে নানা সমস্যার উপর আলোচনা লক্ষ্য করা গেছে, এর মধ্যে একটি অন্যতম সমস্যা হল অমঙ্গল সংক্রান্ত সমস্যা। এটি শুধু যে পাশ্চাত্য দর্শনেই আলোচনা হয়েছে তা নয়, ভারতীয় পরম্পরাতেও এই সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে। এখন মূলত ভারতীয় প্রেক্ষিত থেকেই অমঙ্গলের সমস্যাটির আলোচনা করা হবে এই সমীক্ষায়। আরও স্পষ্ট করে বললে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী কীভাবে অমঙ্গলের সমস্যাটিকে দেখেছেন বা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তারই একটি পরিচয় যেমন দেওয়া হবে তেমনি সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার মূল ধারণাটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা হবে। কিন্তু তার পূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন বাংলা নবজাগরণের এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ। জন্ম ১৮৬৪ সালের ২০শে আগস্ট। তিনি বাংলা গদ্যে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজ চিন্তাকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজ ভাষায় পৌঁছে দেন। তাঁর লেখায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিন্তা ও ভারতীয় দর্শনের একটি সংলাপ মূলক মেলবন্ধন দেখা যায়। কাব্যে যেমন মধুসূদন, উপন্যাসে বঙ্কিম, কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথ তেমনি বাংলার মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর নতুন পথের দিশারী। তিনি গতানুগতিক প্রবন্ধ লেখা থেকে বেরিয়ে এসে বরং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণ ও আদর্শ নিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের কলেজ জীবন শুরু প্রেসিডেন্সী থেকে। ১৮৮৬ সালে বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বিএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এরপর কর্মজীবন শুরু করেন পরীক্ষক হিসেবে ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে তিনি পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পরিষদের প্রতিটি মঙ্গল কর্মের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিনবত্ব আসলে তাঁর ভাষায়, প্রকাশরীতিতে বিষয় বস্তুর নির্বাচনে। দুরূহ ও জটিল বিষয়কে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যে বিপুল ক্ষমতা আছে, তা তিনি দেখান।

সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর তার রসবোধ ও সাহিত্যবোধকে হাতিয়ার করে দার্শনিক সমস্যার উপর আলোকপাত করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং তার রচনায় তিনি বিবিধ দার্শনিক সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। এই সমস্যা গুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল অমঙ্গল সংক্রান্ত সমস্যা। বাংলাদেশের একটি ভূমিকম্পের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি অমঙ্গলের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়টি আমাদের অবহিত করেছেন। ওই ভূমিকম্পের ঘটনায় বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর

লোকেদের ঘর-বাড়ি ইত্যাদি ধ্বংস হয় যার ফলে প্রচুর মানুষের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল অর্থাৎ সম্পদ ও জীবনের হানি ঘটেছিল এবং সেটা প্রজাপীড়ক জমিদারদের কাছে ছিল বড়োই বেদনার। শুধু জমিদার শ্রেণি নয়, যে কোন মানুষের কাছে তার বাসস্থান ধংস হাওয়া ও আহত হওয়া অত্যন্ত দুঃখের এবং কষ্টের। যাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসাবে দেখা হয়। এখন মনে হতে পারে জমিদারদের মাথার উপর নেমে আশা এই প্রাকৃতিক অমঙ্গলের কারণ কি? বা এর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা কি হবে? অন্যভাবে বলা যায় তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস ও আহত হওয়া ঘটনা যদি শুধু প্রাকৃতিক না হয় তাহলে তার ব্যাখ্যা কি হবে? যদিও যিনি পরম করুণাময় তিনি তো কাউকে কষ্ট বা দুঃখ দিতে চান না তাহলে জমিদারদের ঘরবাড়ি, তাদের আহত হওয়ার ঘটনা কেন ঘটলো? এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে একদল ঈশ্বর বিশ্বাসী বলতে পারেন যে, ওই ভূমিকম্পের ঘটনা অনিবার্য ছিল। কারণ বাংলাদেশের এক প্রকার জমিদার প্রজাদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করেন এবং যে দরিদ্রদের শোষণ করে তারা বিত্তবান হয়েছিল সেই শোষণের শাস্তি হিসাবেই এই ভূমিকম্প ঘটেছে যা ঈশ্বর ইঙ্গিতই। শুধু তাই না ঈশ্বরবিশ্বাসীরা এমনও ব্যাখ্যা দিতে পারেন যে ওই ভূমিকম্পে যে সমস্ত গৃহ ধ্বংস হয়েছিল সেই গৃহনির্মাণ কার্যে দরিদ্ররা কাজ পাবে যার ফলে পুনরায় আত্মনিয়োগ করতে সুযোগ পেয়েছিল এর ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল হয়েছিল। তাই এহেন ভূমিকম্প মানব কল্যানেই সাধিত হয়েছে। এভাবে অমঙ্গলের সমস্যা বা অমঙ্গলের ঘটনাকে ঈশ্বরবিশ্বাসীরা ব্যাখ্যা করতে চাইবেন। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্য যদি দোষীদের শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দোষ, নিস্পাপ মানুষের শাস্তি হল কেন? তিনি এই সমস্যাটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- " অমুক বড়লোক প্রজাপীড়ক ছিলেন, ঘরের দেওয়াল পড়িয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়াছে, ইহা সুদৃশ্য কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরিহ ব্যক্তি, যাহার সুশীলতায় এ পর্যন্ত কেহ সংশয় করে নাই, তাহার মাথা চেপটা করিয়া দিয়া তাহার অনাথা পত্নীর অন্নের সংস্থান বন্ধ করা কেন হইল?"

এই পরিস্থিতিতে একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী কীভাবে সমস্যা নিরূপণ করবে তার সম্ভাব্য সমাধান রেখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তারা হয়তো বলবে যে ব্যক্তি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিল তার মৃত্যু ঘটেছে এটা হয়তো দুঃখের কিন্তু তিনি যে সৎ, নিষ্কলঙ্ক ছিল তা কে বলতে পারে। সে হয়তো বলবে- " তাহার দোষ না থাকুক তার বাপের দোষ ছিল" অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ওই ব্যক্তি পাপী বা দুষ্ট বা অসৎ না হলেও তার পরম্পরার সঙ্গে অমঙ্গল কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত। আর এ জীবনে যদি দুঃখ নাও হয় জন্মান্তরে তিনি নিশ্চয়ই ওই ধরনের কাজ সম্পাদন করেছেন। এখানে রসিকতা করে রামেন্দ্রসুন্দর এক গল্প উপস্থাপন করেছেন যেখানে এক ব্যাঘ্র মেষ শাবককে ক্রোধ বা মিথ্যা দোষ আরোপ করতে গিয়ে বলেছিল সে তার জল নোংরা করে দিচ্ছে যদিও মেষ শাবক যেখানে অবস্থান করছে তার নিম্নভাগে ছিল অর্থাৎ

কিনা জলরাশি মেষ শাবকের কাছ থেকে ব্যাঘ্রের অভিমুখে আসছিল না বরং বিপরীত অভিমুখে সেইকথা যখন সে বলেছিল যে আমি আপনার জল নোংরা করিনি তখন ব্যাঘ্র এই যুক্তি অবতারণা করেছিল যে তুমি না করতে পারো তোমার পিতামহ আমার জল নোংরা করেছে। এইভাবে কেউ বলতে পারে যে আপাতদৃষ্টিতে যাকে নিরপরাধ, নিষ্পাপ বলে মনে হচ্ছে পরম্পরা ক্রমে তার পূর্বসূরীদের পাপী এবং অসৎ হতে কোন বাধা নেই অতএব পিতৃপিতামহের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সব ধর্মেই ঈশ্বরের আপাত অমঙ্গল যে সমস্ত কারণ তাকে সৎ কর্ম বা মঙ্গল কর্ম হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্মের অনুগামীদের মতোই আমাদের স্বদেশীয় ঈশ্বর বিশ্বাসীরাও একই ধরনের যুক্তি আরোপ করতে পারে। তবে এই অমঙ্গল কেন বা অমঙ্গল ঈশ্বরের ন্যায় পরায়নতা ও শুভত্বের সঙ্গে যায় না এই অভিযোগ আনার আগে দেখা দরকার যে অমঙ্গলের ধারণাটি কি কাল্পনিক না তার বাস্তব দিক রয়েছে।

তবে অমঙ্গল সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের জানা দরকার অমঙ্গল কি সত্যিই আছে? নাকি সবই মঙ্গল? এই বিষয়টি স্পষ্ট হাওয়া দরকার। অমঙ্গল বলে যদি নাই কিছু থাকে তাহলে কেন অমঙ্গল?- এই প্রশ্ন তোলার কোন মানে হয় না। তাই রামেন্দ্রসুন্দর এখানে অমঙ্গল আদৌ আছে কিনা এই প্রশ্নটির অবতারণা করেছেন। একটি বিষয় তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বস্তুগতভাবে অমঙ্গল বলে কিছু নেই- একথা তিনি সরাসরিভাবে বলেননি। যেটা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতে লক্ষ্য করেছি কিন্তু এখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে মানবচেতনায় যদি না থাকতো তাহলে অমঙ্গল বলে আর কিছু থাকতো না। পৃথিবী কম্পিত হওয়া থেকে শুরু করে গোটা জগত যদি আকাশে নিক্ষিপ্ত হতো তাহলেও সেটা অমঙ্গল বলে মনে হত না, যদি না মানব চেতনা সেটা অমঙ্গল বলে দেখত অর্থাৎ কোন ঘটনা অমঙ্গল কিনা তা নির্ভর করে রয়েছে মানুষ তার চেতনা দিয়ে অমঙ্গল হিসাবে দেখছে কিনা। এই প্রসঙ্গে তার রসিকতা- "পৃথিবীতে যদি চেতন জীবের অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত কেন, সমস্ত ভূমণ্ডল চূর্ণ হইয়া আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলেও কাহারও কোনও মাথাব্যাথা ঘটিত না এবং ব্যাপারটা মঙ্গল কি অমঙ্গল, তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হইত না।" এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে আমরা ভাবছি বলেই অমঙ্গল কারণ, মানুষের চেতনা যদি না থাকতো, মানুষ যদি না থাকতো তাহলে অমঙ্গল বা মঙ্গল বিভীষিকা না করুণা তা বিচার করার কোন প্রশ্নই থাকতো না কারণ মঙ্গল অমঙ্গলের উপলব্ধি মানুষ তার চেতনা দিয়েই করে থাকে। জীব যদি সুখের উপলব্ধি না করত, সুখ দুঃখের তফাত যদি না করত তাহলে মঙ্গল অমঙ্গল সমস্ত আলোচনা বৃথা হয়ে যেত। কারণ মানুষ যতখানি মঙ্গল অমঙ্গল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে একটা পশু তা নিয়ে চিন্তা করে না। কাজেই চেতনাধারি মানুষকে বাদ দিলে মঙ্গল অমঙ্গল বলে কিছু হয় না।

একদল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে শাস্ত্রকার ও ধর্ম বক্তা মনে করেন সমস্ত জীবের মধ্যে কেবলমাত্র মানুষের ইষ্ট অনিষ্ট বিচার করে শুধুমাত্র মানুষের মঙ্গল অমঙ্গল রয়েছে, এমন কি তারা মনুষ্যতর অন্যান্য প্রাণীর মঙ্গল অমঙ্গলকে অস্বীকার করেছেন। তারা মনে করেন জগতের বৈচিত্র শুধু মানুষের ভোগের জন্য। একধাপ এগিয়ে তারা আরও বলেন যে মনুষ্যকূলের জন্যই এই বৈচিত্র্যময় জগতের অস্তিত্ব স্বার্থক। সৃষ্টিকর্তা মানুষের ভোগের হিতে পরিশ্রম করে এই সৌন্দর্যময় জগত সৃষ্টি করেছে বলেই জগত স্বার্থক, সৃষ্টিকর্তার চেষ্টা সফল এবং সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্য প্রশংসনীয়। তারা ঈশ্বরকে সুনিপুণ কারিগর বলেছে যেহেতু তিনি যখন যা দরকার পড়েছে সেটি সময়মত দিয়েছে। তারা মনে করে ঈশ্বর মঙ্গলময় কারণ তিনি আমাদের সূর্যের উত্তাপ দিয়েছে, যেটা ছাড়া টিকে থাকা অসম্ভব। তিনি আমাদের বায়ু দিয়েছে, জল দিয়েছে, পৃথিবী দিয়েছে, তিনি ঘাসের ফলকে শস্যে পরিণত করেছে। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সুখের ব্যবস্থা করেছে মানুষের জন্য।

কিন্তু প্রশ্ন হল অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন? রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে প্রচলিত নানা উত্তর আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে ঈশ্বর তার নিজ ইচ্ছা অনুসারেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়কে সৃষ্টি করেছেন। জীবকে সুখ ও দুঃখ দেওয়া তার অভিপ্রায়, এটাতেই তার আমোদ, এটাতেই তার লীলা। এটাতে তার লাভ কি হয়েছে সেটা বলা না গেলেও যেহেতু তিনি রাজার উপর রাজা বা তিনিই বাদশা তাই এই বিষয়ে কারও হাত নেই বলে মনে করেন রামেন্দ্রসুন্দর। এইরূপ যুক্তিতেও দোষ দেখা যায় কারণ ঈশ্বর যেহেতু মঙ্গলময় ও পরম করুণাময় সেহেতু ঈশ্বর কীভাবে অমঙ্গলের উৎপত্তি ঘটাতে পারে। কাজেই এইরূপ যুক্তি অগ্রাহ্য করে বলতে হয় ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলেন যে কি কারণে জানি না মঙ্গলের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন অমঙ্গল এসে যায়। তবে তিনি এটাও মনে করেন যে ঈশ্বর হতে কখনও অমঙ্গল উৎপন্ন হতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপে অমঙ্গল নেই অর্থাৎ অমঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনি মনে করেন যে মানুষের কল্পনা কখনও থেমে থাকে না, তাই অনেক সময় মানুষ এটাও ভাবতে শুরু করে যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অমঙ্গলময় নামে আর এক দেবতার আবির্ভাব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারা হয়তো দুজন প্রতিযোগিতাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যার পরিণাম একজন মঙ্গলময় সৃষ্টি করেছেন তো অপরজন অমঙ্গল সৃষ্টি করেছেন। এতে তারা নিজেরাই বিরোধ বাঁধিয়েছেন। একজনের নাম জেহোবা অন্যজনের নাম শয়তান কিংবা একজনের নাম অহুরমজদ তো অন্যজনের নাম আহ্রিমান। তাছাড়া উভয়ের চিন্তা ধারার মধ্যেও বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। তাদের এই বিরোধ চিরন্তন। এরা সবসময় একে অন্যকে পরাজয়ের লক্ষ্যে কাজ করে। শয়তান যেমন সর্বদা জেহোবার কাজ পণ্ড করার জন্য বা তাকে ঠকাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। তেমনি ঈশ্বরও শয়তানকে সায়েস্তা

করার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে, শয়তানও ছাড়বার পাত্র নয় কারণ সে শয়তানীতে অদ্বিতীয়। তবে এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শয়তানের পরাজয় ঘটবে বলেই তারা মনে করেন।

কাজেই রামেন্দ্রসুন্দর অন্য কল্পনার আশ্রয় নিয়ে অমঙ্গলের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি বিকল্প ভাবনা উপস্থাপিত করে বলেছেন যে মানুষের অমঙ্গল তার নিজেরই ইচ্ছা অনুসারে ঘটে থাকে কিন্তু তা কখনোই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হয় না অর্থাৎ ঈশ্বরের অনিচ্ছাকৃত। তিনি মনে করেন যেহেতু মানুষের ইচ্ছাটাই স্বাধীন তাই মানুষ চাইলেই সে তার ভাল-মন্দ এই দুটি পথের যে কোন একটিকে বেছে নিতে পারে এবং সেই পথ অনুযায়ী সে জীবনে এগিয়ে যেতে পারে। যদি কেউ ভালোর সঙ্গে থাকে ঈশ্বর তার সহায় হয়, আর কেউ যদি মন্দ পথ অবলম্বন করে তাহলে ঈশ্বর তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে সাবধান করেন অথবা কখনও তার সাজা ঘোষণা করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়- "মনুষ্যের অমঙ্গল ঈশ্বরের অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু মনুষ্যের ইচ্ছাকৃত। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন। মনুষ্যের জন্য ভাল মন্দ দুইটা পথ আছে।" সুতরাং মানুষ তার স্ব- ইচ্ছাই জেনে শুনেই অমঙ্গল ডেকে আনে, এতে ঈশ্বরের কোন হাত নেই বলেই মনে করেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাই বলে ঈশ্বর কি ভালোর পথে নিয়ে যায় না? অবশ্যয় ঈশ্বর ভালোর পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু সে সেই পথে যায় না। তার ফলস্বরূপ মানুষকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর এখান থেকেই মানুষের জীবনে শুরু হয় অমঙ্গলের যাত্রা। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে- "মনুষ্যের দোষে মনুষ্যকে শাস্তি দিবার জন্য, মনুষ্যকে সাবধান করিবার জন্য, মনুষ্যের পাপ ক্ষালনের জন্য অমঙ্গলের উৎপত্তি।"

আমরা যদি ধরে নি মানুষের পাপের কারণে তার জীবনে অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে এই অমঙ্গল কি শুধু মানুষের জীবনেই আসে নাকি মনুষ্য ছাড়াও অ-মানুষী প্রাণীর মধ্যেও অমঙ্গল সীমাবদ্ধ? তা না হলে নিম্ন জীব কূলের মধ্যে নিদারুন জীবন যন্ত্রণা দেখা যায় কেন? জীবসমাজে দুঃখ-কষ্ট, মরণের কোলাহলের ফলে প্রকৃতির যে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে তার জন্য দায়ি কে? এর উত্তরে দিতে গিয়ে অন্য ব্যক্তির সাথে রামেন্দ্রসুন্দর একমত হয়ে বলেন যে ঈশ্বর সমস্ত জীবের আহার ও রক্ষাকর্তা হলেও ঈশ্বর একটি বিষয়ে সমস্যায় পড়ে যায় সেটি হল যখন তিনি জীবের আহার হিসাবে জীবকেই বেছে দিয়েছেন অর্থাৎ প্রাণী বর্গের মধ্যে দেখতে পায় বিশেষ করে মাংসাশী প্রাণী ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্য প্রাণীর উপর অত্যাচার করে তার অকাল প্রাণ কেড়ে নিয়ে আহার গ্রহণ করছে এবং দেখা যায় প্রাণীর খাদ্য শৃঙ্খল এক চক্রাকারে আবর্তিত হয়, যেখানে একটা প্রাণীকে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে অন্য প্রাণীর মৃত্যুবরণ মেনে নিতে হয়। এমতাবস্থায় যদি বলা হয় যে ঈশ্বর অমঙ্গল সৃষ্টি করেছেন তাহলে তার দয়াময়ত্বে বা মঙ্গলময়ত্বে সন্দেহ করতে হয়। আর যদি অমঙ্গল সৃষ্টির ব্যাপারটি কোন এক শয়তানের উপর চাপানো হয় তাহলে তাকে আর সর্বশক্তিময় বলা যায় না। অমঙ্গল সৃষ্টির ব্যাপারটি নিরীহ মানুষের উপরও ন্যস্ত করা যায় না কারণ সেক্ষেত্রে দুর্বলের উপর অত্যাচার করা হয় যেটা একেবারেই

অনুচিত। তাই অন্য কোন উপায় না থাকার কারণে এক শ্রেণীর মানুষ মনে করেন যে অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গল সাধন করা অর্থাৎ মঙ্গল সম্পাদন করার জন্যই অমঙ্গলের যাত্রা। তারা এও মনে করে থাকে স্থূল দৃষ্টিতে যাকে অমঙ্গল বলে মনে হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাই মঙ্গল বলে প্রতিভাত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর এই ধারনাটিকে যে একেবারেই অগ্রাহ্য করছেন তেমন নয়, তিনিও মনে করেন যে অমঙ্গলের পরিণাম হল মঙ্গল।

তথ্যসূত্র:

১। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস শ্রী সজনীকান্ত (সম্পা), রামেন্দ্র রচনাবলী(১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৫৬, পৃষ্ঠা- ২৭৯।

২। তদেব, ২৮০।

৩। তদেব, ২৮৪।

৪। তদেব, ২৮৪।

প্রণবকুমার মাহাতো

বৈষ্ণব পদাবলী গান মনুষ্যত্বের উদারলোকে আহ্বান

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালী তথা ভারতীয় জনজীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রায় পাঁচশ পঁচিশ বছর আগে বঙ্গভূমিতে তাঁর জন্ম। তিনি যে ধর্মবাণী প্রচার করে গেছেন তা বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীর গতানুগতিক প্রথা ও সংস্কারবদ্ধ খণ্ডছিন্ন জীবনে বিক্ষিপ্ত ঐক্যবদ্ধ অভ্যুন্নতির উজ্জ্বলতম দিগদর্শনী এবং তা মুক্তমানবিকতার আদর্শে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ, কালোত্তীর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

চৈতন্যধর্ম কেবলমাত্র ঈশ্বরভক্তির আধ্যাত্মিক ধর্মের ব্যক্তিগত সীমার মুক্তি মোক্ষ কামনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি। চৈতন্যধর্ম অখণ্ড পূর্ণায়ত মানবিক ধর্ম। মহাপ্রভু বলে গেছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা / সর্বোত্তম নরলীলা / নরবপু তাহার স্বরূপ।" চৈতন্য প্রচারিত ধর্মের প্রেরণায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর গানের মধ্যে ঈশ্বরিক এষণার সঙ্গে সঙ্গে রসসৌন্দর্যের অনাবিল আনন্দ আমরা লাভ করি ও সর্বমানবিক আদর্শের চেতনায় আমরা উজ্জীবিত হই। পদাবলী সাহিত্য চিরকালের মানব- মানবীর প্রেমবিরহে ছন্দগীতা। পদাবলীর মধ্যে যে মানবিক সমুচ্চ আদর্শের দিক রয়েছে তা বহু শতাব্দী ধরে মানুষের মন ও হৃদয়কে একইভাবে স্পর্শ করে যায়। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়ে গড়ে উঠেছে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের বিচিত্র রূপ ও রসপর্যায়। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন- বিরহ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার ও ভাব সম্মিলন প্রভৃতি নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যর সনিষ্পত্তি। মানব হৃদয়ে এই নিত্য ধর্ম, প্রেম চিরকালই সবুজ সতেজ নিত্য সত্য। রবীন্দ্রনাথে 'বাঁশি' কবিতায় আমরা পাই হৃদয়ের নিত্য ধর্মে আকবর বাদশা ও হরিপদ কেরানীর কোনো তফাৎ নেই-'সমাজের চেয়ে/ হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।'

বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রাধা ও কৃষ্ণ হলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এই সম্পর্কে ড. শ্রীমন্তকুমার জানা সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। একটু বিস্তৃত হলেও সেটি উদ্ধৃত করছি-

'মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যে দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিতি তার নাম অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। জীবগোস্বামী রচিত "ষট-সন্দর্ভের" অন্তর্গত ভাগবত সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃতে"-এই তত্ত্বটিকে নানাদিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। এরপরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

অদ্বৈতদর্শনে বলা হয়েছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সুবহৎ, বিরাট ও অনন্ত। বেদান্তে ব্রহ্মকে অসীম, অনন্ত, নিরাকার, নিঃশক্তি, নির্গুণ ও নির্বিশেষ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যেমন ভেদ আছে, তেমনি অভেদও আছে। পরমব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণসম্পন্ন। স্বয়ং কৃষ্ণ

সেই পরব্রহ্ম। তিনি লীলাচ্ছলে সৃষ্টি করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সৃষ্টি তার থেকে পৃথক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি তাঁরই অন্তর্ভুক্ত। জীবজগৎ পৃথক হলেও ব্রহ্মসাপেক্ষ। জীব ও ব্রহ্ম একেবারেই এক অথবা দুটোই সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা-তা হতেই পারে না। এদের ভেদও যেমন অচিন্ত্য, অভেদও তেমনি অচিন্ত্য। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদও যেমন সত্য, অভেদও তেমনি সত্য। ভেদও যেমন মিথ্যা অভেদও তেমনি মিথ্যা। ভেদাভেদের প্রশ্নটাই অবান্তর এবং চিন্তার অযোগ্য বলে অচিন্ত্য। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের মতে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ভেদবাদী নয়, অভেদবাদীও নন, তারা ভেদাভেদবাদী।

ব্রহ্মতত্ত্বের এই নতুন ব্যাখ্যার নাম অচিন্ত্যভেদাভেদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি তাৎপর্যময় দিক। পরব্রহ্মের শক্তিরূপ জীবজগৎকে পরব্রহ্ম থেকে পৃথক করা যায় না। শক্তিকে বাদ দিয়ে শক্তিমানকে, কিংবা শক্তিমানকে বাদ দিয়ে শক্তিকে পরম বস্তু বলা যায় না। উভয়ের মিলিত স্বরূপই বস্তুর রূপ। বস্তু হল বিশেষ্য, শক্তি হল বিশেষণ। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই বিশেষ্য, এবং তার স্বরূপ শক্তি। আর তাঁর জীবশক্তিই বিশেষণ। দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাহলে কেবল শক্তিমানের উল্লেখই যথেষ্ট, শক্তির পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন কি। এর সুন্দর উত্তর দিয়েছেন জীবগোস্বামী। সাময়িক কারণে অগ্নির দাহিকাশক্তি স্তম্ভিত হতে পারে, কিন্তু শক্তিমান অগ্নি বর্তমান থাকে। তাই শক্তিকে শক্তিমানের থেকে পৃথক নামে অভিহিত করতে হয়। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করতে হয়। আবার শক্তিমানের বাইরে শক্তির প্রভাব অনুভূত হতে পারে। তাই এস্থলে উভয়ের ভেদকে স্বীকার হিরাধ করতে হয়। কিন্তু এই ভেদ কেবল ভেদ নয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মের সঙ্গে তার শক্তির যুগপৎ ভেদ ও অভেদ স্বীকার করে নিয়েছেন। এই ভেদাভেদ সম্পর্ক অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। বুদ্ধি দ্বারা এর ব্যাখ্যা চলে না। বাঁধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক অচিন্ত্যভেদাভেদেরই সম্পর্ক। বিশ্বভুবনে ব্রহ্ম ও জগতের নিত্যলীলা চলছে এবং চলবে। চৈতন্যদেব এই তত্ত্বেরই মূর্তবিগ্রহ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বাঙালী সাধকের স্বকীয়তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা। একটি মানুষকে কেন্দ্র করে সর্বমানবের আত্মিক বিশুদ্ধি, মানবিক সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ মাধুর্যবিকাশ, মানব সমাজের উদার ভাবসংহতি, সাম্যবোধ ও জাতিবর্ণ ধর্ম-নির্বিশেষে যে অভাবনীয় প্রগতির নিদর্শন বাঙালীর ইতিহাস সুচিহ্নিত হয়ে আছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনারহিত বললে অন্যায় হয় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম পরমসত্যের অনুসন্ধানে পারমার্থিক আদর্শের কথা বললেও তা কেবলমাত্র মর্ত্যসীমার উর্ধ্বে বিচরণ করেনি। এই ধর্ম মর্ত্যজীবনের কালিমা দূর করে -

মানবিক সম্প্রীতি, ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের জয়ধ্বজা প্রোথিত করেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের উৎকর্ষসাধনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিশেষভাবে ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। শুধু - ধর্মচেতনায় নয়, কাব্যে, দর্শনে, অলঙ্কারে ও জীবনী রচনায় বহুমুখী চিন্তাভাবনার সাবলীল প্রকাশে চৈতন্যযুগটি বিশেষ একটি ধর্মের উজ্জ্বল দীপবর্তিকা হিসেবে বিরাজ করছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে চৈতন্যযুগ সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ বললে অত্যুক্তি হয় না।"

নরনারীর চিরন্তন প্রেমের গান সর্বকালে সর্বদেশে সমানভাবে পুজিত হবে, আদৃত হবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে যে প্রেমচিত্র চিত্রিত হয়েছে তা প্রাকৃত বিশুদ্ধ মানবপ্রেম না অপ্রাকৃত স্বর্গীয় প্রেম এ ব্যাপারে তর্কের অবকাশ যথেষ্ট। অপ্রাকৃত প্রেমের সপক্ষে উক্তি এই যে বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই বৈষ্ণব সাধক। ব্যতিক্রম বিদ্যাপতি ও অপ্রাকৃত প্রেমের চণ্ডীদাস। এরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে পদ লিখেছেন। তাঁদের রচনায় প্রাকৃত প্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে। পক্ষান্তরে চৈতন্যোত্তর যুগে পদাবলী সাহিত্য প্রাকৃত অপ্রাকৃতের মধ্যে একদিকে স্বর্গভূমি ও অন্যদিকে মর্ত্যমাধুরীকে দিক নির্দেশ করেছে। চৈতন্য পরবর্তী যুগে পদাবলী সাহিত্য প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-এক বৃন্তে দুটি কুসুম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান নয়', যদিও লক্ষ্য বৈকুণ্ঠ।

এই মানবিক সংবেদনা ও রসসৌকর্যের জন্য বৈষ্ণব কবিদের রচনা অবলম্বনে সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি সম্প্রদায়, উনবিংশ শতাব্দীর কবি শ্রীমধুসূদন ও তরুণ করি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে ব্রজবুলি ভাষায় কবিতা লিখেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৈষ্ণব পদাবলীর পুনরুজ্জীবন ঘটে। জগবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের "প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ" পাঠ করেই বৈষ্ণবপদাবলী সম্পর্কে উৎসাহিত বোধ করেন রবীন্দ্রনাথ। ১২৯২ সালে "পদরত্নাবলী" নামে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এক বৈষ্ণব পদ সংকলন প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নিজেও ভানুসিংহ ছদ্মনামে ব্রজবুলি ভাষায় "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"-তে কুড়িটি পদ রচনা করেন। এরপর থেকেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এবং সাধারণের দ্বারা এগুলি পঠিত ও গীত হতে শুরু করে।

বলাবাহুল্য, বৈষ্ণব পদাবলীর মানবিক দিকটির জন্যই জনমানসে এগুলি বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর কথায় যদি ধরা হয় সেখানে যে প্রেমচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অতিশয় মানবিক। রাধা ও কাহ্ন (কৃষ্ণ) প্রকৃতপক্ষে দুই গ্রাম্য অশিক্ষিত যুবক-যুবতী। রাধার মতো গ্রাম্য অশিক্ষিত গৃহবধূর পরকীয়া প্রেম গ্রামবাংলায় অপ্রতুল নয়। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না কাহ্ন চরিত্রে। দু'একটি বিচ্ছিন্ন উক্তি ছেড়ে দিলে তাকে এক গ্রাম্য কামুক তরুণের থেকে আলাদা করা যায় না। তাই, এখানে মানবিক দিকটিই অধিকরূপে প্রকটিত। বিশিষ্ট বৈষ্ণবপদাবলী সমালোচক ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু উল্লেখ করেছেন—

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মানবতা ও বাস্তবতা আমাদের প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের একটি সম্পদ। এই মানবতা মানবগুণসার কোনো ভাবনির্যাস নহে, তাহা সীমাবদ্ধ আশা-আকৃতির মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো উচ্চতর ভাবলোকের কলাকুতূহল নহে, যে-মানুষকে জানি, যাকে বুকে জড়াইয়া অনুভব করি, যাহার মধ্য দিয়া সাধারণ জীবনের উৎকণ্ঠা মূর্তিমান হইয়া ওঠে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই মনুষ্যত্বকে অভিবাদন জানান হইয়াছে।' তাই বলতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লৌকিক প্রেমের বাস্তব চিত্রই চিত্রিত হয়েছে।

এছাড়া বৈষ্ণবপদাবলীতে যে প্রেমচিত্র আমরা পাই সেগুলির মধ্যেও বাস্তবের ছোঁয়া রয়েছে। সেগুলিকে তাই, শুধুমাত্র প্রেমের কবিতা হিসেবে পাঠ করলেও তার রসাস্বাদন করা যায়। বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হয়ে পাঠ করলেও রসাস্বাদনে বিশেষ বাধা পেতে হয় না। বৈষ্ণব পদাবলী শুধু বৈকণ্ঠের জন্য বৈষ্ণবের গান নয় সাধারণমানুষ তার মধ্যে নরনারীর প্রেম ভালবাসা মিলন বিরহের অমৃতরস পান করতে পারেন। ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসে সাহাজাদপুরে রচিত "বৈষ্ণব কবিতা" থেকে বৈষ্ণবপদাবলীর মানবিক দিকটির প্রসঙ্গই তুলেছেন মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন-

'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?'

অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন যে, রাধার চরিত্র-চিত্রনের সময় বৈষ্ণব কবিগণের অন্তরে বিরাজমান ছিল বাস্তবের কোনো মানুষী রাধা। সেই মানুষী রাধার অশ্রু-আঁখি এবং বিরহ-যন্ত্রণাকেই বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের অঙ্কিত প্রেমচিত্রের মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রের ঐশ্বর্যের দিকটি পরিলক্ষিত হলেও তাকে কেন্দ্র করে যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বাস্তবানুগ। তাতে আমরা প্রাকৃত অনেক রীতি-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি যা একেবারে আমাদের সমাজ থেকে উঠে এসেছে। রাধার সাংসারিক প্রতিবন্ধকতা, শাশুড়ি-ননদীর বঞ্চনা, লোক-নিন্দা-ভয়, বিষ খেয়ে বা জলে ডুবে আত্মহত্যা করার প্রসঙ্গ প্রভৃতি আমাদের সমাজ-বাস্তবতার চিত্রটিকেই প্রকটিত করে। কবি বিদ্যাপতির প্রার্থনা পর্যায়ের একটি পদে প্রাকৃত মানুষের ভাষ্যই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে—

'আধজনম হম নিন্দে গোঙায়লু
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণি রঙ্গ রসে মাতলু
তোঁহে ভজব কোন বেলা।'

রক্তমাংসের বেদনাহত মানুষের জীবনচিত্র কবি এখানে অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যে চিত্রিত করে তুলেছেন।

এছাড়া চণ্ডীদাসের একটি পদে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী সুখ-দুঃখকে তিনি দুটি ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। মানুষ স্বভাবতঃই সুখের প্রত্যাশী। কিন্তু সবসময় সুখ চাইলে তা পাওয়া যায় না। বরং সুখের আশায় দুঃখই বেশী করে পেতে হয় আমাদের। তাই কবি বলেছেন-

'চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখ লাভ তরে পিরীতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঁঈ।'

এখানে আরও একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি, তা হল সুখ লাভের আশায় যারা প্রেম করতে যায় তারা সুখের বদলে দুঃখই পায়।

আর মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে চণ্ডীদাস যে কথাটি ঘোষণা করেছিলেন মানবিকতা সম্পর্কে তা চিরপুরাতন হয়েও চিরনূতন—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

এখন আমরা রাজনৈতিক মঞ্চে মা, মাটি ও মানুষের কথা বলে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করে তুলছি। বহু পূর্বেই চণ্ডীদাস বলে গেছেন মা, মাটি ও মানুষের থেকে কিছু বড় নেই, কেউ মহীয়ান নয়।

মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের কবিতায় মানবতার এমন জয়গান সত্যিই বিস্ময়কর। অন্যদিকে আবার বিস্ময়কর নয়ও। কারণ, সেই সমসাময়িক কালেই তো মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মানবিকতার বাহু-বন্ধনে উচ্চ-নীচ-হিন্দু-মুসলমান-কাঙাল-পতিত সকলকেই আলিঙ্গন করেছিলেন। তাই, শুধুমাত্র বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস নন সকল বৈষ্ণব কবির কাব্যেই এই মানবিক দিকটি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব পদাবলীর এই মানবিক দিকটিরই পূজারী একথা বলাবাহুল্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. সতী, কাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ।
২. রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান, ড. বিমানবিহারী মজুমদার।
৩. মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
৪. বৈষ্ণব কবিতা, সোনার তরী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড।
৫. বৈষ্ণব পদাবলি সমীক্ষা, ড. শ্রীমন্তকুমার জানা।

Utsab Ranjan Kar

From Emergency to "Undeclared Emergency" : The Evolving Role of Indian Civil Society.

1. Introduction : The Two Faces of Crisis.

India's democratic history is often questioned by the 21 months "Emergency" between 1975 and 1977. For decades, the "Emergency" served as a singular cautionary tale-a period where the democratic machinery was formally halted. However, in the 21st century, a new discourse has emerged. Critics and political scientists suggest that India has entered a period of "undeclared emergency," characterized not by the suspension of the Constitution, but by government's strategic plan.

At the heart of this tension lies Civil Society. From the grassroots movements of the 1970s to the digital-age activists of today, the role of non-state actors has been the most accurate barometer of India's democratic health.

2. The 1975 Benchmark : A State of Total Exception

To understand the "undeclared" present, one must first revisit the "declared" past. On June 25, 1975, President Fakhruddin Ali Ahmed, on the advice of Prime Minister Indira Gandhi, declared a state of internal Emergency.

The Suspension of the Fundamental rights

During this era, the state's approach was blunt. Fundamental rights were suspended, and the judiciary was largely sidelined (notably in the ADM Jabalpur case). Civil society at the time was relatively nascent. Most NGOs were focused on service delivery rather than rights-based advocacy.

The Spark of Rights-Based Activism

The brutality of the Emergency acted as a catalyst. Intellectuals, lawyers, and students realized that the state could not be trusted to protect individual liberties. This led to the formation of seminal organizations like the People's Union for Civil Liberties (PUCL) and the People's Union for Democratic Rights (PUDR). Their role was singular: to document state excesses and provide legal aid to the disenfranchised.

3. The Transition : From 1977 to the Late 2000s

Post-Emergency, civil society enjoyed a "Golden Age." The judiciary, seeking to redeem its image, introduced Public Interest Litigation (PIL), allowing civil society to bring the grievances of the poor directly to the highest courts.

During this period, the role of civil society expanded into :

Environmental Protection : The Chipko Andolan and Narmada Bachao Andolan.

Right to Information: The MKSS movement leading to the RTI Act of 2005.

Accountability: Movements for the Right to Food and the Right to Education.

4. The Rise of the “Undeclared Emergency”

The term "undeclared emergency" refers to a state of affairs where democratic institutions-the press, the judiciary, and investigative agencies-appear to function normally on the surface, but are systematically repurposed to serve the executive.

The Architecture of Control

Unlike the 1970s, the current “emergency” does not require a midnight proclamation. It is sustained through a “death by a thousand cuts”:

The Legislative Squeeze : Amendments to the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) have been used to choke the funding of NGOs that are critical of government policy.

The Judicial Retreat : A perceived “executive-mindedness” in the higher judiciary, where cases involving personal liberty are often delayed or dismissed.

The Use of “Draconian” Laws : The frequent use of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) and sedition laws to detain activists without trial for years.

5. Civil Society as the New “Opposition”

In the absence of a robust parliamentary opposition, civil society has increasingly stepped into the vacuum. This has changed the nature of the relationship between the state and the citizen.

From “Partner” to “Anti-National”

In the 1990s and 2000s, NGOs were often seen as partners in development. Today, the discourse has shifted. Civil society actors are often labeled as “Andolan-jeevi” (professional protestors) or “Urban Naxals.” This linguistic shift is crucial; it delegitimizes dissent by framing it as a threat to national security.

The Digital Frontier

The role of civil society has moved into the digital realm. Independent media collectives and fact-checking organizations now perform the role that traditional media houses have largely abandoned. They act as “information sentinels,” protecting the public sphere from state-sponsored or partisan misinformation.

6. Comparative Analysis: Declared vs. Undeclared

The following table highlights the shift in methodology between the two eras:

Feature 1975 Emergency (Declared) 21st Century (Undeclared)

Legal Basis Article 352 of the Constitution Use of UAPA, PMLA, and IT Rules

Media Control Direct Censorship (Pre-approval) Self-censorship, ad-cuts, and take-down orders

Civil Society Role Underground Resistance Legal battles, international advocacy, and digital mobilization

State Narrative "Stability and Discipline" "Nationalism and Development"

Duration Fixed (21 months) Open-ended and normalized

7. Case Studies in Resilience

The "undeclared" nature of the current crisis has forced civil society to become more creative and decentralized.

The Farmers' Protest (2020-2021)

This movement represented a master class in civil society resilience. By combining traditional grassroots mobilization with high-tech communication strategies, the movement successfully forced the government to repeal three farm laws. It proved that mass mobilization can still act as an effective check on executive will.

The Bhima Koregaon Case

Conversely, this case illustrates the extreme vulnerability of civil society. The incarceration of prominent lawyers, scholars, and poets under the UAPA-based on digital evidence that forensic experts have since questioned-serves as a warning of how the state can "decapitate" leadership within civil society.

8. The Global Context: Democratic Backsliding

India's situation is not an isolated phenomenon. It mirrors a global trend of "democratic backsliding" seen in Hungary, Turkey, and Brazil. In these contexts, civil society is often the first target of populist leaders who claim to represent the "true people" against "liberal elites."

The Indian experience is unique because of its scale and the historical resilience of its grassroots. However, the centralization of power in the executive branch has made the work of civil society increasingly dangerous.

9. Challenges Moving Forward

As we look toward the future, Indian civil society faces three existential challenges:

Sustainability: With FCRA restrictions, how will rights-based NGOs survive financially?

Safety: The physical and legal protection of grassroots workers in remote areas.

Polarization: The challenge of speaking to a public that is increasingly divided along communal and ideological lines.

10. Conclusion : The Long Walk to Liberty

The shift from a declared Emergency to an undeclared one represents an evolution in the art of governance-and consequently, an evolution in the art of resistance. The 1975 Emergency taught Indian civil society how to survive; the current era is teaching it how to persist.

While the state possesses the “sword” of law and the “purse” of the treasury, civil society retains the power of “legitimacy.” As long as there are individuals and groups willing to document truth, challenge injustice in courts, and occupy public squares, the “undeclared emergency” remains an incomplete project. Democracy in India is not merely a set of institutions; it is the persistent, noisy, and often dangerous work of its citizens.

References :

Guha, Ramachandra. (2007). India After Gandhi.

Austin, Granville. (1999). Working a Democratic Constitution.

Reports by V-Dem Institute and Freedom House on Global Democratic Trends.

Ganguly, Sumit. (2023). Modi’s Undeclared Emergency. Journal of Democracy.

Narayan, Jayaprakash. (1975). Prison Diary. Popular Prakashan.

PUCL Report (2024). The State of Civil Liberties in India.

প্রতিমা প্রামাণিক

কাব্যনাট্যকার মঙ্গলাচরণ

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশাল জেলার নলডাঙ্গা গ্রামে, মামাবাড়িতে ১৭ জুন, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। পিতা সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা প্রতিমা দেবী। মঙ্গলাচরণ বরিশালের নলডাঙ্গাতে জন্ম নিলেও পড়াশোনা শুরু করেন বরিশাল জিলা স্কুলে। কবির বয়স যখন দশ বা বারো বছর তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে একটি চোদ্দো পঙক্তির কবিতা ছাপা হয়, যদিও কবিতাটি পরে পাওয়া যায়নি। ভালো লেখার জন্য স্কুলের পক্ষ থেকে সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন শিশু কবি মঙ্গলাচরণ। স্কুল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ মঙ্গলাচরণকে খুদে সদস্য হিসেবে যুক্ত করে নিলেন। কবি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বরিশাল জিলা স্কুলে পড়াশোনা করেন। তারপর সুরেশচন্দ্র সপরিবারে বদলি হয়ে চলে এলেন কলকাতা মতিলাল নেহেরু রোডের বাড়িতে। নবম শ্রেণিতে কবি মঙ্গলাচরণ ভর্তি হলেন মিত্র ইনস্টিটিউশনে। কবি মঙ্গলাচরণ কলকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এস.সি এবং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে বি.এস.সি পাশ করেন। তারপর প্রায় আড়াই বছর কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমান আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ) ডাক্তারি পড়েন।

সমাজের পালাবদলে সাহিত্যেও পালাবদল ঘটে। উনিশ শতকের শেষ দিকে পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোল-দর্শন-বিজ্ঞান দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হয়েছে। বিশ শতকের শুরু থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড, ৬ এপ্রিল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে দেশব্যাপী হরতাল, খিলাফৎ আন্দোলন (১৯১৯ খ্রি. - ১৯২২ খ্রি.), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ খ্রি. - ১৯২২ খ্রি.), কংগ্রেসের স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা (১৯২৩ খ্রি.), আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে গৃহযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জাপানের চিন আক্রমণ, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু এবং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে হিটলারের নেতৃত্বে অনাক্রমণ চুক্তি অমান্য করে রাশিয়াকে আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা। দেশীয় ক্ষেত্রে ভারতের মাটিতে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির নেতৃত্বে ভারতছাড়ো আন্দোলন, বাংলায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মন্বন্তর, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির মৃত্যু, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের প্রচলন সহ বিভিন্ন ঘটনা লক্ষ করা যায়। এই সময় পর্বেই মঙ্গলাচরণের সাহিত্য সৃষ্টি লগ্নের শুরু।

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্নায়ু' (১৯৪১ খ্রি.) প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব

বসুর 'কবিতা ভবন' প্রকাশনী থেকে। কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন মা প্রতিমা দেবীকে। লিখেছেন বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ - 'মনপবন' (১৯৪১খ্রি.), 'ঘুমতাড়ানি ছড়া'(১৯৪৭খ্রি.), 'তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪৮খ্রি.), 'মেঘ বৃষ্টি ঝড় (১৯৫১খ্রি.) , 'ক'টি কবিতা ও একলব্য' (১৯৫৯খ্রি.), প্রভৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল চঞ্চল। সর্ব শ্রেণির মানুষের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছিল। মঙ্গলাচরণের কবিতায় এ প্রসঙ্গে—

'আমাদের চোখে জটিল মৃত্যু'('কিমাশ্চর্যম/'স্নায়ু')

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আরও একটি বড় জগৎ হলো অনুবাদের জগৎ। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পাবলো নেরুদার কবিতা অনুবাদ করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পেলেন উল্টোরথ পুরস্কার। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রগতি প্রকাশনের অনুবাদকের কাজ নিয়ে চলে গেলেন রাশিয়ার মস্কোতে। অনুবাদ করলেন বিভিন্ন গ্রন্থ, ভালান্তিন বাতায়েভের - 'ইসকুল' (১৯৭৪ খ্রি.), আন্তন মাকারেঙ্কোর 'জীবন জয়ের পথে' (তিন খন্ড, ১৯৭৮ খ্রি.), ভাসিলি শুকসিনের রাশিয়ার 'গল্প সংগ্রহ' (১৯৭৯ খ্রি.), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস: প্রাচীন ভারত' (১৯৮০ খ্রি.), ননী ভৌমিকের সঙ্গে অনুবাদ করেন 'আলেকজান্ডার পুশকিন' (১৯৮০ খ্রি.), কনস্থানতিন পাউতোভসকির 'কালখিদার বাদা' (১৯৮১ খ্রি.)। এই সময় পর্বে (আট-নয়ের দশকে) সাহিত্য কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত হলেন - সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার (১৯৮৭ খ্রি.), সাংস্কৃতিক খবর সম্মান (১৯৮৭ খ্রি.), গৌরী ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৭খ্রি.),'স্বনির্বাচিত কবিতা' (১৯৯০ খ্রি.) গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৯১ খ্রি.), একুশে সংসদ পুরস্কার (১৯৯১ খ্রি.), সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯২ খ্রি.)।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধে ও সময়ের দাবিতে সৃষ্ট সাহিত্য ভিন্ন মার্গে, ভিন্ন ঘরানায়। আঙ্গিক ও বিষয় ওতপ্রোতভাবে গড়ে তোলে বিবিধ শিল্পকর্ম। নাটকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফর্ম আমরা দেখি যেমন - গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য প্রভৃতি। কবিতার আধারে কাব্যময় সংলাপে, দ্বন্দ্বময়, অভিনয়যোগ্য ও আকারে ছোটো হলো কাব্যনাট্য। সমালোচক উত্তম দাশ 'বাংলার কাব্যনাট্য ও তার ভবিষ্যত' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

"জীবনের দ্বন্দ্বময়তা সত্তার প্রকাশের জন্য আধুনিক সময়ে কবিতার যে নতুন আঙ্গিকের অন্বেষণ, তারই এক সার্থক পরিণতি কাব্যনাট্য"।[১]

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মূলত কবি। মার্কসবাদী চিন্তাধারার আলোকে প্রভাবিত। তাঁর কাব্যনাট্যর সংখ্যা মাত্র একটি কিন্তু এই একটি কাব্যনাট্য ('একলব্য') মঙ্গলাচরণকে স্মরণীয় করেছে। কাব্যনাট্যের প্রকরণগত দিকটি প্রথম দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। বাংলা সাহিত্যের কাব্যনাট্যের স্রষ্টা বলা চলে তাঁকেই। 'চিত্রা' কাব্যের (১৮৯৬ খ্রি.) 'আবেদন', 'বিদায় অভিশাপ', 'কাহিনী' কাব্যের (১৯০০খ্রি.) 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তিসংবাদ'

প্রভৃতি রচনাগুলি কাব্যনাট্যের আদি সূচনা বলা চলে। কাব্যনাট্যর ক্ষেত্রে পাঁচের দশক প্রস্তুতি পর্বের দশক, ছয়ের দশক সমৃদ্ধির দশক। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও রাম বসু মূলত কাব্যজগতের মানুষ। রাম বসু এই সময়ে সব থেকে বেশি কাব্যনাট্য লিখেছেন - 'নীলকণ্ঠ' (১৯৫৭ খ্রি.), 'ব্রীজ' (১৯৫৮ খ্রি.), 'তন্দ্রা ভেঙে ফেরা'(১৯৬২ খ্রি.) প্রভৃতি। কৃষ্ণ ধরের 'এলেম নতুন দেশে (১৯৫৯ খ্রি.), 'একরাত্রির জন্য (১৯৬১ খ্রি.) ,আলোক সরকারের 'বৃষ্টি' (১৯৫৯ খ্রি.), 'অশত্থগাছ'(১৯৬১ খ্রি.), 'একটি বিচ্ছেদ' (১৯৬২ খ্রি.) প্রভৃতি কাব্যনাট্য পাঁচের দশকের প্রস্তুতি পর্বে ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ছয়ের দশকে বুদ্ধদেব বসু আধুনিকভাবে কাব্যনাট্যকে প্রকাশ করেছেন —'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৫৯ খ্রি.) 'কাল সন্ধ্যা' (১৯৬৮ খ্রি.), 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০ খ্রি.), 'প্রথম পার্থ' (১৯৭০ খ্রি.) প্রভৃতি কাব্যনাট্যগুলি বিশেষ উদাহরণ।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'একলব্য' কাব্যনাট্যে মহাভারতের কাহিনি থেকে এই কাব্যনাট্যের বিষয় গ্রহণ করেছেন। প্রধান চরিত্র — দ্রোণাচার্য ও একলব্য, কোরাসে ভূমিকা পালন করেছে সম্মিলিত বনবাসী। গুরু দ্রোণাচার্য মহাভারতের কুরুবংশের পুত্রদের ধনুর্বিদ্যা শেখাতেন। হিরণ্যধনু এক নিষাদ, একলব্য নিষাদপুত্র; ধনুর্বিদ্যা শেখার অধিকার অর্জন করতে পারেনি। একলব্য যোগ্য হয়েও জাত ও ধর্মের কাছে মাথা নত করেছে, প্রত্যক্ষভাবে দ্রোণাচার্যকে গুরু হিসেবে না পেয়েও পরোক্ষভাবে গুরু হিসেবে স্বীকার করে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করেছে। নিষাদ পুত্রকে থামানো যায়নি; উদ্ভাসিত হয়েছে যোগ্যতার আলোয়। দ্রোণাচার্যের চিত্রপট মনের মধ্যে স্থাপন করে গুরু বলে মেনে নিয়ে ধনুর্বিদ্যা অর্জন করেছে। একলব্যর জীবনে বাধাগুলোই যেন পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিল। সম্মিলিত বনবাসীর প্রথম সংলাপে স্পষ্ট অনুভব হয় একলব্যের গুরু নিষ্ঠার গভীর পিপাসা, একটি পায়ের প্রত্যাশিত শব্দের জন্য উৎকর্ণ প্রতীক্ষা - "বুকে নিয়ে সোঁধাগন্ধ গভীর পিপাসা"।

প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দ্রোণাচার্য এসেছেন —

"সাত সমুদ্রের অন্ধকার
তেরোটি রক্তের নদী উজিয়ে এলাম একলব্য"।

এই "একলব্য" কাব্যনাট্যে 'সম্মিলিত বনবাসী' কোরাস হিসেবে সমগ্র কাব্যনাট্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দান করেছে। প্রতিটি পরিস্থিতির মুহূর্তকে প্রকাশ করেছে সুন্দরভাবে। এই কোরাস চরিত্রই যেন সর্বহারা মানুষ যারা সাম্যের জন্য লড়াই করে, সমান অধিকার পেতে চায়। সুমিতা চক্রবর্তী "বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ" গ্রন্থে 'নাটকের কোরাস' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন - "নাটকের আখ্যান এবং সেই আখ্যানের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে দেশ কাল এবং সাধারণ নাগরিকদের মনোভঙ্গির দিক থেকে নাট্যকাহিনীকে খানিকটা বিশ্লেষণ করা, নাট্যদর্শকের সামনে নাট্যআখ্যানটিকে বিভিন্ন দিক থেকে তুলে ধরা - এটাই হচ্ছে কোরাস-এর ভূমিকা"।[২]

সমালোচক তরুণ মুখোপাধ্যায় 'কাব্যনাট্যকার মঙ্গলাচরণ' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —"একলব্য কাব্যনাটকে অবশ্য মঙ্গলাচরণ তাঁর নিজস্ব জীবন বোধ প্রকাশ করেছেন। প্রান্তিক ও হতমান মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। পুরাণকে অধুনার সঙ্গে মিলিয়েছেন। এ যুগে বিশ্বাসের মৃত্যু ভয়ানক ঘটনা। মর্মান্তিকও। তারই এক টুকরো ছবি এখানে পাই"।[৩]

সেই সাধারণ মানুষের জীবন-কথা যেন কোরাসের কণ্ঠে রেখেছেন—

"আসবে আলো আসবে আলো

সংসারের কেন্দ্রে কবে, কবে-যে দোলনায় দুলবে অন্য এক শিশু, ভবিষ্যৎ !"(সম্মিলিত বনবাসী)

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন অরণ্য-আদিম-অনার্য-অধ্যুষিত ভারতবর্ষের প্রান্তিক জীবনের কাছে হস্তিনার মতো রাজপুরে নাগরিক জীবনের প্রবেশের অধিকার কোনো কালেই ছিল না। স্বাভাবিকভাবে একলব্যর পক্ষেও রাজধর্মানুশাসনের অচলায়তন ভাঙা সম্ভব নয়! যদিও গুরু স্বয়ং অর্জুনের রথের সারথি করার স্বপ্নে একলব্যকে প্রস্তাব দিয়েছেন-

গুরু - "নতুন জীবন পাবি দ্বিতীয় জন্মের তোরণেতে চল হস্তিনায়"।

একলব্য গুরুর দেওয়া এই প্রস্তাবে নিজের অধিকার বোধের দায়িত্বে গুরুকে প্রশ্ন করেছে—

একলব্য - "কুরুবংশ-বটের আওতায় আগাছা-জীবন ?
জীবন আলোকলতা অর্জুনগাছের গায়ে" ?

অথবা

"রাষ্ট্র যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। যন্ত্র কি জীবন"?

কাহিনির পরবর্তী অংশে আমরা দেখি দ্রোণাচার্য গুরু হিসেবে দায়িত্ব পালন না করেও গুরুর অধিকার বজায় রেখেছেন। দক্ষিণা স্বরূপ চেয়ে বসলেন বৃদ্ধাঙ্গুলী। সারাটা জীবন ধরে একলব্য যে আঙুলে বিশ্বাস ভরে ধনুকে টঙ্কার দিয়েছিল সেই সহজ বিশ্বাস গুরু কেড়ে নিলেন, এ যেন - 'তপ্ত জিভে মরুভূমি চেটে নিলে আস্থার অঞ্জলি।' দ্রোণাচার্য একলব্যকে নিজের অস্তিত্ব বোঝাতে গিয়ে রামায়ণ প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছেন —" আমি এক স্বর্ণমৃগ মারীচ" অর্থাৎ মারীচ যেমন রাবণের জন্য মায়ামৃগ রূপ ধারণ করেছিল ঠিক তেমনি কুরু বংশের রাজ-আগ্রাসনের খাতিরে দ্রোণাচার্যকে মিথ্যার স্বরূপ নিয়ে সত্যকে চাপা দিতে চেয়েছে।

একলব্যর প্রতিটি দিন রাত হল বিষময়। মানুষের শেষ সম্বল বিশ্বাস, একলব্য সেই শেষ দক্ষিণা দান করেছে! কোরাসের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে —

'এ-রাত্রির মাঝখানে শুয়ে আছে একলব্য: রক্ত স্নানে সম্পূর্ণ মানুষ'।

এই 'সম্পূর্ন মানুষ' সর্বহারা মানুষ; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে অস্তিত্বের জন্য

সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে! সামগ্রিক জীবন যুদ্ধ রক্ত স্নানেরই মতো। একলব্য আপাতমস্তক সেই বিষময় জীবনে রইল।

দ্রোণাচার্য চরিত্রটির একটি বিশেষ দিক দেখা গেল এই কাব্যনাট্যে। গুরু দ্রোণচার্যের শিষ্য রাজ সন্তানেরা। আর এক যোগ্য শিষ্য একলব্য যে একক মানুষ অথচ বনবাসী। দিনের শুরু অন্ধকারে, দিনযাপনের পর রাত্রি নামে সেই অন্ধকারেই! গুরু দ্রোণাচার্য চেয়েছিলেন সমাজ সম্মুখে এনে দাঁড় করাতে এই শিষ্যকে। গুরু দ্রোণাচার্যের মাধ্যমে উঠে এলো চিরকালীন আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব, আর্যের প্রতিষ্ঠা। রাজধর্ম আর মানব ধর্মের মাঝে গুরু ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতে গিয়ে কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে চিরকাল কারণ 'পৃথিবী ওদের' অর্থাৎ রাজাদের, শক্তিমানদের, ধর্মের। সমালোচক উত্তম দাশ এ প্রসঙ্গে বলেছেন -"একটি রাজনৈতিক আবহ রচনা করেছেন দ্রোণ ও একলব্যর মধ্যে"।[৪]

কাব্যনাট্যকার মঙ্গলাচরণ গুরুকে দিয়ে চিরকালের এক সত্য সংলাপ বলালেন -

"আমি এক স্বর্ণমৃগ মারীচ, আমার পেছনে হাঁ-মুখ ক্ষুধা, উলঙ্গ অভাব
তাকাতে পারবেনা তুমি সে-নির্লজ্জ অভাবের দিকে
ক্ষুধাকে বঞ্চনা দিতে পারবে না, পারবে না —
ক্ষুধা হাসিমুখে তুলে দেয় শিশুকে দুধের প্রবঞ্জনা
লজ্জা পিতৃত্বকে"।

গুরু বনবাসী একলব্যকে প্রশ্ন করেছেন - 'ক্ষুধা কেন তার চতুর্বলয় আবদ্ধ করে রেখেছে? বিছানার একপাশে ক্ষুধা কেন শুয়ে' ? সেই উত্তরে একলব্য 'জানিনা' বলে। গুরু একলব্যকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন - জানি না দিয়ে জীবন চলে না কারণ -'জীবন সমাজ বেঁধে বাস জীবন সভ্যতা'।

কাব্যনাট্যকার মঙ্গলাচরণ অসহায় এক যোগ্য সত্তার সমানাধিকরণের জন্য লড়াই করেছেন আমৃত্যু। অন্ধকারে কাটিয়েছে যে জীবন সেই জীবনকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন চিরকাল চলে আসা সত্যের বিভাজিত রূপ; রাজশাসন বনাম গণশাসনের দ্বন্দ্ব।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ, সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় , ছন্দা রায়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা ৭৩ প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০২, পৃ : ১৮১
২. পূর্বোক্ত সূত্র ১, পৃ : ২১
৩. মঙ্গলাচরণ কবি ও কাব্যনাট্যকার, তরুণ মুখোপাধ্যায়, সৃজন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০২২ পৃ : ২৭
৪. পূর্বোক্ত সূত্র ৩, পৃ : ২৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

ঝড়ো হাওয়া, সম্পা: অমল কর, শারদ সংখ্যা, কলকাতা ৩২, ২০১৯

নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, সাহিত্য লোক, কলকাতা ৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

নাট্যকলায় জীবন-শিল্প, সুমিতা চক্রবর্তী, প্রগেসিভ পাবলিশার্স,৩৭এ কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭

বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ, সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় , ছন্দা রায়, এবং মুশায়েরা কলকাতা ৭৩ প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০২

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাসংগ্রহ, সম্পা. সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ২০০৬

মঙ্গলাচরণ কবি ও কাব্যনাট্যকার, তরুণ মুখোপাধ্যায়, সৃজন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০২২

মৌসুমী মন্ডল

রবীন্দ্রদর্শনে মানবতাবাদ : মানবমুক্তির এক দার্শনিক রূপায়ণ

মানবতাবাদ এমন একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন, যা মানবপ্রকৃতির অস্তিত্ব, তার অন্তর্নিহিত মর্যাদা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবজীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের সৃজনশীলতা ও চেতনাশীলতাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা এবং মানবজীবনের গভীর তাৎপর্য অনুসন্ধান করা। মানবতাবাদ মানুষকে কেবল একটি জৈবিক সত্তা হিসেবে নয়, বরং একটি নৈতিক ও চেতনাসম্পন্ন সত্তা হিসেবে বিচার করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাজগতে মানবতাবাদ কোনো বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, বরং তাঁর সমগ্র সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যে তা এক অন্তঃপ্রবাহিত স্রোতের মতো। তিনি মূলত কবি হলেও তাঁর চিন্তাধারা কেবল কাব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সঙ্গীতস্রষ্টা ও দার্শনিক মননের অধিকারী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় বহুমাত্রিক। তাঁর রচনাসমূহে মানবজীবনের সৌন্দর্য, দুঃখ, সংগ্রাম, আশা ও পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রবিঠাকুরের এই বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারে মানবতার যে বহুরূপী প্রকাশ ঘটেছে, তা অবশ্যই দার্শনিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রকৃত অর্থে মনুষ্যত্বের পরম উপাসক। রবীন্দ্র দর্শনে এই জগৎ-সংসার মানুষের উপস্থিতিতেই এতটা সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর 'আমি' কবিতায় এই ভাবনারই কাব্যিক রূপ আমরা পাই —

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে তাকিয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।"[১]

উক্ত পঙ্‌ক্তিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক গভীর দার্শনিক ভিত্তি লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন, জগৎ নিজস্বভাবে অর্থবহ বা সুন্দর নয়; মানুষের চেতনাই জগতের সৌন্দর্য ও অর্থকে বাস্তব রূপ দেয়। মানুষ না থাকলে সৌন্দর্য কেবল একটি জড় গুণে পরিণত হতো; তার কোনো মূল্যগত তাৎপর্য থাকত না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট মানুষ ও জগতের সম্পর্কের বিষয়ে ভিন্ন প্রেক্ষিতে

আলোচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, মানুষ তার সৃজনশীল চেতনার মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র নিজের উপস্থিতির ছাপ রেখে চলেছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে সে জগতকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। এই সৃজনশীলতাকেই তিনি মানুষের প্রকৃত ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম হলো মানুষের স্বভাব বা স্বরূপ।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদকে একটি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো- যেখানে মানুষ, বিশ্ব ও চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক, নৈতিকতা ও আত্মোন্নয়নের ধারণা বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা বিদ্যমান একটি ব্যক্তিমানুষ এবং অন্যটি সমগ্র মানুষ। এই দুই রূপের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ব্যক্তিমানুষ তার ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সে তার নিজস্ব বিষয়সম্পত্তি, জ্ঞান, কর্ম, সাহিত্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যেই জীবনযাপন করতে চায়। এই স্তরে মানুষ সাধারণ জীবনযাত্রার আবর্তে আবদ্ধ থাকে এবং নিজের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র 'আমি'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু সমগ্র মানুষ কেবল বিষয়গত চেতনায় আবদ্ধ নয়। সে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর মহাজীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। তার কাছে লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, মৃত্যু-অমরত্ব প্রভৃতি বিষয় সমান গুরুত্বহীন হয়ে ওঠে। এই মহাজীবনের মধ্যেই সে প্রকৃত আনন্দ ও আত্মোপলব্ধির স্বাদ পায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, যেখানে ব্যক্তিমানুষের অভিমুখ ক্ষুদ্র আমিত্ব ও স্বার্থের দিকে, সেখানে সমগ্র মানুষের অভিমুখ বিশ্ব-আমি এবং আত্মত্যাগের দিকে। ব্যক্তিমানুষ আত্মব্যাপ্তির মাধ্যমে নিজের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র মানুষের স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে।

দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও অর্থনৈতিক অবস্থানের মতো বাহ্যিক পরিচ্ছেদের কারণে মানুষ বাহ্যিকভাবে বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এই সমস্ত পরিচ্ছেদের উর্ধে এক অভিন্ন মানবসত্তা বিরাজমান। এই অন্তর্গত, পরিচ্ছেদহীন মানবসত্তাকেই রবীন্দ্রনাথ 'সমগ্র মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন। এই স্তরে মানুষ বিষয়ভোগের আকর্ষণ থেকে সরে এসে আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের দিকে অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং সেই জীবনকেই সে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মানুষের বাহ্যিক সত্তা থেকে অন্তরের দিকে উত্তরণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘটে। যখন মানুষ সকল প্রকার বিভাজন অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার স্তরে উপনীত হয়, তখনই সে নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে। এই স্তরেই নিহিত রয়েছে তার সৌন্দর্য ও কৈবল্য। তাঁর মতে, বাহ্যিক কর্মই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; বরং অন্তরের সত্যোপলব্ধিই মানুষের সর্বোচ্চ অর্জন।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের একটি সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। বেদে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভেদ রয়েছে। জ্ঞানকাণ্ড যেখানে আত্মোপলব্ধিকে মুখ্য বলে মনে করে, কর্মকাণ্ড সেখানে কর্মফলকে গুরুত্ব দেয়। রবীন্দ্রনাথও যেন এই জ্ঞানমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ যখন নিজের মধ্যে সমগ্র মানবজাতিকে এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে শেখে, তখনই সে প্রকৃত সত্যের সংস্পর্শে আসে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে- রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে অদ্বৈতবাদী? বিষয়টি সহজে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে একটি পার্থক্য স্বীকার করেছেন। তিনি মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে মেনে নিলেও পরমাত্মাকে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাকার বলে উল্লেখ করেছেন। পরমাত্মা তাঁর মতে সকল বিশেষণ ও ভেদ থেকে মুক্ত। মানুষ নিজের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে বিভিন্ন বিশেষণে বিভূষিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ আত্মার একপ্রকার দ্বৈততাকে স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আরও মনে করতেন, মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার সৃষ্টিশীলতার ছাপ রেখে চলেছে। তবে তিনি মানবপ্রকৃতি ও জগৎপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে করেননি। তাঁর মতে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ বা অহংকার সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে। তবে এই অহংকার তিনি নেতিবাচক হিসেবে দেখেননি। বরং এই স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণেই মানুষ সৃজনশীল হয়ে ওঠে এবং নিজের সৃষ্টির প্রতি যত্নবান হয়।

এই সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষের ইতিহাস গড়ে ওঠে। মানুষ নানা রূপের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে। তার জ্ঞান, কর্ম ও চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে বিভিন্নতার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়াস। বিভিন্নতা আছে বলেই মানুষ অভিন্নতার সন্ধান করে। দুঃখ না থাকলে সুখের মূল্য উপলব্ধি করা যেত না, অন্ধকার না থাকলে আলোর তাৎপর্য বোঝা যেত না। ঠিক তেমনই, বিভিন্নতার উপস্থিতিতেই মানুষের মধ্যে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে, অন্ধকার আলোর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়; তা মূলত আলোর অনুপস্থিতিরই প্রকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো-বিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ব আছে বলেই মানুষ ঐক্যের সন্ধান করে। যদি বিচ্ছিন্নতা না থাকত, তবে ঐক্যবিধানের কোনো প্রয়োজনই থাকত না। যেখানে ঐক্যের অভাব, সেখানেই ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। এই বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে অবিচ্ছিন্নতার স্তরে পৌঁছনোর মধ্যেই মানুষের পূর্ণতা নিহিত। আর এই বিচ্ছিন্নতার মূল উৎস হলো অহংকার।

রবীন্দ্রনাথের মতে, অহংকার একদিকে মানুষকে স্বতন্ত্র করে তোলে, আবার অপরদিকে

এই স্বাতন্ত্র্যই মানুষের মধ্যে মিলনের প্রবণতা সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন, "অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না।"[২] এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, বিচ্ছিন্নতা ও ঐক্য পরস্পর নির্ভরশীল। মানুষের সমস্ত সৃষ্টিশীল প্রয়াস এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। ভেদ ও অভেদের মধ্যেই মানুষ একত্বের সন্ধান করে এবং এই সন্ধানই তার যাবতীয় কর্মের প্রেরণা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিসত্তা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সমগ্র মানুষের স্তরে পৌঁছনোর কথা বলেছেন। এই সমগ্র মানুষ আদর্শের দিকে অভিমুখী। এই আদর্শ কোনো বাহ্যিক উপাদান থেকে উদ্ভূত নয়; এটি মানুষের অন্তর থেকেই উৎসারিত। এই অন্তর্গত নির্দেশনাকেই পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট 'বিবেকের বাণী' বলে অভিহিত করেছেন। এই নির্দেশ মানুষকে অবিচ্ছিন্নতা, পূর্ণতা ও বিশ্বমানবতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে, ব্যক্তিমানুষ মূলত তার জৈবিক চাহিদা ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দ্বারা পরিচালিত। এই স্তরে মানুষের মধ্যে 'আমি'-বোধ অত্যন্ত প্রবল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব 'আমি'-কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন- 'ছোট আমি' ও 'বড় আমি'। যে 'আমি' ক্ষুদ্র স্বার্থে আবদ্ধ, তা হলো 'ছোট আমি'; আর যে 'আমি' বৃহত্তর কল্যাণের দিকে প্রসারিত, তা হলো 'বড় আমি'। রবীন্দ্রনাথ এই 'বড় আমি'-কেই 'বিশ্ব আমি' বা 'সমগ্র আমি' বলে অভিহিত করেছেন।

তাঁর মতে, 'আমিত্ব'-এর বিস্তারের মাধ্যমেই মানুষ 'সমগ্র আমি'-এর স্তরে পৌঁছাতে পারে। মানবসেবা ও সমাজকল্যাণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার সংকীর্ণ সত্তাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। ব্যক্তি-আমি থেকে সমগ্র-আমি-তে এই উত্তরণকেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি বলে মনে করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মুক্তি কোনো বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে নয়, বরং সমগ্রতার মধ্যেই নিহিত। এই ভাবনাই তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"[৩]

এর তাৎপর্য হলো- ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই প্রকৃত মুক্তির পথ।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মানুষ বাহ্যিক জগৎ ও তথ্যনির্ভর জীবনকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারে না, আবার সে কেবল এই স্তরেই সন্তুষ্ট থেকেও থাকতে পারে না। কারণ তথ্য মানুষের জীবনের ভিত্তি, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য কেবল প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়, বরং মহত্ত্ব উপলব্ধির জন্য। এই কারণেই মানুষ বলে- সমগ্রেই সুখ, অংশে নয়। তবে স্বরূপ উপলব্ধির পথ সহজ নয়। কারণ মানবসত্তার মধ্যে এক প্রকার দ্বৈততা রয়েছে। একদিকে

সে তথ্য ও প্রয়োজনের দ্বারা পরিচালিত, অন্যদিকে তার অন্তরে এমন এক সত্তা আছে, যার অভিমুখ সমগ্র মানবতার দিকে। এই অন্তর্গত সত্তা অল্পে তৃপ্ত হতে চায় না; সে চায় পূর্ণতা, চায় স্বরূপের উপলব্ধি। আর এই স্বরূপোপলব্ধির পথই সবচেয়ে কঠিন, কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

অদ্বৈত বেদান্তের মতো রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন, মানুষ অজ্ঞানের কারণে- অর্থাৎ স্বার্থপরতার কারণে- নিজের প্রকৃত স্বরূপকে বিস্মৃত হয় এবং বাইরের জগতে তার পরিচয় খুঁজতে থাকে। ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই যে পরম মানব বিরাজমান, সেই উপলব্ধি না করেই মানুষ বহির্জগতে তার সন্ধান করে। এর ফলে সে নিজের মধ্যকার সর্বজনীন মানবতাকে অস্বীকার করে এবং নিজেকেই নিজের কাছে পর করে তোলে। এটাই মানুষের অন্তর্গত হীনতার মূল কারণ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতেও এই ভাবনা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন যে, মানুষ নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থলেই যে সত্য লুকিয়ে আছে, তা না দেখে বাহ্য জগতে তার অনুসন্ধান করে। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে কবি উপলব্ধি করেছেন যে, পরম সত্য ও সর্বজনীন মানবতার বোধ মানুষের অন্তরেই নিহিত। তিনি বারবার মানুষের অন্তরাত্মার জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের অন্তরের মধ্যেই সত্য বিদ্যমান; প্রয়োজন কেবল তার উন্মোচন। এই কারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্য কোনো বাহ্যবস্তুর মধ্যে নয়তা মানুষের চেতনাতেই নিহিত। সত্য হলো সর্বব্যাপী মানবিকতা, যা মানুষের অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান।

অদ্বৈতবেদান্তের মতে জীব অজ্ঞানবশত নিজের প্রকৃত আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বাহ্য জগতে নিজের পরিচয় অনুসন্ধান করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তায় এই ধারণার সঙ্গে একটি গভীর সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র মানবতাবাদী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ স্বার্থপরতার ফলে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তাকে ভুলে গিয়ে বাহ্যিক সাফল্য, ক্ষমতা ও পরিচয়ের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিমানুষের অন্তরেই যে 'পরম মানব'- এর অবস্থান, তার প্রত্যক্ষ অনুভব না করেই মানুষ বহির্মুখী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এর ফলেই মানুষ নিজের সঙ্গেই পর হয়ে যায় এবং এই আত্মবিচ্ছিন্নতাই মানবজীবনের হীনতার মূল কারণ।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় এই আত্মবিস্মৃতির বেদনাময় প্রকাশ সুস্পষ্ট

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে,
দেখতে আমি পাইনি।
বাহিরপানে চোখ মেলেছি,
হৃদয়পানেই চাইনি।"[৪]

এই পংক্তিগুলিতে কবি মানবজীবনের সেই চিরন্তন ভ্রান্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেন- যেখানে মানুষ অন্তরের সত্য উপেক্ষা করে বাহ্য জগতে তার সন্ধান করে।

জীবনের সায়াহ্নপর্বে উপনীত হয়েও রবীন্দ্রনাথ এই অন্তর্মুখী উপলব্ধিকেই পরমসত্যের পথ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, সত্য কোনো বহিরাগত সত্তা নয়; বরং তা মানুষের অন্তরের মধ্যেই স্বপ্রকাশিত-

"সত্যেরে সে পায়
আপন আলোক ধৌত অন্তরে অন্তরে।"[৫]

কখনও আবার তিনি অন্তরতম সত্তার জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো।"[৬]

এই আহ্বান আসলে মানুষের মধ্যে নিহিত সর্বজনীন মনুষ্যত্বের জাগরণকেই নির্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের অন্তরে যে সার্বিক ও সর্বব্যাপী মানবিক সত্তা বিদ্যমান, তার উপলব্ধির মাধ্যমেই বিশ্বমানবতার স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। সত্য মানুষের মধ্যেই নিহিতপ্রয়োজন কেবল তার প্রকাশ ও উপলব্ধি। তাই 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় তিনি বলেন "সেই সত্য যা রচিবে তুমি।"[৭] এখানে সত্য কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং মানবিক সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটে। এই সত্যই হলো সর্বব্যাপী মনুষ্যত্ব, যা মানুষের অন্তর্নিহিত।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবাভিত্তিক অদ্বৈতচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজির মতে, ব্রহ্ম থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত সর্বত্র একই প্রেমময় সত্তার প্রকাশ। তাই জীবসেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরসাধনা সম্পূর্ণ হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের এই মানবধর্ম বা মনুষ্যত্বের উপলব্ধি সম্ভব হয় তখনই, যখন মানুষ অহংবোধ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধচিত্তে নিজেকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করে। চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অদ্বৈতবেদের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সাযুজ্যপূর্ণ হলেও মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। অদ্বৈত মতে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি মানে নিজের ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি মানে সর্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ অনুভব।

অদ্বৈতবেদান্তে জীব স্বরূপতই ব্রহ্ম-অজ্ঞানই তার বন্ধনের কারণ। অজ্ঞান নিবৃত্ত হলে ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ হয়। এই মুক্তি হলো 'প্রাপ্তের প্রাপ্তি'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মুক্তি কোনো জ্ঞানগত বিমূর্ত উপলব্ধি নয়; বরং মানবিক চেতনায় উত্তরণের মধ্য

দিয়েই মুক্তি অর্জিত হয়। তাঁর কাছে মুক্তি মানে বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মতা, মানবতার পূর্ণ বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবভাবনায় মানবসত্তার একটি দ্বৈত রূপ পরিলক্ষিত হয়-একটি ব্যক্তিগত সত্তা এবং অপরটি ভূমাগত বা সার্বিক সত্তা। এই দ্বৈততা তাঁর মানবতাবাদী দর্শনের একটি মৌলিক ভিত্তি। ব্যক্তিগত সত্তা বলতে তিনি অহংকে বোঝান এবং ভূমাগত সত্তা বলতে আত্মাকে নির্দেশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই দুই সত্তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপমা ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, অহং প্রদীপের ন্যায় এবং আত্মা শিখার তুল্য।

রবীন্দ্রনাথের মতে, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিমানুষ এবং মনুষ্যত্বসম্পন্ন পরম মানুষের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টাতেই মানবসভ্যতার ইতিহাসে নানা মানসিক অবস্থা ও চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে। এই মানসিক অবস্থাগুলিই কালক্রমে বিভিন্ন ধর্মতন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। এখান থেকেই স্পষ্ট হয় যে রবীন্দ্রনাথ আচারসর্বস্ব ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের ধর্মেযে ধর্মের মূল নিহিত রয়েছে মনুষ্যত্বের উপলব্ধিতে।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে আদর্শরূপে এবং ধর্মমতকে আচারগত রূপে পৃথক করে দেখেছেন। তাঁর মতে আদর্শ ধর্ম নিত্য ও শাশ্বত, কিন্তু ধর্মমত সময়সাপেক্ষ এবং অনিত্য। ধর্ম যখন আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে, তখন তা প্রকৃত ধর্মের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায় ভ্রান্তিবশত নিজের মতকেই একমাত্র ধর্ম বলে মনে করে এবং এর ফলে ধর্মের মৌলিক আদর্শই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রবণতা সমাজে বিভেদ, অপসংস্কার ও অশান্তির জন্ম দেয়।

যে ধর্ম সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সমাজে বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, তা কখনোই ধর্মের আদর্শ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মতে, ধর্মের প্রকৃত কাজ মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, বিভাজন সৃষ্টি করা নয়। মানুষের ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না; তার অভিমুখ সর্বজনীন ভূমার দিকে। এই প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন

"সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষবুদ্ধির, অহংকারের, অবজ্ঞাপরতার ও মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়- শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্ব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে, - স্বয়ং দেবত্ব অপমানিত ও পরস্পর ব্যবহারে আতঙ্কিত করে রাখে।"[৮]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে দেন যে, যে ধর্ম মানুষে মানুষে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সমাজে অশান্তির পরিবেশ গড়ে তোলে এবং মানুষকে সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে, তা প্রকৃত ধর্ম নয়তা মোহমাত্র। তাঁর মতে, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের উপলব্ধিই একমাত্র ধর্ম।

এই মানবধর্মের ধারণা চণ্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তির সঙ্গে গভীরভাবে সাযুজ্যপূর্ণ

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।"[৯]

জীবনের অন্তিম পর্বেও তাঁর মানবতাবাদী চেতনা আরও গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে

"ওই মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে।"[১০]

উপরিক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের মতে জগতের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা মানব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। মানুষ ব্যতীত বিশ্বজগৎ অপূর্ণ। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা ও বিশ্বসত্তাএই দ্বৈত উপস্থিতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনার উত্থান ঘটেছে। তবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃত ধর্ম হলো মনুষ্যত্বে উত্তরণ, আর আচারসর্বস্ব ধর্মমত তার বিকৃত রূপ। আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে 'বিশ্ব আমি'-তে উপনীত হওয়াকেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই বিশ্ব-আমি উপলব্ধি মানুষের অন্তর্জাত ও বিবেকজাত। একই সঙ্গে এটিও প্রতিপন্ন হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বভাবনা আংশিকভাবে ঔপনিষদিক বৈদান্তিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও তা স্বতন্ত্র মানবতাবাদী রূপ লাভ করেছে। অহংকার যেমন মানুষের স্বাতন্ত্র্যের শর্ত, তেমনই তা মানবিক ঐক্যের পথেও সহায়কএই দ্বান্দ্বিক সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবদর্শনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত সর্বজনীন মনুষ্যত্বের উপলব্ধিই যে তাকে বিশ্বমানবতার স্তরে উন্নীত করেএই সত্যই তাঁর মানবতাবাদের কেন্দ্রীয় বাণী।

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের অন্তরে নিহিত সর্বজনীন মনুষ্যত্বের অনুভবই তাকে সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে উত্তীর্ণ করে বিশ্বমানবতার স্তরে উন্নীত করে। এই মানবিক উত্তরণই তাঁর দর্শনে মুক্তি, ধর্ম ও সত্য- এই তিনটির মিলনবিন্দু।

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মানবতার পূজারী। তাঁর মানবতাবাদ কেবল তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; তা বাস্তব জীবনের অবহেলিত, নিপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষের অন্তরস্পর্শী হয়ে উঠেছে। তিনি নিজেকে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো উচ্চাসনে স্থাপন করেননি; বরং মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়াকেই জীবনের সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই মানবিক আত্মপরিচয়ের ঘোষণাই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক।"[১১]

এই ঘোষণার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ তার পূর্ণতা লাভ করেযেখানে মানুষই দর্শনের কেন্দ্র, মানবিক ঐক্যই সাধনা এবং বিশ্বমানবতাই চূড়ান্ত লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "আমি", শ্যামলী। রবীন্দ্র রচনাবলী।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা (প্রাসঙ্গিক বিষয়: প্রেম-দর্শন ও মানবসম্পর্ক)।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ৩০ সংখ্যক কবিতা, নৈবেদ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতিমাল্য (গান নং ৯২), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৪৬।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ লেখা (কবিতা নং ১৫), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান (পূজা পর্ব), গান নং ৩৯।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কথা ও কাহিনী (কাহিনী অংশ)।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৬৪ (লাইন: ১৯-২০), পূর্ব সংস্করণ।
৯. রায়, যোগেশচন্দ্র (সম্পাদিত), চণ্ডীদাস চরিত, প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ লেখা (কবিতা নং ১৫), পূর্ব সংস্করণ।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "পরিচয়", সেঁজুতি, রবীন্দ্র রচনাবলী।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪৩১।
২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতিমাল্য/৯২, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৪৬।
৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, কথা ও কাহিনী (কাহিনী অংশ), কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯০০।
৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, নৈবেদ্য (৩০ সংখ্যক কবিতা), কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯০১।
৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ (শিশুতীর্থ কবিতা), কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৩২।
৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, দ্য রিলিজিয়ান অফ ম্যান। লন্ডন: জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৩১।
৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ শেষ লেখা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৩
৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সেঁজুতি (পরিচয় কবিতা), কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৩৮।
৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, শ্যামলী (আমি কবিতা), কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৩৬।
১০। রায় সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, দর্শনচিন্তা, রবীন্দ্ররচনা সংকলন, গ্রন্থালয় প্রাইভেট ১৯৮২।
১১। রায় যোগেশচন্দ্র, চণ্ডীদাস চরিত, প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৪।
১২। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৬৪।
১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম, অনুবাদ: ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কলকাতা: ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস।

অনুপ কুমার মাজি

সমকালীন সংকটের ভেতর মানবিকতা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার পাঠ

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অবস্থান বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। তিনি এমন এক সময়ে কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেন, যখন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সমাজ গভীর অস্থিরতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। দেশভাগের অভিঘাত, উদ্বাস্তু সমস্যার বিস্তার, শহরায়ণের দ্রুত গতি এবং মধ্যবিত্ত জীবনের নতুন বাস্তবতা মানুষের মানসিক জগৎকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল। সাহিত্যের অপরাপর শাখার মতোই এই পরিবর্তনের অভিঘাত কবিতায় নানা ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অভিঘাতের চূড়ান্ত রূপ কোথাও তীব্র রাজনৈতিক প্রতিবাদে, কোথাও অস্তিত্ববাদী নিঃসঙ্গতায়, আবার কোথাও ব্যক্তিগত আত্মমগ্নতায়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই দুই মেরুর মাঝখানে অবস্থান করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই মানবিক মূল্যবোধের অনুসন্ধান করেন। তবে তিনি কেবল সংকটের বর্ণনায় থেমে থাকেননি, সংকটের ভেতর দিয়েই মানবিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনার একাধিক দিকের অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানই তাঁর কবিতাকে সমকালীনতার সীমা অতিক্রম করে দীর্ঘস্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা দান করেছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা বোঝার জন্য তাঁর সময়ের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা জরুরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ এবং পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা ভারতীয় সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে, গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং শহরগুলোতে জন্ম নেয় নতুন ধরনের দারিদ্র্য ও বিচ্ছিন্নতা। এই সময়ের মানুষ একদিকে রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে নতুন স্বপ্নের আশ্বাস পাচ্ছিল, অন্যদিকে বাস্তব জীবনে ক্রমশ নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে উঠছিল। নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় এই দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। তাঁর কবিতা সমাজের এই সংকটকে কোনো বিমূর্ত দর্শনের স্তরে নিয়ে যায় না বরং সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তুলে ধরে।

নীরেন্দ্রনাথকে আমরা যদি সমকালীন কবিদের সঙ্গে তুলনা করি, তবে দেখা যায় জীবনানন্দ দাশ যেখানে প্রকৃতির ভেতর মানুষকেই খুঁজে ফিরেন, প্রকৃতি ও নিঃসঙ্গতার প্রতীকী জগৎ নির্মাণ করেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়রা যেখানে বিপ্লবী চেতনায় মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন, তীব্র আত্মপ্রকাশ ও বিদ্রোহী কণ্ঠে কথা বলেন, সেখানে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাব্যচিন্তা সংযত, বাস্তবমুখী এবং মানবকেন্দ্রিক। তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নীরব অভিজ্ঞতাকে কবিতার বিষয় করে তোলেন। তাঁর কবিতায় নাগরিক

জীবন, শহরের ভিড়, মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ভণ্ডামি ঘন ঘন ফিরে আসে। তবে তিনি এই বিষয়গুলোকে নাটকীয় ভাষায় নয়, বরং সংযত ও প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। এই সংযমই তাঁর কবিতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে এবং মানবতাবোধকে দৃঢ় ভিত্তি দেয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতা। দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু স্রোত, শহরায়ণের দ্রুত বিস্তার এবং চাকরিনির্ভর জীবনের প্রসার মধ্যবিত্ত সমাজকে এক নতুন কাঠামো দেয়। এই কাঠামোর ভেতরে মানুষ একদিকে নিরাপত্তা খোঁজে, অন্যদিকে অনিশ্চয়তায় ভোগে। বিশেষ করে তাঁর শহরকেন্দ্রিক কবিতাগুলিতে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ও যান্ত্রিকতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতার মানুষটি নিরাপদ জীবন চায়, কিন্তু সেই নিরাপত্তার মধ্যেই এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে।

"পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।"[১]

নীরেন্দ্রনাথের মধ্যবিত্ত মানুষটি সীমাবদ্ধ, কিন্তু নিষ্প্রাণ নয়। তার স্বপ্ন বড় নয়, কিন্তু সে স্বপ্নই তার জীবনের অর্থ। কবির দৃষ্টিতে এই সীমিত স্বপ্নও মানবিক মর্যাদার অধিকারী। এখানেই নীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক কবিতার অনেক ধারার থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। যেখানে অনেক কবি মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে কেবল ভণ্ডামি বা আপসের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন, নীরেন্দ্রনাথ সেখানে মধ্যবিত্ত মানুষটির অস্তিত্বগত সংগ্রামকে গুরুত্ব দেন।

আধুনিক নগরজীবনের যান্ত্রিকতা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় এক গভীর সংকট হিসেবে উপস্থিত। ভিড়ের মধ্যে থেকেও মানুষের নিঃসঙ্গতা, সম্পর্কের শীতলতা এবং অনুভূতির সংকোচন কবিকে ভাবিত করেছে। তাঁর কবিতায় শহর একদিকে সুযোগের প্রতীক, অন্যদিকে মানবিক বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্র। এই একাকিত্বের মধ্যেও কবি মানবিক সংযোগের সম্ভাবনা খোঁজেনএকটি দৃষ্টির উষ্ণতা, একটি সামান্য সহানুভূতি কিংবা নীরব সহমর্মিতার মধ্যেই তিনি মানবিকতার আশ্বাস পান।

'আবহমান' কবিতায় শহুরে জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও গ্রাম-প্রকৃতির প্রতি ফিরে আসার যন্ত্রণা বর্ণিত।

"কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে,
কে এই খানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে,

এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালবাসে।
ফুরয় না, তার কিছুই ফুরর না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।”[২]

-কবি দেখান, সভ্যতার শুরুতে অরণ্যবাসী মানুষ গ্রাম গড়েছে, আজও সেই শিকড়ের খোঁজ অবিরাম। এটি মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার মানবিক চক্রকে প্রকাশ করে। নগরজীবনের ক্লান্তিতে প্রকৃতির প্রতি ফিরে আসা মানুষের চিরন্তন অনুরাগ দেখায়।

“তেমনি করেই সূর্য ওঠে তেমনি করেই ছায়া।
নামলে আবার ছুটে আসে সান্ধ্য নদীর হাওয়া।”[৩]

‘আবার’ শব্দটি মানবতার চক্রাকার যাত্রাকে প্রকাশ করে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মানবতাবোধ তাই কোনো রোমান্টিক মানবপ্রেম নয়। এটি বাস্তব সমাজকাঠামোর ভেতর গড়ে ওঠা মানবিক চেতনা। তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষ সমাজের প্রান্তিক নয়, বরং সমাজের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই মানুষ ইতিহাসের পাতায় স্থান না পেলেও কবিতার ভেতরে তার অস্তিত্ব গভীর তাৎপর্য লাভ করে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার মানবতাবোধের কেন্দ্রে যে মানুষটি অবস্থান করে, সে কোনো মহাকাব্যিক নায়ক নয়, কোনো বিপ্লবী প্রতীকও নয়। সে একেবারেই সাধারণ মানুষচাকুরিজীবী, মধ্যবিত্ত, নাগরিক জীবনের ভিড়ে প্রতিদিন নিজেকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত এক সামাজিক সত্তা। এই মানুষটি অফিসে যায়, বাসে দাঁড়িয়ে থাকে, বাজার করে, সংসারের দুশ্চিন্তায় রাত কাটায়, আবার ছোট ছোট স্বপ্নও দেখে। নীরেন্দ্রনাথ এই মানুষটিকে করুণার পাত্র হিসেবে দেখান না, আবার ব্যঙ্গের বিষয় হিসেবেও দাঁড় করান না। বরং তার বাস্তব অবস্থানকেই কবিতার কেন্দ্রে এনে মানবতার অর্থ নির্মাণ করেন।

“যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
এখনও সেই ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল
সন্ধ্যার বাতাসে।”[৪]

গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা মানুষের অনুরাগ লাউমাচারের উঠোনে ফিরে আসে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতায় মানবতাবোধের একটি নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করেন। মানবতা এখানে কোনো বিমূর্ত নৈতিক আদর্শ নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের ভেতরে বেঁচে থাকা মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব, তার সীমাবদ্ধতা, ক্লান্তি, ছোট স্বপ্ন ও নীরব সংগ্রামের সম্মিলিত রূপ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা সরাসরি রাজনৈতিক স্লোগান তোলে না, কিন্তু তা গভীরভাবে রাজনৈতিক। তাঁর ব্যঙ্গ ক্ষমতার ভাষাকে প্রশ্ন করে এবং সামাজিক ভণ্ডামির

মুখোশ খুলে দেয়। 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটি এই ব্যঙ্গের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উলঙ্গ রাজা কবিতায় সমাজের অন্ধত্ব ও সাহসের প্রতীকী চিত্র আঁকা হয়েছে।

'সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে'
সবাই চেঁচিয়ে বলছে; শাবাশ, শাবাশ!"[৫]

এখানে লোভ-ভয়ে আচ্ছন্ন সমাজের সমালোচনা।

"কেউ ভাবছে রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।"[৬]

এই ব্যঙ্গ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না। বরং এই সকল 'পরান্নভোজী, কেউ কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক' মানুষের দুর্বলতাকে স্বীকার করেই তাকে সচেতন করার চেষ্টা করে। এখানেই কবির মানবতাবোধের নৈতিক দিকটি স্পষ্ট হয়। তাঁর কাছে রাজনীতি মানে দলীয় অবস্থান নয়, বরং ক্ষমতা ও সত্যের সম্পর্ককে নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করা। এটি মানবতার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে তুলে ধরে, যা ভ্রান্তির মধ্যেও সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়।

কলকাতার যীশু কবিতাটিতেও লক্ষ করা যায় নির্ভীক উলঙ্গ শিশু যান্ত্রিক সভ্যতার বুকে মানবতার যে বাণী বহন করে এনেছে তা মেঘের বুক চিরে এক ঝলক মিঠে রোদ্দুরের মতোই।

"খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গী পাড়ায়।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।"[৭]

কবিতায় শিশুচেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সংকেত বহন করে। বিশেষত 'উলঙ্গ রাজা'কে দেখে কবিতায় শিশুর প্রশ্ন "রাজা তোর কাপড় কোথায়?" আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক অনন্য মুহূর্ত সৃষ্টি করে। এই প্রশ্ন ক্ষমতা, ভণ্ডামি ও সামাজিক সম্মতির মিথকে উন্মোচিত করে। শিশুর প্রশ্ন আসলে মানবতার মৌলিক শর্ত। প্রাপ্তবয়স্ক সমাজ যেখানে আপস করে নেয়, সেখানে শিশুর সরল প্রশ্ন সত্যের মুখোশ খুলে দেয়। নীরেন্দ্রনাথের মানবতাবোধ তাই প্রশ্নহীন আনুগত্যের বিরোধী। তিনি দেখান, প্রশ্ন করার সাহসই মানুষকে মানুষ করে তোলে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল ভাষার সরলতা। এই সরলতা কেবল শৈল্পিক কৌশল নয়, বরং তাঁর মানবতাবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত

একটি নৈতিক অবস্থান। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় যখন দুর্বোধ্যতা, প্রতীকনির্ভরতা ও ভাষাগত জটিলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হয়ে ওঠে, তখন নীরেন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই সহজ, কথ্য ও প্রায় দৈনন্দিন ভাষাকে কবিতার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতার মানুষ যে সাধারণ মানুষ, তার ভাষাও তাই সাধারণ মানুষের ভাষা। জটিল শব্দচয়ন বা দুর্বোধ্য চিত্রকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠককে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তিনি পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সংলাপ স্থাপন করতে চান। এই সংলাপধর্মী ভাষাই তাঁর কবিতার মানবতাবোধকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় মৃত্যু ও প্রেম দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও তা কখনও রোমান্টিক অতিনাটকীয়তায় পরিণত হয় না। তাঁর কবিতায় এই অভিজ্ঞতাগুলি সংযত, নীরব ও গভীর মানবিক বোধের সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যু ও প্রেম এখানে জীবনের ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অংশ।

তাঁর কবিতায় মৃত্যুকে জীবনের বিপরীত হিসেবে দেখা হয় না। বরং মৃত্যু জীবনের অর্থকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর কবিতায় মৃত্যু কোনো ভয়ংকর বা অতিরঞ্জিত অভিজ্ঞতা নয়, বরং এক ধরনের স্বাভাবিক পরিণতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মানবতাবোধের সঙ্গে যুক্ত। কারণ এখানে মানুষকে আতঙ্কিত না করে বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার এক নৈতিক প্রশান্তি লক্ষ্য করা যায়।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমও একইভাবে সংযত। প্রেম এখানে আবেগের বিস্ফোরণ নয়, বরং দীর্ঘ সহাবস্থান, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও নীরব সম্পর্কের প্রকাশ। এই প্রেমে নাটকীয়তা নেই, আছে স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা। মধ্যবিত্ত জীবনের সীমাবদ্ধতার ভেতর এই প্রেম গড়ে ওঠে, এবং সেই সীমাবদ্ধতাকেই সে স্বীকার করে।

এই সংযত প্রেম ও মৃত্যুচেতনা আধুনিক বাংলা কবিতার একটি বিশেষ প্রবণতার বিপরীতে দাঁড়ায়। যেখানে অনেক কবি প্রেম ও মৃত্যুকে তীব্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অস্তিত্বগত সংকটের প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন, নীরেন্দ্রনাথ সেখানে এগুলিকে মানবিক অভিজ্ঞতার সাধারণ স্তরে ফিরিয়ে আনেন।

মৌলিক নিষাদে সমকালীন অন্ধকার ও ভয়ের চিত্র আঁকা। পিতামহকে সম্বোধন করে কবি বলেন,

‘পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি
পিতামহ দাঁড়িয়ে রয়েছি আর চেয়ে দেখছি
রাত্রির আকাশে ওঠেনি একটাও তারা আজ...
আমি ভিতরে বাহিরে যেদিকে তাকাই,
আমি স্বদেশে বিদেশে যেখানে তাকাই শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।’[৮]

কবি এখানে মানুষের দুর্বলতা, ভয়, ব্যর্থতা ও ক্লান্তিকে মানবিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কবিতার মানুষ নায়কোচিত নয়; তারা সাধারণ, কখনও ভীত, কখনও সংশয়ে ভরা। অন্ধকার ও নিষ্ঠুর নদীর পাশে দাঁড়ানোর ভয়ে পিতামহকে ডেকে মানবতাবোধ প্রকাশিত হয় হারানো নীলিমার আক্ষেপে।

"পিতামহ তোমার আকাশ
নীল — কতখানি নীল ছিল?
আমার আকাশ নীল নয়।
পিতামহ তোমার হৃদয়
নীল — কতখানি নীল ছিল?
আমার হৃদয় নীল নয়।" [৯]

আকাশ-হৃদয়ের নীলিমা হারানো, নিষ্ঠুর সময়ে ভয় জাগেযা আলোকিত ইচ্ছার উপর ছায়া ফেলে। এটি মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে স্বীকার করে, পূর্বপুরুষের আলোর সঙ্গে বর্তমানের অন্ধকারের তুলনায় আশার আলো খোঁজে। কবি মানুষের ভয়কেও মানবিক করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই ধারার উত্তরসূরি হলেও তিনি অনেক বেশি নির্দিষ্ট সামাজিক বাস্তবতার দিকে মনোযোগী। তাঁর মানুষ বিশ্বমানবতার বিমূর্ত প্রতিনিধি নয়, বরং নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের মানুষ। তবু এই নির্দিষ্টতার মধ্য দিয়েই তিনি সার্বজনীন মানবিক সত্যে পৌঁছান। কারণ মানুষের ক্লান্তি, ভয়, ভালোবাসা ও প্রশ্ন কোনো একটি সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সমকালীনতা প্রসঙ্গে অমলকান্তির স্বপ্ন'রোদ্দুর হতে চাওয়া'সাধারণ মানুষের অসাধারণ আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে, যা সমাজের গতানুগতিক সাফল্যের বাইরে যায়। এটি মানুষের নির্মল হৃদয়কে পূজা করে, বাস্তবের কষ্টেও আলো ছড়ানোর শক্তিকে স্বীকার করে। কবি দেখান, এমন স্বপ্নই মানবতাকে জীবন্ত রাখে। কবিতায় শব্দ দিয়ে কবি সেই রোদ্দুরের ছবি আঁকছেন —

"ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,
জাম আর জামরুলের পাতায়
যা নাকি অল্প-একটু হাসির মতন লেগে থাকে।" [১০]

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর ও ভোগবাদী সমাজে মানুষ প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষই সব কিছুর কেন্দ্রে। উন্নতি, ক্ষমতা বা সাফল্যের কোনো অর্থ নেই, যদি মানবিক মূল্যবোধ অনুপস্থিত থাকে।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় বারবার 'অন্ধকার' আর 'রোদ্দুর' আনাগোনা করে। 'নীরক্ত করবী'র ছত্রেও ধরা পড়ে-

"এখন রোদ্দুর দেখে মনে হয়, রোদ্দুরের পেটে
অনেক অঁধার রয়ে গেল" [১১]

আসলে সমকালীন যুগযন্ত্রণা কবির কাছে অন্ধকারের প্রতীক। আর সেই যুগযন্ত্রণা থেকে মুক্তিই হল 'রোদ্দুর'।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা সমকালীন সংকটের এক সংবেদনশীল দলিল। যুদ্ধ, দারিদ্র্য, নগরায়ণ ও নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যেও তিনি মানবিকতার আলো নিভতে দেননি। এই মানবিক অবস্থানই তাঁকে বাংলা আধুনিক কবিতায় এক অনন্য স্থান দিয়েছে। শব্দের ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের সেই মানুষটির মুখোমুখি দাঁড় করান, যাকে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। আর সেইখানেই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা আজও জীবিত, আজও প্রয়োজনীয়। বর্তমান সময়ের সামাজিক ও নৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে তাঁর কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়মানুষের প্রতি বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত সভ্যতার প্রধান ভিত্তি। এই বিশ্বাস যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তাঁর কবিতাও প্রাসঙ্গিক থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১। চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ- ৫৮
২। তদেব, পৃ- ৫০
৩। তদেব, পৃ- ৫১
৪। তদেব, পৃ- ৫১
৫। তদেব, পৃ- ১১২
৬। তদেব, পৃ-১১৩
৭। তদেব, পৃ-১১৯
৮। তদেব, পৃ-৫৮
৯। তদেব, পৃ-৫৯
১০। তদেব, পৃ-৪৯
১১। তদেব, পৃ-৬২

গাফফার আনসারী

প্রান্তিক জনপদ ও জনজীবনের চালচিত্র : প্রসঙ্গ নির্মল হালদারের কবিতা

বিংশ শতকের সত্তর দশকের এক ভিন্নতর ধারায় সার্বিকভাবে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গভীরতায় যে কয়েকজন কবি অবগাহন করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী কবি নির্মল হালদার। নিজেকে চেনা, চারপাশকে দেখা, দেশ-কাল চেতনার সঙ্গে ভাবনাকে অন্বিত করার দিকটি নির্মলের কবিতার প্রধান দিক। নির্মলের কবিতায় পুরুলিয়ার কঠিন কঠোর লাল মাটির বুকে পলাশের মতো প্রাণের উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রান্তিক ক্ষুধার্ত জন-জীবন নিজস্ব ছন্দে যাপন করেন। নির্মলের দ্বিতীয় কাব্যের ('পুরনো এ জীবন আমাদের নয়', ১৯৮৩ খ্রি.) কবিতায় পথে-ঘাটে গরু-ছাগলের ভিড় দেখা যায়, নদীতে জাল ফেলার শব্দ, মাঠে গাঁইতি কোদালের শব্দ শোনা যায়, পুকুরঘাটে কাপড় কাচার শব্দ, বাসন মাজার শব্দ, এমনকি মেয়েদেরকে পাথর দিয়ে গা ঘষতেও দেখা যায়। মোরগ লড়াই, কাড়া লড়াই আর ছো-নাচের আসরে কবি জীবনের চূড়ান্ত আনন্দ খুঁজে পান। আবার দু-মুঠো ভাতের জন্য কাউকে সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখা যায়, কেউ আবার সূর্যের প্রখর দীপ্তি অগ্রাহ্য করে পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে আনে। অথবা ফসলের স্বপ্নে মংলু মিয়াকে পাথর কাটার মতো অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখা যায়, কাউকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঝুড়ি বুনতে দেখা যায়, কাউকে আবার গান গেয়ে ধান কাটতে দেখা যায়। ঘরে ফেরা চাষির সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দে কবি ডাক-পিয়নের সুসংবাদ খুঁজে পান। চাষি-বউয়ের চুড়ির শব্দে অথবা তার আঁচলে বাঁধা চাল মেঝেতে শব্দ করে পড়লে কবির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নির্মল হালদারের কবিতায় অবহেলিত আদিবাসীদের নিঃস্ব জীবনে মহুয়া আর হাঁড়িয়ার মাদকতা যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে — সেই বৈচিত্র্যময় জীবন থেকে, যাপন থেকে নির্মল হালদার তাঁর কবিতাকে কোনোদিনই দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি। এমনকি তিনি নিজেও এই সমস্তকিছু থেকে দূরে সরে থাকতে চাননি বরং তাঁর কবিতায় সচেতনভাবে তিনি গ্রাম-জীবন ছড়িয়ে দিয়েছেন। নির্মল তাঁর প্রথম কাব্যের শুরুতেই ('অস্ত্রের নীরবতা', ১৯৮০) 'নগরকেন্দ্রিক' কবিতায় তাঁর অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন :

> "নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে লেখা
> লেখা কি আমার? আমি ওই লেখার মধ্যে পেয়েছি বাবুয়ানি
> বাবু সমাজের রা
> আমি কেন দাঁড়াব ওই লেখার কাছে, ওই লেখা কি আমার?
> আমি আছি ধানক্ষেতে ধান পাহারায়
> আমি আছি মাঠে গরু ছাগল নিয়ে

আমি আছি ঢেঁকির শব্দে, গরুর গাড়ির শব্দে?"
আমি কেন যাব ওই লেখার কাছে?[১]

যে লেখায় নাগরিক ছোঁয়া আছে অথবা নগরকে বিষয় করে যে লেখা গড়ে উঠেছে সে লেখার সঙ্গে কবির আত্মার কোনো যোগ নেই। যে লেখায় 'বাবু সমাজের রা' শোনা যায় — সেখানে এক দণ্ডও তিনি দাঁড়াতে চান না। যিনি ধানক্ষেতে ধান পাহারায় আছেন, যিনি গরু ছাগল নিয়ে মাঠে আছেন, গরুর গাড়ির শব্দে কিম্বা ঢেঁকির শব্দে যাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় — তাঁর পরিচয় আলাদা করে দেওয়ার দরকারই নেই, কেন না তাঁর কবিতাই তাঁর পরিচিতি। নগরকে কেন্দ্র করে যে লেখা গড়ে উঠেছে সেই লেখায় কবি 'বাবু সমাজের রা' শুনতে পান বলেই নগরকেন্দ্রিক লেখা থেকে, নগরজীবন থেকে নির্মল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন। বাবু সমাজ থেকে অনেক দূরের গ্রাম-সমাজ ও গ্রামীণ জীবন-যাপন তিনি বেছে নিয়েছেন। নির্মলের প্রথম কাব্যের 'আত্মকথা' কবিতাতেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বললেন—

"আমার গল্প
কাড়া বাগাল গরু বাগালের মুখে
মেষপালকের কাছেও
আমার গল্প
আমার গল্প নিয়ে গ্রন্থ হয় না মৌন পুঁথি হয় না
একটা গাছে ঠেস দিয়ে
আমার গল্প শুনবে
আমি একটা গাঁয়ের ছেলে
ধান পাকলে বুঝি
ধান কাটা হবে"।[২]

যে জগৎ ও জীবন নির্মলের একান্ত আশ্রয়, যা-কিছু তাঁকে লালন করেছে তা তিনি কোনোদিনই অস্বীকার করতে পারেননা। এক সরল বিশ্বাসে তাই গ্রাম-জীবন আঁকড়ে থেকে নির্মল নিজেকে তাঁর আপন বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। তাছাড়া রাখালের সঙ্গ পেলে নির্মল নিজেকে খুঁজে পান অথবা রাখালের বাঁশির শব্দে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। নানান অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও নির্মল তাঁর কবিয়াল দাদার গানে অঙ্কুরিত ক্ষেতের কথা শুনতে চান। এভাবেই গ্রামের আশা-আকাঙ্ক্ষা কবির নিজের হয়ে ওঠে আর কবিও গ্রামেরই একজন হয়ে ওঠেন। সমস্তকিছুর পরেও এলোমেলো এই জীবন-যাপন ছেড়ে, পলাশের এই রাজ্য ছেড়ে, পাহাড়-নদী-জল-জঙ্গল ছেড়ে — বলা ভালো, পুরনো

এ জীবন ছেড়ে নির্মল কোথাও যেতে চান না। সমস্তকিছু আঁকড়ে থেকে কবি পড়ে থাকতে চান এই রুক্ষ মাটিতেই।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো নির্মলের কবিতায় অন্নকথা একটি বিশেষ দিক। 'পুরনো এ জীবন আমাদের নয়' (১৯৮৩ খ্রি.) কাব্যে নির্মল তাই 'ভাতগীত' গাইতে বসেন। যিনি নিজে ক্ষুধার্ত তিনি অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের আয়োজন করে দিয়ে কিভাবেই বা ক্ষান্ত হতে পারেন? কবি নির্মল তাই বলেন, 'ভাতের চূড়া ভেঙে দিয়ে একই সঙ্গে আমিও খেতে পারি ভাত' (ভাতগীত-১)। কবি জানেন, ভাত ফোটানো কত আনন্দের, তাই ভাত ফোটানোর শব্দে তিনি লাফিয়ে ওঠেন। আবার 'সীতা' কাব্যের শুরুতেই 'হাসছে' কবিতায় ভাতের হাঁড়ির গায়ে ফ্যান লেগে থাকার দৃশ্য দেখে কবি প্রসন্ন হন অথবা হাঁড়ির ভেতরের অন্ন কবির মুখে হাসি নিয়ে আসে। পরক্ষণেই উনুনের পাশে জ্বালানির ঘুঁটেতে পাঁচ আঙুলের দাগ দেখে কবি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। জ্বালানির জন্য গোবরকুড়ানি সকাল বিকাল রাখালের গরুর পিছন পিছন ঘুরে বেড়ায়, একটু একটু করে সঞ্চিত গোবর অবশেষে দেওয়াল জুড়ে গোবরকুড়ানির আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ নেয়। 'বিবাহমঙ্গল' কাব্যের ৪১ সংখ্যক কবিতায় কবি ঠিকই বলেছেন :

"যেন একটা দেয়াল থেকে একটা দেয়াল
আশা- আকাঙ্ক্ষা
যেন একটা দেয়াল থেকে একটা দেয়াল
গোবরকুড়ানি হেসে উঠতে চায়"[৩]

গোবরকুড়ানির এই হাসি পরবর্তীকালে নির্মলের 'খোলামকুচি' (১৯৯৩ খ্রি.) কাব্যের ৪৭ সংখ্যক কবিতাতে প্রার্থনার সুরে উচ্চারিত হয়েছে, 'গাই-গরুর পিছনে পিছনে ছুটে যাই / মনে মনে প্রার্থনা করি: হে ঠাকুর গোবর দাও'। যে ছেলেটির হাতের জাদুতে বাবুদের জুতো ঝকঝকে আয়নায় পরিণত হয় অথবা পুজোতে লাগবে বলে যে মেয়েটি বাগান থেকে নিয়মিত ফুল তোলে — এই কাব্যে নির্মল তাদের কথাও তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে নির্মলের এই কাব্যেই আমরা দেখি— পুকুরের একগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলিই বটের ঝুরির দোলনায় দোল খায়, কখনো বা কালীরূপে বহুরূপীকে দেখে তারা থমকে দাঁড়ায় এমনকি ভয় পায় তবুও বহুরূপীর পিছনে পিছনে গোটা গ্রাম তারা ঘুরে বেড়ায়। এমন বিস্ময়, এমন আনন্দ নিয়ে এই ছেলেমেয়েগুলিই 'এই কুমির তোর জলকে নেমেছি'র মতো কুমির-ডাঙা খেলায় গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আগলে রাখে। তাছাড়া সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ভাঙা সাইকেলের চাকা গড়িয়ে একরকমের খেলার আনন্দ পাওয়া যায় — এই কাব্যের ২৩ সংখ্যক কবিতাতে নির্মল তা-ও তুলে ধরেছেন।

সমস্তকিছুর ভেতর থেকে নির্মল আসলে এমন জীবনের গল্প বলতে চেয়েছেন যে

জীবন নিতান্তই সহজ সরল সাধারণ মানুষের গল্প। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়টুকু মিটে গেলে যে মানুষেরা আলাদা করে শখ পূরণের জন্য কোনোরকম আয়োজন করে না বরং অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়। এইসবকিছুকে আশ্রয় করেই কবি নির্মল হালদার গড়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব কাব্য-ভুবন। নির্মলের এই কাব্য-ভুবন জুড়ে আমাদের চোখে পড়ে গ্রামের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের ছবি। তাঁর কবিতায় দেখতে পাই— মাঠে গরু-ছাগল নিয়ে রাখাল বালক আনমনে তালপাতার ভেঁপু বাজায় আর ধান-পাকা হাওয়ায় শস্য-শ্যামলে ভরপুর জীবনের গান গায়। আবার এরকম নানান দৃশ্যের মাঝখানেই 'বিবাহমঙ্গল' কাব্যের ২২ সংখ্যক কবিতায় কবি নির্মল হালদার যখন লেখেন :

"লম্ফর দিকে চেয়ে চেয়ে
একটা জীবন কেটে গেল দিদির
পঁচিশ পয়সার কেরোসিন তেলে একটা সন্ধ্যে
কিম্বা একটা জীবন কেটে গেল দিদির"[৪]

তখন কবির দিদির অসহায় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি সাধারণ পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অভাব-অনটন আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। লম্ফ বা হ্যারিকেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেরোসিন অপরিহার্য কিন্তু পঁচিশ পয়সার সেই কেরোসিনটুকু কেনার সামর্থ্য হয়ে ওঠে না সাধারণ মানুষের। কবি দেখেন, সেই হ্যারিকেন বা লম্ফর দিকে চেয়ে চেয়ে কত কত মানুষের জীবন কেটে যায়। সাধারণ মানুষ নিজেদের অজান্তেই যাবতীয় সংস্কার আজীবন বহন করে চলেন। তাই 'বিবাহমঙ্গল' কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতায় কবিকে দেখি, 'লাউপাতায় পিঠে বেঁধে/আমি যাই কুটুম্বিতা করতে'। লোক-সমাজে কুটুম্বিতা একটি স্বাভাবিক সংস্কার। কুটুম্বিতা করতে যাওয়া আসলে আত্মীয়দের মধ্যে পারস্পরিক স্বাভাবিক সুসম্পর্ক টিকিয়ে রাখার একমাত্র মাধ্যম। কুটুম্বিতার মতো এমন একটি সংস্কারের সঙ্গে কবি আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন — যা আবহমানকাল ধরে বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

নির্মলের কবিতায় কৃষিনির্ভর বাঙালি জীবনের কথা বারবার ঘুরেফিরে আসে। কেন না, অন্ত্যজ গ্রামজীবনের সঙ্গে কৃষি বহুকালধরে অঙ্গীভূত — বিশেষত বাঙালির চেতনার শিকড়ের সঙ্গে কৃষি সংযুক্ত। তারই নানান উপকরণ নির্মলের কবিতা বহন করে চলেছে। নির্মলের কবিতায় আমরা লক্ষ করি— গরুর গাড়িতে আঁটি আঁটি ধান যেমন নিয়ে আসা যায়, তেমনই গরুর গাড়িতেই বরকনে নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শুধু কৃষি নয়, তাছাড়াও দেখি— ধানকল ও আটাকলে মেশিন-চালক ভূতের মতো সাদা হয়ে ওঠে, কুয়োতলায় কলসি কাঁখে রমণীদের গালগল্প শোনা যায়। তাছাড়া ভীতু কাঠবিড়ালির ছুটে যাওয়া কিংবা ছাগলের করুণ আর্তনাদ — নির্মলের কবিতায় কোনোকিছুই বাদ পড়েনা।

এরকম টুকরো টুকরো ছবির পাশে অনায়াসে জায়গা করে নেয় 'মাঝপথে নেমে রান্নাবান্না' কাব্যের 'হেমন্ত এসে গেল' কবিতায় শীতে 'গোল হয়ে আগুন পোহানো'র মতো গ্রামীণ-জীবনের স্বাভাবিক একটি ছবি। এভাবেই কবিতার আধারে উত্তর আধুনিকতা গ্রাম্যজীবনের নিজস্বতা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। বলা যায়, নির্মলের কবিতা খেয়ে পরে বেঁচে থাকা সাধারণ জন-জীবনের চালচিত্র হয়ে উঠেছে। নির্মল হালদার তাঁর সমগ্র কাব্য-জীবনে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জীবন ও যাপনকে অন্বিত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কাব্য-চেতনায় সমকালীন প্রভাব অপেক্ষা আবহমান জীবন ও সংস্কৃতি কাব্যের আধার হয়ে উঠেছে। জীবন ও সংস্কৃতির এই অনুভবময় দিকগুলি উত্তর আধুনিকতার চিন্তাসূত্রে বারবার আলোচিত হয়েছে।

নির্মল হালদারের কাব্য-জীবনে আয়তনে সবচেয়ে বড় 'মলিন মর্ম মুছায়ে' কাব্যটি এক'শ চুয়াল্লিশটি কবিতার সমন্বয়ে মোট চারটি অংশে বিভক্ত হলেও কবি এই কাব্যে গতানুগতিক জীবনের দৈনন্দিন চাওয়া পাওয়া, অভাব-অভিযোগ, গ্রামজীবনের নানান সংস্কার ও নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের বর্ণনা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। আমরা জানি, মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যই মানুষের প্রাথমিক লড়াই। সেই আদিম যুগ থেকে মানুষ যখন থেকে বন কেটে বসত করতে শুরু করেছে তখন থেকেই অন্নসংস্থানের জন্য মানুষ কেবল জল ও জমির সন্ধান করেছে। এ প্রসঙ্গে নিতাই জানা তাঁর 'পোস্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার পরিচয়' গ্রন্থটিতে 'বাংলা উত্তর আধুনিকতা' নাম-শীর্ষক অধ্যায়টিতে 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-এর যে গল্পটি উল্লেখ করেছেন তা আসলে বাঙালির চৈতন্য-প্রকৃতির চিরায়ত পরিচয়। আরুণিপুত্র শ্বেতকেতুকে ঋষি উদ্দালক পরীক্ষামুলকভাবে ক্ষুধাক্লিষ্ট শরীরে 'মন'-এর অস্তিত্ব সন্ধানে অন্নসংস্থান যে একান্তই অপরিহার্য তা সম্যকভবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই সূত্রেই তেরো শতকের একটি মন্ত্র উল্লেখ করে নিতাই জানা অন্ন-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে মানুষের অন্নচিন্তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে তুলে ধরেছেন :

"আলো ধানে কালো পুতে
জনম যেন যায় এয়োতে"[৫]

আলো ধান থেকে কালো পুত —এই সবকিছুই লোক-জীবনের পরিচয় বহন করে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "মুখে যদি রক্ত ওঠে" (১৯৬৪ খ্রি.) কাব্যের 'অন্নদেবতা' কবিতায় উপনিষদকে স্বীকার করে অন্নের প্রার্থনা ও অন্নের আরাধনা করেছেন। তিনি সর্বভূতে অন্নদেবতাকে লক্ষ করেছেন এবং যে অন্ন আদি-অনন্তকাল ধরে মানুষের ক্ষুধানিবৃত করে আসছে সেই অন্ন কেউ কেড়ে নিতে চাইলে সর্বান্তকরণে তার ধ্বংস চেয়েছেন। অন্যদিকে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর "ক্যাকটাস" (১৯৯৭ খ্রি.) কাব্যের 'বোধি' কবিতায় সুজাতার হাতের পরমান্ন খেয়ে বুদ্ধের বেঁচে ওঠার প্রসঙ্গে অন্নের অমৃত হয়ে ওঠা বিষয়টি প্রতিষ্ঠা

পেয়েছে। আবার কবি নির্মল হালদার তাঁর 'মলিন মর্ম মুছায়ে' (২০০২ খ্রি.) কাব্যটির চতুর্থ অংশের ১৭ সংখ্যক কবিতায় তিনি তাই বলতে পেরেছেন :

"হাঁড়ি গড়তে গিয়ে হাঁড়িই গড়েছি, অন্য কিছু নয়। কেননা
হাঁড়িতে জল ফুটবে, লাফাবে চাল। তারপর
চাল সেদ্ধ, আমার উদরপূর্তির গল্প"[৬]

নির্মলের এরকম কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বহুকালের সাংস্কৃতিক উপাদান যেমন ফুটে উঠেছে তেমনই অন্নচিন্তায় নিমগ্ন মানুষের 'উদরপূর্তির গল্প' আমরা ভুলে যেতে পারি না।

নির্মলের প্রায় প্রতিটি কাব্যেই বাঙালির চিরন্তন চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'তালপাতার পাখা' কাব্যের শুরুতেই 'সাবেকি' কবিতায় 'ঝুমঝুম করে বেজে উঠছে আঁচলের চাবি' অথবা 'দরজার মাথায় সিঁদুরের দাগ, আমপল্লব'-এর মতো দুয়েকটি পঙক্তি বাঙালি জীবনের সাবেকিয়ানার ছবি। নির্মল তাঁর 'গরামথান' কাব্যে যাবতীয় লোক-উৎসব ও পালা-পার্বণ উল্লেখ করে লোক-দেবতার সঙ্গে কৃষিনির্ভর জীবনের আত্মিক যোগাযোগ তুলে ধরেছেন। তাছাড়া প্রকৃতির সঙ্গে লোক-জীবনের পারস্পরিক সু-সম্পর্কটিও এক্ষেত্রে কবি উল্লেখ করেছেন। আবার নির্মলের 'হেই বাবা মারাংবুরু' কাব্যটি কেবল মারাংবুরুকে হাঁড়িয়া উৎসর্গ করে আজীবন সুখে-শান্তিতে জীবন কাটানোর ছাড়পত্র নয়, এমনকি জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের ইতিবৃত্তান্তও নয় বরং বলা যায় কাব্যটি মূল-স্রোতের জন-জীবনের সমান্তরালে আবহমানকাল ধরে বেঁচেবর্তে থাকা আদিম জন-জাতির ইতিহাসও বটে। 'বি পি এল-এর কবিতা' কাব্যে কবি নির্মল হালদার যথাক্রমে 'শিল্প দেখাবে ভালুকনাচ' (২২টি), 'কর্পোরেট' (২২টি) ও 'মুন্নাভাই মুন্নাভাই' (৫টি) — ভিন্ন ভিন্ন এই তিনটি শিরোনামে একত্রে মোট ৪৯টি কবিতায় কখনো শিল্পের বিপরীতে সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন, কখনো কর্পোরেট দুনিয়ার চাহিদা বা প্যাকেজ-কেন্দ্রিক বিপণনের বিপরীতে খড়কুটোর ভাসমান জীবনকেই আঁকড়ে ধরেছেন, আবার লোভ-লালসার অর্থকেন্দ্রিক জীবনে মুন্নাভাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাটিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। এভাবেই মাটি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে কবি উন্মোচন করেছেন এবং বিশ্বায়নের চক্রব্যূহে হাঁসফাঁস করে ওঠা অত্যন্ত সাধারণ-মানের জীবন যে 'ভালুকনাচ' হয়ে ওঠে তাও তুলে ধরেছেন।

নির্মলের এ যাবৎ প্রকাশিত কাব্যে হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতির শেকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর আধুনিক চর্চায় যে-কোনো সমাজ ও সংস্কৃতির বহমান জীবন ও যাপনের ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। বলা যায়, ঐতিহ্য-সচেতনতার দিকটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে উত্তর আধুনিকতা। উত্তর আধুনিকতা বা কবিতার কোনো আন্দোলনকেন্দ্রিক

তাত্ত্বিকতার সঙ্গে নির্মল হালদারের তেমন কোনো পরিচয় নেই — ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। পাঠভিত্তিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার আলোচনায় তবুও দেখা যায় উত্তর আধুনিকতার মূল বীজ-ভাবনার দিকগুলি কবি অজান্তেই লালন করেছিলেন। আবহমান বাংলা কবিতারই এ এক আন্তরসম্পদ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা ও বাঙালির আত্ম-পরিচয়ের ইতিহাস উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

"বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টি লাভ করিয়াছিল।"[৭]

বাঙালিকে নাগরিক জীবনের ছোঁয়া দিয়েছে উপনিবেশবাদ। নাগরিক জীবনের জটিলতায় হাঁসফাঁস করতে করতে কেউ কেউ আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন দেশজ শেকড়কেই। অবসন্ন দেশি-মানুষের গায়ে ধুলোর কলঙ্ক দেখলেও নাগরিক জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশই কারো কাছে একান্ত আপন হয়ে উঠেছিল। এই শেকড়-চেতনা কেবল সময়ের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না, এর মূলে আছে প্রবহমান লোকায়ত জীবনচেতনা — যা বাঙালির একান্তই নিজস্ব সম্পদ। শুধু দেশজ শেকড়কের দিকে, দেশজ শব্দের দিকেই ঝুঁকে পড়া নয়, সার্বিকভাবে নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দেশ-কালের নিরিখে বড় করে দেখার আন্তরিক প্রয়াস ছিল তাঁদের। প্রায় দু'শো বছরের ঔপনিবেশিকতার প্রভাব কাটিয়ে স্বাধীনোত্তর সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালির নিজস্ব চিন্তা-চেতনার উত্থান ঘটেছে আবার।

নির্মল হালদার তাঁর কাব্য-কবিতায় গ্রাম-জীবনের কথা বলতে গিয়ে সার্বিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌমজীবন ও কৌমজীবনকে তুলে ধরেছেন। পক্ষান্তরে বরং বলা যায় নির্মলের কবিতায় বৃহত্তর বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি উঠে এসেছে। নির্মল হালদারের কাব্যে পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা পুরুলিয়ার গ্রামীণ জীবন-যাপন যেমন উঠে এসেছে তেমনই এখানকার আদিবাসী জীবন-যাপনও তুলে ধরতে ভুলে যাননি তিনি। বলা যায়, এখানকার অবহেলিত জনপদের লোকজ সংস্কৃতি তাঁর কাব্যের আধার। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ নির্মলের কবিতায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। নির্মল হালদার কবিতাকে যতটা আটপৌরে রূপ দিয়েছেন বিষয় নির্বাচনে, শব্দচয়নে, অলঙ্কারনির্মাণ ও চিত্রকল্পের প্রতিভাস নির্মাণে অথবা বিষয় উপস্থাপনে বা কাব্যকলা নির্মাণে তা কবির স্বতন্ত্র কাব্য-ভুবনের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। তিনি সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাকে কাব্যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই নির্মল হালদারের 'পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়' (১৯৮৬ খ্রি.) কাব্যের 'ভাতগীত' শীর্ষক কবিতাটির ১, ২ ও ৩ সংখ্যক কবিতাংশে কেবলই ভাতের কথা অথবা ভাত ফোটার শব্দ শোনা যায়। যেমন :

"ফুল তো ফুটেছে অনেক গন্ধ তো পেলেন অনেক
এইবার
ভাত ফোটাব
ভাত ফোটানো কত আনন্দের ভাত ফোটানোর গন্ধ
কত আনন্দের
দেখবেন ভাত ফোটানোর গন্ধে লাফিয়ে উঠছে
আপনার ডাইনিং টেবিলও।"[৮] (ভাতগীত/২)

এমন অভাবী জীবন যারা বয়ে বেড়ায় তাদের কথা কবি ভুলে যাননি বলেই 'গরামথান' কাব্যে তিনি বলতে পেরেছেন, 'ভাত আর ভালোবাসা দুই যে সমান' ('চেয়ে থাকা')। ভাত আর ভালোবাসার সন্ধানে কবি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। ঘুরতে ঘুরতেই কবি দেখেন 'ভাতের সঙ্গে নুনও থাকে না' ('নুন') এমন দুঃখী মানুষ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এই সবকিছুকে আশ্রয় করেই নির্মল হালদারের কাব্য-ভুবন গড়ে উঠেছে। এই কাব্যের 'লালসুতা' কবিতায় কবির কণ্ঠে তাই অনায়াসে উচ্চারিত হয়:

"শিকড় না চিনলে
মাটি না চিনলে
ভালোবাসাও চেনা যায় না।"[৯]

চলমান জীবনকে কবিতার রূপ দিয়ে চলেছেন বলেই নিজের শিকড়ের টান ভুলে থাকতে পারেন না আজও। এই অনিবার্য টানে কবির নাড়ির সঙ্গে মিশে থাকে প্রাগৈতিহাসিক চেতনা। যে চেতনার রঙে কবি রক্ত-পলাশের মতো রঙিন। জীবনের সমস্ত ভার এই মাটির বুকে নামিয়ে দিয়ে মহাপ্রলয়ে তিনি হারিয়ে যাবেন — কবি তা জানেন। তারপরেও গভীরভাবে যা সত্য, যা তাঁর একমাত্র আশ্রয় তারই ধ্বনি অনুরণিত হয় তাঁর কবিতায়। যে আশ্রয়ের প্রতি কবির প্রাচীনতর দায়বদ্ধতা সেই আশ্রয়ের ভরসায় তিনি বুক বাঁধেন। 'ধান ও জলের ধ্বনি' কাব্যের (১৯৮৯) নামশীর্ষক কবিতায় কবি বললেন :

"তুমি চিনতে চাও, পুরনো খড়ে লেগে থাকা জল
আমি খুঁজি, পুরনো খড়ের মধ্যে একটি ধান
মহাপ্রলয়ের পরেও ধান ও জলের ধ্বনি আমাদের আশ্রয়"[১০]

লোক-জীবনকে আঁকড়ে থাকা একজন কবির এ ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার থাকতে পারে না। অনিঃশেষ এক একটি কবিতা দিয়ে আজীবন কবি যেন কবিতার একটিই মালা গেঁথে চলেছেন। এমন নিরলঙ্কার বাক্য, এমন সোজাসুজি উচ্চারণ কবি নির্মল হালদারের স্বতন্ত্রতার পরিচয় বহন করে।

নির্মল হালদার তাঁর অধিকাংশ কাব্যে লোকধর্মকে স্বাভাবিক চলনশীলতা অর্থে গ্রহণ

করেছেন। যেমন, 'বিবাহমঙ্গল' কাব্যের ১৮ সংখ্যক কবিতায় 'গাছে হলুদ সুতা বেঁধে / গাছকে আগে বিবাহ করি' — বিবাহের এই প্রাচীন লোকপ্রসঙ্গ উঠে এসেছে, কিংবা 'খোলামকুচি' কাব্যের ৬ সংখ্যক কবিতায় 'নবজাতকের মুখে মধু দাও'-এর মতো স্বাভাবিক লোকপ্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আবার 'গরামথান' ও 'হেই বাবা মারাংবুরু' কাব্যেও লোকধর্ম অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই জায়গা করে নিয়েছে। তাছাড়া কবিতায় প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারে কবি নির্মল হালদার মাতৃভূমির প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণকেই প্রকাশ করেছেন। তাই বলেই নির্মলের কবিতায় অনায়াসে— 'যে লোকটা বিঁড়ি ফুঁকছিল আপনমনে' (ভাতগীত-৩/ 'পুরনো এ জীবন আমাদের নয়'), 'মুখোশের চোখের ছেঁদায় কী দেখবি' (নাচের রাত/ 'সীতা'), 'মৃত্যুঞ্জয়, ঘরের চালায় খড় গুঁজে দেয়' (২৪ সংখ্যক/ 'মৃত্যুঞ্জয়'), 'মাটি খুঁড়ে মাটিতেল চাই' (২১ সংখ্যক/ 'বিবামঙ্গল'), 'সকাল বেলায় মাড়ভাত খেয়ে ভেড়া চরাতে গেল/ আমাদের যিশু' (৫০ সংখ্যক/ 'বিবামঙ্গল'), 'চোতমাস থেকেই আমাদের জলের অভাব/ বাঁধ-কুঁয়া শুকায় গেছে।'(রুখা-শুখা দিনে/ 'গরামথান') প্রভৃতি পঙক্তির ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চোখে পড়ে।

তথ্যসূত্র:

১) নির্মল হালদার, কবিতা সংগ্রহ ১, ছোঁয়া, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৩, হুগলী, পৃষ্ঠা: ২০
২) প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ২১
৩) প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ১০৭
৪) প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ৯৯
৫) নিতাই জানা, পোস্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার পরিচয়, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি
২০০১, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৬১
৬) নির্মল হালদার, কবিতা সংগ্রহ ২, ছোঁয়া, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৬, হুগলী, পৃষ্ঠা: ১১৯
৭) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', মিত্র এণ্ড ঘোষ, বৈশাখ সংক্রান্তি, ১৩৪৫, পৃষ্ঠা: ৩২
৮) প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ৪৭
৯) প্রাগুক্ত সূত্র — ৫, পৃষ্ঠা: ১৫৪
১০) প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ১২৫

सञ्चिता संतरा

रामकथा के रचयिता : आदिकवि वाल्मीकि

भूमिका: रामायण हिंदू राष्ट्र का एक पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ की महानता का युग-युगांतर से प्रचार और विस्तार होता रहा है। यद्यपि इसबात को बहुत समय बीत चुका है, फिर भी महाकवि वाल्मीकि ने युगों-युगोंपूर्व तमसा नदी के तट पर अपनी वीणा पर जो राग रचा था, वह मधूर और कर्णप्रिय गीत आज भी भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष के हृदय और आत्मा को परम शांति प्रदान करता है। यह कहा जा सकता है कि रामकथा याराम की कहानी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण कथा परंपराओं में से एक है।

विविधतापूर्ण भारत के शिक्षित-अशिक्षित, युवा-वृद्ध, सभी के हृदय में इस ग्रंथ के प्रति अपार प्रेम किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ है। राम, लक्ष्मण और सीता आज भले ही जीवित न हों, दशरथ की अयोध्या नगरी समय की धूल में मिल गई है। अब केवल कवि का अमर नाम और उनके हृदय से रची गई अमृतमयी रामायण ही अवशिष्ट है। जीवन के उतार-चढ़ाव में समस्त भारतीय जनमानस अपने प्राणों से भी प्रिय रामायण के अमृत का पान कर अपनी आत्मा को तृप्त करेगा तथा रामायण की शिक्षाओं को अपने दैनिक कार्यों में उतारकर परम आत्म-संतुष्टि प्राप्त करेगा।

राम, इक्ष्वाकु वंश की अयोध्या नगरी के शासक राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्हीं राम पर आधारित काव्य की रचना 'रामायण' कहलाती है। रामायण गीतों के लिए लिखी गई थी और इस ग्रन्थ की विषयवस्तु चारण कवियों द्वारा गीतों के माध्यम से प्रसारित की गई, इसलिए इसे 'गीतिकाव्य'कहा जाता है। इस गीतिकाव्य को 'रामायण' नाम किसने दिया, यह रामायण ग्रन्थ से स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता। इस महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। उन्होंने राम और सीता के चरित्रों को समाहित करते हुए 'पौलस्तवध' नामक काव्य की रचना की थी। बाद में इसे रामायण के नाम से जाना गया। यह रामायण के प्रथम संकलनकर्ता द्वारा लिखित प्रस्तावना से ज्ञात होता है (श्लोक संख्या-७।१।४) —

> "“काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत।
> पोलस्तवध इत्येवं चकार चरितव्रत्।।” [1]

कवि वाल्मीकि का आत्म-परिचय :

ये वाल्मीकि कौन थे? वे इस संसार में कब अवतरित हुए? और उन्होंने रामायण की रचना कब की? इन हजारों प्रश्नों का अंतिम समाधान आज भी संभव नहीं हो पाया है। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए विभिन्न तर्क सामने आए हैं। आइए, उन्हीं चर्चाओं के आलोक में कवि वाल्मीकि का आत्म-परिचय प्रस्तुत करते हैं। रामायण के प्रथम और अंतिम काण्ड (बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड) में कवि वाल्मीकि के कुछ संदर्भ मिलते हैं। लेकिन इस संबंध में एक बड़ी समस्या यह है कि समय के साथ रामायण के वर्तमान स्वरूप में अनेक कथाएँ जुड़ती और बदलती रही हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण अपने मूल स्वरूप से काफी हद तक परिवर्तित हो चुकी है। इसलिए, यह जानना संभव नहीं है कि वर्तमान रामायण में महाकवि वाल्मीकि की जो आत्म-पहचान उपलब्ध है, वह कितनी सटीक या काल्पनिक है। हालाँकि, भारतीय परंपरा में रामायण की मुख्य पहचान 'आदिकाव्य' और इसके रचयिता 'आदिकवि' के रूप में है। लेकिन रामायण से ज्ञात होता है कि कवि वाल्मीकि इस कथा के रचयिता नहीं हैं। उनका योगदान इस कथा को काव्यात्मक रूप देने में है। कवि वाल्मीकि ने एक प्राचीन लोककथा को राग और लय के माध्यम से वाद्यों के साथ मौखिक प्रदर्शन के योग्य रूप प्रदान किया। धार्मिक परंपरा के आधार पर, वाल्मीकि का जन्म लगभग ५०० ईसा पूर्व माना जाता है। वाल्मीकि के जन्म की सटीक तिथि या समय के बारे में कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

विद्वानों ने अब तक तीन वाल्मीकि की पहचान की है। एक हैं वैयाकरण वाल्मीकि। उनका नाम तैत्तिरीय प्रतिशाख्य (५/३६,९/४,१८/६) में तीन बार आता है। हालांकि उन्होंने एक ग्रामर की रचना की, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने रामायण की रचना की थी।

दूसरे हैं सुपर्ण-वाल्मीकि। उनका जक्रि महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है। सुपर्ण एक क्षत्रिय था। परन्तु इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह सुपर्ण-वाल्मीकि ही रामायण के लेखक हैं। तीसरे हैं कवि भार्गव। इसका उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है (महाभारत, शान्तिपर्व, ५७/४०) —

''श्लोकाश्चयं पुरा गीतों भार्गवेण महात्मना।''[2]

शायद यह भार्गव धीरे-धीरे तपस्वी ऋषियों के लिए एक आम टाइटल बन गया।

प्रचेता के बेटे, पहले कवि वाल्मीकि भी भार्गव थे। क्योंकि वरुण और प्रचेता एक ही हैं। कालिदास वरुण को ''पाणौ पाशः प्रचेतस ":(कुमारसंभव, २/११) कहते हैं। भृगु को भी वरुण का बेटा कहा जाता है। इसके अलावा, श्रीमद भागवत (६/१८/१) में कहा गया है कि वरुण की पत्नी चर्षणी के दो बेटे थे, भृगु और वाल्मीकि।

''चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातोभृगुः पुनः।
वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकाद्भवत किल।।"[3]

हालांकि, महाभारत में (महाभारत, वन पर्व, २००/४), रामायण के लेखक कवि वाल्मीकि का बार-बार और साफ तौर पर जिक्र किया गया है। उन्हें एक सख्त तपस्वी के तौर पर भी बताया गया है— असितो देवलस्तातवाल्मीकिश्च महातपा।

इससे साफ साबित होता है कि प्रचेता के बेटे वाल्मीकि एक महान कवि, ऋषि और तपस्वी थे। वह कभी डाकू नहीं थे। हालांकि, कई पारंपरिक कहानियों के अनुसार, वाल्मीकि अपने शुरुआती जीवन में एक डाकू थे। बाद में, ब्रह्मा के आशीर्वाद से, वे एक महान कवि बन गए। रामायण, महाभारत और दूसरे ग्रंथों में बताए गए ऋषि और कवि वाल्मीकि की पहचान नीचे दी गई है।

★ रामायण के बालकाण्ड में वर्णित कवि का आत्म-परिचय –

यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रामायण के बालकाण्ड के कुछ अंश बाद में जोड़े गए हैं, किन्तु यह भी असामान्य है कि संपूर्ण बालकाण्ड बाद में जोड़ा गया। क्योंकि बालकाण्ड में ही पाठक का परिचय राम और सीता से होता है और इसी काण्ड में उनके विवाह का अनूठा वर्णन है। और यदि इस घटना क्रम को छोड़ दिया जाए, तो रामायण काव्य की मुख्य धारा कहीं खो जाती है। अतः इस काण्ड में प्राप्त कवि वाल्मीकि की आत्म-पहचान न तो संदेहातीत है और न ही इसे भ्रामक एवं अवास्तविक कहा जा सकता है।

बालकाण्ड के आरंभ में (श्लोक संख्या- १ से ४।१।१), पाठकों का सर्वप्रथम रामायण की उत्पत्ति के वर्णन के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि से परिचय होता है। वहाँ, वाल्मीकि नारद मुनि से एक ऐसे पुरुष के विषय में पूछते हैं जो अनेक गुणों से युक्त हो। आज संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान, ज्ञानी, कृतज्ञ, सत्यवादी, अपनी प्रतिज्ञाओं का दृढ़ निश्चयी, सदाचारी, विद्वान, सभी विषयों में पारंगत, अपने कर्तव्यों के पालन में दृढ़, समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने वाला, प्रेम और संयम में अद्वितीय हो, जिसका

क्रोध युद्धभूमि में देखकर स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो जाएँ ? वाल्मीकि का प्रश्न सुनकर तीनों लोकों के ज्ञाता नारद जी ने प्रसन्न मन से उत्तर दिया(श्लोक संख्या- ७और ८), आपने जिन अनेक गुणों का उल्लेख किया है, वे मानव शरीर में मिलना अत्यंत दुर्लभ हैं, परंतु इस संसार में एक व्यक्ति है, और वह व्यक्ति हैं इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम।

तब वाल्मीकि ने नारद के मुख से रामकथा का सारांश सुना। रामायण के दूसरे अध्याय के आरंभ में(श्लोक संख्या-१।१।२) कहा गया है —

''नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारद:।
पूजयामास धममात्मा सहशिष्यो महामुनिम।।"

इस घटना के बाद, ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के स्वच्छ जल में स्नान करने गए। कवि तमसा नदी के तट पर शांत और निर्मल वातावरण से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने जंगल के पास घूमते हुए क्रौंच के एक प्रसन्न जोड़े को देखा। ऋषि वाल्मीकि प्यारे पक्षी जोड़े के प्रेम गीत सुनकर प्रसन्न हुए। उस समय, एक व्रूर निषाद ने एक तीर से क्रौंच को मार दिया। अपने पति से अलग होने की पीड़ा से तड़पते हुए, पत्नी क्रौंची विलाप करने लगा। क्रौंची की हृदय विदारक चीख और दर्द ने कवि को चिंतित कर दिया। तभी, शोकग्रस्त ऋषि वाल्मीकि के मुंह से निषाद शिकारी के लिए एक लयबद्ध शाप निकला(श्लोक संख्या- १५।१।२) —

''मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती: समा:।
यत क्रौंचमिथुनादेकमवधी: काममोहितम।।"

हे निषाद, तुम जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने अकारण ही दो संभोगरत पक्षियों में से एक को बाण से मार डाला। ऋषि वाल्मीकि के दु:ख ने श्लोक नामक काव्य माध्यम को जन्म दिया। तत्पश्चात, सृष्टिकर्ता चतुरानन ब्रह्मा के निर्देशन में ऋषि वाल्मीकि ने तमसा नदी के पूर्ण तीर्थ पर 'रामायण' नामक महान ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इस श्लोक और इस छदोंके माध्यम से वे जो कुछ भी लिखेंगे, वह कभी मिथ्या नहीं होगा। जब तक इस धरती पर नदियाँ और पर्वत रहेंगे, तब तक रामायण या राम की कथा धरती पर फैली रहेगी (श्लोक संख्या-३७।१।२) —

''यावत स्थास्यन्ति गिरय: सरितश्च महीतले।
तावद्रामायणीकथा लोकेषु प्रचरिष्यति।।"

ग्रन्थ पूरा करने के बाद, वाल्मीकि ने अपने द्वारा रचित रामकथा आश्रम के दो कुशीलवों को सुनाई। बाद में, उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और गीतों के माध्यम से इस कथा का प्रदर्शन किया।

रामायण के उत्तरकांड में कवि वाल्मीकि का आत्म-परिचय :

सात काण्डयुक्त रामायण में आदिकवि वाल्मीकि ने अपनी पहचान के बारे में कुछ नहीं बताया। रामायण महाकाव्य के उत्तरकांड में(श्लोक संख्या- १८ओर १९।७।१०९) उन्होंने रामचंद्र को केवल एक बार अपना परिचय दिया। अर्थात वे प्रचेता के दसवें पुत्र हैं। उन्होंने कई सहस्राब्दियों तक तपस्या की।

''प्रचेतसोहं दशम: पुत्रोराघवनन्दन।
वहुवर्षसहस्राणि तपस्चर्या मया कृता।।"

'प्रचेता' शब्द का अर्थ है 'प्रकृष्टज्ञान'(ऋग्वेद १.४३.१)। 'प्रकृष्ट: चेत: यस्य स:' तस्य पुत्र: डपुत्र: = पुतत्रैअ(क)। अर्थात जो बुद्धिमानों की रक्षा करता है, वही प्रचेता है। रामायण के इस काण्ड के एक श्लोक में वाल्मीकि मुनि को राजा दशरथ का मित्र कहा गया है। अपने भाई रामचन्द्र के आदेश पर अपने भतीजे सीता देवी का परित्याग करते समय लक्ष्मण ने सीता देवी से कहा, महायशस्वी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ऋषि वाल्मीकि उनके पिता दशरथ के परम मित्र हैं। अत: उन्हें निर्भय होकर ऋषि के पास रहना चाहिए।(श्लोक संख्या- १६।७।५७)

''राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुङ्गव:।
सखा परमको विप्र वाल्मीकि: सुमहायशा।।"

उत्तर कांड की घटनाओं के क्रम में वाल्मीकि और राम के बीच एक सीधा संबंध स्थापित हुआ है। और रामायण के असंख्य पात्रों में वाल्मीकि मुनि के चरित्र ने एक प्रमुख स्थान या भूमिका ग्रहण की है। रामायण के इस काण्ड में वाल्मीकि को भृगु वंश से संबंधित बताया गया है (श्लोक संख्या- ७।६४।२६)। इस कांड में वाल्मीकि के चरित्र को मानवता और उदारता की दृष्टि से एक अद्वितीय दर्जा दिया गया है। उन्हें रामचंद्र द्वारा निर्वासित सीता के एकमात्र सहारे और सहायक पिता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने सीता के सभी दुखों और कष्टों को अपने हृदय में संजोया। उन्होंने स्वयं सीता

के दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश रखा। उन्होंने उन्हें शस्त्र और गंधर्ववेद की शिक्षा दी। जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री के सुखी जीवन के लिए भरसक प्रयत्न करता है, उसी प्रकार वह रामचंद्र से सीता को पुन: अपना लेने का अनुरोध भी करते हैं। अयोध्या की सभा में भी, वे तीनों लोकों के सभी ज्ञानियों के समक्ष सीता की पवित्रता की दृढ़तापूर्वक घोषणा करते हैं।

इस प्रकार, कवि वाल्मीकि उत्तरकांड के शोकाकुल वातावरण में महाकरुणा के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। ये वाल्मीकि करुणा के साक्षात स्वरूप हैं, सत्य के प्रति अडिग हैं, दु:ख में सांत्वना देने वाले हैं। अत: कहा जा सकता है कि उत्तरकांड में वाल्मीकि की भूमिका केवल एक कवि तक ही सीमित नहीं है, उन्हें राम का सलाहकार और मार्गदर्शक भी बताया गया है। इस कांड में वे राम के पुत्रों के रक्षक, पालक, गुरु तो हैं ही, साथ ही कुश और लव के राम से मिलन में सहायक भी हैं। यद्यपि विद्वानों के मतानुसार, उत्तरकाण्ड के रचयिता कवि वाल्मीकि नहीं, अपितु किसी परवर्ती कवि ने इस कथा की रचना की है। अथवा, कई मामलों में, यह कथा प्रक्षेपित है, अर्थात बाद में जोड़ी गई है। किन्तु, रामायण का कौन-सा भाग प्रक्षेपित है और कौन-सा भाग मूल ग्रन्थ का अंग है, इस पर समय व्यतीत करने के बजाय, वर्तमान में प्रचलित रामायण के स्वरूप को ध्यान में रखकर इस पर चर्चा करना अधिक उचित या युक्तिसंगत है।

★कवि वाल्मीकि के आश्रम का परिचय: रामायण के आदिकाण्ड के प्रथम से चतुर्थ तक, इन चार अध्यायों में रामायण का परिचय दिया गया है। इस परिचय से ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि का शान्त आश्रम तमसा नदी के तट पर था और यह तमसा नदी गंगा के निकट स्थित थी (श्लोक संख्या-३।१।२)। वाल्मीकि अपने आश्रम से निकलकर शिष्य भारद्वाज के साथ वहाँ स्नान करने गए थे -

''जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्व विदूरित:।।"[10]

इसके अलावा, अयोध्या कांड के ५६ संख्यक सर्ग में (श्लोक संख्या १२-१६)वाल्मीकि मुनि के आश्रम का उल्लेख है। अपने वनवास के दौरान, राम और सीता चित्रकूट पर्वत पर स्थित वाल्मीकि मुनि के आश्रम गए थे।

''ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया।
रम्यमासेदतु: शैलं चित्रकूटं मनोरम।।

इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलि:।
अभिगम्याश्रमं सवंवे वाल्मीकिमभिवादयन्न।।"[11]

राम चित्रकूट पहुँचे और वाल्मीकि के आश्रम के पास एक कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। भरत राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए इसी स्थान पर पहुँचे थे। राम के वनवास के वर्णन में मिलता है कि तमसा नदी पार करने के बाद वे चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे। इस प्रकार, चित्रकूट पर्वत की तलहटी के किसी भाग में महर्षि वाल्मीकि का शांत और मनोरम आश्रम स्थित था।

इसके अलावा, रामायण के उत्तरकांड में भी वाल्मीकि के आश्रम का वर्णन है। सीता के चरित्र के बारे में कलंकपूर्ण समाचार सुनकर, रामचंद्र भाई ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, गंगा के उस पार, तमसा नदी के तट पर, महात्मा वाल्मीकि का दिव्य आश्रम है। सीता को उसी आश्रम में छोड़कर आओ। (श्लोक संख्या-१७।७।५५) अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए, लक्ष्मण सीता देवी को गंगा के उस पार वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आए। अत: इस वर्णन से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वाल्मीकि मुनि का आश्रम तमसा नदी के तट पर था और तमसा नदी गंगा के अत्यंत निकट थी - ''गङ्गायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मन:।।"[12]

विभिन्न ग्रंथों में वर्णित कवि वाल्मीकि का आत्म-परिचय:

कवि वाल्मीकि के बारे में कुछ जानकारी बंगाली कवि कृत्तिवास द्वारा रचित रामायण में उपलब्ध है। कवि कृत्तिवास एक मध्यकालीन बंगाली कवि थे। उनके द्वारा रचित रामायण में वाल्मीकि के प्रारंभिक जीवन की कथा उपलब्ध है। अपने प्रारंभिक जीवन में वाल्मीकि एक डाकू थे। उनका नाम रत्नाकर था। वह डाकू बनकर अपने परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करते थे। एक दिन, जब डाकू रत्नाकर ने नारद और महर्षि ब्रह्मा से सब कुछ लूटने की कोशिश की, तो नारद ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे माता, पिता, पत्नी और पुत्र सभी तुम्हारे पापों का बोझ उठाएंगे? यह सुनकर रत्नाकर घर गए और परिवार में सभी से अपने पापों में हिस्सा लेने के लिए कहा। लेकिन परिवार में सभी ने कहा कि वे उसके पापों में हिस्सा नहीं लेना चाहते। असहाय और शोकाकुल रत्नाकर नारद के पास लौट आए और एक डाकू के जीवन के अंतिम सत्य को समझते हुए, उन्होंने नारद से क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए राम नाम का जप करने को कहा। लेकिन पाप कर्मों में लंबे समय तक लिप्त रहने के कारण

दस्यु रत्नाकर राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे। ऐसे में नारद मुनि ने उन्हें 'राम' शब्द का विपरीत अर्थात 'मरा' शब्द का उच्चारण करने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने तपस्या के द्वारा राम शब्द के उच्चारण की क्षमता प्राप्त की। वे साठ हजार वर्षो तक तपस्या करते रहे। उस समय उनके पूरे शरीर पर वल्मीकि की मिट्टी की एक परत बन गई थी। दस्यु रत्नाकर ने वल्मीकि से पुनर्जन्म लिया और वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। उसके बाद ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने सप्त कांड रामायण की रचना की और विश्व प्रसिद्ध हुए। यद्यपि रामायण के उत्तरकांड में वाल्मीकि को प्रचेता का दसवां पुत्र कहा गया है, किन्तु कृत्तिवास के अनुसार वे च्यवन मुनि के पुत्र थे।

''च्यवन मूनिर पुत्र नाम रत्नाकर ।
दस्युवृत्ति करें सेइ वनेर भितर।।"

''मरा मरा वलिते आइल राम नाम।
पाइल सकल पापे दस्यु परित्रान ।।
ब्रह्मा वले तव नाम रत्नाकर छिल।
आजि हइते तव नाम वाल्मीकि हइल।।"[13]

अध्यात्म रामायण में भी एक डाकू कवि वाल्मीकि के जीवन की कथा वर्णित है। हालाँकि, इस कथा में बताया गया है कि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन बुरी संगति के कारण, वे जंगल में यात्रियों को लूटकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। परन्तु, इस कथा में नारद और ब्रह्मा के बजाय सप्त ऋषियों का उल्लेख है। शेष कथा कृत्तिवास विरोचित रामायण से पूरी तरह मिलती-जुलती है–

''अहं पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः।
जन्ममात्रद्विजत्वं मे शूद्राचावरतः सदा।।"

''एकाग्रमनसात्रेव मरेति जप सर्वदा।"

''सर्वसङ्गविहीनस्य वाल्मीकोभून्ममोपरि ।
वल्मीकात सम्भवो यस्मात द्वितीय जन्म तेभवत।।"[1]

स्कंद पुराण में वाल्मीकि के बारे में चार कथाएँ हैं। इस ग्रंथ के वैष्णवखंड के

वैशाखमास माहात्म्य में कहा गया है कि एक व्याध ने राम नाम जपकर अपने पापों से मुक्ति पाई और बाद में उसे वरदान मिला कि वह वाल्मीकि नामक ऋषि के वंश में जन्म लेगा और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस कथा में कृणु नामक एक तपस्वी का उल्लेख है। तपस्या करते समय उसका शरीर वल्मीकि से आच्छादित हो गया। शिकारी ने इसी तपस्वी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ के अवंतिखंड में अग्नि शर्मा नामक एक डाकू का वर्णन है। उसने सप्त ऋषियों के आदेश पर डाकूगिरी त्याग दी और ध्यान व मंत्र जप में लग गया। जब सप्त ऋषि १३ वर्षों के बाद उस स्थान पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि अग्निशर्मा के पूरे शरीर के चारों और वल्मीकि का रूप बना हुआ है। तब उन्होंने अग्निशर्मा को वहाँ से निकाला और उसका नाम वाल्मीकि रखा। सप्त ऋषियों के आदेश पर उसने रामायण की रचना की। इस ग्रंथ के नागरखंड और प्रभासखंड में भी ऐसी ही कथाएं वर्णित हैं।

आनन्द रामायण के राज्यकांड (अध्याय चौहद) में वर्णित कथा में वाल्मीकि के तीन जन्मों का उल्लेख है। पहले जन्म में वे स्तंभ नामक ब्राह्मण थे। दूसरे जन्म में वे एक शिकारी थे। तीसरे जन्म में वे कृणु के पुत्र के रूप में जन्मे और तपस्या करने के बाद वाल्मीकि कहलाए। इस कथा में श्लोक की उत्पत्ति की कथा भी विद्यमान है।

तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' में (अयोध्याकाण्ड, दोहा १९५) लगभग यही बात कही है –

''जान यदि नाम प्रतापु
भयउ सुद्ध कवि उल्टा जापु।
उलटा नामु जपत जगु जाना।
वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना।"[1]

महाभारत के अनुशासन पर्व में, वाल्मीकि युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने एक बार कुछ ऋषियों को ब्रह्मघ्न होने के लिए डांटा था। उन्होंने उन्हें श्राप दिया। तब वाल्मीकि शिव की शरण में गए। महादेव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया और आशीर्वाद दिया, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। (महाभारत, अनुशासन पर्व, १८/८-१०)

वाल्मीकि की उत्पत्ति की कथा कुमार वाल्मीकि या नारनम्पा द्वारा कन्नड़ में रचित तोरवेय रामायण के बालकांड के प्रथम और द्वितीय सन्धि में भी मिलती है। रजतगिरि पर्वत पर देवी पार्वती ने शिव से भगवत्कृपापराहा के विषय में पूछा। तब शिव ने देवी पार्वती

को वाल्मीकि का जीवन-वृत्तांत सुनाया। इस ग्रंथ में वर्णित वाल्मीकि की कथा लगभग कृत्तिवास द्वारा रचित रामायण से मिलती-जुलती है।

उपसंहार : वैसे तो महान लोगों की जिंदगी के बारे में अनगिनत कहानियाँ और किस्से लिखे गए हैं, लेकिन कभी-कभी वे इतने अजीब और अनोखे हो जाते हैं कि आखिर में जिस इंसान की जिंदगी के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, वह खुद को भी पहचान नहीं पाता। रवींद्रनाथ ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि हमारे देश के ज्यादातर पुराने कवियों की कोई बायोग्राफी नहीं है। हमेशा उत्सुक रहने वाले पाठक को इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। पाठक ने कवि की कविताओं से जो बायोग्राफी बनाई हैं, वही उनकी बायोग्राफी हैं। अगर यह असली बायोग्राफी नहीं भी है, तो भी इसे सच मानने में कोई बुराई नहीं है। तो, वाल्मीकि डाकू थे या तपस्वी? ऋषि थे या कवि? किरात थे या ब्राह्मण? जो भी थे, आखिर में वे हमारे कवि हैं। वे रामायण के कवि हैं। वे पूरे भारतीय लोगों के दिलों के कवि हैं। यही उनकी हमेशा रहने वाली और चिरस्थायी पहचान है। इसलिए, लॉजिक और तर्क की दीवार पार करके, उनकी कविता को मानकर, हम आगे बढ़ेंगे और एक नया भारत बनाएंगे।

सन्दर्भसूची :

१. श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि, रामायणम, द्वितीय एडिशन, सम्पा पंडितप्रवर श्रीपञ्चानन तर्करत्न, बेनीमाधव शीलस लाइब्रेरी, २०२०, पृष्ठा संख्या ११.

२. भट्टाचार्य, अमलेश, रामायण कथा, प्रतिभास, १९८८, पृष्ठासंख्या १६४.

३. तदेव, पृष्ठा संख्या १६४.

४. तदेव, पृष्ठा संख्या १६४.

५. श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि, रामायणम, द्वितीय एडिशन, सम्पा पंडितप्रवर श्रीपञ्चानन तर्करत्न, बेनीमाधव शीलस लाइब्रेरी, २०२०, पृष्ठा संख्या ६.

६. तदेव, पृष्ठा संख्या ७.

७. तदेव, पृष्ठा संख्या ८.

८. श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि, रामायणम, द्वितीय एडिशन, सम्पा पंडितप्रवर श्रीपञ्चानन तर्करत्न, बेनीमाधव शीलस लाइब्रेरी, २०२०, पृष्ठा संख्या १४४८.

९. तदेव, पृष्ठा संख्या १३७१

१०. तदेव, पृष्ठा संख्या ७.

११. तदेव, पृष्ठा संख्या २७७.

१२. तदेव, पृष्ठा संख्या १३६८.

१३. ओझा, कृत्तिवास, रामायण, २०१३, सम्पा. मलय, प्रामाणिक, ग्रन्थ विकाश, पृष्ठा संख्या २-४

१४. महर्षि-श्रीकृष्णद्वैपायन-वेदव्यास, अध्यात्मरामायण, वङ्गानुवादसमेतम, पण्डितवर श्रीयुक्त पञ्चानन तर्करत्न, वङगवासी-इलेकट्रोमेशिन-प्रसस, पृष्ठा संख्या ६८-६९.

१५. भट्टाचार्य, अमलेश, रामायण कथा, प्रतिभास, १९८८, पृष्ठासंख्या १६५.

ग्रन्थ सुची :-

१. श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि, रामायणम, द्वितीय एडिशन, सम्पा पंडितप्रवर श्रीपञ्चानन तर्करत्न, बेनीमाधव शीलस लाइब्रेरी, २०२०,

२. भट्टाचार्य, अमलेश, रामायण कथा, प्रतिभास, १९८८,

३. ओझा, कृत्तिवास, रामायण, २०१३, सम्पा. मलय, प्रामाणिक, ग्रन्थ विकाश,

४. महर्षि-श्रीकृष्णद्वैपायन-वेदव्यास, अध्यात्मरामायण, वङ्गानुवादसमेतम, पण्डितवर श्रीयुक्त पञ्चानन तर्करत्न, वङगवासी-इलेकट्रोमेशिन-प्रसस।

Tushar Mandal

Literary Tourism in the Rarh Region of West Bengal : Textual Landscapes, Cinematic Terrains and Cultural Regionalism

This paper explores the emerging field of literary tourism within the western districts of West Bengal, specifically identifying and analyzing destinations immortalized in canonical Bengali literature. This examination delves into how literary works have shaped perceptions of these regions, contributing to their cultural and economic landscape by attracting visitors interested in the settings of their favourite stories (Mahmud et al., 2025). The study posits that the demarcation of geographically significant regions in Bengali literature, as noted by scholars like Dutt and Dhussa, provides a robust framework for identifying potential literary tourism sites that blend natural beauty with profound human narratives (Ghosh, 2023). This interdisciplinary approach merges insights from literary criticism, cultural geography, and tourism studies to highlight how fictional locales translate into tangible travel experiences, thereby enriching both the literary understanding and the regional tourism economy (Ghosh, 2024). This paper will therefore delineate specific sites within West Bengal's western districts that have achieved prominence through their depiction in Bengali literary works, subsequently evaluating their potential for sustained literary tourism development (Quinteiro, 2023). It further investigates the mechanisms through which literary narratives transform geographical locations into culturally significant destinations, drawing parallels with global literary tourism trends. Ultimately, this research aims to provide a comprehensive understanding of how literary heritage can be leveraged to foster sustainable tourism, offering insights into effective strategies for destination branding and cultural preservation (Mahmud et al., 2025). Furthermore, it will explore the challenges inherent in translating literary imagination into physical tourism infrastructure, ensuring authenticity while accommodating modern travel expectations (Pinzón, 2023; Pratiwi et al., 2024). The exploration will encompass an analysis of how narratives, similar to those that transform regions like the Sundarbans into vivid, experiential locales through authors' personal engagements, can similarly elevate the western districts of West Bengal (Rakshit, 2021). The synthesis of literary heritage and geographical reality, therefore, offers a unique opportunity to develop novel tourism itineraries that appeal to both literary enthusiasts and cultural travellers (Mandal, 2019).

Study Area :

The Rarh region constitutes one of the three primary physiographic divisions of West Bengal, spanning latitudes from $21^{\circ}30'26''$ N to $24^{\circ}54'14''$ N latitude and $85^{\circ}58'48''$ E to $88^{\circ}30'10''$ E longitude. Although the etymology of 'Rarh' is subject to debate, it is widely accepted as deriving from the Sanskrit term Roorha, denoting rough or uneven terrain. Situated between the expansive Chota Nagpur Plateau to the west and the Ganges River to the east, this region predominantly encompasses the lower Gangetic plains south of the Ganges and west of its major distributary, the Bhagirathi-Hooghly River. For this study, the research area is defined as the western districts west of the Bhagirathi River, excluding coastal community development blocks-treated as a distinct physiographic unit due to their divergence from Rarh Bengal's characteristic undulating lateritic terrain. The study area thus includes 11 districts and 165 community development blocks. Historically, this region, particularly Rarh Bengal, has been recognized for its geoarchaeological significance, with a continuity of sites ranging from the Paleolithic to early historical periods, thereby offering a rich tapestry for geotourism development (Chakrabarty & Mandal, 2019).

Literature Review : This section reviews existing scholarship on literary tourism, focusing on its theoretical underpinnings and practical applications, particularly within South Asian contexts, to establish a foundation for analyzing its potential in West Bengal's western districts. This review will specifically examine how literary works have historically influenced travel patterns and destination perceptions, drawing insights from both global trends and localized case studies to inform the subsequent analysis of West Bengal's literary landscapes. The concept of literary heritage, though complex to define univocally, is increasingly recognized as a vital component of cultural heritage, enriching destinations by creating new points of interest through imaginary landscapes (Arcos-Pumarola et al., 2018).

This encompasses not just the physical places mentioned in texts but also the author's birthplace, residence, and even fictional settings that have acquired a tangible presence in the collective imagination, fostering what some scholars term an "abstract knowledge" that precedes the "embodied experience" of visiting these sites (Rakshit, 2021). This imaginative engagement, often cultivated during the pre-visit and on-site stages of the tourism experience, underscores the profound influence of literature in shaping perceptions of place and locality (Es, 2020). Such literary immersion thus transforms

geographical locations into culturally resonant destinations, enabling a deeper understanding of both the text and the locale itself (Arcos-Pumarola et al., 2018). This broader perspective challenges traditional, often one-dimensional, definitions of literary tourism by embracing a wider array of narratives and genres that effectively employ a sense of place and time to move audiences globally (Es, 2020). The enduring connection between imagination and actual experience is most apparent in the cultural practice of literary tourism, which involves visiting locations associated with literary narratives, their authors, or their multimedia adaptations (Es, 2020). This form of tourism has historically been intertwined with early travel, such as grand tours, demonstrating how literature has long served as a powerful catalyst for turning readers into visitors of literary sites (Shekari et al., 2022). Indeed, the pervasive influence of literature extends beyond mere textual engagement, crafting evocative images of locales that, through various cultural expressions like cinema and television, transmit knowledge and associate meanings with specific landscapes (Arcos-Pumarola et al., 2018). These narratives, whether fictional or biographical, contribute to a "potent and penetrative tourist product" that offers a deeper intellectual engagement than conventional tourism (Vu et al., 2025). This suggests that literary tourism often caters to a more discerning traveller, seeking authenticity and a deeper connection to the cultural and historical significance embedded within the landscapes (Herbert, 2001). This engagement is further amplified by the reader's interpretation, where the subjective vision of reality constructed from the author's words imbues real places with symbolic meanings, thereby creating "place myths" that resonate with many (Hoppen et al., 2014). This phenomenon allows individuals to merge their "mindscape" with the actual "cityscape," leading to a unique experiential form of literary tourism (Lipovšek & Kesic, 2014). This "imaginative authenticity" is crucial, as it allows visitors to transcend the tangible aspects of a location and engage with the narrative's emotional and symbolic dimensions, often perceiving these literary landscapes as more genuine than audiovisual adaptations (Arcos-Pumarola et al., 2018; Es, 2020). This blurring of boundaries between the imagined and the real is a fundamental aspect of literary tourism, wherein the reader's personal connection to the narrative instigates a desire to visit the actual locations featured within fictional works (Hoppen et al., 2014; Reijnders, 2015). This impetus stems from a desire to reconcile the imagined world with its real-world counterparts, providing a tangible verification of the literary landscape (Pinzón, 2023; Ryan, 2020). The act of visiting these literary sites therefore transforms the tourist into a traveller traversing the urban or rural

landscape in search of scenes and sensations described in their favourite works (Lipovšek & Kesic, 2014). While literary tourism is a well-established academic concept globally, its specific manifestations and potentials within the Indian context, particularly in the western districts of West Bengal, remain an underexplored area. Mandal (2018) have explored the potentiality of literary tourism in the Rarh Region of West Bengal However, a more comprehensive and granular analysis of specific literary works and their associated geographies within this region is required to fully harness its potential for cultural tourism development.

Methodology :

This study aims to address this gap by systematically identifying and analyzing prominent literary destinations within the western districts of West Bengal, drawing upon celebrated Bengali literature to highlight their cultural and historical significance. Utilizing a mixed-methods approach, this research will involve textual analysis of selected Bengali literary works to pinpoint geographical references and thematic connections to the region, supplemented by an examination of existing tourism initiatives and local perceptions (Sharma & Ahmadian, 2019). It is basically a secondary data based research work. This methodological choice allows for a broad survey of literary landscapes and their associated narratives, minimizing the logistical constraints often associated with extensive primary data collection in geographically diverse regions. Extensive literature review and analysis of previous studies on literary tourism, cultural landscapes, and regional literature will form the bedrock of this investigation, ensuring a robust theoretical foundation for subsequent discussions (Ghosh, 2024; Mahmud et al., 2025). This will involve a detailed examination of Bengali literary texts that specifically mention or are set in the western districts of West Bengal, identifying key locations, characters, and thematic elements that contribute to their literary significance (Ergün & YILDIRIM, 2021). This analysis will subsequently inform the creation of a comprehensive inventory of potential literary tourism destinations, categorized by their literary association and cultural relevance, thereby offering a structured framework for future tourism development initiatives (Ghosh, 2024; Rech et al., 2025).

Discussion & Results :

The findings delineate a rich tapestry of literary places, offering insights into how these locations are portrayed in Bengali literature and their current state of recognition as tourist attractions. Though Literary Tourism is not at all a new concept but it became popular since the 2000s. This form of tourism

is quite well established in different parts of the world. In India, this it is nearly non-existent though there is huge potentiality of tourism development in the places associated with famous literatures. Literary Tourism is nothing but the visitation of a place which has direct relationship with an artistic writings- fiction of non-fiction. Film Tourism is also a part of this Literary Tourism in which case movie lovers visit a place associated with a particular movie or where the shooting of a particular movie took place or a place frequently used as shooting spot. The Rarh region of West Bengal encompasses numerous locations possessing significant potential to evolve into fully developed film and literary tourism destinations. Notable among these is the heritage landscape of Santiniketan, including the Khoai badlands, the Sonajhuri Maath, and the adjoining tribal settlements, all of which have repeatedly served as shooting locations for Bengali cinema. Similarly, several sites within Purulia district- particularly Chirugora and the Ayodhya Hills-have gained prominence as preferred outdoor film sets due to their rugged plateau scenery. Certain places also retain cultural memory through association with cult Bengali films; for instance, Saltora, situated near Biharinath Hill, is linked to the widely popular 1990s film Aashite Ashiona. Internationally acclaimed filmmaker Satyajit Ray further contributed to the cinematic visibility of the region by filming Hirak Rajar Deshe across locations such as Joychandi Pahar and the Raghunathpur area. From a literary perspective, Tarasankar Bandyopadhyay's landmark novel Hasuli Baker Upokotha is rooted in the real landscape of Hasuli Bak, located near Labpur Satipith, a setting also associated with his work Dhatridebota. These literary associations are gradually drawing culturally motivated visitors. Additional destinations contributing to the region's film and literary tourism profile include the coastal resort of Mandarmani, the emerging film city at Salboni, and the palace complexes of Kalikapur and Raipur near Bolpur in Birbhum district. The region's rich literary heritage, therefore, provides a compelling framework for developing unique tourism offerings that blend cultural immersion with geographical exploration, thereby promoting geotourism within the Rarh region (Mandal, 2021).

The major selected destinations that bears potentiality of becoming significant literary tourism hubs include Santiniketan, with its deep connection to Rabindranath Tagore's works and the surrounding tribal villages (Chatterjee & Chatterjee, 2025), and various locales within Purulia and Bankura districts that have served as settings for acclaimed Bengali films and literature (Chakrabarty & Mandal, 2018). However selected destinations in the present contexts are-

i) Santiniketan: Santiniketan represents the most formalized literary tourism landscape in eastern India. Established by Rabindranath Tagore as an experimental educational settlement, it integrated pedagogy with ecology. The ashram complex, Uttarayan residences, prayer halls, and open-air classrooms reflect Tagore's belief in learning through environmental immersion. The Khoai ravines formed through lateritic erosion-produce dramatic gullied terrain. Tagore interpreted these formations as metaphors for time, decay, and renewal. The stark red terrain and sparse forests have been used repeatedly in Bengali cinema and art films, creating visual familiarity that reinforces tourism flows.

ii) Hasuli Bank: Hasuli Bak, near Labpur, is immortalized through Tarasankar Bandyopadhyay's Hasuli Baker Upokotha. The crescent-shaped river meander encloses a marginalized settlement-geographically isolated and socially insular. This novel effectively portrays the socio-cultural dynamics and environmental embeddedness of rural life in Bengal, making the location a compelling destination for literary pilgrims seeking to experience the setting of this seminal work (Ghosh, 2024). Tarasankar's Dhatridebota further sacralizes the region, embedding motherhood and fertility symbolism into the same terrain.

iii) Joychandi Hill: Joychandi Hill in Purulia gained cinematic immortality through Satyajit Ray's Hirak Rajar Deshe. The rocky inselberg's starkness visually encoded authoritarian dystopia , transforming a geological feature into a powerful symbol within Bengali cinematic history. The site's dramatic landscape, characterized by its ancient geological formations, continues to attract both filmmakers and tourists, fostering an appreciation for the region's natural beauty and its interwoven cinematic legacy.

iv) Saltora: Saltora, near Biharinath Hill, entered Bengal's cultural imagination through the film Aashite Ashiona. 22 km from Ranigung This location, though less formally recognized as a literary site, exemplifies how popular culture can imbue a physical space with significant emotional and nostalgic value for visitors. It highlights the potential for lesser-known locales to emerge as significant tourism destinations through their portrayal in popular media, even if not directly tied to canonical literary works. The eternal life awarding pond portrayed in the classic film still holds a captivating allure for visitors, drawing them into the nostalgic world of Bengali cinema.

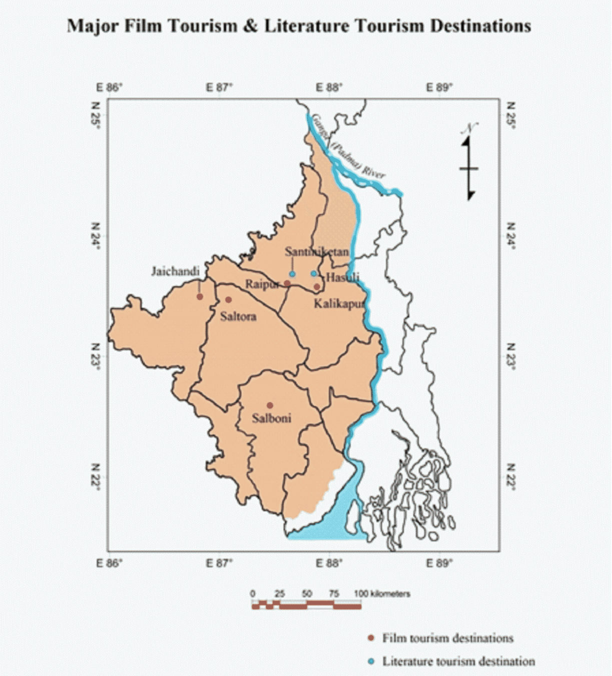

Fig. 1

Source: Mandal, T. (2019)

v) Salboni: Salboni, a locale in Paschim Medinipur district, has emerged as a dedicated film city, leveraging infrastructure development to attract filmmakers and subsequently, tourists interested in the behind-the-scenes aspects of cinematic production. This planned development serves as a modern counterpoint to naturally occurring literary landscapes, emphasizing the deliberate creation of cinematic tourism hubs. This deliberate cultivation of film-centric sites stands in contrast to the organic emergence of destinations associated with literary works, offering a distinct model for cultural tourism development.

vi) Kalikapur and Raipur: Kalikapur and Raipur with their historical royal palaces, offer a glimpse into the opulent lifestyles of Bengal's aristocratic past, thereby enriching the region's cultural tourism tapestry through architectural heritage and historical narratives. These locations, though not directly associated with specific literary texts, represent significant cultural assets that can be integrated into broader literary and geotourism circuits, providing a comprehensive experience of

West Bengal's diverse heritage.

The conceptualisation of a literary tourism circuit within the Rarh region requires moving beyond isolated destination identification toward an integrated spatial framework that connects text, terrain, mobility, and visitor experience. Tourism circuits function not merely as travel routes but as narrative corridors through which cultural meaning is sequentially consumed (Timothy & Boyd, 2003). In the case of Rarh, circuit modelling must account for three interlocking geographies:

- Authorial Landscapes - Sites associated with writers' lives and creative production
- Fictional/Narrative Landscapes - Real places embedded within literary texts
- Cinematic Landscapes - Film shooting and screen-popularised locations

The proposed Rarh Literary-Film Tourism Circuit may be spatially organised as follows :

Santiniketan ? Khoai-Sonajhuri ? Labpur ? Hasuli Bak ? Joychandi Pahar ? Ayodhya Hills ? Chirugora ? Saltora ? Salboni

This circuit is not linear but nodal operating through thematic clustering:

Cluster	Core Theme	Key Sites
Tagorean Cultural Landscape	Institutional literary heritage	Santiniketan, Khoai–Sonajhuri
Tarasankar Narrative Region	Fictional realism	Labpur, Hasuli Bak
Ray Cinematic Terrain	Auteur film geography	Joychandi Pahar
Plateau Film Ecology	Scenic shooting landscapes	Ayodhya Hills, Chirugora
Popular Cinema Memory	Nostalgia tourism	Saltora
Film Infrastructure	Production economy	Salboni Film City
Littoral Extension	Coastal screen tourism	Mandarmani

Constraints, Sustainability, and Policy Framework

The development of literary tourism in the Rarh region is shaped by a convergence of structural constraints and sustainability imperatives. While the region possesses substantial literary and cinematic capital, infrastructural deficiencies continue to impede its transformation into an integrated tourism circuit. Macro-level connectivity to urban gateways exists, yet last-mile accessibility to interior landscapes such as Hasuli Bak, Chirugora, and segments of the Ayodhya Hills remains limited, particularly during monsoonal periods. Accommodation infrastructure is similarly uneven, concentrated largely in Santiniketan and coastal nodes, thereby restricting immersive, multi-day literary tourism experiences within plateau interiors.

Institutional fragmentation further complicates tourism planning. Administrative responsibilities are dispersed across tourism, cultural affairs, and film development bodies, resulting in disjointed branding, uncoordinated infrastructure investment, and limited interpretive development. The absence of a unified narrative identity prevents the consolidation of Rarh's dispersed literary landscapes into a cohesive heritage circuit.

Environmental sustainability presents an equally pressing concern. Lateritic terrains, khoai ravines, and plateau forests are geomorphologically fragile and increasingly vulnerable to unregulated tourism pressures, including trail erosion, waste accumulation, and vegetation loss. Simultaneously, the commodification of folk and tribal cultural practices risks producing staged authenticity, diluting intangible heritage integrity. A sustainable policy framework must therefore integrate conservation-sensitive zoning, community-based tourism enterprises, interpretive heritage infrastructure, and coordinated regional governance. Such an approach would enable the balanced promotion of literary tourism while safeguarding the ecological and cultural landscapes that constitute the foundational grammar of Rarh's literary imagination.

Conclusion :

The literary tourism landscape of the Rarh region reveals a culturally dense yet institutionally underdeveloped heritage geography where literature, cinema, and environment intersect. Unlike monument-centric literary destinations, Rarh's tourism appeal is embedded within ecological and lived landscapes-lateritic plateaus, khoai ravines, river meanders, and forested uplands-rendered meaningful through the writings of Rabindranath Tagore and Tarasankar Bandyopadhyay, and the cinematic imaginaries of Satyajit Ray and others. Sites such as Santiniketan, Hasuli Bak, and Joychandi Pahar collectively illustrate how textual and filmic representations transform marginal terrains into affective tourism spaces. However, the consolidation of Rarh as an integrated literary tourism circuit remains constrained by infrastructural gaps, institutional fragmentation, weak branding, and ecological fragility. Sustainable development therefore requires coordinated governance, interpretive infrastructure, and community participation to balance heritage promotion with landscape conservation. Ultimately, literary tourism in the Rarh region of West Bengal extends beyond destination visitation; it constitutes an embodied engagement with regional literary consciousness where geography itself functions as narrative text and cultural archive.

References :

- Arcos-Pumarola, J., Osácar, M. E., & Molina, N. L. (2018). Literary urban landscape in a sustainable tourism context. Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography, 12(2), 175. https://doi.org/10.5719/hgeo.2018.122.3
- Chakrabarty, P., & Mandal, R. (2018). Tourism and Sustainability: A Geographical Study in the Rarh Region of West Bengal: Sustainable Development: A Dynamic Perspective. Anjan Publishers, Kolkata.
- Chatterjee, D., & Chatterjee, Dr. D. (2025). Rural tourism the path of empowering rural Development special reference to Santal tribal villages near Santiniketan ,West Bengal. International journal of scientific research in engineering and management, 9(2), 1. https://doi.org/10.55041/ijsrem41725
- Ergün, B., & Yildirim, H. M. (2021). Edebiyat Turizmi: Kazda?lar? Üzerine Bir ?nceleme. Seyahat ve Otel ??letmecili?i Dergisi, 18(2), 293. https://doi.org/10.24010/soid.861741
- Es, N. van. (2020). Locating the literary imagination. In Routledge eBooks (p. 166). Informa. https://doi.org/10.4324/9781003045359-13
- Ghosh, P. (2023). Indian Coal Mines in Hundred Years Old Fiction and Now: A Geographical Analysis. Space and Culture India, 10(4), 68. https://doi.org/10.20896/saci.v10i4.1277
- Ghosh, P. (2024). Cultural Landscape is a Power of Increasing the Beauty of the Natural Landscape and It is an Attraction to the Traveller for Visits the Tourists Places: A Study in West Bengal Major Tourist Spots Cultural Landscape. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 12(10), 1428. https://doi.org/10.22214/ijraset.2024.64884
- Herbert, D. T. (2001). Literary places, tourism and the heritage experience. Annals of Tourism Research, 28(2), 312. https://doi.org/10.1016/s0160-7383(00)00048-7
- Hoppen, A., Brown, L., & Fyall, A. (2014). Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations? Journal of Destination Marketing & Management, 3(1), 37. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2013.12.009
- Lipovšek, E., & Kesic, S. (2014). Journeys beyond pages: The use of fiction in tourism. Turisticko Poslovanje, 14, 51. https://doi.org/10.5937/turpos1414051l
- Mahmud, P., Dutta, D. C., Tat, H. H., & Sade, A. B. (2025). Branding Destinations in Banglaphone Regions of South Asia Through Literary Tourism. Economic Analysis Letters, 4(4), 1. https://doi.org/10.58567/eal04040001
- Mandal, T. (2021). Geotourism Potentiality of the Rarh Region of West Bengal: A Geographical Outlook. RESEARCH REVIEW International Journal

of Multidisciplinary, 6(12), 90. https://doi.org/10.31305/rrijm.2021.v06.i12.013

Mandal, T. (2019). Tourism Resources and Environment: A Geographical Study in the Rarh Region of West Bengal. Unpublished PhD thesis.

- Pinzón, L. R. P. (2023). Regional Literature as Epicenter of the Cultural Heritage. Projections of Literary Tourism in Colombia. In IntechOpen eBooks. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.110818
- Pratiwi, D. P., Hawa, A. M., Iman, D. T., Husna, H., & Ferdinal, F. (2024). DIGITALIZATION OF LITERARY WORKS FOR TOURISM PROMOTION IN WEST SUMATRA, INDONESIA. LANGUAGE LITERACY Journal of Linguistics Literature and Language Teaching, 8(2), 535. https://doi.org/10.30743/ll.v8i2.10088
- Quinteiro, S. (2023). Interconnected Pathways and Prospects: Exploring the Synergies between Literary Geography, Tourism, and Education. In Springer international handbooks of education (p. 1). Springer Nature (Netherlands). https://doi.org/10.1007/978-981-99-3895-7_29-1
- Rakshit, N. (2021). Abstract Knowledge, Embodied Experience: Towards a Literary Fieldwork in the Humanities. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 13(3). https://doi.org/10.21659/rupkatha.v13n3.31
- Rech, G., Pini, C., Migliorati, L., & Mori, L. (2025). Literary Tourism and Cultural Sustainability: The Landscape of Beppe Fenoglio in the Langhe, Italy. Sustainability, 17(3), 1237. https://doi.org/10.3390/su17031237
- Reijnders, S. (2015). Stories that move: Fiction, imagination, tourism. European Journal of Cultural Studies, 19(6), 672. https://doi.org/10.1177/1367549415597922
- Ryan, M. (2020). How stories relate to places? Orhan Pamuk's Museum of Innocence as literary tourism1. In Routledge eBooks (p. 265). Informa. https://doi.org/10.4324/9781003045359-21
- Sharma, A. S. A., & Ahmadian, H. (2019). Literary tourism in the Indian sub-continent. In CABI eBooks (p. 133). https://doi.org/10.1079/9781786394590.0133
- Shekari, F., Azizi, F., & Mohammadi, Z. (2022). Investigating literary gaze through the orchestra model of the tourist experience. International Journal of Tourism Cities, 9(1), 268. https://doi.org/10.1108/ijtc-04-2022-0107
- Vu, N. V., Nazari, M. A., Dang, T., Muralev, Y., Mohanraj, M., Tran, T., & Quoc, H. A. (2025). Type of the Paper: Article. https://doi.org/10.2139/ssrn.5384374

Dr. Sandip Tikait

"Bihar Geet" : Re-reading of Social Customs and rituals of the native folks of Manbhum

Marriage is a very important customs in a society. "Bihar Geet" represents wonderful bunch of nuptial songs in Jhumur which reflects the societal norms of the native people of Manbhum. The songs contain not only the customs and rituals but the age old Jhumur songs are the perfect records of human emotions. The marriage songs are as simple and organic as the life style of the native people of Manbhum. The composer of the *"Bihar Geet"* Sri Rohin Chandra Mahato skillfully narrates the entire marriage process. Sri Rohin Chandra Mahato artistically cites himself in the songs as it's an age old technique of mentioning name of the poet in Indian folk tradition.

The first song Sri Mahato dedicates to the god Ganesha, Lord Rama and goddess Saraswati to get blessings to accomplish the songs. It reminds the age old traditions of epic invocations in Ramayana and Mahabharata.

The marriage story begins at the second song:

(১) কি হইতে কি হইলো, বিনাফেরের ফের হলো
বেটা টাকে বিহা দিতে ঘরে কেল কেলি ঢুকে গেল
(২) বিনাদাবিয়েই করল বিহা, পন টাকাটাও নাই লিল
বিহা করার ছ, মাস বাদে, বেটা ছায়ের বাপ হয়ে গেল
(৩) ভাবে গুনে বলে রহিনে, এইটাই কি ভাগে ছিল
বিহা করার ছ মাস পরে, বহুটাও লেড়স হল

[(1} ki hoite ki hoilo, binaferer fer holo
Beta take biha dite ghare kel keli dhuke gelo
(2) binadabieai korla biha, pon takato nai lilo
Biha korar cha, maas baade, beta chaaer bap hoe gelo
(3) vabe gune bole rohine, eitai ki vage chilo
Biha korar cha maas pore, bhutao ledes hola]

(Jharkhand Manbhum Aadi Lok Sangeet Sahitya : 158)

The preparation of marriage ceremony of their son makes them busy in the house. The family is not happy as the son has got married without any dowry or even has refused to accept the dowry amount. This line is important as it reflects the age old dark tradition of dowry system in India. This is a mark of progress among the young people. The self esteem of a young man as well as the progressive approaches are is remarkable though the bridegroom's

family was against it. And the song reveals more that the boy possibly was in love with the bride and it's a love marriage as they become parents within six month of their marriage. And the family of the boy was not happy because too early (within six month of marriage) child birth arises a kind of dispute and shame in the society as well as after child birth the wife of the boy is useless to them as she can't perform any household responsibilities.

The marriage celebration comes in the 3rd songs from the bridegroom family's perspective:

(১) আজ হামাদের সাধের বাবুর বিহা লো
মদ খায়েছি বোতল বোতল নাচবো থয়াথয়া লো
(২) টেসকি মোটর হাওয়াই চলাবলো (২)
কনিয়ার যদি বহিন থাকে চুপেই নিয়ে পালাব
(৩) তিং ধাতিং মাদল বাজাবলো (২)
কোনিয়ার যদি বহিন থাকে টানে আনে নাচাব।
(৪) সংঘাত সংঘাত ফুল পাতায় দিবলো
হামদের ঘরকে আলো রহিম দৈ চিড়া খাওয়াব

[(1) aaj hamader sadher babur biha lo
Mod khaechi botol botol nachbo thaya thaya lo
(2) teski motor haoai cholabela (2)
Koniyar Jodi bahin thaake chupei nea palaba
(3) ting dhating madol bajabolo (2)
Koniyar Jodi bajin thake tane aane nachabo I
(4) Sanghat sanghat phool pathai dibolo
Hamder ghorke aalo rohim dou chida khaoabo]
(Jharkhand Manbhum Aadi Lok Sangeet Sahitya :158)

Food, drinks and dance are the inevitable part of marriage celebration. Drinking and dancing are the part of Manbhum culture in marriage ceremony. In those days car especially taxi is very expensive for the common people. They only can hire it in special occasions like marriage. It's a dream ride for them. The family of the bridegroom is happy and in a very joyous mood. And the young men are in a jovial mood. They are imagining that if there is any sister of the bride they would run away with that girl. And they become friends. There is a tradition of making new friends by exchanging flowers among the girls and boys and that is called *"phool pathai dibolo"*. Curd and flattened rice are the delicious food for celebrations in rural Manbhum.

Sri Rhohin Chandra Mahato mentions both the perspectives in a flawless manner. Now he narrates the bride side or better to mention the girl's side:

(১) মুনুর হামদের বিহাদিব
মুনুর হামদের বিহাদিব
ওগো বলি গো শুভ লগনে
মুনুর হামদের মুখু বর বর লাগে নাইমনে
(২) তেল হলদ মাখাও মুনুকে
তেল হলুদ মাখাও মুনুকে
ওগো বলিগো অতিযতনে
সাজাও সাজাও সাজাও মনকে চুয়া চন্দনে
(৩) মুনু যাবে শশুর বাড়ি
মুনু যাবে শশুর বাড়ি
ওগো বলিগো আনন্দ মনে
বিদায় দাও বিদায় দাও মুনুকে বলে রহিনে

[(1) Munur haamder biha diba
Munur haamder biha diba
Ogo boligo suvo logone
Munur hamder mukhu bar bar go laage nai mone
(2) tel holod makhao munuke
tel halud makhao Munuke
ogo boligo aati jatane
sajao, sajao, sajao Munuke chua chandane
(3) Munu jabek sahur badi
Munu jabek sashur badi
Ogo boligo ananda mone
Bidai dao bidai dao munuke bole Rohine]

(Jharkhand Manbhum Aadi Lok Sangeet Sahitya:159)

The girl’s name is Munu. The nick name denotes that the girl is very loving to their parents. The marriage of Munu repeats twice because Munu’s marriage is very important to their parents and family and they have fixed the particular auspicious time for marriage. And Munu is not happy with her marriage as the bridegroom is not educated one. So, here importance of education has been revealed to make a family. Munu , even a rural girl knows that an uneducated partner is not suitable for her life. Smearing bride with oil and turmeric is a traditional Indian customs of marriage. It's a kind of celebration as well as skin care process for the bride within family with special care and after that for bridal make up they apply sandal paste and so on to enhance the beauty of the girl. Bride’s skin care is a celebration in Indian

marriage. Munu's marriage makes everyone happy as she would be leaving for her in-law's house and Sri Mahato suggests that everyone should send their daughter with happy heart as she is going to make a new family for herself. The tradition of sending the daughter to the in-law's house is though painful to the parents and family but Keeping in mind for the future prospect of the girl one has to accept the customs with open heart.

Here, the mother's heart is heavy as parting with her daughter is painful in the seventh song. Mother of the girl is full of tears at the time of departure to the in-law's house of her dear daughter. The mother is representing a common mother whose tears speak much than anything else. The emotion of a daughter's mother is being simply captured by Sri Mahato. Mother's tears provide the song a soul and make it more organic :

(১) সবাই বলে বিদায় বিদায়, মায়ের মন কেমন করে।
বিদায় দিতে মাজননীর, দু নয়নে জল পড়ে

(২) কাঁদে মুনুর সঙ্গী সাথী মা কাঁদিছে হু করে
ধরয্য না ধরে হিয়ার, বিদায় দিব কি করে।

(৩) কতনা আদরের বিটি, ছিলি গো বাপের ঘরে
রোহিন বলে আজ কেনে দিলি গো বাহির করে

[(1) sabai bole bidai bidai, maaer mon kemon kore I
Bidai dite maa jananir, dunayane jaal pode

(2) kande munur sangi sathi , maa kandiche hu kore
Dhoirjo na dhore hiaar, bidai diba ki kore I

(3) katna aadorer biti, chili go baper ghore
Rohin bole aaj kene didli go bahir kore I]

(Jharkhand Manbhum Aadi Lok Sangeet Sahitya:160)

Not only the mother, the friends and mates of Munu all are weeping to say good bye to their beloved one. Really, it's a difficult task for them to say good bye to Munu. Munu has been raised with love and care like most of the adorable daughters but now she is departing for another home. Sri Mahato puts togather the emotion and social customs side by side to express the untold truth of every girl's parents in a patriarchal society.

As time rolls, the post marriage story of Munu's life has been exposed the other dimension of life the song eleven:

(১) লেনা দেনা চুকে গেল, বিহাটাও পাইরাই গেল
ফাগুন মাসে লিতে আইল, হামার মা বাপে বিদায় দিলো

(২) শশুর ঘরের গুণের কথা বলে দিব কার কাছে
ডুভার মাড়ে পিঁয়াজ কাটা লুলা হাটা ডুবে যাছে

(২) ই বছরের চৈত পরবে কৈ আইলো হামকে লিতে
রোহিন বলে টাকা দিয়ে তোকে বিকে দিয়েছে

[(1) lena dena chuke gelo, bihatao pairai gelo
Fagun maase lite aaila, hamar maa baape bidai dilo
(2) Sasur gharer guner katha bole dibo kar kache
Duvar made piyanj kata lula hata duve jache
(3) e bacharer choit parabe kou aailo hamke lite
Rohin bole taka dea toke beke deache]

(Jharkhand Manbhum Aadi Lok Sangeet Sahitya : 161)

Munu is representing the most of rural Manbhum girls whose life become crucial after marriage. The song mentions that after marriage she visits parental home and she again goes back to her in-law's house in the month of *"fagun"*. Now Sri Mahato reveals the humble conditions of Munu in her in-law's house. The girl is in a helpless situation because she can't even get proper food. Sri Mahato informs the truth of every girl of rural Manbhum after marriage. As days roll, even partents of Munu are indifferent to her. Munu is not invited in celebration also. Sri Mahato's statement is very important here. He says parents sold Munu to her in-laws i.e. with dowry money. And that is the cause of indifference towards her.

Sri Mahato exposes every common girl's journey through his wonderful *"Bihar Geet"*. The psyche of rural India has been exposed. Most of the girl's destiny ends like Munu. Munu is the face of rural girls. The patriarchic society raises their girls as a transferable property. Marriage is the only destination of those girls and unfortunately there is nobody to listen to them. The other side of the grim truth of marriage has been expressed in the songs to conscious the people. The songs are important not because of its aesthetic point of view but have instructional values also.

Works Cited :

Mahato, Rohin Chandra. *Jharkhand Manbhum Aadi Lok Sangeet Sahitya*: Rashik Nagar. Kudmali Aadi Sanskriti, 2019.

সেবিকা হাঁসদা

শতবর্ষে তৃপ্তি মিত্র : ফিরে দেখা, এক অবিস্মরণীয় নাট্য ব্যক্তিত্বের বর্ণময় জীবন

আদিকাল থেকে মানুষ তার কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ করার অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পশু শিকার, কৃষিকাজ, নৃত্য-গীত, লিখন, পূজার্চনা, জীবনশৈলী, পরিবার, রাষ্ট্র কলহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে এর প্রকাশ অনাদিকাল থেকেই হয়ে এসেছে। তার প্রমাণ আমরা পাই গুহাচিত্র, প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কার, স্থাপত্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এখানেই সীমাবদ্ধ না রেখে, সচেষ্ট হয় অভিনয়ের মাধ্যমে তার সকল কর্মকাণ্ডকে কি ভাবে সকলের সামনে মেলে ধরা যায়। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় নাট্য সাহিত্য তথা নাটক। আর তার জন্য প্রয়োজন হলো নাট্যমঞ্চের তথা রঙ্গমঞ্চের।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটক আর নাট্যাভিনয়ে তৃপ্তি মিত্র কিংবদনন্তী প্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব, যাকে স্মরণ করা মাত্রই মনে জেগে ওঠে বাংলা নাটকের নতুন মোড়ের কথা। গণনাট্য দ্বারা বাংলা নাটক যে নতুন দিকে বাঁক নিয়েছিল ও নবনাট্যের হৃদয়ের ঐশ্বর্য উৎসারিত হয়েছিল, উভয় ক্ষেত্রে তৃপ্তি মিত্রের উপস্থিত ছিল লক্ষ্য করার মতো।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর, দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁয়ে তৃপ্তি মিত্র জন্ম গ্রহন করেন। অধুনা বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ সাবডিভিশনে আবহাওয়াটা ছিল একেবারে গ্রাম্য। তাও টাউন বলা হতো কারণ সেখানে কোর্ট কাছারি, ব্যাঙ্ক সব ছিল। এমনকি একটি ছোটখাটো থিয়েটার হলও ছিল, ছেলেদের জন্য হাইস্কুল, মেয়েদের জন্য মাইনর গার্লস স্কুল এসব ছিল। আমেজ ছিল খোলামেলা গ্রামের। স্কুলের পাশ দিয়ে এস-ডি-ওর বাড়ির ধার ঘেঁষে একেবারে যে পাহাড়ি নদীটি বয়ে গেছে তার নাম টাঙন (তাঁর আত্মকথা ধর্মী লেখা থেকে পাওয়া)। তাঁর বাবার নাম আশুতোষ ভাদুড়ী, তাঁর মায়ের নাম শৈলবালা দেবী। তিনি গৃহবধূ হলেও নাটকের প্রতি টান ছিল তাঁর বিস্তর। শৈশবে তৃপ্তি (ভাদুড়ী) মিত্রের পড়াশুনা ঠাকুর গাঁয়ে। এর পর তিনি মায়ের সঙ্গে কলকাতায় আসলে, প্যারিচরণ উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর বড় মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার খ্যাতনামা সাংবাদিক ছিলেন। এক সময় তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক হন। মেজো মামা সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। তারই বাড়ি থাকতেন কবি অরুণ মিত্র। তিনি সুধীন্দ্রনাথের চিত্ত হইতে বিত্ত হইতে প্রিয় ছিলেন। অরুণ মিত্র তৃপ্তি মিত্রের বড় দিদি শান্তিকে বিবাহ করেন। এই বাড়িতেই তৃপ্তি মিত্র বেড়ে ওঠেন। তখন সেই বাড়িতে ছিল বুদ্ধিজীবিদের ভিড়। ১৯৪৩ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেন। সেই সময় যুদ্ধের কারণে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গ্রাম থেকে মানুষ তাদের কঙ্কালসার শরীর নিয়ে ভিড় করে একটু খাবারের জন্যে। এই সময় তিনি ARP তে যোগ দেন মানুষের সেবা করার জন্য, আর সেই সঙ্গে নাটকে নামেন। এই দুর্ভিক্ষা পীড়িত

মানুষের সেবা করা উপলব্ধি তিনি তার নাটকে ফুটিয়ে তোলেন। ১৯৪৩ এ তিনি অভিনয় করে 'আগুন" নাটকে, যদিও সেটা ছিল অনিচ্ছাকৃত। এরপর 'ল্যাবরোটা'রি , 'জবানবন্দী' প্রভৃতি নাটকে তিনি অভিনয় করেন। ১৯৪৪ সালে, "নবান্ন" নাটকে অভিনয়ের পর থেকে তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এরপর তিনি নাটকে অভিনয় করার পাশাপাশি নাটক নির্দেশনা ও পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালে তৃপ্তি মিত্র নাটকে আরেক বিষয় নিয়ে এলেন একক অভিনয় করে। তিনি যে সকল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সে সব চরিত্রে দর্শক অন্য কাউকে ভাবতেই পারত না। তার সংলাপ ছিল নাটকের হৃদস্পন্দন। তার গলার তীব্রতা ছিল এর জন্যে প্রেক্ষা গৃহের শেষতম ব্যাক্তি পর্যন্ত তার কথা পৌঁছে যেত। তিনি আবৃত্তি করতেন বলেন সংলাপে লিরিক্যাল মেজাজ আনতে পারতেন। তিনি নাটকে অভিনয়, নির্দেশনা পরিচালনার পাশাপাশি কিছু মৌলিক নাটক, গল্প , কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর "ইঁদুর", "বিদ্রোহিনী" বাদে বাকি নাটক গুলি মঞ্চস্থ হয়েছে। তিনি আজীবন তাঁর কাজের মধ্যে নিজেকে ব্রতী রেখেছেন। দেখতে দেখতে বহু বছর পার হয়ে গেছে। তবুও নাট্যমঞ্চের মানুষের জানেন তার ছড়িয়ে যাওয়া মনিমুক্ত আজও অন্ধকারে জ্বলে ওঠে। তিনি আজও অপরাজিত।

বিশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের জগতে এক উজ্জ্বল নাম তৃপ্তি মিত্র। যাঁকে স্মরণ করা মাত্রই জেগে ওঠে বাংলা নাটকের নতুন মোড়ের কথা। তিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে নাটক করতে এসেছিলেন। তিনি বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং প্রতিবার তাঁর একটি রূপ আরেকটি রূপকে ছাপিয়ে গেছে। ছোট বেলা থেকে নাটক দেখতে এবং পড়তে অভ্যস্থ ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। মাসতুতো দাদা বিজন ভট্টাচার্য একপ্রকার জোর করাতে তাঁর অভিনয়ে প্রবেশ। তারপর এই জগৎ থেকে আর তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। অনেক বিভাগে অনেক কাজ শিখেছিলেন। তৎকালীন "বহুরূপী" পত্রিকার সম্পাদক, স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ বসু একটি লেখা চাইলে তৃপ্তি মিত্র লিখলেন এবং শম্ভু মিত্র নাম দিলেন "বলি"। তার লেখাগুলি বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। অভিনয় ও নাট্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই তাঁর লেখা নাটকের ঘটনা বিন্যাস ও সংলাপ ব্যবহার অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে আলাদা হয়ে উঠেছে। নাটক লেখার সময় তিনি ভেবেই নিয়েছেন নাটকটি অভিনীত হবে তাই অনেক ক্ষেত্রে মঞ্চের প্রয়োজনে তিনি কাহিনি বিন্যাস ও সংলাপ সৃজন করেছেন। যেহেতু তিনি অভিনেত্রী এবং নাট্য নির্দেশিকা ছিলেন এর প্রভাব তাঁর নাট্য রচনার ওপর পড়েছে। নির্দেশককে অভিনয় মঞ্চায়নের জন্য গৃহীত নাটককে সম্পাদনাও করতে হয়। গ্রহন, বর্জন, সংযোজনও করতে হয়। নাটক রচনার সময় নাট্যনির্দেশকের এই বৈশিষ্ট্যকে তৃপ্তি মিত্র এড়িয়ে যেতে পারেননি। গঙ্গাপদ বাবুর অনুরোধে তিনি নাটক লিখেছেন একথা উল্লেখ করে নাটক রচনা বিষয়ে তিনি যে

বিনয় ও কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন তা অর্থহীন বলেই মনে হয়। কেননা তাঁর নাটক গুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় সেগুলি কতটা রসোত্তীর্ণ এবং উৎকৃষ্ট মানের। তৃপ্তি মিত্র অভিনয়ের দ্বারা থিয়েটারের জগতে যে বিবর্তন এনেছিলেন একথা বলার অপেক্ষাই রাখে না। নাটক তৈরি পর্ব থেকে মঞ্চস্থ হওয়া পর্যন্ত কত রকম গুণের লোকরই না প্রয়োজন হয় এবং এটা যে একটা যৌথ কাজ, তৃপ্তি মিত্র সেটাকে বুঝতে পেরেছিলেন ভালোভাবেই। ভালো নাটক লেখার প্রয়োজনীয়তা তখন যেমন ছিল, ভালো নাটক পড়ার লোকেরও অভাব ছিল। পাঠক দর্শক তৈরি করার প্রয়োজনো ছিল জরুরি। তাই তিনি নাটকের বিষয়বস্তুকে এমন গ্রহন করলেন, যাতে সাধারণ মানুষও জীবনের রসদ খুঁজে পায় এবং তাদের একঘেয়ে অনুভব যাতে না হয়, সেই দিকটিকে তিনি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। সমসাময়িক মানুষের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে, তিনি নাটক রচনা করেছেন। তিনি ভারী তত্ত্বের জালে আবদ্ধ করেননি নাটককে, কেননা পাঠকের ধৈর্য্য সীমিত, আর সেই সীমিত সময়ের মধ্যে কিভাবে পাঠককে আয়ত্তে আনতে হবে তা তিনি জানতেন। তাঁর লেখা নাটক 'বলি', 'ইঁদুর', 'সুতরাং', 'প্রহর শেষে', 'বিদ্রোহিণী' প্রভৃতি নাটকে সে ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, "বহুরূপী' পত্রিকার সম্পাদক গঙ্গাপদ বসুর অনুরোধে তিনি লেখেন তাঁর প্রথম নাটক "বলি"। এটি ছিল একটি একাঙ্ক নাটক। ১৯৬০ সালে তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নাটকটি একটি ত্রিকোণ প্রেমের আবহে রচিত হয়। এখানে ঊর্মিলা তার স্বামী না প্রেমিকে রক্ষা করবে এই টানা পোড়েনে নিজে আত্মহননের পথে পরিচালিত হয়। ঊর্মিলার অতীত ও বর্তমান সামনা সামনি হয় এমন ভাবে, যেখানে নাট্যকাহিনি তার গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে। এখানেই তাঁর অসাধারণ নাট্য বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নাট্য জগতের মানুষ ছিলেন বলে, নিছক মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই নাটক শেষ করলেন না। ঊর্মিলা তার জীবনের অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে মেলাতে না পেরে নিজেই নিজেকেই বলি করলো। এখানেই নাটকের নামকরণ স্বার্থকতা। তৃপ্তি মিত্রের পরবর্তী নাটক "ইঁদুর"। এখানে এক নারীর লড়াইকে সমস্ত কলুষতা, পাশবিকতার বিরুদ্ধে একা লড়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন তিনি। সমাজ সচেতন সমসাময়িক পরিমন্ডলের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা নাট্যকার যে তিনি ছিলেন, তার পরিচয় তিনি এ নাটকে রেখেছেন। এই নাটকটি শিবানীর লড়াইয়ের কাহিনি হলেও কেবল একজন ব্যক্তির ঘটনায় তা সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং তা হয়ে উঠেছিল সার্বিক। বস্তিবাসী ও সাধারণ মানুষ সম্পর্কেও তৃপ্তি মিত্রের যে দারুন অভিজ্ঞতা ছিল, তা তাঁর নাটক পড়লেই ভালো করে বোঝা যায়।

তৃপ্তি মিত্রের পরবর্তী নাটক "বিদ্রোহিনী" এটি একটি ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকে, সংগ্রামী নারী ঝাঁসির রানীর বীর্যবত্তার রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। যদিও, তাঁর বেশিরভাগ নাটকে এরকম একটি সংগ্রামী নারীর পরিচয় পাওয়া যায় বাস্তব থেকে, তবুও, তিনি

"বিদ্রোহিনী"র নায়িকাকে ইতিহাস থেকে তুলে নিয়ে এসে, তাঁকে অসামান্যতা দান করেছিলেন।

তৃপ্তি মিত্রকে বুঝতে গেলে, তাঁর গড়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্তের পূর্বের অনুধাবন জরুরি। তাঁর পারিবারিক পরিমন্ডল ছিল নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হবার বা নাটককে ভালোবাসার অনুকূল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চৎপটে যে দুর্ভিক্ষ এসেছিল, তা তৃপ্তি মিত্রকে চিন্তিত করে তোলে। এই সময়ে, ভেঙে পড়া সমাজ ব্যবস্থা এবং থিয়েটারের ডাক তিনি অনুভব করেন। এরপর তাঁর পুরোপুরি অভিনয় জগতে চলে আসা। পরে, ধীরে ধীরে আঞ্চলিক সীমারেখা অতিক্রম করে জাতীয় স্তরেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। শুধু নাট্যাভিনয় নয়, নির্দেশনার কাজও তিনি পারদর্শিতা দেখালেন। তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে যেমন ফুটিয়ে তুলেছিলেন, নারীর অন্তর্দন্দ্ব, রাজনৈতিক - সামাজিক আবহ, বৃদ্ধ বাবা - মার করুন অবস্থা। তেমনই, তাঁর নাটকে নারীর সংকটকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীকে তিনি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। যা তৃপ্তি মিত্রের পূর্বে এবং পরে খুব অল্প কয়েকজন নাট্যকারের নাট্যভাবনায় উঠে এসেছে। তিনি তাঁর নাটকে, গল্পের সরলতার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার এমন বর্ণনা করেছেন, যেটা অতি সাধারণ বলে মনে হলেও, বিষয়গুলি পাঠককে চিন্তা করতে বাধ্য করে। নাটকে অভিনয় ও নাটক লেখার পাশাপাশি, তিনি কিছু গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধও লিখেছিলেন। যদিও তাঁর প্রবন্ধে আত্মপরিক্রমা ও আত্মবীক্ষণের বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে বার বার। যেমন, আমার 'ছেলেবেলায়', 'আমার অভিনয় আমার অভিজ্ঞতা', 'অভিনয়ের রীতিনীতি নিয়ে' , 'গ্রুপ থিয়েটার ভাঙছে কেন", 'থিয়েটারের মেয়েরা' প্রভৃতি প্রবন্ধে আমরা অভিনেত্রী পরিচালিকা ও নাট্যবিচারক তৃপ্তি মিত্রকে আমরা প্রতিনিয়ত নতুন করে খুঁজে পাই।

তথ্যসূত্র :

১. "তৃপ্তি মিত্র নাটক সমগ্র" - তৃপ্তি মিত্র , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
২. "থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা" - শমিক বন্দোপাধ্যায়, লালমাটি প্রকাশন।
৪. "তৃপ্তি মিত্র শিল্পে ও জীবনে" - দেবাশীষ রায় চৌধুরী, রত্নাবলী প্রকাশন।
৫. "বাংলা নাটকের ইতিহাস" - অজিত কুমার ঘোষ , দেজ প্রকাশন।
৬. "নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ" - অজিত কুমার ঘোষ , দেজ প্রকাশন।
৭. "বহুরূপী যাপন" - সৌমিত্র বসু , এবং অধ্যায় প্রকাশন।
৮. 'এই পৃথিবী রঙ্গলয়" - তৃপ্তি মিত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

পত্রিকাপঞ্জি :

৪. বহুরূপী, সংখ্যা - ৭২, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯।
৫. শুদ্রক, তৃপ্তি মিত্র সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯২।

বুদ্ধদেব মাজী

'শীতকাল কবে আসবে সূপর্ণা' : এক গণ্ডিবদ্ধ অভ্যস্ত জীবনযাপনের সরোবর থেকে উন্মুক্ত জীবন সমুদ্রের আকাঙ্ক্ষাময় কাব্যগ্রন্থ

এলোমেলো অগোছালো, নদীর স্রোতের মতো, বন্য কোলাহলের মতো প্রবাহমান আমাদের জীবন; সেখানেই তার সৌন্দর্য, তার ছন্দময়তা। জীবনের একটা জগৎ গণ্ডিবদ্ধ উঠোন-বারান্দাময় ঘর সংসারের একলা আবহাওয়ায়, আরেকটা গণ্ডি ছাড়িয়ে উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ জাগতিক কোলাহলের ভিড়ে বিরাটত্বের শিহরণ নিয়ে। গণ্ডিবদ্ধ জীবনের জটিলতার সমস্যায়, রাজনৈতিক সামাজিক বেড়াজালে পিষ্ট হতে হতে দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড় প্রাণস্বত্ত্বা এক উন্মুক্ত, বিস্তীর্ণ প্রবাহের আকাঙ্ক্ষা করে। আলো খোঁজে দিগন্ত বিস্তৃত এক প্রশান্তির। এই দুই জগতের একটা আরেকটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত, শুধু রাস্তাটা বোঝার অপেক্ষা জীবনের গভীরতাকে বুঝতে। ভাস্কর চক্রবর্তীর (১৯৪৫-২০০৫) কাব্যগ্রন্থ 'শীতকাল কবে আসবে সূপর্ণা' (১৯৭১) এর কবিতাগুলি সেই পথের প্রবাহমানতায় স্নাত।

চল্লিশটি কবিতা সম্বলিত 'শীতকাল কবে আসবে সূপর্ণা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবনবোধের থেকেই বৃহত্তর উন্মুক্ত জীবনবোধকে তথা জীবন জিজ্ঞাসাকে উপস্থাপিত করেছে। ভাস্কর চক্রবর্তীর কাছে কবিতা "আলোয় ভর্তি একটা পাহাড়, যে আলো শুধুই হাজার মোমবাতির। মোমবাতিগুলো সব জ্বলছে, আর পাহাড়টা আস্তে আস্তে ডানা ভাসিয়ে শূন্যে উড়ছে, আর ভেসে যাচ্ছে। কবিতা আমার কাছে ঠিক এইরকম আলোয় সাজানো একটা পাহাড়ের ভেসে যাওয়ার মতো।"[১] তাঁর মতে কবিতা যেকোনো লাইন থেকেই শুরু হতে পারে আবার শেষও হয়ে যেতে পারে যেকোনো লাইনে গিয়ে। আমাদের জীবনের পালাগুলোও অনেকটা এরকমই তো। কবিতার মতো জীবনের প্রবাহও হাজারমুখো উন্মুক্ত।

এই 'শীতকাল কবে আসবে সূপর্ণা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দিগভ্রান্তি', ১৯৬৫ সালের দিকের রচনা এই কবিতা কবির এক ছটফটানির মধ্যে থেকে উঠে আসা। তার এই ছটফটানির মূল কারণ কবিতার ভাষা নিয়ে, একটা নতুন কিছু, একটা অন্যরকম কিছু করার চেতনাবোধ; এই চিন্তার ফলাফল হয়ে আসে কবিতাটি। কবি এক সাক্ষাৎকারে বলেন-"তখনই একটা চিন্তা মাথার মধ্যে চলে এসেছিল, আমার ভাষাটা আমাকে খুঁজে পেতে হবে। ওই ১৮/১৯ বছর বয়সেই আমি ছটফট করতাম আমার কবিতার ভাষার জন্যে। সেই ছটফটানির মধ্যেই আমি একদিন একটা কবিতা লিখলাম দিকভ্রান্তি' নামে, সেটা 'শীতকাল কবে

আসবে সুপর্ণা'র প্রথম কবিতা।"[২] এই 'দিগভ্রান্তি' কবিতায় আছে এক অগোছালো সত্ত্বার প্রবাহ যা আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে অন্য এক স্রোতে ভেসে এক গভীর শূন্যতার প্রান্তরে পৌঁছায়। যেখানে অতীতের পূর্ণতার কল্পনাটুকু আছে বাকি সব শব্দহীন অন্ধকার রাতের মতো, শীতের রাতের মতো নিঃসঙ্গ। সংস্কারের মোড়কে অভ্যস্ত পোশাকি কার্যকলাপ নিরর্থক, রহস্যময় নীরবতার অন্ধকারগুলো— যারা শীতের রাতের অবয়বে বিরাজমান ভালোবাসার বর্ণময়- বৈচিত্রময় জেদ বা নিরপরাধ স্পন্দন সেসব রহস্যময় শিহরণের সন্ধান রাখে, টের পায়, ভ্রান্তি এসে গেলেও একটা পথ খুঁজে পায়,- "তুমি শীতের রাতের মতো শব্দহীন- আমার ভালোবাসা/ তোমাদের বাগানবাড়ি জানে।"[৩] এই কবিতায় যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে, তা কবির মতে — "লোকে যেভাবে ঈশ্বর ভাবে, সেভাবে 'ঈশ্বর' শব্দটা আমার ঠিক আসেনি। হয়তো এমন জায়গায় বলেছি যে মনে হয়েছে, হ্যাঁ সেটা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না।"[৪]

'ঘুমের মধ্যে' কবিতা এক কোনঠাসা জীবনের কথা বলে। যে জীবন "এক অনেক নিচের ঘরে" সরে পড়া, জগৎ সংসার সমাজের ভিড় থেকে ব্রাত্য। এই সরে পড়া অস্তিত্ব নিঃসঙ্গ- একাকীত্ব জীবনের গণ্ডিতে ফেলে দেয়, যা মৃত্যুর সামিল। এই বেঁচে থাকায় শুধু প্রাণ থাকে, কোনো সুর থাকেনা পার্থিব কোলাহলের। এই সরে পড়া জীবন প্রবাহে অনেক নিচের ঘরে চলে যাওয়া সত্ত্বার প্রশ্ন জাগে "শুয়ে শুয়ে এ কোথায় আমি?"[৫] এই ব্রাত্য অবস্থার ভবিষ্যৎ বা বর্তমান স্পন্দন ভাবনা থেকেই এক উন্মুক্ত প্রবাহের, ভিড়ের সরোবরে সামিল হওয়ার শিহরণ তোলে।

'১৯৬৭' কবিতায় ভেতর বাইরের এক মুক্তি-বন্দির প্রবাহ চলছে, ভিড়ের মধ্যে, মুক্ত মঞ্চের মধ্যেও ব্রাত্যতার শিহরণ, নিঃসঙ্গতার আভাস; সবকিছুই হচ্ছে তবু কিছুই যেন হচ্ছে না, কেমন যেন সময়ের প্রবাহে গা ভাসিয়ে হৈ হট্টগোলের ভিড় রাশি রাশি ছুটে চলেছে কোন শব্দহীন অনিশ্চিত লক্ষে, যেখানে রক্ত-মাংসহীন কঙ্কাল শুধু রাশি রাশি কঙ্কাল অপেক্ষমান।

এই কাব্যগ্রন্থে নাম কবিতা 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'য় জীবনের দৈনন্দিন হৈ হুল্লোরময়, অস্বস্তিকর দমবন্ধ হয়ে আসা পরিবেশের গণ্ডিবদ্ধতা থেকে এক প্রশান্তির প্রতীক স্বরূপ, উন্মুক্ত খোলা ছাদ স্বরূপ শীতকালের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে ব্যাঙের মতো শীতঘুমরূপ এক শীতলতার স্পর্শ পাওয়া যায়। এই কবিতার মধ্যে রয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। ওপার বাংলার মানুষের এপার বাংলার পরিবেশে উদ্বাস্তুর জীবন, খাদ্যাভাব, রাজনৈতিক মতবিরোধ,

মিছিল, হত্যা সব নিয়ে কলকাতার পরিবেশ দমবন্ধকর গৃহবন্দি প্রাণের মতো ছটফটে পরিস্থিতির শিকার। এই কালো জমাটবদ্ধ ছায়াময় একপ্রকার আলোহীন কুঠুরি সভ্যতা থেকে বিরক্ত হয়ে, ব্যাঙের শরীরের মতো হয়ে শীতকালের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে,- "কেন এই দৌড়ে যাওয়া? আমার ভালো লাগে না / শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা আমি তিন মাস ঘুমিয়ে থাকবো।"[৬]

'কবর থেকে উঠে এসে' কবিতায় 'কবর' শব্দটি এখানে মৃত্যুর সোপান হিসাবে নয়, নির্জন- নিঃসঙ্গ বদ্ধ চেতনার শারীরিক উদ্দীপনা হিসাবে উঠে আসে। মাটির তলার জগতের মতো এক অন্ধ কোনঠাসা বন্দি জীবন অবয়বের মাটির ওপরের উল্লাস মঞ্চে জীবনের পথ খোঁজার পথ এই কবিতা। এ যেন ওপর তলা আর নীচের তলার রহস্যময় বাঘবন্দি খেলা, দুটো জগৎ, দুটো অস্তিত্বের ভিড়ে অজস্র নিঃসঙ্গ অবয়ব আর এলোমেলো সহস্র প্রাণের উন্মাদনার বুলি। তারপর বাঁচার লড়াই, বেঁচে থাকার সাঁতার, "সকাল গড়িয়ে তারোপরে, দুপুর অনেক আগে হাত পা ছড়িয়ে ভেসে গেছে/ ফের সন্ধ্যেবেলা ফের কবরের মধ্যে শুয়ে আমি/তুমিও বুঝলে না/ ডাক্তারখানায় যারা ডাক্তারের আগে এসে বসে থাকে, আমি তাদেরই একজন।"[৭]

মুক্ত বাতাসের বহমান ধারায় নৌকার মতো গা ভাসিয়ে দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখি ভাস্কর চক্রবর্তীর এই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' কাব্যগ্রন্থের 'হায় জীবন' কবিতাটিতে। একটা জমাটবদ্ধ কালো ছায়ার আড়ালে জীবন জটিলতার মোড়কে নিমজ্জিত থাকা অস্তিত্ব জ্বালে "আটাশ বছর, তিরিশ বছর, এইরকম ভাবেই কেটে যাবে"[৮] ছেড়ে যাওয়া ভালোবাসার স্পর্শ আর ফিরে পাবে কী না তাও জানে না, তারপরেও একটা প্রাণ খোলা, মুক্ত বাতাসের আকাঙ্ক্ষা করে, অর্জন করতে চেষ্টা করে জীবনের পথ যে পথের আকাঙ্ক্ষায় "কুষ্ঠরোগী মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে"। ঘড়ির কাঁটার মতো একতালে ঘুরতে ঘুরতে এমন এক একটা সময় আসে জীবনে, যখন এক অবর্ণনীয় অর্থহীনতা কাজ করে চেতনায়, — "আমি জানি না জানিনা আমি অর্থহীন বারান্দা/শুধু শুধুই জেগে ওঠে আমার বুকের ভেতরহায়, জীবন"[৯] তার পরেও চলতে থাকে জীবন যাপনের লড়াই, প্রত্যাশিত খোলা জানালার ওপারের বিস্তীর্ণ সবুজতায় শ্বাস নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

'কেন' কবিতায় বর্তমানের জটিল নিঃসঙ্গতা থেকে অতীতের সেই এক ব্যর্থ ধাক্কা খাওয়া একঘেয়েমি অস্তিত্বময় জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন "একটা দিন, আরেকটা দিনের মতো / আরেকটা দিন, আরেকটা দিনের মতো, এইরকম, অস্থিসার, ফাঁকা"[১০] বর্তমানটাও সেরকম অবস্থা থেকে সরে আসে নি। অথচ সেখানে কতকিছু করণীয় ছিল যার সিকিভাগও

করা হয়নি, জীবনকে জীবনের মতো উপভোগ করা হয়নি — "কতশত ব্যর্থ দিন বহে গেল /লাল মোটর গাড়িতে আমার / হাসা হলো না— বিয়ে বাড়িতে, যথাযথ/ হাসা হলো না আমার চিহ্নহীন/ বছর গুলো, ওই পড়ে আছে পিছনে"[১১] এই আক্ষেপ এবং নিঃসঙ্গতা বর্তমান জীবনবোধের প্রতি, নিজের সত্ত্বার মনস্তাত্বিক অস্তিত্বের উদ্ভাসিত চেতনার প্রতি এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, যা জীবনমুখী শিহরণের উত্তর হয়ে আসে।

দিন পেরোতে থাকে পা ফেলতে ফেলতে, আমরা বুড়ো হই ধীরে ধীরে। রাতের অন্ধকারের মতো জীবনের রহস্যময় জটিলতাগুলো জট পাকাতে পাকাতে টেনে নিয়ে যায় মহাকালের পথে। রাত্রির নির্জনতার মতো, একরোখা একঘেয়েমির মতো জীবনের অনেক স্তূপেও একঘেয়ে গণ্ডিবদ্ধ নিঃসঙ্গ প্রবাহ থাকে, যেখানে ইচ্ছে থাকে আকাশছোঁয়া কিন্তু হয়ে ওঠে না। দিনে দিনে শুধু ভাবনার পাহাড় নিয়ে বুড়ো হয়ে যেতে হয়। 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'র 'রাত্রি' কবিতা সেই চেতনাই উপস্থাপিত করেছেন, "ঝরে পড়ছে নক্ষত্র, শব্দ নেই, শুধু মানুষ/ মাদুর পেতে শুয়ে রয়েছে বারান্দায়/মশা মারছে/ বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি"[১২]

'প্রতিশোধ ১' কবিতাতে রয়েছে দুটো সত্ত্বা, একটা ভেতরের একটা বাইরের, দুটো জগৎ আলাদা তবু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। ভেতরের সত্ত্বাটা জানে সে একটা ঘরবন্দি বিছানায় আটকা পড়ে আছে। বাইরের সত্ত্বাটাও যে সেই পথে এবং পরিণতি সেই ভিড়ের মধ্যেও নিঃসঙ্গ, গণ্ডিবদ্ধ অবস্থা তা স্পষ্ট। এই সত্ত্বা দুটো কখনো দুটো পৃথক মানুষ হয়ে যায় আবার একাত্ম হয়ে আসে। কখনো নারী পুরুষের সম্পর্কের ভাঙন ধরা ঢেউ, আবার কখনো প্রেমিক প্রেমিকার ব্যর্থ জীবনের স্পন্দন হয়ে উঠে আসে। কিন্তু দু'দিক থেকে দু'য়েরই অবস্থা সেই এক, ভালোবাসাহীন, সৌন্দর্যহীন, ক্লান্তি আর ক্লান্তি ঘেরা অবসাদ। কিন্তু এই দমবন্ধ হয়ে আসা অস্তিত্ব থেকেও উত্থানের প্রাণ খোলা স্বস্তির আশ্বাস আকাঙ্ক্ষা করেছেন কবিতার এই পর্যায়ে— "তারপর বিশাল ঘন্টা বেজে উঠবে কোথাও একদিন সময় হলে/ মরা মাছের মতো ভেসে উঠবো জলের উপর/মরা মাছের মতো জলের ওপর ভেসে থাকবে তুমি।"[১৩] কখনো কখনো পোস্টমর্ডানিজম এর সুরও এই কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। জীবনটা কী হচ্ছে, কী অবস্থা, কী হতে পারে তার ফলে, এইসব চেতনার স্পন্দন রয়েছে এই কবিতায়।

কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর ছোট বোন পালমুলারি ফাইব্রোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ পাঁচ মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে মারা যায়। এই ছোট বোনের প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় বার বার ফিরে এসেছে। এই মৃত্যু কবিকে বিশেষ ভাবে আঘাত দিয়েছিল, হৃদয়ে আটকেছিল

জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত। তবে 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' কাব্যগ্রন্থের 'ছোটবোন' কবিতাটি শুধু বাৎসল্য রসের স্পর্শেই শেষ হয়ে যায় না, এর অর্থ আরো গভীর। এই ছ'টি লাইনের কবিতা বলে নারী স্বাধীনতার কথা। বলে পুরষকেন্দ্রিক জীবন ভাবনার আবহাওয়ায় নারীদের কেন পুরুষদের সাহারা নিয়ে থাকতে হবে? একই অধ্যায়টাতো তারাও পেতে পারে। সমস্ত ট্যাবু ঘিরে ধরবে কেন তাদেরকেই আজও? কতকাল আরো পাহারা নেবে তারা, কতকাল আর জীবন সঙ্গী না খুঁজে আগলে রাখার দারোয়ান খুঁজবে পুরুষের অবয়বের ভিড়ে,— "আমি কি পাহারা দেবো/ ছোটবোন ঘুমায় যখন/ দুপুরে, আকাশনীল/শরীরের শান্ত কলরব/আমি কি ঘুমাবো পাশে/ছোটবোন ঘুমায় যখন"[১৪] এই কবিতার জার্মান অনুবাদ করেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাটি নিয়ে কবি ভাস্কর চক্রবর্তীকে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছিল, যা তাঁর মতে সঠিক ছিল না। এই আক্ষেপ তাঁর ডায়েরির পাতায় লক্ষ করা যায়, 'শয়নযান' এর 'ছোটবোন' প্রসঙ্গে। কবিতায় বাৎসল্য রস যেভাবে রয়েছে তা যেন স্পষ্ট তেমনি স্পষ্ট এর নারী স্বাধীনতার প্রবাহ এবং সমাজের প্রতি একটা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব, নারীরা স্বাধীন তবুও স্বাধীন নয় এই চিন্তারই পরিস্ফুটন হয়েছে এই কবিতার ছত্রে ছত্রে।

'শুধুমাত্র তোমাকে ৩' কবিতা এক আবেগ আপ্লুত নিঃসঙ্গ চেতনা কোনো এক সম্পর্কের নাগাল পাওয়ার, স্পর্শ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ক্লান্তিহীন শব্দজ্বাল বোনে। তার আলাপী হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব কল্পনা করে গভীর শান্তির স্পর্শ পেতে চায়,— "এক একটা গাছের সঙ্গে/সারাজীবন থেকে যেতে ইচ্ছে করে এক হাজার পাখির মধ্যিখানে/বসে থাকতে ইচ্ছে করে দুপুর বেলা সত্যি/দুপুর বেলা, আরও কত কী করতে ইচ্ছে করে হলুদ শাড়ি পরে/যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাকো বারান্দায়।"[১৫]

'স্টেশন' কবিতাও হতাশাগ্রস্থ, রুগ্ন, জীবনবিমুখ মানুষের কথা বলে, এবং এও বলে যে আরো অধীক সমস্যা নিয়ে মানুষ রয়েছে তবে তারা কিন্তু জীবনবিমূখ হচ্ছে না; তারা খোঁড়া পা, কানা চোখ, অনাথ, চাকরীহীন বেকার হয়েও জীবনের পথে চলার জন্যে লড়াই করে চলেছে, "তুমি এক দৃষ্টে খোঁড়া মেয়েটার দিকে খোঁড়া মেয়েটা/উপহার দিলো তোমাকে এক অবিস্মরণীয় হাসি।"[১৬]

উট যেমন রুক্ষ শুষ্ক বালির ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ স্বাচ্ছন্দে অনায়াসে চলে যেতে পারে, জীবনটাকেও সেরকম রুক্ষ শুষ্ক বাস্তবতার মধ্যে লালিত করে জীবনমুখি সত্যের পথে চালিত করার চেষ্টা, আর ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা ভেসে যাওয়ার অনেকটা দূর উন্মুক্ত কোলাহলময়তায় ঘরবন্দি, আটকে পড়া অভ্যস্ত পরিসর থেকে ছাড়া পেয়ে দৌড়ানোর আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় এই

কাব্যগ্রন্থের ‘উট’ কবিতায় “তোমার আমার জ্বর সন্ধ্যেবেলা/চেয়ে দেখ, ঝুম্পার মা আর ঝুম্পা একা বসে আছে বারান্দায়/এসেছে ফাল্গুন মাস চলে যাইনিয়ে চলো তোমাদের দেশে।”[১৭]

‘শীতকাল কবে আসবে সূপর্ণা’ কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা ‘হারে রে রে’ তে সময়ের জটিলতা তথা কঠোর বাস্তবতার ঘেরাও থেকেই স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফেরার সুর রয়েছে। সুখের আকাঙ্ক্ষা কার না থাকে? এখানেও তা আছে, “ঘুমোতে যাবার আগেই আমি স্বপ্ন দেখি সুখের”। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরিবর্তন হয় পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে, ক্ষয় হয়ে আসে অনেক কিছু, তাই এখানে ধ্বনিত হয়েছে “কাল সমস্ত রাত, আমার পা’র জন্যে /আমি বসে বসে কেঁদেছি আমার পা হায়/আগের মতো নেই আর ক্রমশই রোগা হয়ে যাচ্ছে আজকাল/জুতোই পরতে চায় না কিছুতে”[১৮] তবুও ঘুরে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক গতিতে ফেরার চেষ্টায় পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বাকি প্রাণগুলোতে, যারা ক্ষমতাশীল হওয়া সত্ত্বেও মুষড়ে আছে, আহ্বান করেছেন তাদের জাগরণের মন্ত্রে, “দেখ হে, ওরা চিৎকার করছে দেখ হে ওরা জেগে উঠছে, ওরা আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়”। এই কবিতার সমাপ্তিতে স্বাভাবিক অবস্থায়, মুক্ত মঞ্চে ফেরার, ঘরবন্দি চেতনা থেকে বৃহত্তর জগতে পদার্পনের আশ্বাস রয়েছে, আশ্বাস রয়েছে শান্তির তথা হাসির দিনের “দুর্ভাবনা নেই আমাদের/খুব তাড়াতাড়ি ঐ এসে গেল আমাদের হাসির দিন/ভালো লাগছে খুব, আশে পাশে/দৌড়তে দৌড়তে যাওয়া-আসা করছে মানুষদাড়ি কামাতে, দ্রুত ঐ ঢুকে পড়ছে সেলুনে”[১৯] নকশাল পরিস্থিতি এবং সমকালীন রাজনৈতিক যে দোটানা তার থেকেই একরূপ উৎরে স্বাভাবিকতার উন্মুক্ত বিস্তীর্ণতায় ফেরার আকাঙ্ক্ষা যেন এই কবিতার শেষ পংক্তিগুলো।

এছাড়াও এই কাব্য গ্রন্থের অন্যান্য কবিতাগুলো যেমন ‘দরজা খোলো মা’, ‘দুপুরে’, ‘ছাব্বিশ বছর, আমি’, ‘অসুখ’, ‘চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা চারজন’ প্রভৃতি কবিতাগুলির শ্বাস প্রশ্বাসে এক গভীর নিঃসঙ্গতাবোধ, নীরব একাকীত্বতার সঙ্গে সঙ্গে উঠোন বারান্দার গণ্ডিবদ্ধ অভ্যস্ত জীবন পরিসর থেকেই উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ জীবন সমুদ্রের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, ভাস্কর, কবিতা সমগ্র ১, দে'জ, এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ২২
২. ঐ, পৃ. ২৩৭
৩. ঐ, পৃ. ৩১
৪. ঐ, পৃ. ২৩৮
৫. ঐ, পৃ. ৩৪
৬. ঐ, পৃ. ৩৮
৭. ঐ, পৃ. ৪৯
৮. ঐ, পৃ. ৫০-৫১
৯. ঐ, পৃ. ৫১
১০. ঐ, পৃ. ৫২
১১. ঐ, পৃ. ৫১
১২. ঐ, পৃ. ৫২
১৩. ঐ,পৃ. ৫৩
১৪. ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯
১৫. ঐ, পৃ. ৫৭
১৬. ঐ, পৃ. ৫৮
১৭. ঐ, পৃ. ৬২.
১৮. ঐ, পৃ. ৬৩
১৯. ঐ, পৃ. ৬৪